ভক্তবলয়

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদি ও মধ্যযুগের লীলা-পার্ষদ-চরিত)

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদি ও মধ্যযুগের লীলা-পার্ষদ-চরিত 'ভক্তবলয়' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা' কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতার উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

ভক্তবলয়

[শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদি ও মধ্যযুগের লীলা-পার্যদ্‌-চরিত]

ভূমিকা

শ্রীগুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (পণ্ডিতদা)

ফণিভূষণ রায়, এম. এ. (ট্রিপ্‌ল্‌), এল এল. বি.

শিখা রায়, এম. এ., পি এইচ. ডি, এম. লিব্‌. এস সি

শাণ্ডিল্য প্রকাশন

১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

BHAKTABALAY

By Phani Bhusan Roy & Dr. Sikha Roy

প্রকাশিকা ঃ

শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ

জে ১/২, করিম বক্স রো, কলকাতা - ৭০০ ০০২

ব্যবস্থাপনা ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র রিসার্চ একাডেমি

ফ্ল্যাট নং ২০; ৪৮, টালাপার্ক এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৭

ফোন ঃ ২৫৫৬ ৪০২৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা ভাদ্র, ১৪১১ (১৮ই আগস্ট, ২০০৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১১৭শ আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে

পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ, ১৪১১

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

অলংকরণ ঃ দেবাশীষ পাত্র

০৩৩ ২৫৫৮ ৬৫৫৭

অক্ষরবিন্যাস ঃ

ডিজিটাল অফসেট প্রিন্টার্স

১১২, বিধান সরণী (শ্যামবাজার)

কলকাতা - ৭০০ ০০৪

মুদ্রণ ঃ

আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

৩০শে ভাদ্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ — ১২ই মাঘ, ১৩৭৫

রাঃ স্বাঃ

পরমপ্রেমময়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
অগণিত
ভক্তবৃন্দের করকমলে—

: ভূমিকা :

জগতে সবচেয়ে বড় শিল্পী মা। জননী মনোমোহিনী দেবী গুরুদত্ত যে-নাম পেলেন, সেই নামই তিনি প্রসব করলেন। তাঁর গ্রাম্য জীবন; কিন্তু ভালবাসার দরুন গুরুকে কেন্দ্র করে জগতের ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করে স্বামীভক্তিপরায়ণতার মধ্য দিয়ে স্বর্গে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন । দিকচক্রবালকে প্রকম্পিত করে দয়াল ঐ মায়েরই গর্ভে আবির্ভূত হলেন। ঈশ্বর যখন নিরাকার থাকেন তখন বিজ্ঞান হয়ে থাকেন। প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ তাকেই শিল্প বলে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলতে জননী মনোমোহিনী দেবীকেই আমি বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় জননী মনোমোহিনী দেবী তাঁর পুত্রের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে চার লাইনের যে-কবিতাটি লিখে দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সহজ চলার মধ্য দিয়ে সমস্ত জীবন নিম্নবর্ণিত সেই কবিতার চারটি লাইনই প্রতিপালিত হয়ে চলেছে :

" অকূলে পড়িলে দীন হীন জনে
নুয়াইয়া শির, কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।।"

সহজ মানে জন্মের সঙ্গে যা। প্রেমপ্রীতিভালবাসাবিহীন জগতে প্রেমেরই মূর্ত প্রতীক যখন আবির্ভূত হন, সেই স্থানে প্রবৃত্তি-সঞ্জাত চলার বিরমণ হওয়ায় সমুদ্রগর্ভে নিম্নচাপের দরুন যে ঝড়ের আবির্ভাব ঘটে, প্রেমময়ের অভ্যুত্থান-স্থলেও প্রবৃত্তিপরানিষ্ঠ মানুষের তেমনতরই ঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ঝড়ের মধ্য দিয়ে সাধারণত চার শ্রেণীর মানুষ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে তাদের জীবনের জ্বালার উপশমের আশায়— আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী, জিজ্ঞাসু। প্রেমের অবতার যিনি তিনি প্রত্যেককেই নিজেরই অঙ্গের অংশস্বরূপ মনে করেন। কিন্তু তিনি লৌকিকভাবে প্রেমিক জ্ঞানীর সঙ্গ বেশি পছন্দ করেন বলে মনে হয়।

আকাশ যেমন নিজের সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, তিনিও তাঁর সীমা পান না। মাউন্ট এভারেস্ট আকাশের যতখানি সীমা দিতে পেরেছে, আকাশেরও লীলা তার সঙ্গে ততখানি হতে পেরেছে। বিশ্বজগতের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টারও হওয়া সমান্তরাল ভাবে চলেছে। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, বিশেষ অহংকার-সম্ভূত দৃষ্টিকোণ থেকে গলিত অহং-এর প্রেমের স্পর্শে জীবন আরও সুন্দরভাবে উন্নতিমুখর,

ক্রমোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষার সুষ্ঠু পরিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর দ্বারা পরিপূরিত হয়েছেন তাঁরা, তাঁর প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এতদিন পর্যন্ত যাঁদের মধ্যে ভাবপ্রবোধী স্নায়ু সতেজ হয়ে উঠেছিল, তাঁর প্রতি প্রেমের দরুন তাঁদের কর্মপ্রবোধী স্নায়ু ফুটে উঠতে লাগলে। কী করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাকে রূপায়িত করে তুলতে পারা সম্ভব— ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি সেইদিকে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, পরমপিতার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠতে পারলে আমাদের জীবনের যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর সবকিছুর মধ্যে থেকেও অসংস্পৃষ্ট—এ যেন অণুর মধ্যে তিনি নিউক্লিয়াস স্বরূপ। ভক্তবৃন্দ যেন ইলেকট্রন্‌সের মত নিউক্লিয়াসের টানের মতই তাঁকে কেন্দ্র করে চিন্তা, কর্ম যা কিছু করে চলেছেন। সেইসব ভক্তবৃন্দের জীবন পর্যালোচনা করলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমাদের বোধের মধ্যে আনতে সমর্থ হয়ে উঠি। পরমপিতা তো আলোর মত, আলো যেখানে প্রতিফলিত হয়, তাছাড়া তো তাঁকে দেখা যায় না। আমাদের নানা মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছে আসি, আমরা দেখিও তদনুরূপ। প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে দর্শন করা ছাড়া তিনি তো দৃষ্ট হন না। একটি মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন, —আপনি তো ভগবান, আপনি সব পারেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, — তুই যেমন ভগবতী, আমি তেমন ভগবান।

তাই শ্রদ্ধেয় ফণিভূষণ রায় ও তাঁর সহধর্মিণী শিখা রায় লিখিত ভক্তবৃন্দের এই গাথা পরমপিতাকে দর্শন করবার দৃষ্টি খুলে দেবে—এই আমার বিশ্বাস ।

সৎসঙ্গ, দেওঘর।

২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০২

শ্রীগুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

ঃ প্রস্তাবনা ঃ

সমগ্র প্রাণিজগতের মৌলিক চাওয়াটি হল অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা। সকলেই থাকতে চায়, বাঁচতে চায়, বাড়তে চায় এবং সন্ততির মাধ্যমে অস্তিত্বের ধারা বজায় রেখে যেতে চায়। মানুষ অন্য সব প্রাণীর চেয়ে সেরা—তার আকাঙ্ক্ষাতেও সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিফলন ঘটে। মানুষ শুধু বাঁচতে চায় না, আনন্দে বাঁচতে চায়, এবং তার সত্তার অংশীদার সবখানি পরিবেশকেও নন্দিত, বর্ধিত করে নিজের অস্তিত্বকে সার্থকভাবে উপভোগ করতে চায়। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নানা স্রোতের আবর্তন; তাই একদিকে তার কল্যাণবুদ্ধি, অপর দিকে আক্রমণের শানিত আয়ুধ। প্রেম, করুণা, প্রীতি, স্নেহ, সবই মানুষের গুণ। আবার আদিতম পশুবৃত্তিজাত হিংসা, ক্রূরতা, যাকেই প্রতিপক্ষ বোধ হবে তাকেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি—এসবও মানুষেরই অবগুণ। এই দুই বৈপরীত্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যুগে যুগে মানব অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হয়, এবং সংকটমোচনের প্রয়োজনে আবির্ভাব ঘটে যুগন্ধর মহাপুরুষের।

মানুষ যখন ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিমুখী চলনে নিজেকে এবং পরিবেশকে দূষিত করে তোলে, ব্যতিক্রমী চলনায় মঙ্গলকে ভুলে গিয়ে অমঙ্গলের অর্চনায় অবক্ষয়ের চরমে পৌঁছয়, তখন মানুষেরই অন্তরাত্মা এমন একজন দিশারীকে খোঁজে যিনি তাকে মানসিক ও বাস্তব জীবনের নিম্নতম ধাপ থেকে ক্রমোত্তরণের পথে নিয়ে যেতে পারেন। আর এই সন্ধান, এই আকুল আকাঙ্ক্ষা যখন সামগ্রিকভাবে আন্তরিক হয়, তখন সেই সম্মিলিত আকুতির টানে জাগ্রত হন পরম সত্তা—সর্বগুণাধার ভগবান তখন মানব তথা সমগ্র জীবজগতের কল্যাণে নরদেহ নিয়ে উপযুক্ত আধারে আবির্ভূত হন। এমনই এক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র বাংলার পাবনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ-এর অন্তর্গত) হিমাইতপুর গ্রামে শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মনোমোহিনী দেবীর যে-সন্তানের আবির্ভাব ঘটল, পরবর্তীকালে তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে খ্যাত হন। কিন্তু এক গ্রাম্য বিপ্রসন্তান—প্রথাসিদ্ধ উচ্চশিক্ষারও যিনি বিশেষ সুযোগ পাননি —তাঁর মধ্যকার কোন বিশিষ্টতা তাঁকে সবার প্রাণের ঠাকুর করে তুলল, তা অনুধাবন সাপেক্ষ। অন্য আর পাঁচটা কিশোর কিংবা তরুণের মতই তো ছিল তাঁর চলা, বলা, জীবনযাপন। বাবা-মায়ের শাসন, আদর, বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম —সবই ছিল তাঁর জীবনে আর সমস্ত গ্রামবাসীর মতই। কিন্তু তারই মধ্যে লুকোনো ছিল আগুন—চকিত হাসিতে, চোখের দৃষ্টিতে, ভালবাসতে পারার অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় ঘটত যার স্ফুরণ। কিন্তু সে আগুনের আঁচ টের পাওয়ার সামর্থ্য প্রাথমিক

পর্যায়ে খুব কম সংখ্যক মানুষেরই হয়েছিল, যাঁরা পরবর্তীকালে সেই প্রেমানলের ছোঁয়ায় প্রজ্জ্বলিত আপন প্রাণের প্রদীপ থেকে জ্বালিয়ে দিতে পেরেছেন অগণ্য দীপ প্রাণ হতে প্রাণান্তরে। ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হলে বাহ্যিক মানবীয় আবরণের অন্তরালে তাঁর ঐশী শক্তিকে চিনতে পেরে, তাঁতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে তাঁরই অমৃতবার্তা জনে জনে পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না—সর্বযুগেই মুষ্টিমেয় কিছু ভক্তপ্রাণ মানুষ এই অধিকার লাভ করেন। তাঁরা পূর্ব হতেই পরমপুরুষ-নির্ধারিত হয়ে থাকেন হয়তো। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

পরমপ্রেমময়ের প্রেমের আঙিনায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁর লীলার আদি ও মধ্যপর্বে, তাঁদের মধ্য থেকে কুড়িজন ভক্তের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'ভক্তবলয়'। এছাড়াও আরও নিত্যপার্ষদ্ ও লীলাসঙ্গী ছিলেন, উপযুক্ত তথ্যাভাবে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না। 'ভক্তবলয়' বস্তুতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববিকিরণের জ্যোতির্বলয়। এঁরা যত বেশি স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে ততখানিই প্রতিফলিত হয়েছেন সেই পরম প্রকাশ। এঁদের জীবনকথা তাই দয়াল ঠাকুরের লীলাকথা। সাধন-ভজন, ইষ্টনিষ্ঠা ও ইষ্টবাহী চলন যে কত ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, ভক্তজীবনী যেন তারই দৃষ্টান্ত।

গুটিকয়েক থেকে আজ কোটিতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যসংখ্যা। এঁদের কাছে প্রথম যুগের ভক্তরা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। ইতিহাসের সেই ভুলে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের উন্মোচনের প্রয়োজনে এই জীবনীর প্রয়াস। পূর্বগ যাঁরা, তাঁদের না জানলে, না বুঝলে বর্তমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই পূর্ব- পূর্বের আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথসন্ধানের উদ্দেশ্যেই 'ভক্তবলয়' এর মালিকা-গ্রন্থন।

'ভক্তবলয়'-এ জীবনীগুলি সময়ের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। সময় বলতে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আসা ও দীক্ষাগ্রহণের সময় বুঝতে হবে। কুড়িজন ভক্তের মধ্যে প্রথম জন কিশোরীমোহন দাস। শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ে বয়সে আট বছরের বড়, দুরন্ত, লোকত্রাস কিশোরী পরশপাথরের ছোঁয়ায় কীভাবে লোকত্রাণে পরিণত হলেন, কেমন করে 'ভূতে পাওয়া'-র মত তাঁকে 'ভগবানে পেয়েছিল'—তারই যথাসাধ্য বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবিস্মরণীয় উক্তি ". . . প্রথমেই যারা গ্রহণ করেছিল, তারা মাত্রই দুইজন। সে একজন আমার কৈশোরের খেলার সাথী—আমার অনন্ত মহারাজ—আর একজন কিশোরীমোহন দাস।" সর্বশেষে জীবনীটি যাঁর, তিনি ভক্তবলয়ের অর্ন্তভুক্ত একমাত্র জীবিত ভক্ত প্রফুল্লকুমার দাস—জন্ম ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রধান বাণীলেখক, 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' মহাগ্রন্থের সংকলক, অনন্য শ্রুতিধর এই ক্ষণজন্মা পুরুষটি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ". . . প্রফুল্ল একেবারে চুর হয়ে গেছে।

কোন্ মহাপুরুষ ও তা আমি জানি না। কিন্তু ও যা পেয়ে গেল কত হাজার বছর পরে এতখানি কেউ পাবে জানি না।. . . " শ্রীশ্রীঠাকুরকে যথাযথভাবে পরিবেশনের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-র সংকলনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি : ". . . প্রফুল্লর বইগুলি তাড়াতাড়ি ছেপে ফেলা দরকার। Conversation (কথোপকথন) -গুলি Wonderful (অপূর্ব) জিনিষ হয়েছে। এত সহজ, এত সুন্দর, আমার সামনে যখন পড়ে, আমিই মুগ্ধ হয়ে যাই। . . . "

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য লীলাপার্ষদ্ অথবা আশ্রমিক না হওয়া সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ঠাকুরের সাহচর্য বা সান্নিধ্য বাহ্যত খুব বেশি না পেলেও দেশবন্ধুর অন্তরলোকে তাঁর আসন ছিল গভীরভাবে প্রোথিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিপত্তি তখন ছিল ভারতবর্ষব্যাপী—জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে তাঁর প্রভাব ও স্থান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সবকিছু ফেলে রেখে তিনি নিজেকে নিঃশেষে সদ্‌গুরুর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবান্দোলনের প্রত্যক্ষ শরিক হতে চেয়েছিলেন একান্ত আগ্রহে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার গভীরতা ও হৃদয়ের সুতীব্র আকুলতা তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রা। মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইষ্টৈকান্তিকতাই এখানে বিবৃত হয়েছে।

পর্যাপ্ত সূত্র না পাওয়ায় প্রতিটি জীবনীর তথ্য ও কাহিনী সর্বক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়নি। তবে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে সম্ভাব্য সব ধরনের তথ্যসূত্র আহরণের। সম্ভব হয়েছে এঁদের প্রত্যেকের দুর্লভ আলোকচিত্র সংগ্রহ করা। প্রায় সকলেরই জন্ম ও শ্রীদাস ব্যতীত অন্যদের মৃত্যুর সাল এবং অপর জন্ম, অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের সালও বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে আরও দুটি রচনা — ১) শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ২) নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হ'তে। পরিশিষ্ট অধ্যয়নে এই দুটি রচনার তাৎপর্য বোঝা যাবে। পাঁচ/ছয় বছরের প্রয়াসে 'ভক্তবলয়' পূর্ণতা পেয়েছে। তথ্যসংগ্রহের উৎসে কিছু পুরোনো বই ও পত্রিকা রয়েছে, তবে প্রবীণ ইষ্টভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া, ভক্তবৃন্দের পরিবারবর্গের কাছেও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও তথ্য সংযোজন-সংশোধন পাওয়া গেছে। সকলকে জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। এই গ্রন্থ প্রণয়নের রূপরেখা নির্ণয়ে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র এবং সৎসঙ্গের বর্তমান সংঘাচার্য পূজ্যপাদ দাদা (শ্রীযুক্ত অশোক চক্রবর্ত্তী)-র লেখা পত্রের কিয়দংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রেরণাপ্রদ : ". . . আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম যুগের ভক্তদের জীবনী রচনা করছেন। এটা খুবই ভাল কাজ। তবে লেখার সময় সবসময় মনে রাখবেন, এই সব মানুষেরা প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দীপ্তিতে উজ্জ্বল বলেই বরণীয়। এঁদের নিষ্ঠা ও সাধনা পরবর্ত্তীদের প্রেরণা-স্বরূপ নিশ্চয়ই। তবু শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পরম সত্য এই যে, দয়াল ঠাকুরই আমাদের একমাত্র প্রিয়পরম। তিনিই ধ্যেয়, অনুসরণীয়, পূজ্য এবং একমাত্র

নিয়ন্তা।. . .” ভক্তবলয় উপস্থাপনায় পূজ্যপাদ দাদার এই অমিয় উপদেশ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথাসাধ্য প্রযত্ন নেওয়া হয়েছে। তাঁর এই মূল্যবান সংকেত আমাদের জীবনচলনায় নিত্য স্মরণীয়। গ্রন্থটি নিয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ পরবর্তী চিঠিটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে — “ ... ‘ভক্তবলয়’ পাঠ করবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আছি”। এতদিনে তাঁর সেই প্রতীক্ষার মর্যাদা দিতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি। পূজ্যপাদ দাদার চিঠি দুটির প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট করা হল।

‘ভক্তবলয়’ প্রণয়নের পরিকল্পনা পর্ব থেকে শুরু করে প্রতি স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, প্রেরণা এবং নিরন্তর প্রণোদনা দান করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পৌত্র পূজ্যপাদ শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। বহু তথ্যের সংযোজন, সংশোধনেও তাঁর ঐকান্তিক সহায়তা পেয়েছি। তাঁর মঙ্গল-আর্শীবাদ আমাদের নিয়ত সহায়।

কাল-অতিক্রান্ত সাহিত্য-শিল্পী ভক্তপ্রবর শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অবিরাম তাগাদা এবং নিরবধি প্রেরণা ও পরামর্শ ‘ভক্তবলয়’-এর পরিধি প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, গ্রন্থের নামকরণও তাঁরই। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গতানুগতিকতার উর্দ্ধে তাঁর স্থান।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সৎসঙ্গে ‘পণ্ডিতদা’ নামে যিনি সমধিক খ্যাত। ঋত্বিগাচার্য্য ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ আত্মজ, আশৈশব আশ্রমে লালিত, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহসান্নিধ্যস্নাত পণ্ডিতদা তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ পাণ্ডিত্য নিয়ে বিশিষ্ট প্রবীণ আশ্রমিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অনবদ্য শৈলীতে রচিত তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গ্রন্থের সম্পদ।

প্রকাশিকা শ্রীমতী চন্দনা ঘোষের সহযোগিতায় গ্রন্থপ্রকাশ ত্বরান্বিত হল; এছাড়া, বন্ধুবর শ্রীঅরুণ দে, শ্রীনিতাইচন্দ্র ভক্ত এবং শ্রীদিলীপ সেনের নিয়ত সহায়তার জন্য তাঁদের জানাই সকৃতজ্ঞ প্রীতি। দয়াল তাঁদের নিত্য-মঙ্গলে রাখুন, এই প্রার্থনা। ভক্তবলয় পাঠে মানুষের অন্তরে যদি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকুলতা বৃদ্ধি পায়, নিষ্ঠা ও ইষ্টস্বার্থ যদি স্থান পায় ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে, তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করে তোলার সংকল্প যদি জন্ম নেয় কারও প্রাণে, তবেই আমাদের প্রয়াসের সার্থকতা।

ফণিভূষণ রায়
শিখা রায়

ফ্ল্যাট নং ২০;
৪৮, টালাপার্ক এভিনিউ
কোলকাতা - ৭০০ ০৩৭
দূরভাষ : ২৫৫৬ ৪০২৬
তাং : ২২শে শ্রাবণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক: শান্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

SATSANG

P. O. SATSANG
Dist. DEOGHAR (BIHAR)
PIN—814 116

Date 29. 5. 97

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু
মাসিমা,

আপনার 19.5.97 তারিখের চিঠি পেলাম। আপনার পা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। দয়া করে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবেন। বিশেষ করে আমার মত আপনারও যখন শরীর সামর্থ্য নাই তখন সাবধানে সচেতন ভাবে চলাফেরা করাই শ্রেয়।

আপনি মনে করে আত্মজীবনীটি সম্বন্ধে জানিয়েছেন এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা। বইটি আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আমরা পাঠিয়েছি।

আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম যুগের ভক্তদের জীবনী রচনা করছেন। এটা খুবই ভাল কাজ। তবে লেখার সময় সব সময় মনে রাখবেন, এই সব ভক্তদের প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েই রয়েছেন। এঁদের নিষ্ঠা ও সাধনা পরবর্তীদের প্রেরণা যুগিয়ে দিয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পরমসত্য এই যে, দয়াল ঠাকুরই আমাদের একমাত্র প্রিয়পরম। তিনিই শ্রেয়, অনুসরণীয়, পূজ্য এবং একমাত্র নিয়ন্তা। সেই পরম প্রেমময়ের কোন কিছু যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তাঁকে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমান্তরাল করে তুলে ধরা হয়েছে তাতে আমাদের ঠাকুরের সাধনায় কিছু ক্ষতি হয়েছে বলেই মনে করি। নিজের জীবনসাধনায় আমার এবং আমার প্রিয়পরম দয়ালের মধ্যে আর কিছু থাকলে অন্যায় হবে সন্দেহ নাই, সুতরাং দয়া করে এদিকে খেয়াল রাখবেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

(ঠ)

জানি তোমার অনুলিখিত বই, বাবার সাথে কথা
মনে মনে লিখেছিল। অসাধারণই হয়েছে কাজটা।
ঠাকুর বাবার সাথে সাথে আমিও কম শুনিনি।

ভাল থাকবে। সুস্থ থাকবে অনায়াসে।
অনুরাগী হয়ে থাকবে।

পরমপিতা মঙ্গল করুন।

ইতি
প্রীতিবদ্ধ
শশাঙ্ক চক্রবর্তী

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সূচীপত্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

কিশোরীমোহন দাস

১৪ই চৈত্র, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ — ১৯শে বৈশাখ, ১৩৫১

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কিশোরীমোহন দাস

ভক্ত ও ভগবান, দুটি কথা পরস্পরসাপেক্ষ। ভগবান বা ভজমান, যিনি ভক্তের যাবতীয় অনুরাগ, ভক্তি ও ভালবাসার কেন্দ্র, তাঁকে ব্যতীত যেমন ভক্ত শব্দের তাৎপর্য নেই, তেমনই ভজনা করার কেউ না থাকলে ভগবান তাঁর ষড়ৈশ্বর্য উন্মোচনের আধার পান না। অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে তাই ভক্ত ও ভগবান, দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভগবত্তা উপলব্ধি করে তাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার দায়িত্ব সর্বপ্রথমে যাঁরা বহন করে ধন্য হন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন ঠাকুরের আবাল্য পরিচিত কীর্তনের ঋষি কিশোরীমোহন দাস।

কিশোরীমোহনের জন্ম হয় ১২৮৭ সালের ১৪ই চৈত্র দোল পূর্ণিমায়। পিতা কেশবলাল দাস ছিলেন বৈষ্ণব। হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম প্রতাপপুরে মাঝিপাড়ায় ছিল তাঁদের নিবাস। কিশোরীমোহনের প্রথাগত শিক্ষালাভ বিশেষ হয়নি, অল্প বয়সে 'কমপাউন্ডারী' বিদ্যা শিক্ষা করে নিজের বাড়িতে ডিস্‌পেন্‌সারি খোলেন। পরবর্তী কালে এ কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেন।

যৌবনে কিশোরীমোহন ও তার দুর্বিনীত অনুচরদের ক্রিয়াকলাপকে গ্রামবাসীরা সুনজরে দেখতেন না। কিশোরীমোহনের অনুচরদের মধ্যে অনেক মদ্যপ, উগ্র প্রকৃতির যুবক ছিল; তাদের অনিয়ন্ত্রিত, অশিষ্ট আচরণ গ্রামবাসীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এসব কিছু জানা সত্ত্বেও অনুকূলচন্দ্র কিশোরীমোহনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন এবং আদর করে 'ডাক্তার' বলে ডাকতেন। গ্রামবাসীদের কাছে অনুকূলচন্দ্র ছিলেন আদর্শ, তাঁর চরিত্রমাধুর্য, সেবামাহাত্ম্য তাঁকে করে তুলেছিল সবার প্রিয়জন। সবার ভয় ছিল, এহেন চরিত্রবান যুবক কুসঙ্গে অধঃপাতে যাবে, তাই এই সঙ্গ পরিহার করতে সকলেই অনুকূলচন্দ্রকে বিশেষ উপদেশ দিতেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্র এই উপদেশে কান দিতেন না। পিতামাতারও যথেষ্ট ভর্ৎসনা, তিরস্কার পুত্রকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করতে পারেনি।

আত্মসচেতন অনুকূলচন্দ্র জানতেন, কোনভাবেই কিশোরীমোহনের প্রভাবাধীন তিনি হতে পারেন না, বরং কিশোরীমোহনের চরিত্র সংশোধন করে সৎপথে আনা সম্ভব। মাতৃভক্ত অনুকূলচন্দ্র জননীদেবীকে বুঝিয়ে বলেন, "মা, তুই মোটেই ভয় করিস না। যদি কিশোরীর পাল্লা ভারী হয়, তবে আমি কিশোরীর দিকে যাব, আর আমার পাল্লা যদি ভারী হয়, তবে কিশোরীই আসবে আমার দিকে। তুই দেখ্ না কার পাল্লা ভারী হয়।"

কিশোরী ভাল কীর্তন করতে পারতেন। তাঁর চরিত্র সংশোধনের জন্য অনুকূলচন্দ্র এই সুযোগটির সদ্‌ব্যবহার করেন। কিশোরমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তিনি একটি কীর্তনের দল গঠন করেন এবং প্রত্যহ কিশোরীর বাড়িতে কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। অনুকূলচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে কিশোরীমোহন অনুচরবৃন্দসহ কীর্তনে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সংকীর্তনের সঙ্গে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ এবং সদ্‌আলোচনায় তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি,

প্রেমপ্রীতির উন্মেষ হতে থাকে। যতই দিন যেতে থাকে, ততই তাঁরা আদর্শানুসরণে আপ্রাণ হয়ে ওঠেন। পঙ্কের মধ্য থেকে পঙ্কজ প্রকাশিত হয়ে উঠতে থাকে সূর্যের প্রভাবে।

কিশোরমোহনের পরিবর্তন অভাবনীয়। সর্বদাই এক ভাবোন্মাদনায় বিভোর হয়ে থাকেন। ভগবানকে লাভ করার এক দুর্বার প্রেরণা, ব্যাকুলতা তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। সুযোগ বুঝে অনুকূলচন্দ্র কিশোরীকে তৎকালীন প্রখ্যাত সাধক ঠাকুর হরনাথের সঙ্গ করার জন্য প্রায়ই তাঁর সোনামুখী আশ্রমে পাঠাতেন। ঠাকুর হরনাথের পুণ্যপরশে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণের আকুলতা প্রকাশ করায় ঠাকুর হরনাথ কিশোরীমোহনকে বুঝিয়ে বলেন—'যিনি যুক্তিপরামর্শ দিয়ে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনিই তোমার গুরু। তিনি সদ্‌গুরু, যুগপুরুষোত্তম। তাঁর সঙ্ঘ গড়ার সময় হয়েছে। তুমি সর্ব মনপ্রাণ দিয়ে তাঁরই অনুসরণ কর, তোমার পরম মঙ্গল হবে। আমিও তো তাঁতেই আছি।' তাঁর এই কথা কিশোরীর বিশেষ পছন্দ হল না এবং স্বভাবতই তিনি ভাবলেন যে তিনি দীক্ষাগ্রহণের অনুপযুক্ত বলেই ঠাকুর হরনাথ তাঁকে এসব কথা বলে নিরস্ত করছেন।

অনুকূলচন্দ্রের আকর্ষণ কিশোরীমোহনের কাছে খুবই জীবন্ত; তাঁর চরিত্রের দ্যুতি, উচ্চমার্গের ধ্যানধারণা, বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব, সেবাপরায়ণতা এ সবই কিশোরীর একান্তভাবে জানা। কিন্তু তাঁর থেকে বয়সে বেশ কিছুটা ছোট ছেলেবেলার এই বন্ধুটির যত গুণই থাকুক, তিনি কি সদ্‌গুরু হওয়ার উপযুক্ত? এই সংশয়ে কিশোরীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। আবার ঠাকুর হরনাথের কথাই বা অবিশ্বাস করবেন কী ভাবে! অবশেষে তাঁর মনে হল, যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ পুরুষ, অতএব অনুকূলচন্দ্রকে পরীক্ষা করবেন তিনি। যদি তাঁর কার্যকলাপে অন্তর্যামিত্বের পরিচয় পান, তবেই তিনি তাঁকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করবেন। এরপর চলল কিশোরীমোহনের নানাধরনের নানা পরীক্ষার পালা; তাঁকে তো নিশ্চিত হতেই হবে—বেলা বয়ে যায়, আর তো দেরি করা চলে না!

একদিন গভীর অমাবস্যার রাত্রে কিশোরীমোহন একাকী নির্জন শ্মশানে সাধনায় বসে আকুলভাবে ভগবানকে ডাকছেন—দয়াল, কোথায় তুমি, একটিবার দেখা দাও, অভাগার তাপিত প্রাণ শীতল কর। ঠিক এই সময়ে শুনতে পেলেন অনুকূলচন্দ্রের কন্ঠের 'ডাক্তার, ডাক্তার'—এই ডাক। জনহীন শ্মশানে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছু নয় ভেবে কিশোরী উচ্চৈঃস্বরে রাম নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। আবার শুনতে পেলেন, 'রাম নাম করছ কেন? আমি ভূত নই, আমি অনুকূল।' এবার কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে কিশোরীমোহন বলেন—তুমি যদি অনুকূল হও তবে এমন অসময়ে এখানে এসেছ কেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল— তোমার জন্যই এখানে এসেছি, চল, বাড়ি চল। ইতিমধ্যে অনুকূলচন্দ্র কিশোরীমোহনের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। অনুকূলচন্দ্র চলেছেন আগে আগে, কিশোরীমোহন তাঁর

পিছনে। কিশোরীমোহনের সন্দেহ তখনও যায়নি; তিনি শুনেছিলেন ভূতপ্রেতের পা মাটিতে পড়ে না, তাঁর সহযাত্রীর পা মাটিতে পড়ছে কিনা, তা বিশেষভাবে লক্ষ করতে থাকেন। অমনি সহযাত্রীটি বলে উঠলেন, ডাক্তার, পা ঠিক মাটিতে পড়ছে, আমি ভূত নই, তুমি নির্ভয়ে চল। কিশোরীমোহন অবাক বিস্ময়ে ভাবেন—তবে কি ঠাকুর হরনাথের কথাই ঠিক?

কিশোরীমোহনের সন্দেহ তবু যায় না। আরও পরীক্ষা করার বুদ্ধিতে মনে চিন্তা এল — ও যদি এখন পদ্মায় ডুব দিয়ে আসে তবে আমার মনে কোন সংশয় থাকবে না। যেমনি ভাবা অমনি অনুকূলচন্দ্র বলে উঠলেন—ডাক্তার, দাঁড়াও, জুতোয় ময়লা লেগেছে মনে হচ্ছে, পদ্মায় একটা ডুব দিয়ে আসি। গভীর রাতে মাঘ মাসের শীতে অনুকূলচন্দ্র গায়ের জামাকাপড়সুদ্ধ পদ্মায় নেমে স্নান করে এলেন এবং উভয়েই বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছুটা এগোনোর পর কিশোরীমোহনের সন্দিগ্ধ মন ভাবতে লাগল—এমনও তো হতে পারে যে সত্যিই ওর পায়ে ময়লা লেগেছে আর তাই স্নান করে এল। যদি আরেকবার স্নান করে আসে তবেই পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এর পরে অনুকূলচন্দ্র বাড়ি পৌঁছেই স্নানের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললেন—ডাক্তার, দেহের ময়লা ধুলেই যায়, মনের ময়লা কিন্তু সহজে দূর হয় না। তাহলে আর একবার স্নান করে আসি, কি বল? এই বলে আর একবার স্নান করে এলেন।

বিস্ময়ে অভিভূত কিশোরীমোহনের ইচ্ছা হল তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়তে। কিন্তু পরক্ষণেই অহংবোধ মাথা চাড়া দেয়, ভাবেন—অনুকূল যদি কাল কারও কাছে বলে দেয় যে কিশোরী ভগবান বলে পা ধরেছিল, তবে যে লোকে লজ্জা দেবে। কিন্তু আবেগে ভেসে যায় অহং, অন্তর্যামী অনুকূলচন্দ্রের চরণে লুটিয়ে পড়েন কিশোরীমোহন। অনুকূলচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন—এই যে ডাক্তার ভগবান বলে আমার পায়ে পড়লে, কাল সকল লোককে বলে দেব। কিশোরী বুঝলেন, অনুকূল প্রকৃতই অন্তর্যামী। তখনকার মত দ্বিধাহীন হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে জিজ্ঞাসা করেন,—ঠাকুর, তুমি শ্মশানে এলে কী করে? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন, দেখ, সেতার বা এসরাজে অনেক তার থাকে, তার একটাতে ঝঙ্কার দিলে অন্যগুলিতেও ঝঙ্কার ওঠে। তেমনই ভাই, তোমার কান্না, তোমার আকুল আহ্বান আমার মনে বড় বাজে। আর শ্মশানে কাজ কী ভাই? যা পাবার তা তো পেয়েছ। মনে রেখো, ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে।

এত পরীক্ষার পরও কিশোরীমোহন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় অনুকূলচন্দ্র সত্যিই সর্বজ্ঞ সদ্‌গুরু, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বিরুদ্ধ চিন্তার স্রোতে দিশাহারা হয়ে পড়েন। ভাবেন—না আছে অনুকূলচন্দ্রের সাধন-ভজন, না আছে কঠোর শাস্ত্রজ্ঞান। দ্বিধাগ্রস্ত মনে আবার আসে পরীক্ষা করার চিন্তা। একদিন একজোড়া খেজুড়ের গুড়ের সন্দেশ কিনে এনে পটের পিছনে রেখে ভাবেন, অনুকূল যদি কীর্তনের পর সন্দেশ দুটি চেয়ে খায় তবে বোঝা যাবে সে প্রকৃতই

অন্তর্যামী। তখন রোজই কীর্তন হয় কিশোরীর বাড়িতে, অনুকুলও অংশ নেন তাতে এবং কীর্তনের পর জল খেয়ে বাড়ি চলে যান। সেদিন কীর্তনের পর জল না খেয়েই বাড়ি চলে যান। অন্তর্যামিত্বের সাড়া না পেয়ে কিশোরীমোহন আবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে অনুকূল কিশোরীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলেন, রোজ রোজ শুধু জল খেয়ে যাই, আজ কিন্তু জোড়া সন্দেশ চাই, তখন অত লোকের সামনে চাইতে পারিনি। কিশোরী সহজভাবে বলেন, এত রাত্রে এখন সন্দেশ কোথায় পাব? উত্তরে অনুকূলচন্দ্র বলেন—আজ যে বাজার থেকে সন্দেশ এনে পটের পিছনে লুকিয়ে রেখেছ—এই বলে নিজেই পটের পিছন থেকে সন্দেশ বের করে সন্দেশসহ জল খেয়ে বাড়ি চলে যান। কিশোরীমোহন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবেন, কত পরীক্ষা করলাম, প্রমাণও পেলাম, তবু মনের অবিশ্বাস যায় না। আত্মধিক্কারে মন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

স্থির বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে পৌঁছতে কিন্তু কিশোরীমোহনকে আরও সংশয়ের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। একবার দুটো পাত্রে ভোগ সাজান কিশোরী; একটি ভোগ ঠাকুর হরনাথের নামে, অপরটি অনুকূলচন্দ্রের নামে নিবেদন করে মনে মনে ভাবেন, অনুকূল যদি নিজে থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগটি গ্রহণ করেন তবে চিরদিনের মত সন্দেহের অবসান হবে এবং ঠাকুর হরনাথের কথামত তাঁকেই গুরু বলে গ্রহণ করব। ভোগ নিবেদনের বেশ কিছু পরে অনুকূলচন্দ্র তাঁর কীর্তনের সঙ্গী দুর্গানাথ সান্ন্যালকে সঙ্গে নিয়ে কিশোরীর বাড়িতে এলেন। সজ্জিত ভোগদুটি দেখে উৎফুল্ল হয়ে আহারে বসে দুটি ভোগই নিজের কাছে টেনে এনে বলেন—দুই কি আছে ডাক্তার, সবই এক। এটাও আমার, ওটাও আমার—এই বলে দুর্গানাথকে একটি ভোগ দিয়ে অপরটি নিজে গ্রহণ করেন। অনুকূলচন্দ্র যে ভোগটি গ্রহণ করেন, সেটি ছিল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ।

কিশোরীমোহনের ভাবের যেমন অন্ত নেই, তেমনই শেষ নেই পরীক্ষারও। কীর্তনের চরম অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র তখন প্রায়শই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা। অনুকূলচন্দ্রের দেহে কোন অনুভূতি আছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য একবার একটি জ্বলন্ত টিকে তাঁর ঊরুতে চেপে ধরেন কিশোরী। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি পুড়ে যায়। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের কোন সাড়া পাওয়া যায় না, যেমন অচৈতন্য ভাবে পড়ে ছিলেন তেমনই পড়ে রইলেন তিনি। চেতনা আসে অনেক পরে, সমাধিভঙ্গের পর। অনুশোচনায় দীর্ণ হয় কিশোরীমোহনের অন্তর। সকলের আশ্রয়স্থল অনুকূলচন্দ্র সবকিছুরই প্রশ্রয় দেন।

সীমাহীন এই প্রশ্রয়ই কিশোরীমোহনের উত্তরণের পথ মসৃণ করে। প্রেমভক্তি আর ভালবাসার পথ অবারিত হয় চিরতরে। কিশোরীমোহনের দীক্ষা হয় পুরুষোত্তম-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীর কাছে। একদা লোকত্রাস কিশোরীমোহন রূপান্তরিত হন লোকত্রাণ কিশোরীমোহনে, হয়ে ওঠেন অগণিত মানুষের ভালবাসা, প্রেরণা ও

নির্ভরতার কেন্দ্রস্থল। তথাকথিত লেখাপড়া তেমন করেন নি, ছিল না সুগ্রথিত ভাষার বাঁধুনি, অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরামভাবে বলে যেতেন পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবন-কাহিনী। আবেগাপ্লুত হয়ে শ্রোতারা শুনতেন মনোহরণ সেসব কথা। তাঁর চলাফেরা কথাবার্তায় প্রকাশ পেত স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরীয় ভাব— মুখচোখের দিব্য বিভা আকর্ষণ করত ভক্তপ্রাণ মানুষকে। গর্ব করে বলতেন, মানুষকে ভূতে ধরে, আমাকে ভগবানে ধরেছে। আমি না করেছি এমন অকাম নেই, কিন্তু ঠাকুর আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কথা বলা ছাড়া উপায় নেই।

একবার কোন একটি নিষিদ্ধ কাজের প্রতি কিশোরীমোহনের খুব ঝোঁক চাপে। হয়তো কাজটি করেও ফেলতেন—কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই রাত্রে কতগুলি মৌমাছি কিশোরীমোহনের লেপের মধ্যে ঢুকে তাঁকে দংশন করে। এই দংশনে তিনি গুরুর অপরিসীম কৃপা অনুভব করে যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দলাভ করেন, কারণ এই ঘটনায় তাঁর মন থেকে অবৈধ চিন্তা দূর হয়ে গেল। দংশন-কাহিনী তিনি আর কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। পরদিন সকালে ঠাকুরের কাছে কিশোরীমোহন এলে ঠাকুর বলেন, ডাক্তার, মৌমাছির কামড় কেমন? কিশোরীমোহন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন— কে বলেছে যে আমাকে মৌমাছি কামড়িয়েছে? তখন ঠাকুর তাঁর নিজের শরীর কিশোরীমোহনকে দেখালেন। কিশোরীমোহন দেখলেন তাঁর শরীরে যেখানে যেখানে মৌমাছি দংশন করেছিল, ঠাকুরের শরীরেও ঠিক সেই সেই স্থানে মৌমাছি দংশনের স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। ভক্তের রক্ষাকল্পে ভগবানের আত্মনিগ্রহের লীলা চিরন্তন।

শীতকাল, রাত প্রায় এগারোটা। শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্গানাথ সান্ন্যালকে বলেন, দুর্গানাথদা, আপনি এখনই গিয়ে কিশোরীকে কিছু খাওয়াতে পারেন? আজ্ঞে, আপনার আদেশ হলে পারি—এই বলে দুর্গানাথদা মহানন্দে কিশোরীমোহনের বাড়ি গেলেন। সেখানে তখন সকলে কীর্তনের পর শয্যা গ্রহণ করেছে। অগত্যা দুর্গানাথদা এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে স্টীমার ঘাটে গিয়ে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভাল খাবার কিছু না পেয়ে চিঁড়ে ও খাগড়াই মুড়কি কিনে এনে কিশোরীমোহনকে ডাকেন। কিশোরীমোহন সব শুনে খাবারের কিছুটা বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে অবশিষ্টাংশ নিজে খেতে আরম্ভ করে, অশ্রুসজল নয়নে বলতে থাকেন—ঠাকুরের কী কৃপা! আজ রাত্রে আমাদের কারও আহারাদি হয়নি, পরম দয়াল অন্তর্যামী জানতে পেরেছেন বলে আপনাকে দিয়ে এই খাদ্যসামগ্রী আনিয়ে দিলেন! এমন সময়ে ঠাকুরের অপর পরম ভক্ত অনন্তনাথ রায় (মহারাজ) এক ঠোঙা রসগোল্লা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন— দুর্গাদা, আপনি শুকনো চিঁড়ে দিয়েছেন, ও কি খেতে পারা যায়? এই নিন, এই রসগোল্লা খেতে দিন। সেই রসগোল্লা কিছু বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কিছু কিশোরীমোহন পরম তৃপ্তিভরে খেলেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর অনন্তনাথ দুর্গানাথকে নিয়ে আশ্রম অভিমুখে রওয়ানা হলেন। অনন্তনাথকে অনুসরণ করে দুর্গানাথ এগিয়ে চলেছেন, হঠাৎ চোখের পলকে অনন্তনাথকে আর দেখতে পেলেন না। বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে

দুর্গানাথ দ্রুত আশ্রমে এসে দেখলেন ঠাকুর ও অনন্তনাথ যে ঘরে থাকেন, ঘরটি ভিতর থেকে বন্ধ। ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন দুর্গানাথ; চিৎকারের শব্দে ঠাকুর ও অনন্তনাথ ঘুম ভেঙে ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসেন। দুর্গানাথ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন, কিশোরীমোহনের বাড়িতে অনন্তনাথ যাননি, চতুর চূড়ামণি ঠাকুরেরই আর এক লীলাভিনয় হল তাঁর পরম ভক্তের গৃহে।

একবার কিশোরীমোহনের ঘরে কোন আর্থিক সংকুলান নেই, এমনকী ঘরে কোন খাদ্যসামগ্রীও নেই। এমতাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর এসে কিশোরীমোহনের কাছে মালপোয়া খেতে চান। কিশোরীমোহন হাতের আংটি বন্ধক রেখে ঠাকুরের জন্য মালপোয়া নিয়ে এলেন। ঐ দিনই ডাক্তারি ও বাকি আদায় বাবদ পঁচাত্তর টাকা উপার্জন হয়। এর কিছুদিন পরে অনুরূপ আর্থিক অনটনের মধ্যে ঠাকুর এসে এক কৌটো সিগারেট চান কিশোরীমোহনের কাছে। কিশোরী কালবিলম্ব না করে পুনরায় আংটি বন্ধক রেখে আড়াই টাকা দামের এক কৌটো সিগারেট এনে ঠাকুরকে দেন। আগের ঘটনা হেতু এবারে বৃহত্তর লাভের বাসনা তাঁর মনে গোপনে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু এবারে এরপর সাতদিনের মধ্যে তাঁর আর কোন উপার্জন হল না। উপরন্তু অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে জনাকয়েক অতিথি এসে হাজির হলেন। চিন্তায় ব্যাকুল কিশোরীমোহনের কাছে ঠাকুর এসে বলেন, — কী ডাক্তার, আর এক কৌটো সিগারেট আমাকে কিনে দেবে? কিশোরী উত্তর দ্যান, তুমি তো সবই জান, হাতের আংটিটি সেদিন বন্ধক রেখেছি, অতিথি এসেছেন, তাঁদেরও কোনপ্রকার সংস্থান নেই। এখন কীভাবে তোমাকে সিগারেট এনে দেব! ঠাকুর তখন বলেন—দেখ ডাক্তার, সেদিন যে আংটি বন্ধক রেখে মালপোয়া কিনে আমাকে খেতে দিয়েছিলে, সেটি নিষ্কামভাবে করেছিলে। সেজন্য সেদিন পঁচাত্তর টাকা পেয়েছিলে। তারপরে যে আংটি বন্ধক রেখে আমাকে সিগারেট কিনে দিয়েছিলে, সেটি লোভের বশবর্তী হয়ে।... তোমার এই দুর্লোভের জন্য কিছুই পাওনি। প্রতিজ্ঞা কর—এইরূপ বাসনা রেখে আর কোন কাজ করবে না। কিশোরীমোহন অনুতপ্ত হৃদয়ে তখনই সেই প্রতিজ্ঞা করলেন। ঠাকুর তখন কিশোরীর অতিথিদের সৎকারের সুব্যবস্থা করে দিলেন। কিশোরীমোহনের বাড়ির প্রাঙ্গণে সারা রাত ধরে কীর্তন হচ্ছে, ভোর হয়ে এল, কিশোরীমোহন মেতে আছেন কীর্তনে। একটু বেলা হতেই দেখা গেল এক ভদ্রলোক হাতে একটি নতুন বস্ত্র নিয়ে চিন্তাগ্রস্তভাবে কিশোরীমোহনের বাড়ির দিকে আসছেন। তিনি কীর্তন আঙিনায় উপস্থিত হলে শ্রোতারা কৌতূহলবশে তাঁর পরিচয় ও এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কীর্তন থেমে গিয়েছে; কিশোরীমোহন কীর্তনের শেষে বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোক দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে—'এই সেই লোক, এই সেই লোক' বলতে বলতে নতুন বস্ত্রটি তাঁর পায়ে রেখে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। কিশোরীমোহন তাঁকে নিবৃত্ত করে শান্তভাবে বসিয়ে এহেন দান ও প্রণামের কারণ জানতে চান। ভদ্রলোক জানান, তাঁদের আদরের সন্তান ১২/১৩ বছরের মেয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ টাইফয়েড-এ

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

ভুগছে, চিকিৎসায় কোন ফল হয় নি, রোগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তিনি সর্বদাই ঈশ্বরকে ডাকছেন কন্যার আরোগ্য কামনায়। গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ স্মিতহাস্যে তাঁকে বলছেন—'তোর বাক্সের নতুন কালোপাড়ের ধুতিটি হিমাইতপুর গ্রামের চুল-দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটিকে দিয়ে প্রণাম কর, তবে তোর মেয়ে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে।' ঐ স্বপ্ন দেখার পর সকালেই ভদ্রলোক কাপড় নিয়ে হিমাইতপুর গ্রামে এসে বর্ণনা অনুযায়ী কিশোরীমোহনকে দেখে প্রণামে উদ্যত হন।

সব শুনে কিশোরীমোহন সেই ব্যাক্তিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে ইনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ময় পুরুষ কি না। ভদ্রলোক সেই মুহূর্তেই ঠাকুরকে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপে চিনতে পারেন। এর পর কিশোরীমোহন তাঁকে সঙ্গে করে ধুতিটি মাথায় নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন—ডাক্তার, কী ব্যাপার, আজ যে একেবারে সকালেই, তাতে আবার কাপড় দিয়ে প্রণাম, ভদ্রলোকটিই বা কে? এই কথা বলে তিনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কিশোরীমোহন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করার পর ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না এমন ভাব করে বলেন, তা ভালোই তো, কাপড়টি তোমাকে দিয়েছেন, তুমিই নাও, আমাকে দিচ্ছো কেন? কিশোরীমোহন বলেন, রোগ ভাল করতে ভদ্রলোক এসেছেন, আমি তা কী করে করব? এজন্য আমি কাপড়খানা তোমাকে দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড়খানি গ্রহণ করে কিশোরীমোহনকে ফেরত দিয়ে দিলেন এবং সযত্নে রাখতে বললেন। পরে ঐ মেয়েটি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে।

একবার ফরিদপুর থেকে চোদ্দজন অতিথি এসেছেন কিশোরীমোহনের বাড়িতে। ঘরে খাবার কিছু নেই, হাতে টাকাপয়সাও নেই। অতিথি সৎকারের চিন্তায় বিমর্ষ কিশোরীমোহন ঠাকুরের ফটোর সামনে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা ও ধ্যানে বসেন। কিছুক্ষণ ধ্যানে বসার পরে প্রথমে দর্শন করলেন আলো—কোটিসূর্যবিনিন্দিত জ্যোতিপুঞ্জ, শ্রবণ করলেন নানা সুমধুর শব্দ। তারপর কোথায় যেন একটি বক্র ছিদ্রপথে আকাশে উঠে গেলেন—সেখানে সুমধুর বংশীধ্বনি শোনার পর তিনি বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে পড়েন। বহুলোকের চিৎকারেও তাঁর জ্ঞান ফিরে এল না; এই অবস্থায় বহুক্ষণ থাকার পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। তখনও আচ্ছন্নভাব সম্পূর্ণ কাটে নি — এমন সময় ডাকপিওন মানি অর্ডার নিয়ে এল; ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী পঁচিশ টাকা পাঠিয়েছেন। কিশোরীমোহন নিশ্চিন্ত হয়ে অতিথি সৎকারে উদ্যোগী হন। এমন সময়ে ঠাকুর এসে বলেন, কী ডাক্তার, মানি অর্ডার এলো নাকি? কিশোরীমোহন নির্বাক হয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর তখন সহাস্যবদনে বলেন —শোন ডাক্তার, আকুল প্রাণে ডাকলে জ্যোতিদর্শনও হয়, বাঁশীও শোনা যায়, টাকাও পাওয়া যায়। অবিশ্বাস কোরো না ডাক্তার। এই টাকা এখন খরচ কর, কিন্তু যার টাকা তাকে শীঘ্রই দিও। কিশোরীমোহন অতিথি সেবা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন এবং পরে সে টাকা যথাসময়ে পরিশোধও করেছিলেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পরবর্তীকালে সে-যুগ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, তখন বাইরের লোকজন তেমন আসেনি। কিশোরী-টিশোরীর সঙ্গে কীর্তন করতাম। পরে ধীরে ধীরে লোক এল। তখন আশ্রমে বেশ জঙ্গল ছিল। মাঝখানে মাঝখানে পরিষ্কার করে মাচা করা ছিল। সেখানে জপধ্যানাদি করা হত। অনেকে গাছতলা পরিষ্কার করে থাকতো। সেখানে লোকে কুশাসন পেতে নামধ্যান করত। বাঘের ভয় ছিল, রাত্রে বাঘের ডাক প্রায়ই শোনা যেত। তখন কষ্ট অসুবিধা অনেক ছিল। কিন্তু কষ্টের বোধ কারো ছিল না। দিন রাত আলাপ, আলোচনা, কীর্তন, নামধ্যান—এসব নিয়ে লোকে মত্ত থাকত। সে এক যুগ গেছে। এর পর অনেকদিন পর্যন্ত একটা ধরন ছিল। প্রত্যেকের ঝোঁক ছিল অপরকে সেবা দেবার। কারো সেবা নিজে নেবে না, কিন্তু অন্যকে সেবা দেবে।

নামধ্যানের সময়ে মারক শক্তির বাধাদানের ঘটনাও ঘটে কিশোরীর জীবনে। হিমাইতপুরে সেই সময়ে অনেক ভাটির গাছ ছিল, মাঝে মাঝে ফাঁকা থাকতো। কিশোরীমোহন অনেক সময়ে সেখানে আসন পেতে ধ্যানে বসতেন। এই সময়ে মারক শক্তির প্রভাবে অনেক ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে—কখনও বা দেখতেন চারদিকে অজস্র সাপ। প্রথম দিকে ভয় পেয়ে চলে আসতেন অনুকূলচন্দ্রের কাছে—অনুকূলচন্দ্র অভয় দিতেন। পরের দিকে অবশ্য এই সব উপদ্রবের উপশম হয়।

সাংসারিক জীবনের ব্যক্তিগত অসুবিধা বা বিঘ্নও কিশোরীমোহনের ঠাকুরমুখী অদম্য চলনের পথরোধ করতে পারেনি। কিশোরীমোহনের চতুর্থ পুত্রের সেসময় কঠিন অসুখ। যত দিন যায় রোগ বেড়েই চলে, প্রাণের আশা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতম হয়ে আসে। বাড়িসুদ্ধ সকলে শোকে মূহ্যমান। এমন সময়ে কুষ্টিয়ার দোগাছি থেকে ভক্তরা এলেন কিশোরীকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। দোগাছিতে এসেছেন গোঁসাই (আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী), তাঁর সঙ্গে কিশোরীকেও একসঙ্গে পেতে চান ভক্তরা। ঠাকুরের উৎসব, নামগান হবে ঠাকুরের, কিশোরী না বলতে পারলেন না—চলে গেলেন দোগাছিতে। দিনের পর দিন সেখানে চলেছে নামগান, সবকিছু ভুলে মত্ত হয়ে আছেন কিশোরী। এদিকে তাঁর পুত্রের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে ঠাকুর লোক পাঠিয়ে ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে।

পুত্রের মৃত্যুর আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীমোহনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধে কিশোরীমোহনকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মুমূর্ষর শয্যার চারপাশে আবর্তন করে কীর্তন করতে বলেন। কিশোরীমোহন তাই করেন। তখন রাত্রি সাড়ে নটা—ঘোর দুর্যোগে প্রকৃতি উথাল-পাথাল। তারই মধ্যে শিশুটির প্রাণবায়ু নির্গত হল। ঠাকুর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে সামলানোর জন্য নিজে থাকলেন, কিশোরীমোহনকে নির্দেশ দিলেন পুত্রের মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে পদ্মাবক্ষে ভাসিয়ে দিতে। একটি নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রে মৃতদেহ দাহ করার বিধি নেই — সেজন্যই অনুরূপ নির্দেশ। শিশুর গায়ে দু'-একটি সোনার অলঙ্কার ছিল, ঠাকুর সেগুলি খুলে নিতে নিষেধ করেন। অতঃপর

সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলাকীর্ণ পথে কিশোরীমোহন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে একাকী রওয়ানা হন পদ্মার দিকে অন্তরে দুঃসহ পুত্রশোক নিয়ে। মানসিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার উপরে অন্ধকার; মাইলখানেক পথ পার হয়ে পদ্মায় যখন দেহটি বিসর্জন দিতে যাবেন, তখন আর টাল সামলাতে পারলেন না, নিজেও পড়ে গেলেন নদীতে। ঝড়ের পদ্মার উত্তালতা কল্পনার অতীত— মুহূর্তমধ্যে খরস্রোতে ভেসে গেলেন কিশোরীমোহন — অবিরাম ইষ্টস্মরণ ব্যতীত আর কিছুই তখন তাঁর করণীয় ছিল না। হঠাৎই একটি বাঁশজাতীয় কিছু হাতে ঠেকল, তৎক্ষণাৎ সেটি ধরে ফেলে কোনমতে পাড়ে এসে উঠলেন। কিন্তু এর মধ্যেই অনেকদূর চলে এসেছেন তিনি — গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন জায়গাটি। ঝড়বৃষ্টির দাপটও অব্যাহত। অসহায়ভাবে অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে জঙ্গলের মধ্যে আছাড় খেতে খেতে চলেছেন —মনে হচ্ছে, আর বুঝি এখান থেকে বেরোনো সম্ভব নয়। আকুলভাবে ডেকে উঠলেন — ঠাকুর! সে মুহূর্তে কেউ তাঁর হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন — ডাক্তার, ভয় নেই! বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলোয় দেখলেন — সামনেই ঠাকুর! ঠাকুর তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর সাবধানে ধরে সেই বনের ভিতর থেকে বার করে নিয়ে এলেন। কিশোরীমোহনের তখন সমস্ত দুঃখবেদনা ছাপিয়ে একটি ব্যথায়ই মন ভরে উঠেছে — আমার জন্য ঠাকুর এই দুর্যোগে এই জঙ্গলে এত কষ্ট করে এসেছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে গেলেন স্বীয় জননী মনোমোহিনী দেবীর কাছে; তিনি পরম সান্ত্বনায় শান্ত করলেন পুত্রশোকে অধীর কিশোরীমোহনকে।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে অনন্তনাথ রায় বাইরে থেকে আশ্রমে ফেরেন বসন্ত রোগক্রান্ত হয়ে এবং ঐ কালব্যাধিতেই তার জীবনান্ত হয়। তারপরেই রোগ আশ্রমে দাবানলের মত ছড়িয়ে পরে এবং অন্য অনেকের মত কিশোরীমোহনও সেই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে ওঠে—ডাক্তাররা প্রাণের আশা ছেড়ে দেন। শেষ অবস্থা আগতপ্রায়, জীবনের লক্ষণ ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে, এমন অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলেন — ডাক্তার, আমাকে ছেড়ে যাও কোথায়? তোমরা সবাই চলে গেলে আমার কী উপায়? ওঠো শিগগির!

সে ডাক শুনে মুমূর্ষুপ্রায় হতচেতন কিশোরীমোহন অকস্মাৎ সদ্য ঘুম ভাঙা মানুষের মত চোখ মেলে চাইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর দেহে প্রাণের অন্যান্য লক্ষণ ফিরে এল; কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন তিনি। ভালবাসার অমোঘ শক্তিতে ঠাকুর তাঁর কর্মসাধক ভক্তকে এভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।

এক্ষেত্রে অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঠাকুর এভাবে সবাইকেই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে পারেননি কেন। উত্তর একটাই—ঠাকুরকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে যাঁরা চলতে পেরেছেন, তাঁর প্রেমশক্তি তাঁদের প্রতিই পূর্ণ কার্যকরী হতে পেরেছে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক না কেন, তাঁর অভীষ্ট পথ থেকে যিনি বা যাঁরা—

সাময়িকভাবে হলেও—তিলমাত্র বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁর করুণা পৌঁছনোর পথ পায়নি, ব্যর্থতার বেদনায় কেঁদে কেঁদে ফিরেছে। একতানতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার, একচুল এদিক ওদিক হলে সুর মেলে না; প্রেমতরঙ্গের প্রেরক ও গ্রাহক, দু'পক্ষই তাতে বঞ্চিত হন। অপরদিকে গ্রাহকের দিক থেকে কোনরকম বিচলনের বাধা না থাকলে পরম প্রেমময়ের অনবধি ঐশী প্রেমসুধা মঙ্গলনির্ঝর হয়ে অভিষিক্ত করে চলে তাকে অনির্বার। কিশোরীমোহনের নিষ্ঠা ছিল এমনই নিষ্প্রশ্ন, নির্বাধ।

এছাড়াও আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার — প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে জীবদেহের কোন না কোন সময়ে অবসান ঘটে; তা চিরস্থায়ী নয়, নশ্বর। ইষ্টানুগ চলনের মধ্য দিয়ে দেহের অকাল নাশ হয়তো রোধ করা সম্ভব, কিন্তু এক জন্মের নির্দিষ্ট কর্মসাধন সমাপ্ত হলে, দেহটি ত্যাগ করে জন্মান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেই হয়। সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিণামের পথ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও রুদ্ধ করেন না, কারণ তা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

কিশোরীমোহনের আর এক বিশিষ্ট পরিচয় ছিল 'কীর্তনের ঋষি' রূপে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অধ্যাত্ম-আন্দোলনের শুরু করেছিলেন কীর্তনের মাধ্যমে এবং কিশোরীমোহন তাঁর একেবারে আদি যুগের সাথীরূপে কীর্তনের মাধ্যমে উন্নত সাধনস্তর লাভ করেন। ক্রমে এমন অবস্থা হয় যে কীর্তনরত অথবা কীর্তনে উদ্যত কিশোরীমোহনের মনে কোন চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র তা বাস্তবে পরিণত হত। হয়তো কখনও মনে ইচ্ছা হল কীর্তন শুরু করার—দেখা গেল, তিনি আরম্ভ করার আগেই চারপাশের অন্যান্য সকলে কীর্তন শুরু করেছে। অথবা কীর্তন করতে করতে কখনও মনে হল, এইবার বন্ধ করলে হয়,—তিনি চুপ করার আগেই অন্যান্য সকলে থেমে যেত।

একদিন তাঁর নিজগৃহে কীর্তন চলছে—সকলকে নিয়ে কিশোরীমোহন কীর্তনরত, তুমুল কীর্তন হচ্ছে। এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন, তারপর আকাশের দিকে নির্দেশ করলেন। কিশোরীমোহন দেখেন, বহুদূরব্যাপী এক আশ্চর্য আলোকবলয় আর তার মধ্যে খোলকরতালযোগে বহু ছায়ামূর্তি কীর্তনরত। ঠাকুর কাঁধ থেকে হাতখানি সরিয়ে নিতেই সে অপরূপ দৃশ্য অন্তর্হিত হল, আবার যখনই ঠাকুর কাঁধে হাত রাখলেন আবার সেই দৃশ্য। পার্থিব কীর্তনের আকর্ষণে বহু বিদেহী সত্তা কীর্তনানন্দে যুক্ত হয়েছে— বুঝলেন কিশোরীমোহন, এবং উচ্চ আধারসম্পন্ন ভক্তটিকে শ্রীশ্রীঠাকুর সে অদৃশ্যপূর্ব দৃশ্য দর্শন করালেন একান্ত প্রীতিভরে। কীর্তনের ঋষি কিশোরীমোহন একবার নামগানে বিভোর হয়ে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাশীধামে বিশ্বনাথ মন্দিরে বিশ্বনাথের মাথার উপর উঠে পড়েন! তাঁর ঐ ভাবোন্মত্ত দশা দেখে হাজার পাঁচেক লোক হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে সেই অভিনব দৃশ্য দেখতে থাকেন। মন্দিরে

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

চর্ম নিয়ে প্রবেশ নিষেধ বলে চর্মবাদ্য নিয়ে কীর্তনের দলকে মন্দির-প্রবেশে বাধা দিতে এসেছিল পাণ্ডারা, কিন্তু কীর্তন ও উল্লম্ফন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে তাদের পক্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভক্তি-বিশ্বাসের তীব্রতায়, আবেগের প্রাবল্যে এমন অনেক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছেন কিশোরীমোহন সেযুগে, কালের প্রবাহে যার অধিকাংশই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন।

ঠাকুরের প্রতি তাঁর দুর্বার ভালবাসা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। সকলেই যে পরম পিতার সন্তান, এবং সবার মধ্যেই যে তিনি বিদ্যমান, কিশোরীমোহনের অন্তর্লোকে এই বোধের উন্মেষ হয় অতি সহজে, স্বাভাবিকভাবে। সবাইকে ভাল না বেসে তাই তাঁর উপায় ছিল না। অপরের সুখদুঃখ আনন্দবেদনায় তাঁর ছিল একাত্মতার অনুভব। জীবনের চরম সত্য বলে যাঁকে জেনেছেন, যাঁকে গ্রহণ করলে সব সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যায়, সেই ঠাকুরের কথাই বলে যেতেন অবিরত বিভিন্নভাবে —প্রেমের ফল্গুধারা চিরপ্রবহমান ছিল তাঁর অন্তরে। মানুষকে তাই তাঁর প্রিয়পরম ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যেই ছিল তাঁর চরম তৃপ্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে একবার বলেন, "আমি ছিলাম একা, কেউ চিনত না, জানত না। তবে আমিও ভালবাসতাম লোককে, লোকেও ভালবাসত আমাকে। কিশোরীকে পেলাম। তাকে লোকে পয়লা নম্বর গুণ্ডা বলে জানত। কিন্তু আমি দেখলাম ওর একটু ক্ষুধা আছে। ওকে গান বেঁধে দিতাম, ঠাকুর হরনাথের কথা বলতাম, খুব ভক্তি হল তাঁর প্রতি। সেই ভক্তি ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠল আমাকে নিয়ে, ও আমাকেই চেপে ধরল।" অন্য এক প্রসঙ্গে বলেন — "কিশোরীর Co-ordination ও materialisation বেশী ছিল। টানও ছিল তেমনি তুখোর। .... ওই বাজখাঁই গলায় কিশোরী যখন হরিবোল হরিবোল বলে গেয়ে উঠত, তখন সে যাই হোক, he was a king."

ঠাকুরের আদর্শ প্রচার, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সৎ দীক্ষা দান, লোকসংগ্রহ, লোকসেবা — এসবই ছিল কিশোরীমোহনের অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মধ্যে ছিল এক দুরন্ত প্রাণশক্তি, শ্রীশ্রীঠাকুরের অসামান্য সান্নিধ্যে যা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিপার্শ্বপ্লাবী কল্যাণকর্মে। তাঁর তাণ্ডব কীর্তনের প্রেমের স্রোতে অসংখ্য তৃষিত নরনারী পেয়েছিলেন তৃষার শান্তি। হিমাইতপুর ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকতেন না—ঠাকুরের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এবং আশ্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে ছিল তাঁর অপরিসীম দৃষ্টি।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময় কিশোরীমোহনের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রয়াসে হিমাইতপুরের পার্শ্ববর্তী অন্তত পঞ্চাশটি গ্রামের একটি লোককেও অনাহারে প্রাণ হারাতে হয়নি। সূর্যোদয়ের আগে থেকেই শুরু হত ভিক্ষা ও দান গ্রহণ এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটতে ঘটতে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যেত। বুভুক্ষু নরনারীর একজনও অভুক্ত থাকলে তিনি সেদিন অন্নগ্রহণ করতেন না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কিশোরীমোহনকে 'ভগবানে পাওয়া' ব্যাপারটি যে কত গভীর, তাঁর সমগ্র সত্তা যে কীভাবে ঠাকুরময় হয়ে গিয়েছিল, অতি ক্ষুদ্র একটি ঘটনায় তার দৃষ্টান্ত মেলে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামবাসীদের অনাহার-নিবারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে চাল সংগ্রহের কাজে বেরিয়ে একদিন প্রবল দুর্যোগে পড়েছেন; সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় চলেছেন ঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী চাল সংগ্রহে। একজন তাঁকে বলেন—একবারে ভিজে গেলেন যে দাদা, একটা ছাতা নিয়ে বেরোলেন না কেন? কিশোরীমোহন অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দ্যান—তা কী করে নেব, ঠাকুর তো ছাতা নেওয়ার কথা বলেননি। ইষ্ট নির্দেশ বহির্ভূত একটি পদক্ষেপও না ফেলা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল এমনই স্বাভাবিক। এই বিভীষিকাময় মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে সামলে নিলেও নিজের শরীরকে সামাল দিতে পারলেন না তিনি। কঠোর শারীরিক শ্রমে ভেঙে পড়ল স্বাস্থ্য, অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিশোরীমোহন। ধীরে ধীরে নিভে আসতে লাগল তাঁর জীবনদীপ। ১৩৫১, ১৯শে বৈশাখ তেষট্টি বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি আদরের 'ডাক্তার', কীর্তনের ঋষি, মহাপ্রাণ ভক্ত কিশোরীমোহনের জীবনাবসান ঘটে। পরিশেষে তাঁর শ্রাদ্ধতর্পণ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মস্পর্শী অভিভাষণখানি উল্লেখ করা হচ্ছে :

সাধু ঋদ্ধি তাপস !

ভক্তবীর কিশোরীমোহন আজ আর নাই। ইষ্টানুগ সেবা-সম্বর্দ্ধনী হোম বেদীর কল্যাণযজ্ঞানলে তার ঐহিক শরীর আহুতি দিয়া নিজেকে জ্যোতিষ্মান অমরার অমর স্পর্শে সার্থক করে তুলেছে। আমার আবাল্য সহচর যৌবনের জ্যোতিঃ প্রৌঢ়ের পরম বান্ধব—তার যা কিছুকে সম্বর্দ্ধিত করে যথাযোগ্য লোকে চলিয়া গিয়াছে। আজ আর সে নাই। আমি একা, সম্মুখে তার শ্রাদ্ধবাসর, আমাদের প্রাণঢালা অর্ঘ্য নিয়ে তাকে অভিনন্দিত করার দিন সম্মুখেই। ভক্তবীর, সেবাভিক্ষু, কর্মসন্ন্যাসী তার আত্মাকে আমাদের প্রাণকাড়া সশ্রদ্ধ সামর্থ্য দিয়ে ধন্য হতে কেউ কি কুণ্ঠিত হব? তার সেবাকে স্মরণ করে প্রাণঢালা কৃতজ্ঞতায় তার স্মৃতিকে পূজা করতে কোন কুণ্ঠা আমাদ্গিকে নিরোধ করতে পারে? কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে দীপ্ত করে তুলুক। আরও দেখতে হবে আমাদ্গিকে তার পরিবারবর্গের কেউ যেন কখনও অন্নবস্ত্রের অনটনে বিমর্ষ না হয়ে ওঠে। ধৃতি, ঋদ্ধি ও প্রজ্ঞা বুকের প্রাণকাড়া ভালবাসা নিয়ে ভক্ত কিশোরীমোহনের জয়গান করুক।

২৫শে বৈশাখ — তোমাদেরই দীন

সন ১৩৫১ — "আমি"

'ভক্তবীর, সেবাভিক্ষু, কর্মসন্ন্যাসী'—স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত এই অভিধাত্রয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর আবাল্য সহচর, যৌবনের জ্যোতি, প্রৌঢ়ের পরম বান্ধব কিশোরীমোহনের পরিচয় শাশ্বত হয়ে থাকবে।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।
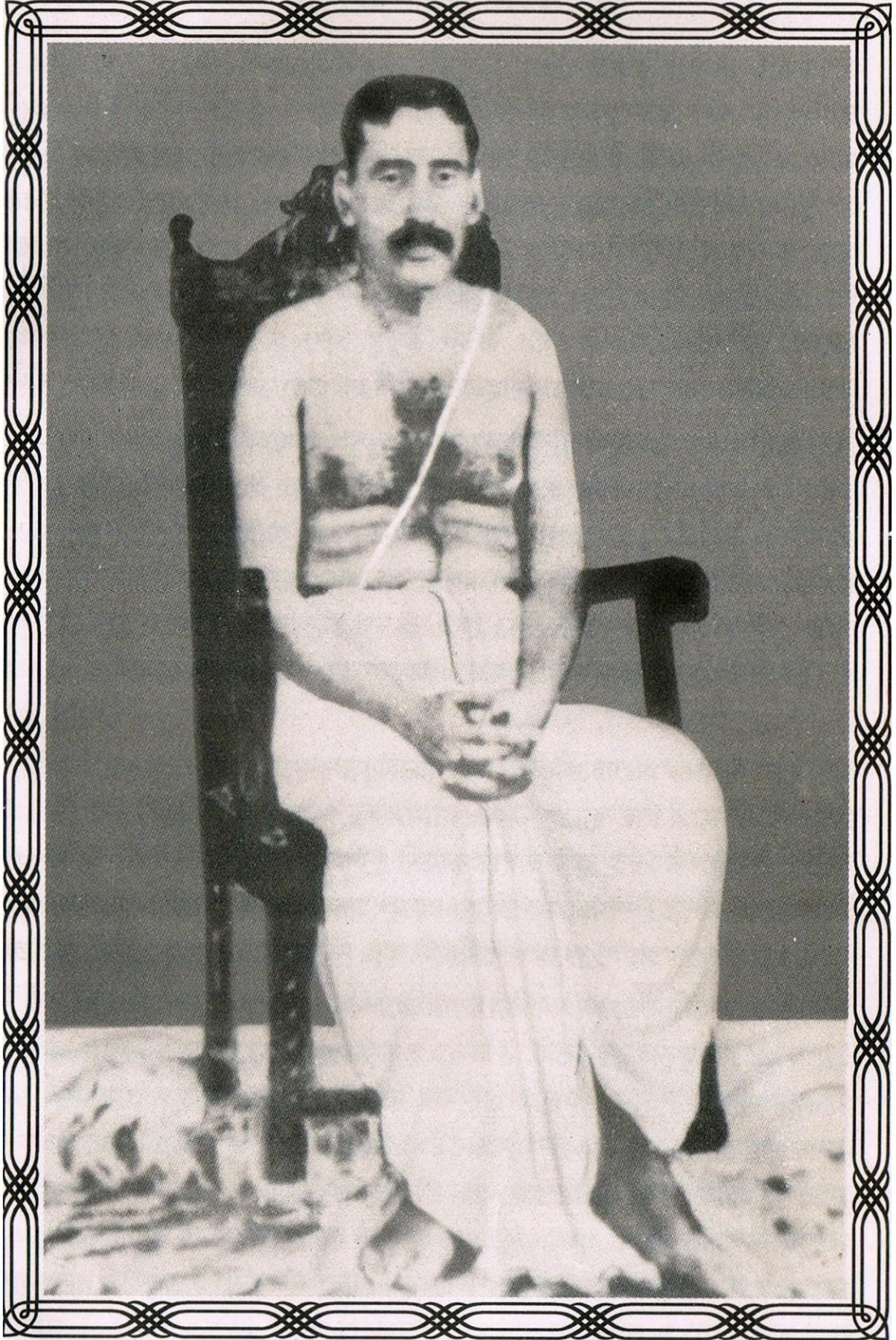
অনন্তনাথ রায়

৬ই আশ্বিন, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ — ২৯শে মাঘ, ১৩৪১

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

অনন্তনাথ রায়

মানবদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অনুভব করার সামর্থ্য বিশেষ প্রারব্ধজাত অধিকার না থাকলে লাভ করা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যখন অনকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক গ্রাম্য বিপ্রসন্তানমাত্র ছিলেন, তখন তাঁর ঐশী বিভা উপলব্ধি করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল প্রাথমিকভাবে মাত্র দুজনের—তাঁদেরই একজন মহাসাধক অনন্তনাথ রায়। ঠাকুরের বাল্যসখা অনন্তনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাধন-তপস্যার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণাবতারত্ব এবং তাঁর এই উপলব্ধিজাত জ্ঞান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা উপচারে উপস্থিত করেন পিপাসু আর্ত মানুষের কাছে, প্রেরণার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলেন অগণিত প্রাণ।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার কাশীপুর গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৬ই আশ্বিন, শনিবার দ্বারকানাথ রায় ও ব্রহ্মময়ী দেবীর পুত্র অনন্তনাথের জন্ম হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় আর্থিক অস্বচ্ছলতা-হেতু প্রথাগত শিক্ষালাভ বিশেষ সম্ভব হয়নি অনন্তনাথের। ষোল বৎসর বয়সে হিমাইতপুরের ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরীর কাছে কম্পাউণ্ডারির কাজ শেখেন এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারি বিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। এই সময় থেকেই কিশোর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে অনন্তনাথের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যে অনন্তনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগের বছর দুই পরে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের তিন বৎসরের মাথায় একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেন এবং শিশুপুত্রটিরও বাইশ দিনের মাথায় মৃত্যু হয়। উপর্যুপরি শোকে, যন্ত্রণায় অনন্তনাথ বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। শান্তি ও মানসিক স্থৈর্যের আশায় তিনি গুরুগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং কিছুদিনের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ভগবৎ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—মনের অনিঃশেষ বুভুক্ষা যেন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। এদিকে বন্ধু অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গেও নিত্য যোগাযোগ;যত দিন যায় ততই যেন এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন অনন্তনাথ অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় কালক্রমে অদ্বৈতানুভূতি, শব্দশ্রবণ, জ্যোতি দর্শন প্রভৃতি সাধন জগতের অনেক পর্যায়ই অতিক্রম করেন তিনি। কিন্তু মনে তৃপ্তি আসে না—ভগবানকে সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠেন অনন্তনাথ। মন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকে, অবশেষে মনে হয়—এ জীবনে যখন তাঁকে বাস্তবভাবে পেলাম না, তখন এ দেহ রেখে লাভ কী? দেখি, পরজন্মে নূতন দেহ ধারণ করে নবীন উৎসাহে সাধনা করে তাঁকে পাওয়া যায় কি না। নির্জনে সাধনা করার জন্য কাশীপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যখানে একটি সাধন-কুটির নির্মাণ করেছিলেন অনন্তনাথ—সেই সাধনগৃহেরেই আড়িকাঠে উদ্বন্ধনে

প্রাণত্যাগে উদ্যত হন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, প্রবল বৃষ্টি। অনুকূলচন্দ্র হিমাইতপুরে ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে রোগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলেন। প্রায় আধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে অনন্তনাথের সাধনগৃহের দ্বারে উপস্থিত হয়ে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে থাকেন, "অনন্ত রে, দরজা খোল্, দরজা খোল্, ভিজে গেলাম, শিগগির দরজা খোল্"! ঠিক সেই মুহূর্তে অনন্তনাথ বন্ধনরজ্জু গলায় পরতে উদ্যত হয়েছেন। বাইরে থেকে আকস্মিক বাধা পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর ভাবতে লাগলেন—ভগবৎপ্রাপ্তিতে কি এতই বিঘ্ন? এ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে নব উদ্যমে সাধনারও উপায় নেই! অনুকূলচন্দ্রের সবল আঘাতে কপাট ভেঙে পড়ল—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে অনন্তনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তিনি বলেন, "আমি কী অপরাধ করেছি যে, তুই আমাকে ফেলে যাচ্ছিলি? 'ভগবান' 'ভগবান' বলে পাগল—ভগবান যে তোর পাছে পাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে!" বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অনন্তনাথ প্রাণের আবেগে অনুকূলচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। অনুকূলচন্দ্রের স্পর্শে ঝলকে ঝলকে জ্যোতি-তরঙ্গ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অনন্তনাথের সত্তাকে। শান্ত সমাহিত হয়ে আসছে মন—অগণিত নাদ একটার পর একটা ধ্বনিত হয়ে চলেছে অভ্যন্তরে। জ্যোতি-তরঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন এক তেজোময় পুরুষ, যাঁর অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে অপরূপ বিভা। দেখলেন — সেই তেজোময় পুরুষ স্বয়ং অনুকূলচন্দ্র, তাঁর বাল্যের সখা, জীবনের পরম সাথী।

বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গীটির মধ্যে অনন্তনাথ সেদিন যে কী দেখতে পেলেন, তা অপরের বোধগম্য নয়। যেন এক অনন্ত বিশ্রাম, এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়; যেন জীবনের সমস্ত প্রাপ্তির শেষ সীমা! চির-ঐশ্বর্যময় পিতা তাঁর পুত্রকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। অনন্তনাথের অন্তরতম আকূতি,তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ভক্তির ব্যাকুলতা সেদিন ধন্য হল—এক অভাবনীয়রূপে পেলেন তিনি সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ, এক নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন এতদিনকার পরিচিত বান্ধবটিকে। ঠাকুর তখনই সেই অবস্থায় অনন্তনাথকে জননীদেবী (শ্রীশ্রীঠাকুরের মা)-র কাছে নিয়ে গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর দু'বছর অতিক্রান্ত প্রায়—সাধন-ভজনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে অনন্তনাথের প্রায় রোজই আলাপ আলোচনা হয়। মাতা মনোমোহিনী দেবীর গুরুকৃপার নানা কাহিনী শুনে, তাঁর ইষ্টনিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে অবশেষে অনন্তনাথ মাতৃদেবীর কাছ থেকে সৎনাম গ্রহণ করেন এবং সন্তমতের পশ্চিমদেশীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীসরকার সাহেবের মূর্তি স্থাপন করে নিষ্ঠাসহ নামধ্যান করতে থাকেন। এই সময়ে প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাবসমাধি হতে থাকে। অপার বিস্ময়ে অনন্তনাথ

লক্ষ্য করলেন ভাবসমাধি অবস্থায় অনুকূলচন্দ্রের অঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুরাশি রকমের আসনের প্রকাশ, শুনলেন বিভিন্ন ভাষায়, বিনা আয়াসে, অবলীলাক্রমে জাগতিক নানাপ্রকার সমস্যার অপূর্ব সমাধান, ঈশ্বর-তত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি জটিল ধর্মতত্ত্বের সহজ সুস্পষ্ট মীমাংসা। দিনের পর দিন এইরূপ অসংখ্য ভাববাণী শুনতে শুনতে অনন্তনাথের মনে অনুকূলচন্দ্রের ভিতরে ভগবত্তার পূর্ণ প্রকাশ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। একদিন ভাববাণীতে অনুকূলচন্দ্র অনন্তনাথের নাম ধরে ডেকে বলেন, "অনন্ত রে, কোথাও রওনা হ'তে হ'লে মেল ট্রেনে যাওয়া যায়, mixed train - এ যাওয়া যায়, আবার গরু-মহিষের গাড়ীতেও যাওয়া যায়। ইহা বুঝে যা করার হয় করবি।" মহাভাবাবস্থায় এইরূপ-আরও অনেক নির্দেশই শুনতে পেলেন। অনুকূলচন্দ্রের ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে মাতৃপ্রদত্ত সাধন-পদ্ধতি নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতে থাকেন অনন্তনাথ; আর কোন দ্বিধা, কোন সংশয় রইল না, সম্পূর্ণভাবে তাঁতেই সমর্পিত হলেন। বিরতিহীন এ যাত্রা অনন্তনাথের চলল অনন্তের পথে— যার ইতি নেই, বিচ্ছেদ নেই, যাতে আছে শুধু ধ্বনিময় গতি, অব্যাহত নামময়তা।

সমর্পিত-প্রাণ অনন্ত এরপর হিমাইতপুরে ঠাকুরের কাছে এসে বসবাস শুরু করেন। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি নিজেকে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত করেন। কাশীপুরের মাঠে একটি মন্দির নির্মিত হয়—সেখানে অনন্তনাথ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় আহারনিদ্রা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়া-রহিত হয়ে একাদিক্রমে পাঁচ দিন, সাত দিন, এক মাস, দু'মাস, এমন কি তিন মাস পর্যন্ত একাসনে ধ্যানমগ্ন থেকে সাধনা করতেন। তাঁর তীব্র সাধনা সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন, অনন্তর সাধনা কী কঠোর! এমনও হয়েছে কতকাল ঘর থেকে বেরোয়নি। আমি একদিন গিয়ে দেখি সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, বুকে একটুও স্পন্দন নেই। মনে করলাম—মরে গেল নাকি! তার সমস্ত গায়ের পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দিই, মাছিগুলো কোনরকমে গা থেকে ছাড়িয়ে দিই— তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। শেষে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হলো। শরীরের অবস্থা দেখে মনে হত আর বেশী দিন বাঁচবে না।

সাধনার সময়ে একবার অনন্তনাথ শুধু দুধ পান করে এবং মৌন ব্রতাবলম্বী হয়ে ছয় মাস কাটিয়েছিলেন। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে অধিকাংশ সময়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনে ঠাকুরের সঙ্গে সাধনাদি বিষয়ে কথাবার্তা বলে বিভিন্ন অবস্থা ও স্তর বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। এই ভাবে দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন— শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পূর্ণ অবতার;এ পর্যন্ত জগতে যত অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তিনি সকলেরই পরিপূরক এবং তিনিই বর্তমান পুরুষোত্তম। অনন্তনাথের

এই মহাসাধনার যুগে তখনও কোন কর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। সেই সময়টিকে কীর্তনের যুগ বলা চলে। ক্রমে ক্রমে আশ্রমে জনসমাবেশ আরম্ভ হয়েছে; চারিদিকে ভাবগম্ভীর সাধনতত্ত্বের আলোচনা চলছে—কোথাও ঠাকুর স্বয়ং, কোথাও অনন্ত মহারাজ, আবার কোথাও বা আগন্তুকগণ নিজেরাই আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এক মগ্ন, ঐশ্বরীয় ভাবভূমি গড়ে তুলছেন। আনন্দময়, অমৃতময় সে এক নতুন জগৎ, যেখানে বিবাদ-বিসম্বাদ, অতৃপ্তি-হতাশার কোন ছায়া নেই।

নামধ্যানের মধ্যেই অনন্তনাথ পেতেন উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসা। সেবার কুষ্টিয়াতে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের আয়োজন চলছে। ইংরেজির ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। ভক্তরা বিশ্বগুরুর আবির্ভাব জানিয়ে ছাপিয়ে ফেলেছেন অসংখ্য প্রচারপত্র, প্রস্তুত করেছেন প্রাচীর-লিখন এবং সেই অনুযায়ী সবরকমের অন্যান্য প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত বিষয়টি ঠাকুরকে জানানো হয়নি। ঠাকুরকে জানাতে এলে তিনি কোনমতেই সম্মতি দিলেন না—উৎসবে উপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা। বললেন, সে কী কথা, আমাকে বিশ্বগুরু, অবতার ইত্যাদি বলে প্রচার করা কেন? আমি কি কখনও আপনাদের বলেছি যে আমি বিশ্বগুরু বা অবতার?

উদ্যোক্তারা মহা বিপন্ন হয়ে অনন্তনাথের শরণ নিলেন। সমস্ত শুনে অনন্তনাথ তাঁর কাশীপুরের সাধন-মন্দিরে গিয়ে ধ্যান মগ্ন হন। একাদিক্রমে পাঁচ দিন ধ্যানে অবস্থানের পর মন্দিরের দরজা খুলে কুষ্টিয়ার ভক্তবৃন্দকে ডেকে বলেন—যান, উৎসব করুন, ঠাকুরকে বিশ্বগুরু, পুরুষোত্তম যা খুশি বলুন। এ প্রণয়ের ডাক নয়, বিধিসম্মত নাম। ঠাকুর আপনাদের উৎসবে যাবেন।

এই কথা বলে মহারাজ মাতা মনোমোহিনী দেবীর কাছে গেলেন। তাঁর ও মায়ের মধ্যে কথা হল। ইতিমধ্যে ভক্তবৃন্দও জননী দেবীর সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত নিবেদন করেন। জননী দেবী অতঃপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলেন, ওরা অত করে বলছে, কুষ্টিয়ার উৎসবে যা একবার। মায়ের কথায় ঠাকুর অবশেষে সম্মত হলেন।

তাপস-প্রবর অনন্তনাথ তপস্যার বলে যে উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন—"সন্তমতের পূর্ব পূর্ব গুরুদের নামের সহিত 'মহারাজ' শব্দ যুক্ত দেখা যায়, যথা স্বামীজি মহারাজ, হুজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব প্রভৃতি অনন্তনাথও ঐ জাতীয় একজন উন্নত সাধক, সুতরাং তাহাকেও 'মহারাজ' বলিয়া ডাকা উচিত।" অনন্তনাথের অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট হয়েই ঠাকুর তাঁকে মহারাজ আখ্যা দেন। সেই থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অগণিত শিষ্যবর্গের কাছে তিনি 'মহারাজ' বলে পরিচিত হন।

সৎনাম গ্রহণের পূর্বে অনন্তনাথের মাঝে মাঝে মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হত। কিন্তু যতবার তিনি উদ্যোগ নিতেন ততবারই বন্ধু অনুকূলচন্দ্র কৌশলে তাঁকে নিবৃত্ত করতেন।

একবার অনুকূলচন্দ্র নাজিরপুরে দুর্গানাথ সান্ন্যালের বাড়িতে নদীপথে রোগী দেখতে গিয়েছেন। অনন্তনাথ হিসেব করে দেখলেন নাজিরপুর থেকে ফিরতে অনুকূলচন্দ্রের অনেক রাত হবে। নিশ্চিন্তমনে তিনি ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বাজিতপুর হাট থেকে মাংস, পেঁয়াজ প্রভৃকি কিনে ফেরার পথ ধরেন। গভীর জঙ্গলে ঘেরা ময়মনসিংহের কালীবাড়ির পথে হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে একটি সন্ধ্যামালতী ফুলের ডাল হাতে নিয়ে অনুকূলচন্দ্র অনন্তনাথের সামনে এসে বলেন, দেখ অনন্ত, কী আশ্চর্য—একই বৃন্তে দুই রঙের ফুল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জিজ্ঞাসা করেন, কী রে কী বাজার করে আনলি দেখি!—বলেই ভৃত্যটির কাছ থেকে বাজারের ঝুড়ি নিচে নামিয়ে বলেন, কী রে অনন্ত, তুই এসব খাবি? অনন্ত আর কোন কথা না বলে ঝুড়ি ফেলে বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়ি ফিরে খেয়াল হল—এত অল্প সময়ের মধ্যে অনুকূলচন্দ্রের এখানে আসা তো কোনভাবেই সম্ভব নয়! তখনই তিনি অনুকূল-জননীর কাছে গিয়ে জানলেন যে অনুকূলচন্দ্র নাজিরপুর থেকে ফেরেননি। এই দিনের ঘটনায় অনন্তনাথের মনে বাল্যবন্ধুটির সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। পরদিনই দুর্গানাথ সান্ন্যালের বাড়িতে গিয়ে জানলেন যে আগের দিন ঐ সময়ে অনুকূলচন্দ্র ঐ বাড়িতে রোগী দেখতে এসে বহুক্ষণ ছিলেন। কথাবার্তার মাঝে একবার প্রাকৃতিক ক্রিয়ার জন্য বাইরে জঙ্গলে যান। অনন্তনাথ বুঝলেন—কোনভাবেই ঐ সময়ে কালীবাড়ির পথে অনুকূলচন্দ্রের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে সম্ভব ছিল না। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা লৌকিক চোখে চিরদিনই এভাবে রহস্যাবৃত থাকে। একনিষ্ঠ সাধককে তিনি ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক, মঙ্গলের পথেই পরিচালিত করেন।

সাধনভজন চলাকালীন একবার অনন্তনাথের ধারণা হল কামাদি রিপু জয় করা কঠিন নয়; ঠাকুরের কাছে তিনি তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন— ওতে স্বাধীন কর্তৃত্ব কিছুই নেই। ঐ সব ব্যাপার ইষ্টনিষ্ঠা ও পরমপিতার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এ বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে অনন্তনাথের আরও অনেক আলাপ আলোচনা হলেও অনন্তনাথের মতের পরিবর্তন হল না। সম্ভবত তাঁর ঐ সময়কার স্বস্থ মানসিকতা এবং অন্তরের দৃঢ়তার জন্য ঐ ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল। এর কিছুদিন পর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনন্তনাথ নবদ্বীপে যান; সেখানে তিন/চার দিন দিবারাত্রি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কীর্তনাদি শ্রবণ ও দর্শন করেন। এর পরে তাঁর মানসপটে অনবরত বৈষ্ণবীদের নৃত্যদৃশ্য আভাসিত হতে থাকে এবং এক তীব্র কামনার সৃষ্টি হয়। ঠাকুরের কৃপায় কোনমতে রিপুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে হিমাইতপুর ফিরে এসে ঠাকুরকে বিস্তারিতভাবে সব বলেন। ঠাকুর সব শুনে খুব হাসলেন। সাধনার উচ্চস্তরে উঠেও যে-কোন সময় বিচলন আসতে পারে এবং উত্থানের পর পতনমুখী স্রোতের টান

স্বভাবতই প্রবলতর হয়। একমাত্র ইষ্টনিষ্ঠাই সেই পতন প্রতিহত করতে সক্ষম। সাধন-পথের আর এক শক্ত বাধা হল অহং; সেই কারণেই অনন্তনাথের রিপু জয়ের অহং এইভাবে বিদূরিত হয় তাঁর করুণায়।

হিমাইতপুরে ঠাকুরের শয়নগৃহের পাশে একটি ঘরে ঠাকুর অনন্তনাথের মাতৃদেবীর স্মৃতিতে 'ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং ঐ চিকিৎসালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব অনন্তনাথের উপর অর্পণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে অনন্তনাথ সেখানে প্রত্যহ রোগী দেখতেন এবং বহু দূরদূরান্তে যেতেন রোগী দেখার জন্য। তাঁর সেবা এবং রোগ-অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসা পদ্ধতির খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে মহানগরী কলকাতাতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বহু কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

অনন্তনাথের স্বতঃপ্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় কার্শিয়াং-এ আসেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। ঠাকুরের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে অনন্তনাথও এসেছেন। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ আর. এল. দত্ত ঠাকুরের চিকিৎসায় নিযুক্ত; তিনি প্রতিদিনই এসে দেখে যেতেন ঠাকুরকে। ঠাকুরের শয্যার পাশে টেবিল চেয়ার রাখা ছিল, সেখানে বসে ডাঃ দত্ত প্রেসক্রিপ্শন্ করতেন। একদিন অনন্তনাথ অন্যমনস্কভাবে টেবিলের পাশে বসে টেবিলের উপর রাখা কাগজে কিছু লিখে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর নিত্যদিনের মত ডাঃ দত্ত এসেছেন ঠাকুরকে দেখতে, হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল টেবিলের উপরের কাগজটিতে। তিনি কাগজটি হাতে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে বললেন—আমি আজ এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করব মনে করে এসেছি—অথচ আমার লিখিত প্রেসক্রিপ্‌শন্ টেবিলের উপরই আছে। এ কী করে সম্ভব হল? অনন্তনাথ তখন বলেন, ঐ লেখাটা আমার। সকালে এখানে বসে থাকতে থাকতে কী যেন মনে হল, তাই লিখে ফেললাম। আর আপনার হাতের লেখা তো কিছুদিন ধরেই দেখছি, তাই হাতের লেখাটা আপনার মতই হয়েছে। ডাঃ দত্ত আবিষ্ট চিত্তে বলেন—তুমি যে এত বড় ডাক্তার ও এত keen observer, এটা সত্যিই বিস্ময়ের। তোমার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তাতে তুমি খ্যাতনামা চিকিৎসক হতে পারবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি অনন্তনাথকে চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষা ব্যতিরেকেও আরও অনেক জাগতিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তদানীন্তন সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির বিপুল কর্মভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সাধন-ভজনপ্রিয় মানুষটি এসব কাজে বিশেষ আনন্দ পেতেন না। কখনও কখনও বলতেন—আর এই সকল বিষয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। মনটাকে এত নীচে নামিয়ে আনতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়, তবু করতেই হবে, কারণ এই মালিকের ইচ্ছা। ধর্ম ও

কর্মযোগ সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁকে বলেন, দ্যাখ অনন্ত, লোকহিতকর কাজ না করে শুধু বসে বসে নামধ্যান করলে ধর্ম হয় না। সাধনা যেমন করতে হবে, বাস্তব কর্মে ইষ্টের নির্দেশও তেমনই মূর্ত করে তুলতে হবে। গুরুগতপ্রাণ অনন্তনাথ ঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করে নিজের জীবনে এই আদেশকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিলেন।

দীক্ষাদানের অধিকারী ঋত্বিকরূপে অনন্ত মহারাজের একটি নিজস্ব ধরন ছিল। তিনি সহসা দীক্ষাপ্রার্থীকে দীক্ষা দিতে চাইতেন না। বেশ কিছুদিন ঘোরাতেন, হয়তো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন, দীক্ষাপ্রার্থীর আধ্যাত্মিক পিপাসা প্রকৃত বা স্থায়ী কি না। ধৈর্য ছিল অসীম, জিজ্ঞাসু প্রার্থীর কথা নিজে শুনতেন বেশি, উত্তর দিতেন সীমিত-ভাবে। তাতেই প্রশ্নকর্তা পেয়ে যেতেন সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা। ভক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন সরকারের ভাষায়—দেখলাম এক অতি আশ্চর্য্য মানুষ এই মহারাজ। কতই না আবোল তাবোল বকে চলেছি, ঘন্টার পর ঘন্টা একনাগাড়ে, শুনেই চলেছেন তিনি তীক্ষ্ণ মনোযোগে, সতৃষ্ণ অথচ সস্মিত দৃষ্টি বিছিয়ে। কথার মাঝে বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তির লেশমাত্র নেই। এই অপরূপ প্রকৃতি ও শিক্ষা আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। মহারাজের আলোচনা পদ্ধতির আর একটি বিশেষত্ব আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। তা হচ্ছে আমার কথাগুলি মোটামুটি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি কথা কিছু বলতেন না, পরে যা বলতেন তা আমারই উক্তির সূত্র ধরে ।. . . তিনি যেন এক মনোযোগী ছাত্র, আমার বক্তব্যটা অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝে নেওয়ার জন্য আগ্রহশীল।

সাধক অনন্তনাথের শরীরে বীজনাম জপের প্রভাবে যে তাপের সৃষ্টি হত, একবার তার পরিচয় পেয়েছিলেন 'অমিয়বাণী'-র সংকলয়িতা অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। ঠাকুর ও অনন্তনাথ তখন কুষ্টিয়ায় অশ্বিনী বিশ্বাসের বাড়িতে কিছুদিন যাবত রয়েছেন। একদিন পাশাপাশি দুটি চৌকির একটিতে ঠাকুর, অপরটিতে অনন্তনাথ ঘুমিয়েছেন। অনেক রাত্রে অশ্বিনীকুমার বাড়ি ফিরে অনন্তনাথের পাশে এসে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে 'বাবারে বাবা, গেলাম, গেলাম' বলে চিৎকার করে তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর চিৎকারে ঠাকুর ও অনন্তনাথ ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন, অশ্বিনীকুমার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন ও ঘামছেন। ঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে ঘুমের মধ্যে অনন্তনাথের হাত তাঁর বুকের উপর পড়লে প্রচণ্ডতাপের অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে একটা দাহ ভাব বোধ করেন, ক্রমে ঐ দাহ ভাব বেড়ে যেতে থাকায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং শরীর ঘামতে থাকে। ঠাকুর তখন রহস্যভরে বলেন, ওরে বাবা, আপনি আমার কাছে না শুয়ে ঐ ডাকাতের কাছে শুতে গেলেন কেন?

সে যুগে নামস্পন্দনের সাহায্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার বা এর গতিবেগ বৃদ্ধি করে মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং দুরারোগ্য রোগীর নিরাময়ের উদ্দেশ্যে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। নামচিকিৎসায় জীবন ফিরে পাওয়ার বহু

ঘটনাই ঘটেছে সেই সময়। ঠাকুর বলতেন, খুব নাম করলে দেহের মধ্যে প্রবাহিত অদৃশ্য আলোকস্রোত মস্তিষ্কে সংহত হয়, চোখ দিয়ে তা বেশি করে ঠিকরে বেরোয়, আর তখন কারও দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলে বা স্পর্শ করলে, ঐ সূক্ষ্ম জীবনীশক্তি সঞ্চারণে সে শুধু নড়ে ওঠে তা নয়, মৃত হলে জীবন্ত হয়েও উঠতে পারে। সদ্যমৃত ব্যক্তির শরীর বিধানের কোন বিশিষ্ট যন্ত্র যদি একেবারে বিকল বা বিকৃত না হয় তবে ঐ রকম নাম করতে করতে তাকে স্পর্শ করে থাকলে, সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

অনন্তনাথের অসামান্য গুরুভক্তির একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার আশ্রমের ডাক্তারখানার পিছন দিক থেকে তীব্র দুর্গন্ধ সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ঐ পথে যাওয়ার সময় ঠাকুরও ঐ গন্ধ পান। তাঁর নির্দেশে অনুসন্ধান করে দেখা যায় একটি গরুর ঠ্যাং জঙ্গলে পড়ে আছে এবং সেটিই দুর্গন্ধের উৎস। অনন্তনাথ তখন ডিস্‌পেন্সারিতে বসে রোগী দেখছিলেন। ঠাকুর তাঁকে ডেকে বলেন, অনন্ত রে, ডাক্তারখানার পিছনে মরা গরুর ঠ্যাং নাকি পড়ে আছে, তা থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছে, তুই এক্ষুনি গিয়ে মুখে করে কামড়ে ওটাকে ঐ নদীর চরায় দূর করে ফেলে দিয়ে আয় তো। যেমনই বলা তেমনই কাজ—অনন্তনাথ ঠাকুরের আদেশ পাওয়ামাত্র সানন্দে সেই পূতিগন্ধময় গরুর ঠ্যাং দাঁতে কামড়ে নদীর ধারে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ঐটি থেকে তাঁর শরীরে ময়লা পড়ছিল, কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যথাস্থানে ঠ্যাংটি ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এলেন এবং পূর্ব্ববৎ রোগী দেখতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন জগতের সামনে তুলে ধরলেন সাধকের নির্বিকারতা এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

ঠাকুর-সেবায় অনন্তনাথ ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী—নিজ হাতে সর্বদা গুরুর সেবা করায় তৎপর ছিলেন। ঠাকুর কখন কী কাজের আদেশ করেন, তার জন্য প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন। অনেক সময় গভীর রাতে ঠাকুর বিশেষ কোন জিনিষ খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তখনই মহারাজ বাজিতপুর ঘাট না হয় পাবনা থেকে সেই খাদ্য সংগ্রহ করতেন অথবা নিজ হাতে প্রস্তুত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হতেন। আর ঠাকুরও শিশুর মত চাওয়ামাত্র কিছু না পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন—যেন এতটুকু বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না, এমন করতেন।

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বিষয়েই অনন্তনাথের গুরুসেবার আকুলতা পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল। ঠাকুর কড়াইশুঁটি খেতে ভালবাসেন—মহারাজ প্রখর রৌদ্রে—দুপুর দুটো, তিনটে পর্যন্ত শুঁটি তুলছেন, কোন ক্লেশবোধ নেই। কোথাও গেলে যা ভাল লাগত তাই ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। ঠাকুরের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবই তাঁর আপনার। ঠাকুর খাবার-পাতে লেবু ভালবাসতেন, তাই ঘরে কখনও

লেবু না থাকলে যেখানে থেকে হোক লেবু সংগ্রহ করা চাই-ই তাঁর। শিষ্যবর্গও তাঁর বড় আপনার জন, কারণ তারা যে সব ঠাকুরের লোক। ঠাকুর ছাড়া তাঁর নিজস্ব বলে আর কিছু ছিল না। তাঁর সমস্ত কাজের লক্ষ্যই ছিল ঠাকুরের প্রীতি-সম্পাদন।

কীর্তনের যুগে অনন্ত মহারাজ কীর্তনের দল নিয়ে অনেক জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। তাঁর আপনভোলা নৃত্যভঙ্গিমা এক স্বর্গীয় ভাব-বলয়ের সৃষ্টি করত।

১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাসে একদিন সৎসঙ্গ দালানের পিছনে কিশোরীমোহনের ঘরের সামনে বাবলাতলায় কীর্তন হচ্ছে। কিশোরীমোহন, সতীশচন্দ্র, কোকনচন্দ্র, তরণী ও নফরচন্দ্র প্রভৃতি আছেন কীর্তনে। কিশোরীমোহনের তাণ্ডব নর্তন-কীর্তনের আঘাতে একজন কীর্তনসঙ্গী ছিটকে গিয়ে দালানের রকের উপর পড়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সবাই কীর্তনে মাতোয়ারা, কিছুক্ষণ পর লক্ষ পড়ল সবার সঙ্গীটির প্রতি। অনেক চেষ্টাতেও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না। অবশেষে অনন্ত মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হল। মহারাজ এসেই ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে কীর্তনের মধ্যে নিজেও নাচতে থাকেন, ব্যক্তিটিকেও নাচাতে থাকেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর লোকটির প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

অনন্তনাথের তথাকথিত পড়াশুনো ছিল অতি সামান্যই, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম ছিল। বিভিন্ন সময় তত্ত্ববিচারের সময় এই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। ঠাকুরের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধবাসরে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এক মহাসম্মেলন হয়; সেখানে অনন্ত মহারাজের তত্ত্ব আলোচনায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রখর বিচারশক্তির পরিচয় পেয়ে পণ্ডিতবর্গ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর এই জ্ঞান ছিল উপলব্ধি-সঞ্জাত, তাই তার গভীরতা ছিল অমেয়।

ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে ঠাকুরকে যেসব পত্র লিখতেন, ঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশমত অনন্তনাথ সেসব পত্রের উত্তর দিতেন। এইসব পত্রাবলির কিছু সংকলিত হয়ে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র 'সান্ত্বনা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। চিঠিগুলির মধ্যে সাধন-রাজ্যের বহু জটিল তত্ত্বের মীমাংসা ও চলার পথের বহু নির্দেশ সহজভাবে পাওয়া যায়। সাধনার বিভিন্ন স্তরে সাধকের অনুভূতি সংক্রান্ত ভাবগম্ভীর বিশ্লেষণও রয়েছে এই পত্রাবলিতে। 'সান্ত্বনা'-র সার্বজনীন আবেদন সেই সময়ে ভক্তদের বিশেষ প্রেরণার উৎস হয়ে পথপ্রদর্শকের গৌরব অর্জন করে। এই পত্রসংকলনের শাশ্বত ভাবভূমি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তদানীন্তন পত্রপত্রিকায় সংকলনপুস্তকটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' -র মন্তব্য : "... এই পত্রগুলিতে লেখকের জ্ঞান, ভক্তি ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মার্থ-বিষয়ক পত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যেরও অনেক

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

উপাদান আছে।" সৎসঙ্গের তৎকালীন মুখপত্রে অনন্তনাথের যেসমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও সাহিত্য-প্রতিভার অনবদ্য স্বাক্ষর রয়েছে।

এহেন স্থিতধী, সাধনসিদ্ধ অনন্তনাথও কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান রোধ করতে পারেননি। ১৩৪১ সালের অর্ধোদয় যোগের সময় প্রবাসী সৎসঙ্গী মহল থেকে বারংবার আমন্ত্রণ আসতে থাকে অনন্তনাথের কাছে, কিন্তু অনন্তনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে গেলে তিনি নিষেধ করেন। অনন্তনাথ একান্ত জোরাজুরি করায় একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঠাকুর অনুমতি দেন। ঠাকুর বলতেন— আমার ইচ্ছানুসারে যে কাজ হয়ে যায় তা মঙ্গলজনক। আর কেউ যদি বাধ্য করে কোন কাজ করায়, কিংবা অনুরোধ করে, তখন বড় অসুবিধে ঠেকে। তা অনেকে বোঝে না, কিন্তু তাতে ভালো ফল হয় না।

এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। বাইরে থেকে ঘোরাঘুরি করে অনন্তনাথ আশ্রমে ফিরলেন মারক বসন্তরোগ নিয়ে। ঠাকুর শুনে ছুটে এলেন, স্বচক্ষে তাঁর অবস্থা দেখে গভীর পরিতাপের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বঙ্কিম রায় শুশ্রূষার ভার নিলেন। তিনি এবং আরও দু'একজন ছাড়া কেউই ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। ঠাকুর অবিরাম বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন ওষুধের সন্ধানে আর হাহুতাশ করে বলেন, আমার কথা কেউ শোনে না, তাই যতসব বিপদ ঘটে।

দুর্বিষহ রোগযন্ত্রণায় অনন্তনাথ ছটফট করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আশংকায়, উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠেন, সমগ্র আশ্রমিক পরিমণ্ডলেই থমথমে বিষাদের মেঘ জমে। সেই ভয়ঙ্কর রোগগ্রস্তের ঘরে আর একজনেরও ছিল অবারিত গতি—তিনি পুরুষোত্তম-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবী।

২৯ শে মাঘ সকালে ঠাকুর অনন্তনাথের ঘরের জানালার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—অনন্ত, তোর কী কষ্ট হচ্ছে? অনন্তনাথ অতি কষ্টে বঙ্কিমের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুর্বল হাত দুটি জড়ো করে প্রণাম জানান, তারপর ইশারায় জানান—বাকশক্তি নেই। ঠাকুর বেদনাদীর্ণ মুখে চলে আসেন সেখান থেকে। অল্পক্ষণ পরেই অনন্তনাথের সমস্ত যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে— পরমপ্রিয়কে শেষ প্রণাম জানিয়ে স্থূল সত্তার অবসানে সূক্ষ্ম সত্তা তাঁরই চরণে চিরলগ্ন হয়। শেষ প্রণামের অবকাশটুকু দিতেই বোধহয় শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ মুহূর্তে তাঁর বাল্যসখার কাছে গিয়েছিলেন।

অনন্তনাথের প্রয়াণসংবাদ জানামাত্র ঠাকুর পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যান পদ্মার চরের দিকে—পিছন পিছন জননীদেবী ছোটেন শোকাতুর পুত্রকে সামলাতে, যদিও তাঁর নিজের শোকও পুত্রশোকেরেই সমতুল্য। আশ্রমের আকাশ-বাতাস বিষাদ বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সকলের প্রাণের মানুষ মহারাজের অকাল বিয়োগে। তাঁর বয়স তখন মাত্র আটচল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যুশোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে এমন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

মূহ্যমান করে তুলেছিল যে ঠাকুর পূর্ণ এক বছর পদ্মার পাড়ে একটি তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করেন—আশ্রমের মধ্যে থাকতে তাঁর বেদনা বোধ হত।

সমস্ত জীবন ঠাকুরের সঙ্গ করে অনন্তনাথ বুঝেছিলেন, ইষ্টের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসাই চরম সাধনা, আর এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে প্রিয়পরমকে তৃপ্তি দেওয়ার এক একটা সাফল্যের আনন্দই মানুষের জীবনে সত্যিকার প্রাপ্তি বা উপভোগ। মৃত্যুশয্যায় যতক্ষণ বাকশক্তি ছিল তার মধ্যে শুশ্রূষাকারীদের বলেন—ভালমন্দ এ জীবনে অনেক কিছুই করলাম। তোরা যত পারিস প্রাণপণে ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করিস, মানুষের জীবনে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কর্তব্য আর কিছুই নেই।

মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যবর্গের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি ঠাকুরের প্রাণের আবেগের ব্যাপ্তি ও আকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই আবেগ-মথিত কাব্যময় আহ্বানটি এখানে উদ্ধৃত করা হল:

“রা”

অস্তিবর্ধনপরেষু,

এই কাঙাল আমাকে —

প্রথমেই যারা গ্রহণ করেছিল, তারা মাত্রই ছিল দুই জন। সে এক জন আমার কৈশোরের ছিল খেলার সাথী—আমার অনন্ত মহারাজ—আর এক জন—কিশোরীমোহন দাস।

এক জনই মাত্র আছে—আর এক জন সে চ'লে গেছে — এই দুনিয়ার মানুষের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে—বিরহ ও বেদনার ঢেউয়ে পারিপার্শ্বিক সব অন্তর হলদল ক'রে—

সেদিন এই তো এল—ওই আসে—সেই ২৯শে মাঘ—যেদিন আমার পায়ের তলা থেকে লহমায় দুনিয়াটা যেন সরে গিয়েছিল — আকাশটা হ'য়ে গিয়েছিল নীলহারা ফাঁকা—

ঐ দিনে কি কেউ ভাই তোরা—তার স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে—সেই তার স্মৃতিতর্পণ করে শ্রদ্ধার দানে এই পরিপার্শ্বিককে তৃপ্ত ক'রে তার এই আমার আগুন-ছোঁয়া প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জ্বালিয়ে দিবি না?

কে আছ দরদী! আমার এই ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সুরের টানে—চ'লে এস শ্রদ্ধাতর্পণে—যা দিতে সাধ—তাই নিয়ে।

দীন

সৎসঙ্গ, পাবনা — *তোদেরই*

১৮ই মাঘ, ১৩৪২ সন — *'আমি'*

উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে অনন্তনাথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধকর্মের আয়োজন করেন এবং আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে সকলকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করে অন্তরতম সখার তর্পণ করেন।

মহাসাধক অনন্তনাথ মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থাতেও ইষ্টানুরাগের যে প্রেরণার আলো জ্বালিয়ে তুলে ধরেছেন, তার দ্যুতি চিরদীপ্যমান হয়ে অনন্তকাল পথ দেখাবে ভক্তজনকে।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সতীশচন্দ্র গোস্বামী

ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ — ১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৯

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সতীশচন্দ্র গোস্বামী

প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমত—যেমন, ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান, এসবের সঙ্গে হিন্দু ধর্মমতের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে অন্যান্য ধর্মের কেন্দ্রে যেমন একজন মাত্র করে মহামানব আছেন, হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী অথবা অবতারকে কেন্দ্র করে হিন্দুমতের এককে শাখা সৃষ্টি হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকে আরাধ্য করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-অনুগামী সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে খ্যাতি লাভ করেছে। মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদ পরম সাধক অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে তাঁর বংশগৌরবের পরম্পরা সার্থকভাবে বহন করেছেন।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত শালগাড়িয়ার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান সতীশচন্দ্রের জন্ম ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে, এক শুক্রবারে। পারিবারিকভাবেই একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তাঁর বেড়ে ওঠা, এছাড়াও অতিরিক্ত বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম-প্রবণতা ছিল সতীশচন্দ্রের মধ্যে। যখন সাত / আট বছরের বালক মাত্র, তখন অন্য অনেকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে কলকাতায় এসেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গলার মালা খুলে বালকের গলায় পরিয়ে দেন—যেন চিহ্নিত করেন ভবিষ্যতের পরম ভগবদনুরাগীটিকে।

ইংরেজি স্কুলে শিক্ষালাভ করেন সতীশচন্দ্র, আবার চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনো করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সমাজেও স্থান করে নেন। টোলে পড়াশুনো করতে যেতে হত পাবনাতে, সেখানে স্কুলে যাতায়াতকারী একটি বালককে দেখে বড় ভাল লাগত। ছেলেটি দেখতে ভারী সুন্দর তো ছিলই, তাছাড়াও আরও কী যেন ছিল তার মধ্যে, বারবার চোখ পড়ত সতীশচন্দ্রের তার প্রতি।

সতীশচন্দ্রের জন্মগত বিবাগী মন উপনয়নের পরে ব্রহ্মচর্য পালনের সময় থেকেই উচ্চতর ভাবভূমিতে যায়, সংসার-বৈরাগ্য ভালভাবে বাসা বাঁধে অন্তরে। এদিকে পারিবারিক শিষ্যসংখ্যা প্রচুর, প্রায়ই কোন-না-কোন শিষ্যবাড়ি যেতে হয়। যা যা করণীয় করেন সবই, কিন্তু মনপাখি আনমনা হয়ে থাকে। দাদা মুকুন্দচন্দ্র বহুবার বলেও ভাইকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেননি। দেখতে দেখতে বয়স হল ত্রিশ বছর। ১৩১১ বঙ্গাব্দ। শিষ্যবাড়ি থেকে ফিরছেন সতীশচন্দ্র, দূর থেকে দেখেন বাড়ির সদরে নহবৎ বসেছে, উঠোনে সামিয়ানা, কোন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। বাড়িতে ঢুকে জানতে পারেন, পরের দিন তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হয়েছে, তাঁকে কিছু জানানো হয়নি আগে। মনের মধ্যে ভারী অস্থিরতা অনুভব করেন;একদিকে পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্ন—কথার খেলাপ হলে তাঁর অভিভাবকদের চরম অসম্মানিত হতে হবে। আবার অন্যদিকে বাউণ্ডুলে বৈরাগী মন ছটফটিয়ে ওঠে বন্ধনের আশঙ্কায়। অদ্ভুত এক

এল, এবং আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলেন ঘুমের মধ্যে। এক পরম রূপবান কিশোর তাঁর মাথায় হাত রেখে গভীর স্নেহে বলছেন —'ভোগের দ্রব্য সম্মুখে রেখে ত্যাগই ত্যাগ। নতুবা ত্যাগ ভ্রান্তিমাত্র।' বড় চেনা চেহারা কিশোরের — পাবনার সেই স্কুল পড়ুয়া সুন্দর ছেলেটি! ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেন এক অপূর্ব শিহরণে শরীর-মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মনের অস্থিরতা দূর হল—কেমন করে যেন মনের মধ্যে একটি সুস্থিতির ভাব ফুটে উঠল। কাশীপুরের মহানন্দ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুবাসিনীর সঙ্গে সতীশচন্দ্রের বিবাহ হয়ে গেল।

সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করলেও মনের গভীরের সন্ন্যাসীটি তাড়না করে ফিরতেন সতীশচন্দ্রকে। আপন-পর বোধের সীমারেখা অন্য সংসারী মানুষের মত সীমায়িত করতে পারেনি তাঁকে। পরিপার্শ্বস্থ সকলের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুযায়ী কর্ম তাঁর সহজাত ছিল। একারণে পারিবারিক শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর মান্যতা ছিল খুব বেশি। সকলেই তাঁকে চাইতেন—তিনিও বেশির ভাগ সময়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র তীর্থভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। বাজিতপুর ঘাটে এসে উপস্থিত হন স্টীমার ধরার জন্য। সেখানে এসে শোনেন, স্টীমার আসতে অনেক দেরি আছে। কাছেই শিষ্য পুলিন ঘোষের বাড়ি। পুলিনের একান্ত ইচ্ছা, সতীশচন্দ্র এই সময়টুকু তাঁর বাড়িতে বিশ্রাম করুন। প্রিয় শিষ্যের অনুরোধে গেলেন তিনি পুলিনের বাড়িতে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল বেড়ার গায়ে টাঙানো একটি বাণী—'ভোগের দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগই ত্যাগ, নতুবা ত্যাগ ভ্রান্তিমাত্র।' কথাটি খুব চেনা মনে হল সতীশচন্দ্রের—কবে, কোথায় যেন শুনেছেন। বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ে গেল বিবাহের আগের রাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা, অপরূপ এক কিশোরের কথা! বিস্মিত হয়ে পুলিনকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বাণীর উৎসের কথা। পুলিন কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে ইতস্তত করতে থাকেন—মনে সংশয় আসে যে গুরুদেব ব্যতীত অন্য কারও প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির কথা জানলে গুরুদেব হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। এমন সময় বাড়িতে প্রবেশ করলেন তেইশ/চব্বিশ বছরের এক তরুণ—উজ্জ্বল, কমনীয় মুখখানি —সেই স্বপ্নের সুন্দর কিশোর, পাবনার সেই ছোট ছেলেটি। সতীশচন্দ্রের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই সেই তরুণ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেন—দাদা, কথাটা কি ভুল বলেছি? কী উত্তর দেবেন গোঁসাই, সমস্ত শরীরে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে, সে রাত্রের স্বপ্নদর্শনের আনন্দের স্মৃতি জেগে ওঠে। তিনি আবিষ্টের মত সেই কত দিনের আকর্ষণের মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। জানতে পারলেন, হিমাইতপুর গ্রামের বাসিন্দা এই যুবকের নাম অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইতিমধ্যেই আশেপাশের অনেকে তাঁকে 'ঠাকুর' বলে ডাকে, তাঁকে অসীম ভক্তি করে। ঠাকুর গোঁসাইকে আদরভরা সুরে বলেন—দাদা, আমার তো মনে হয়, আপনি জন্ম-জন্মান্তরে আমার ভাই ছিলেন। যাবেন কি একবার আমাদের কীর্তনের ওখানে কিশোরীর বাড়িতে? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দুর্দান্ত কিশোরীমোহন দাসকে

বিবর্তিত করে তাঁকে উত্তরণের দিকে নিয়ে যেতে ঠাকুর কীর্তনের পরশমণি ছুঁইয়ে স্বপথে এনেছিলেন। কিশোরীমোহনের অদম্য প্রাণশক্তির মত্ততা কীর্তনের মাতনের যাদুতে বিনায়িত হয়ে উঠেছিল। তাই সেসময় প্রতি সন্ধ্যায় কিশোরীমোহনের বাড়িতে কীর্তন হত। সেখানে যাওয়ার জন্যই সতীশচন্দ্র গোস্বামীকে অনুরোধ করলেন ঠাকুর। গোঁসাই ঐ মধুর আবদারের উত্তরে কথা দিলেন যে তীর্থযাত্রা শেষে কিশোরীমোহনের বাড়ি হয়ে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। ঐদিনই তাঁর তীর্থে রওয়ানা হওয়ার কথা, তাই সেদিন যাওয়া হবে না।

উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘোরেন গোঁসাই, কিন্তু তাঁর মন পড়ে রয়েছে অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। তাঁর হাসিভরা মুখখানি সর্বদাই জাগরিত হয় মানসপটে। তীর্থপতির ধ্যান করতে গেলে ভেসে ওঠে ধ্যানে অনুকূলচন্দ্রের সহাস্য বদন, কানে ভাসে তাঁরই কণ্ঠস্বর, 'দাদা, আমার কথা ভুলে যাবেন না কিন্তু'। দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিতে গিয়ে দেখেন অঞ্জলি দিচ্ছেন তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে। তীর্থে আর মন বসে না। বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে বাজিতপুর স্টীমার ঘাটে এসে দেখেন ঘাটে দাঁড়িয়ে পুলিনের ভাই মুকুন্দ। ঠাকুর তাকে পাঠিয়েছেন গোঁসাইকে কিশোরীমোহনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। গোঁসাই স্তম্ভিত; আজ এই স্টীমারে ফেরার কথা অনুকূলচন্দ্র জানলেন কি ভাবে?

গোঁসাই রওয়ানা হলেন কিশোরীর বাড়ির দিকে মুকুন্দকে সঙ্গে নিয়ে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সংকীর্তনরব, "এসো গৌরাঙ্গ নদীয়ার চাঁদ হে"। গোঁসাই ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ালো। ঠাকুর এগিয়ে এসে গোঁসাইকে জড়িয়ে ধরে বলেন, এসেছেন দাদা? এবার চলুন বাইরে গিয়ে কীর্তন করা যাক, কীর্তনের আগুন জ্বালিয়ে দিন। ঠাকুরের উপস্থিতিতে কীর্তন জমে উঠেছে, সবাই কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। ঠাকুরও নাচছেন হেলেদুলে। অবাক বিস্ময়ে গোঁসাই দেখছেন ঠাকুরের গায়ের রঙ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে—লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি সাত রঙের খেলা তাঁর শরীরে। এক একবার এক এক রঙে রঙীন হয়ে উঠছেন, কখনও আবার সপ্তরশ্মির সমন্বয়ে শ্বেতশুভ্র, কখনও বা সমস্ত রঙহীন ঘোর কৃষ্ণ। বিস্ময়ের ঘোর কাটে না গোঁসাইয়ের। এর পরই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। অসংখ্য আসন-মুদ্রা তাঁর শরীরে স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে, যার এক একটিকে আয়ত্ত করতে সাধককে করতে হয় বহু বছরের তপস্যা। আসন-মুদ্রাদির পর দেহ ক্রমশ স্থির হতে থাকে এবং অতি দ্রুত কাঁপতে থাকে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ডাক্তারি প্রোব ঢুকিয়ে দেয় আঙুলের মধ্যে—কিন্তু ঠাকুরের ভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। এই কঠোর নির্যাতনে শিউরে ওঠেন গোঁসাই, কাঁদতে থাকেন অঝোরে।

অবিশ্রান্তভাবে ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে বাণী নির্গত হয়ে চলেছে, কিন্তু সেইসব অমূল্য বাণীনিচয় অনুলিখন করে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে

কত পরম ধন ভেবে দুঃখিত হন গোঁসাই। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর জল খেতে চাইলেন গোঁসাইয়ের কাছে। উৎফুল্ল গোঁসাই ঘটি মাথায় নিয়ে পদ্মায় ডুব দিয়ে জল নিয়ে এলেন ঠাকুরের জন্য, জল পানে তৃপ্ত হলেন ঠাকুর।

সেদিনের মত যে যার বাড়ি ফিরে যান। গোঁসাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অনন্তনাথকে এই মহাভাববাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং পরে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ থেকে বাণী অনুলিখনের কাজ শুরু হয়।

গোঁসাই আসেন কাশীপুরে শ্বশুরালয়ে। রাত্রে তাঁর ঘুম হল না, ভাবেন শুধু ঠাকুরের কথা। সমাধিস্থ অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র কথা বলেন, এতো শ্রীপুরুষোত্তমের লক্ষণ! আর বিলম্ব নয়—এবার সময় এসেছে তাঁকে গ্রহণ করার। ভোরে উঠে স্নান করে ঠাকুর ঘরে আসেন রাধাগোবিন্দর পূজা করতে। কৃষ্ণ নাম করতে গিয়ে করেন অনুকূল নাম —সবই তাঁর ভুল হয়ে যাচ্ছে, মনপ্রাণ সবকিছু জুড়ে আছেন শুধু ঐ একজন। পুজোর ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য দরজায় হাত রেখে এক পা তুলেছেন, কিন্তু পা নামাতে পারছেন না, দেখছেন সেখানে অনুকূলচন্দ্রকে, পা ফেললেই যে তাঁর গায়ে লাগবে; হাত নামাবেন, তারও উপায় নেই, বাহুর তলায় ঠাকুরের শ্রীমুখখানি; সর্বত্র তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। নিশ্চল হয়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন গোঁসাই, অঝোরে ঝরে চলে প্রেমাশ্রু।

জামাতাকে ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতে না দেখে চিন্তায় পড়েন শ্বশ্রূমাতা রাধারাণী দেবী। তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঐ অবস্থায় সতীশচন্দ্রকে দেখে এবং ডেকেও সাড়া না পেয়ে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান, ভাবেন—সতীশচন্দ্র পাগল হয়ে গিয়েছেন। খবর পাঠানো হয় অনন্তর কাছে। অনন্ত সব শুনে বোঝেন এ কোন্ ব্যাধি, তিনি নিজেও তো ভুক্তভোগী, ঐ একই ব্যাধির শিকার। মহা আনন্দে অনন্ত ছুটে আসেন গোঁসাইয়ের কাছে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকেন। গোঁসাইয়ের ঘোর ভাঙে, ভাবেন— আর কোন অন্তরাল নয়, প্রত্যক্ষভাবে চাই তাঁকে। মহারাজ অনন্তনাথ গোঁসাইকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে—নিজের রান্না হবিষ্যান্ন দুভাগ করে নিয়ে একে অপরকে খাইয়ে দেন পরম আদরে।

সন্ধ্যায় দুজনে এলেন ঠাকুরবাড়িতে। গোঁসাই জড়িয়ে ধরেন ঠাকুরের চরণ-যুগল, ঠাকুর তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে কিশোরীমোহন এসে পড়লেন সদলে জয়ঢাক সহ তুমুল নিনাদে কীর্তন করতে করতে। ঠাকুর যোগ দিলেন কীর্তনে অনন্ত মহারাজ ও গোঁসাইকে সঙ্গে নিয়ে। কীর্তন জমে উঠল, পরপর দু'বার ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন, তবে এদিন কোন বাণী প্রকাশ হয়নি। কীর্তনের পর রসগোল্লা প্রসাদ পেলেন ভক্তরা—মহারাজ, গোঁসাইও প্রসাদ নিলেন পাত্র থেকে।

রাত্রে ঠাকুর গোঁসাইকে নিয়ে এলেন হিমাইতপুর নিজের বাড়িতে। শ্রীশ্রীঠাকুর-

জননী মাতা মনোমোহিনী সাদরে গ্রহণ করেন তাঁর এই নতুন পুত্রটিকে। পাশাপাশি বসে আহার শেষ করেন ঠাকুর ও গোঁসাই। গভীর রাত্রে ঠাকুর গোঁসাইকে নিয়ে এলেন পদ্মাতীরে নিমতলায়। গোঁড়া বৈষ্ণব হলেও গোঁসাই কালী পূজাও করতেন, দেখতেন জগজ্জননীর মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিকাশ। ঠাকুর গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করেন, দাদা নাকি কালীপূজায় সিদ্ধ? গোঁসাই জানালেন তিনি কালীপূজোও করেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালী, তারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা আরম্ভ করে বীরাচারী ও দিব্যাচারী সাধন পদ্ধতির গূঢ় তত্ত্ব বলতে থাকেন—উদ্‌ঘাটন করেন পঞ্চমকার ও ষট্‌চক্রের রহস্য। তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন গোঁসাই, মনে হয় জগজ্জননী স্বয়ং যেন চরম গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ঠাকুর হঠাৎ বলেন, দাদা তো এই মন্ত্র জপ করেন, তাই না? তাঁর অজানা কিছুই নয়, আবার জানলেন গোঁসাই। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্রগামী, অন্তর্যামী, ধরাধামে অবতীর্ণ পুরুষোত্তমরূপে।

ঠাকুর গোঁসাইকে বললেন তাঁর সামনে বসে জপ করতে। গোঁসাই জপধ্যান আরম্ভ করলেন, ঠাকুর তাকিয়ে আছেন অপলকে মুখের দিকে। তরতর করে সুরত চড়ে যাচ্ছে, ষট্‌চক্র, সপ্তস্বর্গ ভেদ করে মন আরোহণ করছে আরও ঊর্ধ্বে, সহস্রার, বঙ্কনাল পার হয়ে কত নাদ, ধ্বনি—তারপর অপরূপ জ্যোতিতরঙ্গের খেলা। সম্মুখে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—যাঁর অঙ্গজ্যোতি দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হয়ে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করছে, যাঁর প্রতি রোমকূপে হিরণ্যবর্ণ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, যাঁর চতুষ্পার্শ্বে ধ্বনিত হচ্ছে অশ্রুতপূর্ব নাদব্রহ্ম—এই তো সেই পুরুষ—এ যে অনুকূলচন্দ্র! বাহ্য সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন গোঁসাই। ঠাকুর ডাক দিলেন, নিন দাদা, উঠুন, ঢের হয়েছে। আর কেন? জ্ঞান ফিরে পেয়ে গোঁসাই দেখলেন তিনি তখনও জপ করে চলেছেন—কিন্তু এ জপ তো তিনি আরম্ভ করেননি! তিনি আরম্ভ করেছিলেন নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ ও কৃষ্ণমূর্তির ধ্যান দিয়ে, কিন্তু এখন তিনি জপ করছেন এক নতুন নাম যা তিনি আগে কখনও শোনেননি; আর ধ্যান করছেন ঠাকুরের। তৃষিত হৃদয়ে পেলেন এক অবর্ণনীয় আনন্দানুভূতি, যার কোন উপমা নেই।

ভোর হয়ে এল—ঠাকুর গোঁসাইকে নিয়ে এলেন কাঠের ঘরের দোতালায়, নিজে হাতে দরজা বন্ধ করে বললেন, এবার হ'ল তো? লেগে পড়েন। 'কী হ'ল'—গোঁসাইয়ের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন—কী পেলেন কাল রাত্রে নিমতলায়—কী দেখলেন—কী বুঝলেন? গোঁসাই আর পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে, তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে বললেন, আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিন! 'আশ্রয় তো দেওয়াই আছে শালা। আশ্রয় না দিলে তুমি পেলে কোথায়? দেখাল কে?'—'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এলেন ঠাকুর। বললেন—আর বসে থাকলে চলবে না, এবার ঝাঁপিয়ে পড় পরমপিতার কাজে। ঢের সময় গেছে, আর নয়। আকুল হৃদয়ে গোঁসাই বলেন, আমাকে দয়া করে আপনার যোগ্য করে নিন। এবার 'তুমি'

থেকে 'তুই'-তে নেমে এসে পরম রসিকটি বলেন, যোগ্য তো হয়েই আছিস শালা, না হলে কি আর ও পাওয়া যায়? পরমুহূর্তেই বয়সের মর্যাদা রক্ষা করতে ফিরে গেলেন 'আপনি' সম্বোধনে। বললেন—জানা তো হয়ে গেছে সব— আর একবার শুনে নিন। সেদিনের তারিখ ছিল ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র স্বয়ং আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দিলেন শ্রীমৎ আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামীকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রথম নিজে দীক্ষাদান।

দীক্ষাগ্রহণের পর গোঁসাই ফিরে এসেছেন তাঁর নিজের বাড়ি শালগাড়িয়ায়। ধ্যান, জপ চলতে থাকে নিয়ত, জ্যোতিদর্শন, নাদ শ্রবণও হয়, কিন্তু সেই অভূতপূর্ব অনুভূতি কোথায়, যা তিনি পেয়েছিলেন পদ্মাতীরে নিমতলায়? তবে কি তিনি সব দিয়েও ফিরিয়ে নিলেন? ব্যাকুল হয়ে ওঠেন গোঁসাই। ভাবেন, সেদিন তাঁর অহৈতুকী করুণায় যা পেয়েছিলেন, সাধনার দ্বারা তা অর্জন করতে হবে। কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন তিনি। এদিকে ঠাকুরও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন গোঁসাইয়ের জন্য। লোকের পর লোক পাঠান, তারা ফিরে এসে বলে জপধ্যানে ডুবে আছেন গোঁসাই। কিন্তু ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-আনন্দ তো লক্ষ্য নয়, চাই কর্ম, তীব্র গতিতে কর্ম। ঠাকুরের যে এখনই প্রয়োজন এই শিষ্যটিকে মানবকল্যাণার্থে—গোঁসাই ঝাঁপ দিলে তবেই শুরু হবে কাজ, নতুবা তাঁর কাজের যে দেরি হয়ে যাবে!

৬ ই শ্রাবণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দের সন্ধ্যায় কিশোরীমোহনের বাড়িতে সমবেত হয়েছেন অনেকে। ঠাকুর এসেছেন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে। পরমভক্ত যতীশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন গোঁসাইয়ের কথা, শুনলেন তিনি সাধনায় নিমগ্ন হয়ে আছেন। কীর্তন শুরু হল; কীর্তনের চরম পর্বে সমাধিস্থ হলেন ঠাকুর। কিশোরীর মনে প্রশ্ন, ঠাকুর গোঁসাইয়ের জন্য এত ব্যস্ত কেন? অদ্বৈত বংশের সন্তান, সেই কি অদ্বৈত প্রভু? ঠাকুরের কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই। অদ্বৈত মহাপ্রভু। ও ঝাঁপ দিলে প্রকৃত প্রচার আরম্ভ।' পরবর্তীকালে এ বিষয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি যা বলেন, তাতে তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই, তাই সে কথার দায়িত্বও তিনি নিতে পারেন না।

পরদিন ঠাকুর নিজেই গেলেন গোঁসাইয়ের বাড়ি, সঙ্গে অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন ও কীর্তনের দল। শুরু হল তুমুল কীর্তন। সেযুগের কীর্তনের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এককথায় ঠাকুরের উপস্থিতিতে সৎসঙ্গের আদিযুগের সেই তাণ্ডব কীর্তন অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। নৃত্য করছেন কিশোরীমোহন কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে, কখনও বা হুঙ্কার দিয়ে ঢাকের উপর লাফিয়ে উঠে নেচে চলেছেন। তালে তালে লাফিয়ে উঠছেন মহারাজ, অথচ হাঁটু ভাঙছে না, পা বাঁকছে না, রবারের মূর্তির মতন পা মাটিতে ঠেকা মাত্র লাফিয়ে উঠছেন শূন্যে—ধ্যানস্তিমিত নেত্র, হাস্যময় প্রশান্ত মুখ। গোঁসাইও যোগ দিয়েছেন কীর্তনে—তুমুল তাণ্ডব নৃত্য, কণ্ঠে হুঙ্কার,

কখনও ঢাকসুদ্ধ ঢাকীকে বনবন করে ঘোরাচ্ছেন, কখনও বা কাউকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছেন—কাউকে কাঁধে তুলছেন, কারও কাঁধে উঠছেন —এ যেন শিব তাণ্ডবের দুরন্ত রূপ! হেলে দুলে নাচছেন ঠাকুর—দেহে জ্যোতিতরঙ্গের খেলা—অস্থিহীন, গ্রন্থিহীন, অপরূপ ছন্দোময় নৃত্য। ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন—মহাভাববাণীতে উচ্চারিত হল—'কর্ম্ম, কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম। যত কর্ম্ম, তত অগ্রসর। তোরা কি জানিস? ভগবানের বাহু। প্রচার করতে তোদের তৈরী, কুড়িয়ে নিতে। ঐ শোন, ঐ দ্যাখ্, পূর্ণত্ব প্রাপ্তি অতি নিকটে।'

শালগাড়িয়ায় বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়—অগণিত মানুষ ভূলুণ্ঠিত হয় দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে। এবার ঠাকুর গোঁসাইকে নিয়ে ফিরে এলেন হিমাইতপুরে। গোঁসাই ঠাকুরের কাছে মিনতি করেন—দয়াল আমার যখন পরম সৌভাগ্য হয়েছে আপনাকে লাভ করার, তখন যারা আমার কাছে পূর্বে দীক্ষা নিয়েছে বা পরে নেবে, তাদের এই সৎনাম দেওয়ার অনুমতি দিন আমাকে। ঠাকুর বলেন, গোঁসাইদা, প্রথম প্রচারের দায়িত্ব কিন্তু অনেক, বহু সইতে হয় প্রথম পথিকৃৎকে। গোঁসাই বলেন—রোগ-শোক-দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, আজীবন এ মোর উপাসনা। তথাপি প্রচার তব আমার কামনা। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ও গোঁসাইয়ের দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি আনিয়ে দিলেন আগ্রায় লিখে, কারণ সেখানেই এই সৎনাম প্রথম প্রচারিত হয়। প্রচার আরম্ভ করেন গোঁসাই এতদিন দীক্ষা দিতেন নিজে গুরু হয়ে, এখন দীক্ষা দেন গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরই আদেশে। বহুধা-বিস্তৃত সৎসঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত হল এই সময় থেকে।

১৩২২ সাল, গোঁসাই এসেছেন বারাদীতে। এখানে এসে কঠিন অসুখে পড়লেন, বিয়াল্লিশ দিন শয্যাশায়ী। খোকা ডাক্তার দেখে গিয়েছেন, কুষ্টিয়া থেকে বড় ডাক্তাররাও এসে দেখে যান—কিন্তু কোন আশার আলো পান না কেউ। হাত পা নাড়াবার ক্ষমতা নেই গোঁসাইয়ের। ঠাকুরকে খবর দেওয়া হল—ঠাকুর মহারাজ ও কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কুষ্টিয়ায়, সঙ্গে ঢাক ও বাদ্যযন্ত্র ও কীর্তনের দল। কিশোরী কীর্তনের দল নিয়ে কীর্তন করতে করতে চললেন বারাদীতে। ঠাকুর ও মহারাজ যাবেন কিছু পরে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঢাকের শব্দ; ভয় পেলেন গোঁসাইয়ের পরিচর্যাকারীরা, ভাবলেন ঢাকের প্রচণ্ড শব্দে হয়তো রোগীর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। কীর্তনের দল এসে পড়েছে, বাধা দিতে গেলেন কয়েকজন—কিন্তু বাধা মানবে কে? কিশোরী সদলে এসে পড়লেন গোঁসাইয়ের ঘরের সামনে উঠোনে। আরম্ভ হল তুমুল কীর্তন। হঠাৎ অসুস্থ গোঁসাই এক লাফে দরজা ও বারান্দা পার হয়ে পড়লেন গিয়ে কীর্তনের মাঝে। দুই হাতে দুটো ঢাক ধরে বাদক সহ ঘোরাতে থাকেন বন বন করে—কণ্ঠে তাঁর ভীম গর্জন। সবাই ভাবল অসুখের বিকার—এবার পড়বেন আর প্রাণ হারাবেন। ঠাকুরও নেমেছেন কীর্তনে মহারাজকে নিয়ে। অনেকক্ষণ চলল সেই তাণ্ডব কীর্তন। গোঁসাই পড়লেনও না, মরলেনও না; ফিরে পেলেন তাঁর সুস্থ শরীর, রোগের কোন

লক্ষণই আর নেই তখন তাঁর শরীরে।

১৩২৪ সালের মাঘ মাস। সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছেন কুষ্টিয়ার কলাবাগান আশ্রমে। গোঁসাই খিচুড়ি ভোগ রান্না করছেন—ঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ পাবেন ভক্তরা। কয়েকজন ভক্ত ধরে বসলেন গোঁসাইকে, ঠাকুর ভোগ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে চান তাঁরা। গোঁসাই বললেন, তোমরা যদি আমাকে কীর্তনে মাতাল করে দিতে পার তবে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কীর্তন আরম্ভ হল, গোঁসাই ভাবাবেশে কীর্তন করে চলেছেন—সঙ্গে ভক্তরা। এদিকে ঠাকুর হিমাইতপুরে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। মাঘ মাসের শীত, রাত্রি তখন প্রায় আটটা, হঠাৎ ঠাকুর বললেন—কুষ্টিয়া যাব। বলা মাত্রই শুরু হল যাত্রা—সঙ্গে কিশোরী, মহারাজ, যদু পাল ও আরও কয়েকজন ভক্ত। দীর্ঘ নয় মাইল চড়া হেঁটে, খেয়া নৌকোয় দুটি নদী পেরিয়ে রাত দশটায় কলাবাগান আশ্রমে এসে পৌঁছলেন ঠাকুর। পাথরের থালায় ভোগ সাজিয়ে বসে আছেন সতীশচন্দ্র ঠাকুরের প্রতীক্ষায়, রাত বাড়ছে দেখে ভক্তরা অনেকেই খেতে বসে গেছেন। এমন সময় ঠাকুর এসেই বললেন—শীগ্‌গির খেতে দে, বড্ড খিদে পেয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে ভোগে বসলেন তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, কীর্তনের একটা শক্তি আছে—জোর করে মনকে উচ্চে নিয়ে যায়। কীর্তন দিয়েই ঠাকুর আরম্ভ করেন এবারের তাঁর নরলীলা। কীর্তনের দল নিয়ে আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী নলডাঙায় গিয়েছেন প্রচারে। কীর্তন চলছে প্রবল বেগে, নামের অনলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আলোড়ন। দলে দলে ধর্মপিপাসু মানুষের দল এসে দীক্ষা নিয়ে জীবন সার্থক করছেন। কাছেই ছিল পতিতাপল্লী—সেখানকার এক পরমা সুন্দরী রমণী অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হয়ে উন্মাদিনীর মত কীর্তনের মধ্যে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল গোঁসাইয়ের পা। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমাকে উদ্ধার করুন, আমাকে রক্ষা করুন বাবা, বলে দিন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী! গোঁসাই তাকে আশা দিলেন, আশ্বাস দিলেন, ভরসা দিলেন। শোনালেন দয়াল ঠাকুরের অভয় বাণী—জীব, তোর চিন্তা কী? তোর ভয় কী? মহাপাপ করে থাকিস ক্ষতি নাই। আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে তোদের অন্তরে স্থান দে—আমি সব পাপতাপ মুছে দেব। পরম আশ্বস্ত হয়ে রমণীটি ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং যথাসর্বস্ব দান করে মস্তক মুণ্ডন করে ঈশ্বরের নামগানে আত্মস্থ হন।

সাময়িক ভ্রান্তিতে কোন নারীর বিচলন ঘটলে সমাজ তাকে পরিত্যাগ করত, আত্মীয়-স্বজন কারোর কাছেই তার আর আশ্রয় মিলত না। এদের আশ্রয় ছিল গোঁসাইয়ের কাছে। তিনি বলতেন, এদের ছেড়ে দিলে এরা আরও অধঃপতনের পথে চলে যাবে, এদের দ্বারা বহুলোক কলুষিত হবে, অজস্র বর্ণসংকরে ভরে যাবে দেশ। বরং এদের আশ্রয় দিয়ে আদর্শের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে মঙ্গল হবে সব দিক দিয়ে।

কীর্তনের অমিত শক্তির বহু পরিচয় কীর্তনসাধক আচার্য সতীশচন্দ্রের জীবনে

পরিব্যাপ্ত। কীর্তনরত অবস্থায় স্পর্শ করে কতজনের জীবনে যে তিনি কত অঘটন ঘটিয়েছেন তার শেষ নেই। একবার বরইচারা গ্রামের জানকী হালদার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে নাম চিকিৎসার সাহায্য চেয়ে খবর পাঠান। শ্রীশ্রীঠাকুর আমলাপাড়ার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে জানকীর চিকিৎসার জন্য যেতে বলেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু সাহস পায় না — ভাবে সে কী করে পারবে! ঠাকুর তাকে স্পর্শ করে ভরসা দেন—নিশ্চয়ই পারবি, চিন্তা নেই। ঠাকুরের নির্দেশে সে অবশেষে বরইচারা গিয়ে জানকীকে স্পর্শ করে নাম করতে করতে রোগীকে আরোগ্য করে ফিরে আসে। এই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সতীশচন্দ্রের কীর্তন- যাদুর এক দৃষ্টান্ত। সে জাতিতে ছিল নাপিত, জাতব্যবসা ছেড়ে জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করত; দুর্দান্ত প্রকৃতির নাস্তিক ছিল সে। গোঁসাই নগর-কীর্তন নিয়ে পথ পরিক্রমা করতে করতে তার বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হতেই এক মোটা লাঠি হাতে ছুটে এল গোঁসাইকে মারবে বলে, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র তার হল অদ্ভুত দশা—সমগ্র পৃথিবী যেন টলে উঠল, চারপাশের সব কিছু আলোকিত হয়ে উঠল, কিছু বোঝার আগেই দেখা গেল পাষণ্ড রামকৃষ্ণ বিশ্বাস পাগলের মত নেচে নেচে কীর্তনে চলেছে সবার আগে আগে। অচিরেই দীক্ষা নিল সে আর হয়ে উঠল নামধ্যান -পরায়ণ পরম ভক্ত; গোঁসাইয়ের নিত্য সহচর হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁরই সেবায় দিন কাটতে লাগল তার।

বরইচারা গ্রামেই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত ডাক্তার সতীশ জোয়ারদার, তাঁর ভাই রাধারমণ জোয়ারদার—এঁদের বাড়ি। রাধারমণ-জায়া সরোজিনীর একান্ত আকুল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ঠাকুর একবার তাঁদের গৃহে এসেছেন অন্যান্য অনেক ভক্ত ও পার্ষদ সহ। গোস্বামী সতীশচন্দ্রও আছেন সঙ্গে। সেখানে নাটমন্দিরে শুরু হল কীর্তন —কীর্তনের কম্পনে সমস্ত পরিবেশ প্রকম্পিত হতে লাগল। এমন সময় সেখানে রতনলাল নামে এক হিন্দুস্থানী এসে উপস্থিত হল—সরকারী খাজনা আদায় করার কাজ তার। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা বলিষ্ঠ দেহী রতনলালকে গৃহকর্তা রাধারমণ অনুরোধ জানান সেদিন সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের। কিন্তু রতনলাল অত্যন্ত গোঁড়া, বাঙালীর ছোঁয়া রান্না সে খায় না। রাধারমণ জানান যে সদ্ ব্রাহ্মণ সব কিছু রান্না করছে, স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হবে সেখানে। কিন্তু রতনলালের ঐ এক গোঁ—বাঙালির ছোঁয়া সে খাবে না। বিরক্ত হলেন রাধারমণ—তাকে বলেন যে এমন নামকীর্তন যাঁরা করছেন, তাঁদের যে-কারো প্রসাদ পাওয়াই ভাগ্যের কথা, আর স্বয়ং ঠাকুরের প্রসাদ পেলে তো তার বংশ উদ্ধার হবে। এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ রতনলাল নামকীর্তনরত গোঁসাইকে লক্ষ করে ছুটে যায়—চেপে ধরে তাঁকে, উদ্দেশ্য—এদের ভণ্ডামি ভেঙে দেবে সে! কিন্তু ঐ দৈত্যোপম রতনলাল তাঁকে চেপে ধরতেই কীর্তন করতে করতে গোঁসাই রতনলালকেই বগলে চেপে আনন্দে নাচতে লাগলেন, তারপর সজোরে নিক্ষেপ করলেন প্রাঙ্গণে। সেখানে পড়েই রতনলাল উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করতে লাগল, সঙ্গে উম্মাদ-নৃত্য। কীর্তনের পরে স্নানাহার পর্ব; ঠাকুর ভোগ হয়ে যাবার পরে ভক্তরা

আহারে বসবে। গোঁসাই সেসময় রাধারমণকে বললেন রতনলালের সন্ধান নিতে। দেখা গেল—বাইরে বসে অঝোরে কাঁদছে সে, আর নাম করে চলেছে অবিরাম। রাধারমণকে দেখতে পেয়েই পরম আগ্রহে জানতে চাইল—ঠাকুর-ভোগ হয়ে গেছে কিনা এবং সে প্রসাদ পাবে কি না। রাধারমণ তখন তাকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর তাঁর প্রসাদের থালা ধ'রেই রতনলালকে দিতে বললেন। রতনলাল মহা আনন্দে সে প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হল। তারপর দীক্ষা নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এল আশ্রমে।

কীর্তনের আশ্চর্য প্রাণদায়ী ক্ষমতার আর এক প্রকাশ বর্ণিত হচ্ছে। কুষ্টিয়ার অন্তর্গত এক গ্রামে বিষ্ণুপদ বিশ্বাস নামে একজন ইষ্টভ্রাতাকে একবার মহাবিষধর কালকেউটে দংশন করে। তৎক্ষণাৎ বাঁধা হয় কামড়ানো জায়গার কাছে—চিকিৎসক এসে অপারেশন করে বিষ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন, ইঞ্জেকশনও দেন। কিন্তু তার জীবনের লক্ষণ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে; অতঃপর ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করানো হয় শেষ চেষ্টা হিসাবে—কিন্তু সবই বিফল হয়—ক্রমেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে তরতাজা যুবক বিষ্ণুপদ। বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। এমন সময় হঠাৎই সেখানে হাজির হলেন আচার্য্য সতীশচন্দ্র। তাঁকে দেখে সকলের কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। সতীশচন্দ্র অবিলম্বে কীর্তনের আয়োজন করতে আদেশ দেন। সেইমত শুরু হল কীর্তন। জমে উঠল কীর্তন, গোঁসাই নিমগ্ন হলেন তাতে। এরপরেই বিষ্ণুর মৃতপ্রায় দেহখানি এক হেঁচকা টানে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কীর্তন ও নৃত্য করতে থাকেন বিপুল বেগে — সতীদেহ স্কন্ধে শিবের তান্ডব নৃত্যের মত। দীর্ঘকাল কীর্তন করতে করতে বিষ্ণুর দেহে ক্ষীণ স্পন্দন ফিরে এল—ক্ষীণভাবে অনুভব করে সে যেন পদ্মার ঢেউয়ের মাথায় একবার উঠছে আবার নামছে। তার চেতনা ফিরে আসছে বুঝতে পেরে গোঁসাই দেহটি মাটিতে নামালেন—কিন্তু তখনই আবার অচেতন হয়ে পড়ে সে। আবার কাঁধে তুলে নিয়ে শুরু হল নাচ ও কীর্তন—সে কীর্তনের উম্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল উপস্থিত অন্যান্য সকলেও। ক্রমে বিষ্ণুর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল—স্মরণে এল সর্প দংশনের কথা; দেখল, গোঁসাই তাকে কাঁধে করে নেচে চলেছেন তখনও। অতঃপর নেমে পড়ল সে গোঁসাইয়ের কাঁধ থেকে—সাশ্রুনয়নে প্রণাম করল প্রাণদাতাকে।

একবার শিবচতুর্দশীতে সতীশ জোয়ারদার, রাধারমণ জোয়ারদার এবং অন্যান্য কয়েকজন উপবাস করেন। সন্ধ্যাবেলা মাটির শিব গড়িয়ে তার মাথায় জল দেওয়ার উদ্দেশ্যে পদ্মার বাঁধের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গোঁসাই বসে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ঠাকুরও ছিলেন কাছেই। শিবপূজার উদ্দেশ্যে যাওয়া ভক্তদলকে ডেকে ঠাকুর গোঁসাইকে ইঙ্গিত করে বলেন—মূর্তিমান চলন্ত শিব থাকতে আপনারা কোথায় পূজো করতে যাচ্ছেন?

ঠাকুরের এ কথায় ভক্তবৃন্দ গোঁসাইয়ের সামনে গিয়ে তাঁর পায়েই অঞ্জলি দিয়ে শিবপুজো সমাপ্ত ক'রে, প্রণাম করে গৃহে ফিরে উপবাস ভঙ্গ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের 'চলন্ত শিব' সতীশচন্দ্র তাঁর গুরুর মতই লোকপালী ছিলেন। ১৩৫০-এর নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বাংলায় লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুরের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির প্রসাদে সৎসঙ্গীবৃন্দের তেমন দুর্দশা হয়নি।

এই দুর্ভিক্ষে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম কিশোরীমোহন দাসের অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা চিরস্মরণীয়। তিনি নিজে সারাদিন ভিক্ষা করে সেই ভিক্ষালব্ধ দানে অগণিত বুভুক্ষুর খাদ্য জুগিয়েছেন। সতীশচন্দ্রও আশ্রমস্থ যেসব পরিবার সংকোচবশত চাইতে পারতেন না, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দৈনন্দিন সাহায্য দিয়ে আসতেন। পৌরোহিত্য বা প্রণামীর অর্থে না কুলোলে ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করে উপবাসী পরিবারগুলিকে নিয়ত সহায়তা করতেন।

গুরুকে বা ইষ্টকে যেমন সবদিক থেকে সর্বদা বহন করে চলতেন সতীশচন্দ্র, গুরুও তেমনই তাঁর প্রাণপ্রিয় ভক্তটির আধিব্যাধিতে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

একবার সতীশচন্দ্রের কোমরে অত্যন্ত ব্যথা হয়েছে। বসলে উঠতে কষ্ট হয়, উঠলে বসতে কষ্ট হয়। ব্যথা যায় না কিছুতেই—কষ্ট পাচ্ছেন সতীশচন্দ্র। ঐ অবস্থা লক্ষ করে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, সতীশদা, আপনার কী হয়েছে? ঠাকুরের কথা শুনে সতীশচন্দ্র ঠাকুরের পা দুখানি দু'হাতে স্পর্শ করে বললেন—আপনি আর সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন না। সতীশচন্দ্রের একথা এভাবে বলার কারণ যে তিনি বিশেষভাবে জানেন যে, ঠাকুর অনেক সময়ই অপরের রোগ নিজের শরীরে গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি তাঁর ব্যথার কথা ঠাকুরকে জানাতে চান না। এরপর জলযোগ গ্রহণের কিছুক্ষণ পর সতীশচন্দ্র উঠতে গিয়ে দেখলেন তাঁর আর কোন কষ্ট হচ্ছে না, ব্যথা সম্পূর্ণ দূরীভূত। কিন্তু ঠাকুরের কোমরে অত্যন্ত ব্যথা দেখা দিল। গুরুগতপ্রাণ সতীশচন্দ্র গভীর দুঃখে ঠাকুরকে বললেন, আমি তো বললাম আমার ব্যথার কথা আপনার শুনে দরকার নেই। এই দেখুন, আমার ব্যথা সেরে গিয়ে আপনার হল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, অনেক সময় ঠাকুরকে রোগব্যাধির কথা না জানালেও তাঁর মনোযোগ কোনভাবে আকৃষ্ট হলেই অপরের রোগ যন্ত্রণা তাঁর দেহে প্রকাশ পেত।

গোঁসাইয়ের কাছে মাঝে মাঝে অশরীরী আত্মার আসা-যাওয়া ছিল। গোঁসাইয়ের সঙ্গে তাদের বার্তাবিনিময় হত। একবার রাজশাহীর নওগাঁয় বিভূতিভূষণের বাড়ির বারান্দায় গোঁসাই ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর রাত্রে বিভূতিভূষণের স্ত্রীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ঘরের মধ্য থেকে শুনতে পেলেন, গোঁসাই কারও সঙ্গে কথা বলছেন। কৌতূহলবশত জানালা খুলে দেখলেন, চৌকিতে গোঁসাই একা উপবিষ্ট, অন্য কেউ নেই। গোঁসাইয়ের উত্তর শোনা যাচ্ছে, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর গোঁসাই দিচ্ছেন, সে প্রশ্নগুলি শোনা যাচ্ছে না। ভয়ে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যায়,

জানালা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়েন। পরদিন সকালে গোঁসাই তাঁকে বলেন, রাত্রে আমাকে কথা বলতে শুনলে আর কখনও জানালা খুলে দেখিস না।

কুষ্টিয়ার রেলের ওভারসিয়ার প্রমথনাথ গাঙ্গুলির স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। প্রমথর প্রবল আকাঙ্খা স্ত্রীকে একবার দেখার ও কথা বলার। চেপে ধরলেন গোঁসাইকে। গোঁসাই রাজি হননি—কিন্তু প্রমথর অত্যন্ত পীড়াপিড়িতে শেষে সম্মত হলেন। গোঁসাই প্রমথর ঘরে তার খাটের পাশে একটি ছোট খাটে রাত্রে ঘুমোন। সেদিন বললেন, তুই একা থাক, আমি অন্য ঘরে শোব। রাত্রে ঘুম আসছে না প্রমথর, মৃদু আলোকিত ঘর। হঠাৎ দেখলেন—খাটের পাশে দণ্ডায়মান মৃতা স্ত্রী। সে বলল, কেন তুমি আমাকে বারবার ডাক বল তো? আমার যে কষ্ট হয়। প্রমথ জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় আছ তুমি, কেমন আছ? সে বলল, ঠাকুরের কাছে আছি, ভাল আছি। অনেকক্ষণ কথা হল দুজনের। দরজার বাইরে থেকে গোঁসাই তারপর বললেন, আর নয়, এবার দরজা খোল্, আমাকে তামাক দে। অদৃশ্য হয়ে গেল অশরীরী। দরজা খুলে গোঁসাইকে তামাক সেজে খাওয়ালেন প্রমথ।

নামের তরঙ্গে কত যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটত যার অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীয়মান। নামের প্রভাবে যোগযুক্ত অবস্থায় সমর্পিত প্রাণ উচ্চ আধার এসব ভক্তপ্রবরের ব্যক্তিত্বে আসত এক অসাধারণ পরিবর্তন—এঁদের চিন্তাতরঙ্গ স্পর্শ করতে পারত যে কোন অন্তরকে। মুখে প্রকাশ না করেও কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই প্রভাবিত করতে পারতেন যে কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিসমষ্টিকে। একবার গোঁসাই পাবনা থেকে কুষ্টিয়া যাচ্ছেন স্টিমারে। কিছুক্ষণ যাবার পর তাঁর খেয়াল হল স্টিমারে তো ঠাকুরের কোন ভক্ত নেই। গান ধরলেন গোঁসাই গভীর ভাবসম্বেগে। সুরেলা গলায় ভাবে আপ্লুত হয়ে গাইতে থাকেন গোঁসাই। মুগ্ধ হল সবাই, একে একে দীক্ষা নিল তারা। সারেং থেকে খালাসি, কেবিনের যাত্রী থেকে ডেকের যাত্রী, সবারই দীক্ষা সম্পূর্ণ হল। গোঁসাইয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, স্টিমার আর ভক্তশূন্য রইল না। আর একবার চলতি ট্রেনের কামরায় যতজন সহযাত্রী ছিল সকলকে দীক্ষিত করেছিলেন গোঁসাই।

নামময় অবস্থার সংস্পর্শে সেযুগে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয়। ডাকপিওন লক্ষণ ঘোষ পক্ষাঘাতে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। বহু চিকিৎসাতেও ফল হয়নি কোন। অশ্বিনী বিশ্বাসের বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে, পরিচালনা করছেন গোঁসাই। প্রতিবেশীরা লক্ষণকে এনে রাখল গোঁসাইয়ের পায়ের কাছে, ব্যাধিমুক্তির মিনতি জানিয়ে। লক্ষ্মণকে বুকে জড়িয়ে কীর্তনে নামেন গোঁসাই; কিছুক্ষণ নৃত্যের পর তাকে ছেড়ে দিলেন—লক্ষ্মণ সুস্থ দেহে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল সকৃতজ্ঞ চিত্তে। নাম চিকিৎসায় এভাবে অনেক দুরারোগ্য রোগীর ব্যাধিমুক্তি ঘটে। রোগীকে স্পর্শ করে নাম করা হত কখনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে, কখনও বা পর্যায়ক্রমে। নামের বিচিত্র শক্তি দেখে দূরদূরান্ত থেকে

নানা রোগের রোগীরা আসত নামচিকিৎসায় সুস্থ হতে। অটুট ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে খুব তীব্রভাবে নাম করলে দেহের মধ্যে প্রবাহিত অদৃশ্য আলোকস্রোত মস্তিষ্কে সংহত হয়; তখন অসুস্থ বা সদ্য মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে ঐ সূক্ষ্ম জীবনীশক্তির সঞ্চারণে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হতে পারে, মৃত ব্যক্তিও জীবন পেতে পারে—যদি ঐ মৃত ব্যক্তির শরীর বিধানের কোন বিশিষ্ট যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিকল বা বিকৃত না হয়।

সতীশচন্দ্র দানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অজস্র প্রণামী পেতেন—অকাতরে বিলিয়ে দিতেন শেষ কর্পদক পর্যন্ত। একবার সুরেন বিশ্বাস গোঁসাইয়ের গায়ে তখনকার সময়ের আড়াইশো টাকা দামের একটি নতুন শাল জড়িয়ে দিলেন। গোঁসাই ফিরছেন কুষ্টিয়ার আশ্রমে। রাস্তায় দেখেন এক নগ্ন ভিখারি শীতে কষ্ট পাচ্ছে। গোঁসাই প্রথমে শালটি তাকে দিলেন—তারপর একে একে নিজের জামা, কাপড়, জুতো ইত্যাদি যাবতীয় পরিধেয় তাকে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে। যোগ্য সহধর্মিণী গোঁসাই-মা সবদিক থেকে পরিপূরণ করতেন গোঁসাইকে।

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও সংগ্রহ করে নিয়মিত পাঠাতেন। ভিক্ষার চেয়ে গোঁসাই লোককে সেবা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন বেশি। নাম চিকিৎসায় রোগীকে চিকিৎসা করে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে ভুগতেও হয়েছে অনেকবার। রোগীর কর্মদোষ কাটাতে অনেক সময় রোগ টেনে নিয়েছেন নিজের দেহে। এর ফলে একবার তাঁকে দীর্ঘ ছ'মাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। এই জাতীয় অসুখে গোঁসাইয়ের চিকিৎসা করতেন কিশোরীমোহন।

মহা তাপস সতীশচন্দ্র গোস্বামী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইষ্টের অভীষ্ট পূরণে সচেষ্ট ছিলেন। জীবনের পরম মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে যে ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছিলেন, জীবন-সায়াহ্নেও ছিল সেই পরম প্রাপ্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি। সাধন জগতের বিভিন্ন স্তরানুভূতি এবং তাতে সহজ বিচরণ তাঁর কাছে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। কখনও কোন অবস্থায়ই বিচলিত হতেন না—শান্ত, স্থির লালিত্যে ভরা মুখমণ্ডল ছিল সদা হাস্যময়।

দেশ বিভাগের পর সতীশচন্দ্র কিছুদিন বোলপুরে ছিলেন সপরিবারে, তারপর দেওঘর চলে আসেন এবং দেওঘরেই তাঁর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ থেকেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় গোঁসাইয়ের শরীর ভেঙে পড়েছিল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি উৎসবের পর থেকে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। ঠাকুরের সঙ্গ লাভের দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের জীবনে এবারই গোঁসাই ঠাকুরের জন্মতিথিতে তাঁকে পৈতে পরাতে পারলেন না অসুস্থতার জন্য। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুরের ফটোর দিকে। নাম করে চলেছেন, মুখমণ্ডলে গভীর প্রশান্তির চিহ্ন। কথা খুব কম

বলেন, তবে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৯ অবস্থা আরও খারাপ হল, অক্সিজেন চলছে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, গলা দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, মুখের হাসিটি তবু অম্লান। ছেলে হরি গোঁসাইকে অভয় দিয়ে বলেন—আমি ভালই আছি, তোর কোন চিন্তা নেই। ১৭ই বৈশাখ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র পূজনীয় ছোড়দা (বিবেকরঞ্জন চক্রবর্তী) এসেছেন দেখতে, আনন্দের হাসি হাসলেন গোঁসাই। ১৮ই বৈশাখ সকালে পূজনীয় বড়দা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এসে বসলেন গোঁসাইয়ের কাছে—হাত বাড়িয়ে দিলেন গোঁসাই তাঁর দিকে। ঠাকুরের একটা বড় ফটো চাইলেন, ফটোটি বুকে নিয়ে পৈতে পরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত বোলালেন ফটোর উপর, তারপর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে ফেরৎ দিলেন ফটো। বড়দাকে বললেন, এবার আমি চললাম এখান থেকে। আর সহ্য করতে পারলেন না বড়দা, বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যার পর ডাঃ বনবিহারী ঘোষ গোঁসাইকে দেখে এসে পুত্র হরি গোঁসাইকে বলেন—মন শক্ত করুন, বিচলিত হবেন না, আর কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবেন। কীর্তনের ঋষির যাত্রালগ্নে কীর্তন করতে বলেন বনবিহারী ঘোষ। ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্ বঙ্কিম রায় আপত্তি জানান—বলেন, পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, এখন কীর্তন করা মানেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া। পুত্রকে ডেকে গোঁসাই জানতে চান, অমাবস্যা কখন লাগবে। হরি গোঁসাই জানান—পরের দিন বেলা বারোটায়। গোঁসাই বলেন—তাহলে সে-পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই।

পরদিন ১৯শে বৈশাখ দলে দলে ভক্তরা অবিরাম আসছেন শেষবারের মত তাপস শ্রেষ্ঠকে প্রণতি জানাতে। সকাল পেরিয়ে গেল—ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। যাঁর অভ্যন্তরে সর্বদাই রণিত হচ্ছে শঙ্খ-ঘন্টার সুমিষ্ট ধ্বনি, সেই গোঁসাইও শুনলেন পার্থিব ঘন্টার শব্দ। বাড়িতে প্রত্যেককে নাম ধরে ডেকে বললেন খেয়ে নিতে। চোখের জল ফেলতে দিচ্ছেন না কাউকে, চোখের জল পড়লেই মুছে নিতে বলছেন। একটা বাজার পর বললেন—এবার প্রস্তুত হও কে কে আমার সঙ্গে যাবে। আমি যাব ঐ পথে—হাতদিয়ে দেখিয়ে দিলেন শ্মশান যাত্রার পথ। দেড়টার সময় ঠাকুরের ফটো চেয়ে নিয়ে বুকে রেখে প্রণাম করলেন। চৌকিতে বসে দু'জন কায়স্থ কন্যা তাঁর পরিচর্যা করছিল, একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"এবার যে তোমাদের একটু নামতে হয, লক্ষ্মী"। নেমে দাঁড়াল তারা। ঠাকুরের ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন মহাসাধক, একটা পঞ্চাশ-এ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি জানিয়ে সাঙ্গ করেন সাতাশি বছরের পার্থিব জীবন—মিলিত হলেন প্রিয়পরমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মিলনে।
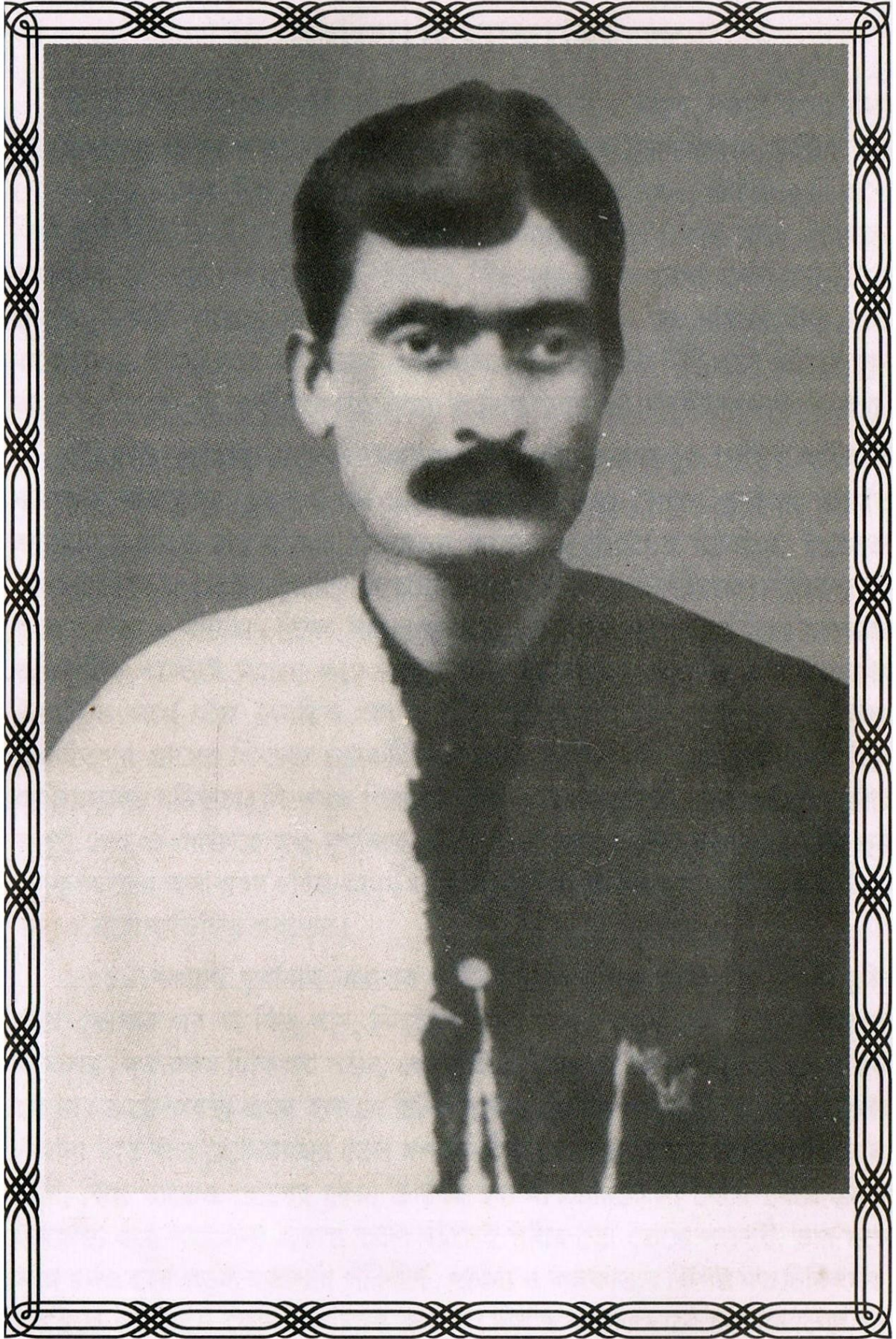
দুর্গানাথ সান্ন্যাল

১লা বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ — ?

দুর্গানাথ সান্ন্যাল

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একান্ত নবীন বয়সে তাঁর মানব সত্তার মধ্যে যাঁরা মহামানবতার প্রকাশ লক্ষ্য করে তাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে তাঁরা বিশেষ উচ্চ শক্তির অধিকারী। পরবর্তীকালে যখন 'শ্রীশ্রীঠাকুর' রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তখন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসু ও পিপাসু ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাছে এসেছেন স্বাভাবিক প্রেরণায়। কিন্তু একান্ত পরিচিত, নিত্যকার চোখে দেখা তরুণ মানুষটিকে প্রাণের, মনের, আত্মার সবটুকু সঁপে দিয়ে তাঁর হয়ে ওঠার সামর্থ্য যাঁরা লাভ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে মানবাত্মার সংকট-বিমোচন-প্রয়াসের ইতিহাসে তাঁদের স্থান অনেকের ঊর্ধ্বে। এই স্মরণীয়দের তালিকায় দুর্গানাথ সান্ন্যালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি মহকুমার অন্তর্গত সোনারপুর গ্রামের অধিবাসী যাদবচন্দ্র সান্ন্যালের পুত্র দুর্গানাথ ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ পাবনার অন্তর্গত নাজিরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গানাথের মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। সেজন্য দুর্গানাথ মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নাজিরপুরেই বসবাস করতে থাকেন। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর নাজিরপুরের জমিদার যাদবচন্দ্র অধিকারীর এস্টেটে নায়েব পদে নিযুক্ত হন। মাতামহের সম্পত্তি এবং নায়েবির উপার্জিত অর্থে তাঁর বৈষয়িক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। নাজিরপুর সংলগ্ন হিমাইতপুর গ্রামের শিবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে দুর্গানাথের ছিল আত্মীয়সুলভ ঘনিষ্ঠতা। বিশেষত শিবচন্দ্র-গৃহিণী অনুকূল-জননী মনোমোহিনী দেবীর অপূর্ব স্নেহ ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ দুর্গানাথ তাঁকে জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পুত্র অনুকূলচন্দ্রের অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য ও প্রেমশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ তাঁকে 'ঠাকুর' বলে অভিহিত করতেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে দুর্গানাথ একবার কঠিন পীড়াকবলিত হয়ে পড়েন। কিছুদিন জ্বরে ভোগার পর যা কিছু খান, কিছুই হজম হয় না। ক্রমে দেখা দিল দুরারোগ্য আমাশয়। যত রকম চিকিৎসা সম্ভব, কোনটিই বাদ যায় না, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। ক্রমে অবস্থা এমন হল যে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পুরোনো চালের সামান্য ভাত আর ছোট মাছের তেল মশলাবিহীন ঝোল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না তিনি, কিন্তু তাতেও রোগের কোন উপশম হল না। এদিকে না খেয়ে খেয়ে ক্রমশ হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়লেন; একান্ত তরুণ বয়সেই শরীর তো ভেঙে পড়লই, তার সঙ্গে সঙ্গে মনও হয়ে পড়ল হতাশায় পরিকীর্ণ। পাবনা ও কলকাতার বিশিষ্ট যত চিকিৎসক, সবাইকে দেখিয়েও কোন ফল লাভ হল না। দীর্ঘ ছ'বছর এভাবে রোগভোগের পর অবশেষে আত্মীয়-পরিজনের পরামর্শে দেওঘরে গিয়ে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ধরনা দিলেন। রোহিণী রোডের 'ডক্টরস্ লজ'- এ একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে বৈদ্যনাথ-মন্দিরে ধরনা দেওয়ার সময় আকুলভাবে কুলগুরুর কাছে প্রাপ্ত নাম জপ করতেন। দেওঘরে বালানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা

বালানন্দ স্বামী তখন আশ্রমে বর্তমান ছিলেন। তাঁর কাছেও প্রায়ই যেতেন দুর্গানাথ, কাছে বসে তাঁর আলাপ-আলোচনা শুনতেন আর রোগমুক্তির জন্য মনে মনে প্রার্থনা জানাতেন। কিন্তু আমাশয় রোগ তাঁর বেড়েই চলল, ধীরে ধীরে শরীর ফুলে উঠতে শুরু করল। গভীর নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল দুর্গানাথের অন্তর, বুঝি এভাবেই অবসান হবে দুর্লভ মানবজন্মের। অবশেষে একদিন গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলেন, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ বলছেন—ভয় নেই রে, বাড়ি ফিরে যা! তোর এ রোগ বাড়ির কাছে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে গিয়ে নাম করলেই সারবে। পরদিন সকালে কিছুটা উৎসাহিত হয়ে মন্দিরে গিয়ে তাঁর তীর্থগুরু দেবীপ্রসাদ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবার আদেশ কীভাবে পাওয়া যায়? পাণ্ডা বলেন—কোন স্বপ্ন দেখেছেন কি? দুর্গানাথ তখন তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। অভিজ্ঞ সেই পাণ্ডা তাঁকে বাড়ি ফিরে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছেই যেতে বললেন।

আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান চিত্তে নিজগ্রাম নাজিরপুরে ফিরলেন দুর্গানাথ সান্ন্যাল। এত কিছুর পর এই অসহ্য রোগের শেষ হবে কিনা ঘরের কাছে নিতান্ত নবীন আবাল্য পরিচিত অনুকূলচন্দ্রের কাছে? সে কি সত্যিই মহাপুরুষ? কেউ কেউ অবশ্য তাকে 'ঠাকুর' বলে, গুরু বলেও মানে, কিন্তু মনের সংশয় থেকেই যায়। আবার স্বপ্নাদেশও তো অগ্রাহ্য করতে পারেন না! যাহোক, বাড়ি ফিরে পরদিনই অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন স্থির করলেন। অনুকূল-ভক্ত অনন্তনাথের অগ্রজ অন্নদা রায় ছিলেন দুর্গানাথের বন্ধু। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অনুকূলের বাড়ি যাবেন ভেবে কাশীপুর গ্রামে তাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখেন—অনুকূলচন্দ্র সেখানেই উপস্থিত। অনুকূল ও অনন্ত, দু'বন্ধু একসঙ্গে বসে চিঁড়ে আর খাগড়াই খাচ্ছিলেন —তাঁকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরে 'এই যে দুর্গাদা এসেছেন' বলে তাঁর মুখে মুঠো করে চিঁড়ে আর খাগড়াই দিতে থাকেন, দুর্গানাথও খেতে থাকেন। তাই দেখে অন্নদা রায় ধমকে বলেন —তোরা করছিস কী? দুর্গাদা আমাশায় শরীর ফুলে মরতে বসেছে, আর তোরা তাকে চিঁড়ে আর খাগড়াই খাওয়াচ্ছিস—তোরা ওকে মারবি নাকি? বকুনি খেয়ে অনুকূল ও অনন্ত চিঁড়ে খাওয়ানো বন্ধ করে অনুকূলের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। দুর্গানাথের মনে হল, স্বপ্নাদেশের ব্যাপারটা আগে অনন্তকে জানাবেন। তাঁকে বললেন একবার তিনটে নাগাদ নাজিরপুরে তাঁর বাড়িতে যেতে। তদনুযায়ী অনন্তনাথ দুর্গানাথের বাড়ি গেলে তাঁকে নিয়ে বাড়ির কাছে পদ্মার তীরে এলেন দুর্গানাথ। সেখানে বসে বৈদ্যনাথের স্বপ্নাদেশের কথা বিস্তৃতভাবে জানালেন তাঁকে। মহাসাধক অনন্তনাথ তখন ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম সাধনা ও তৎপ্রদত্ত নামজপের সুগভীর তাৎপর্য দুর্গানাথকে বুঝিয়ে বলেন। সেদিন সারারাত অনর্গলভাবে হৃদয় বিনিময় হয় দুজনের; আত্মস্থ মিতবাক্, স্থিতধী অনন্তনাথ দুর্গানাথের মনোরাজ্যে এনে দেন আশার নবীন কিরণ, বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার অলোকময় প্রেরণা।

পরদিন সকালে ঠাকুরের কাছে তাঁকে নিয়ে চললেন অনন্তনাথ। যাওয়ার পথে

দুর্গানাথ বলেন, কুলগুরুর মন্ত্রে একবার দীক্ষা নিয়েছি, আর কিন্তু দীক্ষা নিতে পারব না। হিমাইতপুরে ঠাকুরের বাড়িতে পৌঁছনোর পর জননী মনোমোহিনী দেবী অত্যন্ত আদর করে বসালেন তাঁকে, অনেক আশা-ভরসা-সান্ত্বনা দিয়ে দুপুরে সেখানে খেয়ে যেতে বললেন। তিনি মায়ের কাছে গোপনে স্বপ্নের কথা সব খুলে বলেন। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর সেখানে ছুটে এসে হাজির হলেন, বললেন, মা, দুর্গাদার না খাওয়ার দরুন এমন অসুখ হয়েছে, যা ভাল লাগে তাই খাবে, খুব খাবে, তবেই ওর রোগ সারবে।

দুপুরে স্নান সেরে এসে দেখেন মা ঠাকুরের কথা অনুযায়ী আহারের আয়োজন করেছেন। তাঁকে বলেন, নে, খেতে বোস। ঘন ক্ষীর, মোটা আউস চালের ভাত, ছোলার শাক ইত্যাদি তাঁকে খেতে দিলেন মাতৃদেবী, যা সাধারণ ভাবেই যথেষ্ট গুরুপাচ্য, ওঁর পক্ষে তো একান্তই বিষবৎ। ঠাকুরের নির্দেশে এবং মায়ের স্নেহ-অনুজ্ঞায় তিনি নির্দ্বিধায় খেয়ে নিলেন সে-সব কিছু। স্থানীয় ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী এরকম খাওয়ার কথা শুনে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্গানাথকে তিরস্কার করলেন। প্রত্যুত্তরে দুর্গানাথ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—ডাক্তারবাবু, আপনাদের কথা অনেক শুনেছি, আর আপনাদের কথা শুনব না। অনুকূল যা বলে তাই খাব, তাই করব। জননী মনোমোহিনী দেবী বললেন—আমার একটা টোটকা জানা আছে, সকালে খালি পেটে উঠে খেতে হয় তিন দিন। সুতরাং মায়ের আদরে, ঠাকুরের আশ্রয়ে কাটল তিন দিন। এই তিন দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও অনন্ত মহারাজের সঙ্গে স্টীমার ঘাটে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, অফুরন্ত গল্প আর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুরের আর এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তশ্রেষ্ঠ কিশোরীমোহন দাসের বাড়িতে মধ্যরাত পর্যন্ত উতরোল কীর্তন। ছ'বছরের দুরারোগ্য ব্যাধি, দুর্গানাথের জীবনীশক্তি যাতে নিঃশেষ প্রায় হয়ে এসেছিল—কোথায় উধাও হয়ে গেল! স্বপ্নাদেশ এভাবে সফল হল তাঁর জীবনে।

শরীরের রোগমুক্তি তো হল, কিন্তু মনে আর এক রোগ বাসা বাঁধল, সে রোগের নাম অনুকূল-প্রেম। এ রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পরিবর্তে পুরোপুরি তাতেই মগ্ন হয়ে যেতে চাইল সত্তা। প্রায় রোজই সকাল-বিকেল দু'বেলা অনুকূল-দর্শন না হলে মন মানে না। প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন অনুকূলচন্দ্র ও অনন্তনাথকে, একসঙ্গে তাঁদের সঙ্গে বসে ইচ্ছেমত আহার করেন।

দিন দশ/বারো পর একদিন সারাদিন একবারও যাওয়া হয়নি হিমাইতপুর — দুর্গানাথের মনের ভেতরটা আঁকু-পাকু করছে তাঁর জন্য। কিন্তু শরীর একটু খারাপ লাগায় আর গেলেন না, রাতে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ গভীর রাতে বাইরে থেকে ঠাকুরের গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল—দুর্গানাথদা, ও দুর্গানাথদা! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখেন—লণ্ঠন হাতে একাকী ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। সাদরে ঘরে নিয়ে এসে বসালেন তাঁকে, তামাক সেজে দিলেন। এর আগে দুর্গানাথ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার দরুন তাঁর সামনে ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজ তামাক খেতেন না। কিন্তু

ঐ ক'দিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় সে কুণ্ঠার বাঁধ ভেঙে যায়, একসঙ্গে তামাক খেতেন তাঁরা। ঠাকুর বললেন— আপনি আজ গেলেন না, তাই ভাল লাগল না বলে আপনাকে দেখতে এলাম। দুর্গানাথের সমগ্র প্রাণমন ভরে উঠল আনন্দে—মানুষের জন্য মানুষের এত ভালবাসা থাকে! অত রাত্রে দুজনে বসে অনেক গল্প, অনেক কথা হল। গল্প তো ফুরোবার নয়, তবুও তো যেতে হবে। ঠাকুর উঠলেন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। দুর্গানাথ তাঁকে একলা যেতে দিলেন না, গৃহিণীকে দরজা বন্ধ করতে বলে নিজেও চললেন ঠাকুরের সঙ্গে; বলে গেলেন, পরদিন সকালে ফিরবেন। সারা রাস্তা কথায় কথায় কাটল। ঠাকুরের বাড়ির সামনে পদ্মার পারে একটি ছোট ঘর ছিল, সেখানে ঠাকুর ও অনন্তনাথ প্রায়ই রাত্রে শুতেন; সে ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে ঠাকুর বললেন —ঐ ঘরে অনন্ত আছে, ওখানে যান, আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। এই বলে ঠাকুর বাড়ির দিকে গেলেন, দুর্গানাথ ঐ ঘরের সামনে গিয়ে অনন্তনাথকে ডাকলেন। দরজা খুললেন অনন্ত, এবং যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সঙ্গে দুর্গানাথ দেখলেন ঘরের মধ্যে অনন্তর পাশে দাঁড়িয়ে এ কে! এ যে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র! সদ্য ঘুম ভাঙা মানুষের মতই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দুর্গানাথ কোনমতে বলেন—কে তুমি? তুমি কী করে এখানে এলে? এই যে আমার সঙ্গে একসঙ্গে আমার বাড়ি থেকে এসে আমাকে অনন্তের ঘরে যেতে বলে চোখের সামনে দিয়ে নিজের বাড়িতে গেলে! আমার বাড়িতে আর বাড়ি থেকে আসার পথে যে এত গল্প হল!

শ্রীশ্রীঠাকুর নিতান্ত ভালমানুষের মত অতি সরলভাবে বললেন— দুর্গাদা, আমি তো কোথাও যাইনি। পাশে দাঁড়ানো অনন্তকে বললেন—অনন্ত, আমি কি কোথাও গিয়েছিলাম? অনন্তও বললেন, কৈ, ঠাকুর তো কোথাও যাননি, আমি আর ঠাকুর তো একসঙ্গে শুয়েছিলাম। সকলের অগোচরে এক সূক্ষ্ম হাসি ছিল কি তখন ঠাকুরের ওষ্ঠাধরে? বাইরে কিন্তু তার প্রকাশ নেই, ছেলে ভোলানোর মত করে বলেন, ও কিছু নয় দুর্গাদা, ও আপনার মনের ভুল।

দুর্গানাথ কি তাই মেনে নিতে পারেন? বাড়িতে ফিরে গেলে যে এখনও তামাকের টিকের উত্তাপ অনুভব করতে পারবেন, যে তামাক দুজনে খেলেন এই একটু আগে! সবই মনের ভুল? মনের ভেতরে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। ঠাকুরের আর অনন্তনাথের একটি করে হাত শক্ত করে নিজের দুই বাহুর তলায় চেপে ধরে দুজনকে নিয়ে চললেন ঠাকুরের বাড়ির ভেতরে—যেন সেখানে গিয়ে দেখতে পাবেন সত্যিই আর এক অনুকূল ভেতরে আছেন! ভেতরে ঢুকে দেখেন—সব নিঝুম অন্ধকার, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। কয়েকবার জোরে জোরে 'মা, মা' বলে ডেকেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। বিবশ হয়ে এল তাঁর সর্বশরীর, লুপ্ত হল যেন জাগতিক সমস্ত বোধ। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এ কোন্ মহা অস্তিত্ব! আছড়ে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে, কাঁদতে লাগলেন অবরুদ্ধ আবেগের অকস্মাৎ মুক্তিতে, অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন—আজ থেকে তুমি আমার কালী, দুর্গা, গৌর, কৃষ্ণ সবই! তুমি দয়া করে এই অধমকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দাও! ঠাকুর

শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে তুলে ধরে বললেন—করেন কী দুর্গাদা! আপনি আমার পায়ে হাত দিয়ে এসব কথা কেন বলছেন? প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে দুর্গানাথ উদ্বেল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর তখন বললেন—মায়ের ওপর হুকুম আছে নাম দেওয়ার। মা দীক্ষা দেবেন। এর পরেও কাটল কয়েকটি দিন। ক্রমেই দুর্গানাথের কাতরতা ও আকুলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছল। অবশেষে ফাল্গুনের প্রথমে, ১৩২০ বঙ্গাব্দে, রাত্রিবেলা মাতা মনোমোহিনী দেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়ে পদ্মাতীরের সেই ছোট ঘরে তাঁকে সৎনামে দীক্ষা দিলেন—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র সত্তা।

প্রকৃতিগতভাবেই দুর্গানাথ অমায়িক, সৎ ও সরল অন্তঃকরণের অধিকারী ছিলেন। সৎনাম গ্রহণ করার পর নিত্য নামধ্যান-সাধনভজনের ফলে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও জননী মনোমোহিনীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁর প্রকৃতির ক্রমোন্নয়ন হয়ে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহামানবিক নানা অপরূপ লীলার নিত্য সাক্ষীরূপে ধন্য হয়ে উঠেছিল দুর্গানাথের জীবন। দীক্ষাগ্রহণের অব্যবহিত পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে একদিন ঠাকুর ও দুর্গানাথ রাতের খাওয়া দাওয়ার পর পদ্মাতীরের ঘরে শোওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে পদ্মাতীরের ঐ ঘরে যেতে বেশ খানিকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হত। সেই পথে মাঝামাঝি এসে ঠাকুর হঠাৎ বললেন, এই যে যতীশ এসেছে!

— কোন্ যতীশ?

— যতীশ ঘোষ।

— যোগী ঘোষের ছেলে যতীশ ঘোষ?

— হ্যাঁ।

— সে তো আজ চার / পাঁচ দিন হল মারা গেছে।

— এই দেখুন না, আপনার ও আমার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, ঐ চলে গেল কিশোরীর বাড়ি কীর্তন করতে।

— কী আশ্চর্য! আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি মরা মানুষ দেখতে পেলে কেমন করে?

— নাম করুন, তবেই আপনিও দেখতে পাবেন ও জানতে পারবেন যে মৃত্যুর পরও জীবিতের মতই তারাও সবকিছুই করে। আপনারা কেউ আমার কাছে এলে আপনাদের মনোভাব যেমন বুঝতে পারি, ওদের বেলায়ও তেমনই। খুব করে নামধ্যান করলে ইহ ও পরলোকের সব তত্ত্ব সহজেই আপনাদেরও জানার পাল্লার মধ্যে এসে যাবে।

অপর একদিন সকাল দশটা নাগাদ ঠাকুর আশ্রমে বসে অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। দুর্গানাথও সামনে উপস্থিত আছেন। হঠাৎ ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন—এই রে, ডুবে গেল, ডুবে গেল! আবার একটু পরেই বলে উঠলেন, নাঃ বেঁচে গেল। উপস্থিত কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। পরের দিন ঠাকুর হঠাৎই কুষ্টিয়ার দিকে

রওয়ানা হলেন। দুর্গানাথ এবং আরও কয়েকজন সঙ্গে চললেন। কুষ্টিয়া পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন যে স্থানীয় ইষ্টভ্রাতা প্রফুল্ল রায়ের পাঁচ/ছয় বছরের ছেলে জলে ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাওয়ায় ছেলেটি বেঁচে যায়।

১৩২২ বঙ্গাব্দের একটি ঘটনা। পদ্মাতীরের যে ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অনন্ত মহারাজ থাকতেন, প্রায়শই দুর্গানাথও সেখানে থেকে নামধ্যান করতেন। একদিন রাত্রে ঠাকুর ঘরের মধ্যে চৌকিতে শুয়ে আছেন। নিচে পৃথক পৃথক আসনে বসে অনন্তনাথ ও দুর্গানাথ নামধ্যানে রত। রাত্রি প্রায় দেড়টা নাগাদ অকস্মাৎ ঠাকুর চৌকি থেকে নেমে দরজা খুলে ছুটতে শুরু করেন আর অবিরাম বলতে থাকেন — পরমপিতা, তোমার কাজ কী করে করব—লোক পাচ্ছি না—। হতচকিত ও সন্ত্রস্ত অনন্ত এবং দুর্গানাথও তাঁর পেছনে ছুটতে থাকেন, কিন্তু তাঁর গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন তাঁরা। চোখের নিমেষে বহু দূরে চলে গেলেন ঠাকুর। তাঁরা সেই অভিমুখে ছুটতে ছুটতে বেশ কিছুটা গিয়ে দেখলেন নদীতীরে শ্মশানের কাছে বালির চরে আকাশের দিকে মুখ করে হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে, বেদনাপীড়িত কণ্ঠে উন্মত্তের মত বলে চলেছেন— হে পরমপিতা! মানুষ পেলাম না! আমি থেকে কী করব? আমি যাই ! আমি যাই!

এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে বিমূঢ় অনন্তনাথ ও দুর্গানাথ ঠাকুরের পায়ে পড়ে পা দুখানি জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন — ঠাকুর, আমাদের ছেড়ে যেও না, আমাদের কাঁদিয়ে যেও না, আমরা তাহলে তোমার অভাবে বাঁচব না। ঠাকুরের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের শরীরও কাঁপতে লাগল থরথর করে। এরপর এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হল তাঁদের সামনে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাঁরা দেখলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডল থেকে সার্চলাইটের মত তীব্র এক অপূর্ব জ্যোতিরশ্মি নির্গত হয়ে আকাশ স্পর্শ করল—সে আলোকের আভায় অন্ধকার রাত্রেও আকাশের মেঘগুলো সাদা, গোলাপি নানা রঙে রঙীন হয়ে দেখা যেতে লাগল। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল অপরূপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, বিশেষত প্রশস্ত ললাটখানি যেন আয়নার মত স্বচ্ছ প্রতিভাত হচ্ছে। ভাবনার অগম্য, বোধের অতীত এই অভিনব অভিরাম দৃশ্যে অভিভূত, বিহ্বল হয়ে পড়লেন দুই ভাগ্যবান ভক্ত। নিত্য যিনি ধরাছোঁয়ার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সর্বসীমা অতিক্রমকারী অমিত প্রসার দর্শনে শিহরিত হয়ে উঠল তাঁদের সমগ্র সত্তা। কিছুক্ষণ পরে অস্তমিত হল সেই বিভা, কমে আসতে লাগল ঠাকুরের শরীরের কম্পন; ক্রমশ তাঁর পার্থিব চেতনা ফিরে আসতে লাগল এবং দেহখানি অবশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অনন্ত মহারাজ ও দুর্গানাথ দু'দিক থেকে তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর অবস্থা।

নামধ্যানে দুর্গানাথের অনুরাগ ক্রমে আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও অনন্তনাথের সঙ্গে রাত্রে থাকাকালীন তো বটেই, নিজের বাড়িতে থাকলেও রাত্রে বসে গভীর নামধ্যানে ডুবে যেতেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। একদিন রাত আড়াইটে নাগাদ

নিজের পৃথক বিছানায় বসে নামধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন দুর্গানাথ। ক্রমশ বাইরের সমস্ত শব্দ লুপ্ত হয়ে অভ্যন্তরে অনাহত শব্দ জপ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তাঁর সুগভীর তন্ময়তায় ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল কী এক কোলাহল। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন, তাঁর তিন শিশু পুত্র মাঝরাতে জেগে উঠে হুড়োহুড়ি শুরু করেছিল, ছোটরা প্রায়শই যেমনটি করে থাকে, এবং তাদের মা তাদের থামাবার জন্য প্রহার করায় তিনজন একসঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছে। তাদের সম্মিলিত কান্নার আওয়াজই তাঁর কানে পৌঁছে অনাহত শব্দ জপে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বিরক্তি এবং ক্রোধ আবির্ভূত হল তাঁর মনে। হাতজোড় করে পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন—সাধনার বিঘ্নস্বরূপ এমন সন্তানে তাঁর আর দরকার নেই, শেষ হোক এরা! এরপর ছেলেরা চুপ করে গেল, তিনিও আবার জপধ্যানে মন দিলেন। কিন্তু মন যেন আর ঠিক লাগল না, কী যেন এক তালভঙ্গ হয়ে গেল। মানসিক এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল দুর্গানাথের।

পরদিন ভোরে শঙ্কিত বিস্ময়ে দেখলেন, তিন পুত্রেরই ভীষণ সর্দিকাশি ও জ্বরবিকার। প্রবল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর পিতৃহৃদয়—এ কী সর্বনাশ করেছেন তিনি! তবে কি তাঁর মুখনিঃসৃত কথাই ফলতে চলেছে? সেই মুহূর্তে ছুটলেন ঠাকুরের কাছে। দূর থেকেই মনে হল যেন বড় গম্ভীর, থমথমে ঠাকুরের মুখখানি। কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন, ওষুধ চাইলেন ছেলেদের জন্য। আরক্তিম মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুর্গানাথদা, এ আপনি বড়ই অন্যায় কাজ করেছেন। একেবারে এরকম ভাবাবস্থায় পরমপিতাকে জানিয়েছেন! আপনি একা উদ্ধার হতে চান, আর আপনার নিকটতম পারিপার্শ্বিক—যারা আপনার পরমপিতার দান—তাদের মৃত্যু চান! এ এখন কেমন করে রক্ষা করা সম্ভব হবে?

নিজের অপরাধের জন্য তীব্র অনুশোচনায় পুড়ে গেল দুর্গানাথের হৃদয়, কাতরভাবে ঠাকুরের পা দুখানি ধরে ক্ষমা চেয়ে পুত্রদের প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন, পরমপিতার কাছে যখন জানিয়েছেন, তখন তিনি অন্তত একজনকে নেবেনই, আর দুজনকে ফিরিয়ে দেবেন। এখন আপনি ঠিক করুন, কাকে দেবেন। দুর্গানাথ আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন—তুমি বাঁচাও! তুমি বাঁচাও! ঠাকুর বললেন, সবার ছোটটিকে অল্পদিন লালন-পালন করেছেন, ওকে পরমপিতা নিলে ব্যথা একটু কম লাগবে, ও-ই যাক। এ কথা বলে সকলের জন্যই ওষুধ দিলেন।

দেখা গেল, বড় ছেলে দুটো অল্পদিনের মধ্যেই সেরে উঠল, কিন্তু ছোটটির অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল। আত্মীয়স্বজন বিশেষভাবে বলতে লাগল অন্য ডাক্তার দেখানোর জন্য। কিন্তু দুর্গানাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কোন চিকিৎসককে ডাকতে সম্মত হলেন না। পরিশেষে তাঁর আত্মীয় অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি ও গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ির পীড়াপীড়িতে পাবনার তদানীন্তন বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক আনন্দনাথ রায় ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করতে সম্মত হওয়ায় দুর্গানাথ তাঁকে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই চিকিৎসক স্থানীয় কিছু লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে ঠাকুরের

পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ দিলেন এবং দুর্গানাথের আপত্তি সত্ত্বেও আত্মীয়পরিজন ছেলেটিকে সে ওষুধ খাওয়ালেন। এরপরই তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। দুর্গানাথ ঠাকুরকে সব কথা জানালেন। তিনি বললেন, আপনি তাকে বাঁচাতে চাইলে কী হবে, পরমপিতা তাকে নেবেন, তাই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চিকিৎসার বিভ্রাট ঘটল। আগামীকাল ঠিক এগারোটায় তার মৃত্যু হবে, আর যদি আপনি পীড়াপীড়ি করে আমাকে তার আগে আপনার বাড়িতে নেন, তবে সে আগেই মারা যাবে।

পরদিন সকাল দশটায় ঠাকুরের বাল্যকালের শিক্ষক পঞ্চানন মৈত্র ঠাকুরকে গিয়ে জানালেন যে দুর্গানাথ সান্যালের পুত্রের অবস্থা খুব খারাপ, ঠাকুর যেন একবার যান। শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীমোহন দাস সহ সেখানে যাওয়ার আধ ঘন্টা পর ঠিক এগারোটার সময় দুর্গানাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যু হয়। কিন্তু দুর্গানাথের অন্তর আশ্চর্য রকমের অবিচল, শান্ত হয়ে গেল, সব শোকতাপ তাঁর কে যেন হরণ করে নিয়েছে!

প্রায় বারোটা নাগাদ ঠাকুর সেখান থেকে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। সেদিন বিকেলেই দুর্গানাথ ঠাকুর-বাড়িতে গেলেন। সেখানে কয়েকজন ইষ্টভ্রাতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দুর্গাদা, আপনি কি দেবতা? আপনার চেহারায় তো শোকতাপের কোন চিহ্নও নেই, আর এদিকে ঠাকুর আপনার ওখান থেকে ফিরে এসে কী কান্না কাঁদলেন! সেজন্য তাঁর খাওয়াদাওয়া হতে আজ সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। দুর্গানাথ অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন, নামধ্যানে অর্জিত অমোঘ শক্তির অসতর্ক প্রয়োগে তাঁকে যে অকালে একটি সন্তান হারাতে হল, সেই সন্তান হারানোর বেদনা তাঁর হয়ে বহন করলেন ভক্তের ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

দুর্গানাথের আত্মীয় এবং সহপাঠী গিরীন্দ্র লাহিড়ি দুর্গানাথের কিছু জমিজমা কৌশলে দখল করে নিয়েছিলেন; বৈষয়িক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন গিরীন্দ্র দুর্গানাথের ঠাকুরকেন্দ্রিক চলনা ভাল চোখে দেখতেন না। প্রায়ই বলতেন, নিজের জোতজমা বাড়িঘর দেখ না, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে নিয়েই মজে আছ। আমি তোমাকে এই আশ্রম ছাড়াবই। উত্তরে দুর্গানাথ বলেন— আমার ঠাকুর দয়াল, তুমি আমার আত্মীয় ও সহপাঠী বন্ধু, আমিও শপথ করে বলছি, তোমাকে তাঁর শ্রীচরণতলে নেবই নেব।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে দুর্গানাথ গিরীন্দ্র লাহিড়ি সম্পর্কে তাঁর শপথের কথা জানানোতে ঠাকুর বললেন—সে তো এ জন্মে আমাকে ধরতে পারবে না, পরজন্মে ধরবে। সামনে ছিলেন অনন্তনাথ। তিনি ঠাকুরকে বললেন—দুর্গাদা যখন বলে ফেলেছে, তখন তো তা করতেই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতভঙ্গীতে অনন্তনাথকে বলেন, তুমি কিংবা দুর্গাদা, এই দুজনের কারও কথায়ই সে দীক্ষা নেবে না; তবে কুষ্টিয়ার সতীশ জোয়ারদারকে যদি আনতে পার, তাহলে তার কথায় দীক্ষা নিতে পারে।

ঠাকুরের নির্দেশে সতীশ জোয়ারদারকে আসার কথা জানিয়ে চিঠি লিখে সেটি ডাকে দিতে গেলেন দুর্গানাথ গিরীন্দ্র লাহিড়িকে সঙ্গে নিয়ে। গিয়ে দেখেন, যে

বাড়িতে পোষ্ট অফিস, সেই যোগেশ চৌধুরীর বাড়িতেই সতীশ জোয়ারদার বসে আছেন। তাঁকে দেখেই তো দুর্গানাথের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সতীশের কাছে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানালেন যে সকালে নামধ্যান করার সময় শুনতে পেলেন ঠাকুর বলছেন, শিগগির এই অবস্থায়ই এখানে চলে আসুন, আমার এখানে কাজ আছে। তৎক্ষণাৎ একবস্ত্রে রওনা হয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে চলে আসেন। ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র তিনি সতীশকে কাশীপুরে যোগেশ চৌধুরীর বাড়িতে যেতে বলেন, কিন্তু কী কারণে, তা কিছু বলেন নি। একথা শুনে দুর্গানাথ গিরীন্দ্র লাহিড়ি সম্বন্ধে সব কথা তাঁর কাছে খুলে বললেন।

যোগেশ চৌধুরীর বাড়িতেই গিরীন্দ্র লাহিড়ি, সতীশ জোয়ারদার ও দুর্গানাথ সান্ন্যাল দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাধা করলেন। তারপর শুরু হল নানা কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা। ঐ এক দুপুরে সতীশ জোয়ারদারের কাছে ঠাকুর-বিষয়ক আলোচনা শুনে গিরীন্দ্রর মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল। সন্ধ্যার মুখে মুখে তিনি বললেন, চলুন যাই, ঠাকুরের কাছে গিয়ে আলাপ আলোচনা করি। একসঙ্গে সকলে আশ্রমে এসে দেখলেন, চালাঘরে কীর্তন চলছে। দুর্গানাথ মহা উৎসাহে কীর্তনে যোগ দিলেন, আর সতীশ গিরীন্দ্রকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের কাছে। কীর্তন চলল রাত বারোটা পর্যন্ত। কীর্তন শেষ হওয়ার পর দুর্গানাথ জানতে পারলেন, গিরীন্দ্রর দীক্ষা হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখলেন ঠাকুর মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট, গিরীন্দ্র সামনে বসে অঝোরে কাঁদছেন। এতদিনকার সঞ্চিত যত মালিন্য বুঝি ধুয়ে যাচ্ছে সেই অবাধ ধারায়। দুর্গানাথকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন গিরীন্দ্র—ভাই দুর্গা, আমি না জেনে এতদিন তোকে কত গাল দিয়েছি, আর তুই- ই আজ আমার জীবন ধন্য করলি — জীবনে সত্যিকার আনন্দ দিলি! ইষ্টপ্রাণের ইষ্টায়নের শপথ পূর্ণ হল এভাবে।

ক্রমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা-বিশ্বাসের গভীরতা আরো থেকে আরোতর হয়ে উঠতে লাগল দুর্গানাথের চিত্তে। পরিবারবর্গ নাজিরপুরে থাকলেও তিনি প্রায় বেশির ভাগ সময়ই ঠাকুর-সান্নিধ্যে হিমাইতপুরে কাটাতেন। নামধ্যান, ভজনকীর্তন, উচ্চ ভাবের আলোচনা, সর্বোপরি জগৎমোহন ঠাকুরের সুতীব্র আকর্ষণ সব মিলিয়ে অন্তরে তাঁর গভীর আনন্দের প্লাবন বয়ে যেত। একদিন নাজিরপুর থেকে হিমাইতপুর যেতে যেতে গ্রামে প্রবেশের মুখে তাঁর কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। মনে হল, গ্রামখানি যেন আশঙ্কিত, বিষাদমলিন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার পর অযোধ্যা-প্রবেশোন্মুখ ভরতের যেমন বোধ হয়েছিল যে অযোধ্যা নিষ্প্রাণ, দীর্ণ, নিরানন্দ, তার গাছপালা নিস্পন্দ, পাখিরা কাকলিশূন্য, পথ জনহীন, দুর্গানাথের যেন অকস্মাৎ সেরকম একটা অমঙ্গল আশঙ্কার অনুভব হল। তিনি এগোতে লাগলেন শঙ্কিত চিত্তে। ঠাকুরের বাড়ির কাছাকাছি অগ্রসর হয়ে দেখেন, জননীদেবী মলিন মুখে সম্বিৎহীন দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। সে দৃশ্যে তাঁর বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে

উঠল, দ্রুত পায়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাতা মনোমোহিনী দেবী প্রকৃতিস্থ হয়ে ম্লানমুখে বললেন— আয় বাবা। কিন্তু তাঁর সেই প্রাণভরানো উচ্ছ্বসিত আদরমাখা ডাক এ নয়, এ যেন এক বিষাদপ্রতিমার যান্ত্রিক স্বর। কী হয়েছে মা—গভীর উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করেন দুর্গানাথ। মা উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে উত্তর দেন,— আমাদের জমি কাল নীলাম হয়ে যাচ্ছে সব—

— সে কী, কত টাকা অনাদায়ে?

— ষোলশ টাকা।

— মা, আমি কি তোমার ছেলে নই, আমাকে কেন কিছু বলনি?

— কী আর বলব বাবা।

— তুমি চিন্তা কোরো না মা, আমি ব্যবস্থা করছি।

— সে কী বাবা, এতগুলো টাকা—

— তুমি দ্যাখই না। —এই বলে দ্রুত পায়ে নিজের গৃহে ফিরলেন দুর্গানাথ। সম্পন্ন গৃহস্থ হলেও এককথায় ষোলশ টাকা জোগাড় করা, বিশেষত গ্রামের বাড়িতে, তখন সহজসাধ্য ছিল না। বাড়ি ফিরে যেখানে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ষোলশ টাকা একত্র করে ছুটলেন আবার হিমাইতপুর। মায়ের হাতে সেই টাকা তুলে দিয়ে তবে তিনি নিশ্চিন্ত। রক্ষা পেল নীলামের হাত থেকে সে জমি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরবর্তীকালে কতবার যে এ কাহিনী কত লোককে বলেছেন তার ঠিক নেই। বলতেন—দুর্গানাথদা অসময়ে আমাদের যা উপকার করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্গানাথ অবশ্য খুব সঙ্কোচ বোধ করতেন অপরের সামনে এ ঘটনার উল্লেখে। পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় তিনি দেখাশুনা করতেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর চলে আসার পর দুর্গানাথও সপরিবারে চলে আসেন দেওঘর। ঠাকুরের থেকে বেশি দূরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ঠাকুরকে ভালবেসে, তাঁর পায়ে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই ছিল তাঁর পরম আনন্দ, চরম পরিতৃপ্তি। দেওঘরে আসর পর সৎসঙ্গের নবপর্যায় সূচিত হয়;বহু ক্লেশ অতিক্রম করে নবীন উৎসাহে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তোলেন নতুন প্রতিষ্ঠান। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে দুর্গানাথও ভাগ করে নেন আশ্রমিক জীবনের কৃচ্ছ্রতা, অটল ইষ্টানুরাগে বহন করেন ইষ্টপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিচিত্রবর্ণ বহু লীলার সাক্ষী, তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত দুর্গানাথ সান্যাল-এর জীবনাবসান হয়।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সতীশচন্দ্র জোয়ারদার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সতীশচন্দ্র জোয়ারদার

'অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করে, . . . ' —শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই অমোঘ উক্তি তাঁর স্বজ্ঞাপ্রসূত। এবং অভাব এক অর্থে মনুষ্যস্বভাব। সর্বপ্রকার বস্তুগত প্রাপ্তির মধ্যেও আরও কিছুর অভাব মানুষকে অস্থির করে তোলে। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'। আর যে-মুহূর্তে সেই পরশমণির সন্ধান পাওয়া যায়, সুবর্ণের শাশ্বত উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হয় সকল অসংগতির মালিন্য, ধন্য হয়, সার্থক হয় নরজীবন এই মরলোকের সীমানায়। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্য ও কৃপার পরশমণির ছোঁয়ায় আত্মানুসন্ধানের উদ্বেলতা থেকে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় উত্তীর্ণ এমনই এক জীবন পেয়েছিলেন সতীশচন্দ্র জোয়ারদার।

সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের জন্ম হয় নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত বরইচারা গ্রামে। পিতার নাম হরিশচন্দ্র জোয়ারদার। বাল্যকাল থেকেই সতীশচন্দ্রের অন্তরে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির ব্যাকুলতা ছিল। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র দে তার ঈশ্বর-ভাবনাকে আরও জাগ্রত করেন। কী ভাবে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে—এই চিন্তা বিভোর করে রাখত কিশোর সতীশচন্দ্রকে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে এল. এম. পি. পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুষ্টিয়া শহরে চিকিৎসা কার্য শুরু করেন। তিনি কিছুদিন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই সময় তাঁর জনসেবামূলক কাজ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ডাক্তারিতেও জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য আসে সহজেই।

কিন্তু ভগবৎ-পিপাসু তাঁর মন এ সবের মধ্যে প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পায় না। বিভিন্ন সময়ে বহু মতে সাধন-ভজন করে বিফল মনোরথ হয়ে একসময়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন সতীশচন্দ্র। এই সময় কুষ্টিয়ার ডাক্তার গোকুল মণ্ডলের কাছে শুনলেন, সদ্‌গুরুর সন্ধান পেয়েছেন গোকুল মণ্ডল। তিনিও একজন চিকিৎসক, বিপ্রসন্তান। তৎপ্রদত্ত সৎনাম-ই তাঁদের সাধনা; নিরামিষ আহার এবং সদাচার সাধনার সহায়ক। সংসার জীবনের সব কিছুর ভিতর দিয়েই সাধন-ভজন চলতে পারে। এই সদ্‌গুরুকে অনেকে মহাপুরুষ বলেন, অনেকে আবার বলেন অবতার পুরুষ। কথাগুলি শুনে আনন্দিত হলেন সতীশচন্দ্র, কিন্তু মনের সন্দেহও রইল কিছু, কারণ ইতিপুর্বে বহু ধর্মগুরুই তাঁকে হতাশ করেছেন। তবু তাঁকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল মন।

একদিন শুনলেন, সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কুষ্টিয়া শহরে আসছেন। মনে মনে ভাবলেন, এবার তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ভগবান যখন ভালমন্দের বোধ দিয়েছেন, তখন বিচার করে দেখতে অসুবিধা কোথায়? তিনিই যে সদ্‌গুরু, এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেলে তাঁর চরণে আশ্রয় নেওয়া, নতুবা পূর্ব

থেকেই সাবধান হওয়া—এই ছিল সতীশচন্দ্রের মনোভাব।

কুষ্টিয়ার বার লাইব্রেরির বেশ কিছু উকিল, মোক্তার এবং শহরের গণ্যমান্য ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকেই তখন তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। কারও কারও আবার স্বপ্নে উপদেশ এবং দীক্ষা গ্রহণ হয়েছে। এঁরা সকলেই তাঁকে 'ঠাকুর' সম্বোধনে অভিহিত করেন।

বছরটি ছিল বাংলার ১৩২৪ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছেন তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত উকিল প্রফুল্ল রায়ের বাড়িতে। কৌতূহলবশত সতীশচন্দ্র একদিন সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, এক গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি যুবা সংজ্ঞাহীনের মত ঘরের মেঝেতে শায়িত রয়েছেন—অথচ অনবরত তাঁর মুখ থেকে বহু কথা নিঃসৃত হয়ে চলেছে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; ঘরের বাইরে এবং চতুর্দিকে দর্শন-প্রয়াসী উৎসুক বহু নরনারীর ভিড়। কয়েকজন ভক্ত অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। আরও লক্ষ্য করলেন—তাঁর শরীরের দক্ষিণদিকের কটিদেশ থেকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত অংশের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত মাংসপেশী অতি দ্রুতগতিতে কম্পিত হচ্ছে। ভাবলেন—ভণ্ডামি নয় তো? অতীতের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা এই সন্দেহের মূলে ছিল।

ঐ ঘরে উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, কীর্তনের মধ্যে ঠাকুরের সমাধি হয়েছে। এটি তাঁর মহাভাবাবস্থা। জগতের মঙ্গলের জন্য এই সব মহাবাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। সতীশচন্দ্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের ডান পা-খানি চেপে ধরে দেখলেন যে সে কম্পন অকৃত্রিম এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত; ঐ দ্রুত স্পন্দন কারও পক্ষে ইচ্ছা করে করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি ঠাকুরের দুটি পা বলপূর্বক মাটিতে চেপে ধরেও সে স্পন্দনের গতি রোধ করতে সক্ষম হননি। তিনি আরও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ অতি সুন্দর, প্রেমপূর্ণ, ধর্ম ও কর্মের সার সত্য, তত্ত্বপূর্ণ এবং জগতের সকল প্রকার মঙ্গলকর উপদেশ।

ঠাকুরের মহাভাবাবস্থার পর অর্ধচেতন দশা এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। তাঁর চেহারার মধ্যে কোন সাধুর চিহ্ন বা বেশভূষা নেই। মনে হল নেহাৎ ছেলেমানুষ, কিন্তু চেহারাটি সুন্দর। সুপ্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ময় শরীর, আর অদ্ভুত এক আকর্ষণ চোখদুটিতে; এমনটি ঠিক আর আগে কখনও দেখেননি সতীশচন্দ্র। আবার অপূর্ব সরলতা তাঁর আচার-আচরণে, একেবারে বালকসুলভ। যতই দেখেন যেন পিপাসা মেটে না কিছুতেই। বেলা অনেক হয়েছে। এরপর হঠাৎই 'দাদা, আসুন, আপনাকে আমি তেল মাখিয়ে দিই'—এই বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঠাকুর সতীশচন্দ্রের গায়ে তেল মাখিয়ে দিলেন।

যিনি এত লোকের ঠাকুর, আরাধ্য দেবতা, তাঁর এই দীন ব্যবহার! এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সরলতা, উদারতা, বিনয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলকেই আত্মবোধ

—এ সবই মুগ্ধ করল সতীশচন্দ্রকে।

স্নান ও আহারের পর সকলে একত্রে ঠাকুরের কাছে বসে নানা সদ্ আলোচনা শুনছেন, সতীশচন্দ্রও আছেন সেখানে। মনে ভাবছেন—মানুষটির ভালবাসা মুগ্ধকর, কিন্তু অবতার বলে বোঝা যাবে কী করে? এই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র ঠাকুর তাঁর কাছে এসে সুমধুর কণ্ঠে বলেন—দাদা, আমি মহাপুরুষও নই, অবতারও নই। আপনিও যে পরমপিতার সন্তান, আমিও সেই পরমপিতার সন্তান।

এই ঘটনার দু'একদিন পরে ঠাকুরের সঙ্গে বারাদী গ্রামে গোপেন্দ্রনাথ সাহার বাড়িতে গিয়েছেন সতীশচন্দ্র। সেখানে হঠাৎ তাঁর পায়ের স্নায়ুতে ভয়ানক ব্যথা শুরু হয়। মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর অন্দর মহল থেকে ছুটে এসে বলেন,—দাদা, কী হয়েছে? আহা! পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে? দেখুন দাদা, মন বড় পাজি, যদি উপরের দিকে অর্থাৎ পরমপিতার দিকে থাকে তবে এসব কিছু হয় না। আর যদি মন নিচের দিকে থাকে তবে ওসব হয়। সতীশচন্দ্র তাঁর কাছে ওষুধ চাইলে তিনি 'আঃ, ভুলে যান'—এই বলে ব্যথার জায়গাটি স্পর্শ করা মাত্র ব্যথার আর লেশমাত্র থাকল না। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলে চলে গেলেন। পাশে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি পুলকাশ্রু-রোমাঞ্চিত অবস্থায় বিভোর হয়ে গেলেন। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্রীশচন্দ্র বলেন, আমি এই ঠাকুরকে আর কখনও দেখিনি। এই প্রথম দর্শন। যখন তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক যেন শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি—এই বলে শ্রীশচন্দ্র আবার কাঁদতে লাগলেন। সতীশচন্দ্র গিয়েছিলেন তাঁকে পরীক্ষা করতে, কিন্তু প্রতি পদে পদে ধরা পড়লেন। কত দেখলেন, কত বুঝলেন, দ্বিধা তবু সম্পূর্ণ যেতে চায় না। আর দয়াল ঠাকুর তাঁর অনন্ত প্রেমের বাহু প্রসারিত করে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষায় আছেন ভক্তের দ্বিধাহীন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের।

আর একদিনের ঘটনা। বারাদীর উক্ত গোপেন্দ্রনাথ সাহার বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং ত্রিশ চল্লিশ জন ভক্তের নিমন্ত্রণ। সকলে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের যাওয়ার কোন প্রস্তুতি নেই দেখে সতীশচন্দ্র ঠাকুরকে বারাদী যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। ঠাকুর বলেন, পা চলছে না দাদা। সতীশচন্দ্র বলেন—পা চলছে না কেমন? তিনি বলেন, মন চলছে না। এ কথা শুনে সতীশচন্দ্র বলেন, তারা এত লোকের রান্নার বন্দোবস্ত করেছে, এতক্ষণে বোধহয় রান্না শেষও হয়ে গিয়েছে, এখন না গেলে তারা মনে বড় ব্যাথা পাবে। তাছাড়া, আমরাও বাড়িতে খাব না বলে এসেছি, বারাদী না গেলে আমরাই বা এখন খাব কোথায়? তিনি বলেন, স্টেশনে তাদের লোক আসতে পারে, একখানা চিঠি লিখে তাদের জানিয়ে দেওয়া হোক। অগত্যা একজন চিঠি নিয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখলেন সেখানে বাস্তবিকই তাদের লোক এসেছে, তার হাতে চিঠি দিয়ে দেওয়া হল। এদিকে ঠাকুর

সবাইকে তাঁর ওখানেই মধ্যাহ্নের আহার সেরে নিতে বলেন। সতীশচন্দ্র সে কথার উত্তরে বলেন যে মাত্র চার পাঁচজনের মত ব্যবস্থায় ত্রিশ চল্লিশজনের আহার সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। ঠাকুর বললেন—দুটি দুটি করে খেয়ে জল খেয়ে কোনমতে কাজ চালিয়ে নিন, প্রণয় থাকলে তেঁতুল পাতায় স্থান হয় শুনেছেন তো! তাঁর কথায় সকলেই আহারে বসেন এবং আকণ্ঠ ভোজন করেন। অর্থাৎ পাঁচজনের ব্যবস্থায় ত্রিশ চল্লিশ জনের পূর্ণ ভোজন সমাধা হল।

পৃথিবীতে অনেক ঘটনারই সাধারণভাবে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; আমাদের দৃষ্টির বা বোধের সীমানার বাইরে থাকে সে সমস্ত সংঘটনের প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কোনখানে কার্যকারণহীন বিশৃঙ্খল কোন ঘটনা সম্ভব নয়—কার্যকারণ-সম্পর্কটি সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের বাইরে থাকে, সেখানেই বিষয়টি অলৌকিক বলে প্রতিভাত হয়। বস্তুত অলৌকিক বলে কিছু নেই। সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা পুরুষ যিনি, তাঁর জ্ঞানের ও দৃষ্টির পরিধির বাইরে কিছু নেই, তাঁর লোকোত্তর প্রজ্ঞার অন্তর্গত সবই; তাই তিনিই আপাত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার অযোগ্য বহু বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন করেন।

আহার-পর্ব শেষে সবাই দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামরত; বারাদী থেকে দুজন এসেছিলেন, ঠাকুরের নির্দেশে তাঁরাও এখানেই আহার করেছেন। বেলা গড়িয়ে এসেছে; হঠাৎ ঠাকুর বলেন—চলুন, এখনই সেখানে যাব, তারা বড় ব্যস্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়েছে। তাঁর কথায় সবাই অবাক হল। কিছুক্ষণ আগেই যেখানে যাওয়া হবে না বলে সকলের আহারের ব্যবস্থা হল, এখনই কি না সেখানে যাওয়ার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন! অগত্যা ঠাকুরের ইচ্ছামত সবাই বারাদী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ঠাকুর সতীশচন্দ্র-কে জিজ্ঞাসা করেন, সতীশদা, সেখানে গিয়ে খেতে পারবেন তো? সতীশচন্দ্র উত্তর দেন, সে কী কথা, একবার আকণ্ঠ ভোজন করিয়ে আনলেন, পাঁচ ছয়জনের রান্নায় ত্রিশ চল্লিশ জনকে খাওয়ালেন, আবার এ কী বলছেন? ঠাকুর বললেন, চলুন, দেখতে পাবেন সেখানে কোন এক ব্যাপার বোধহয় আছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে জানা গেল, গোপেনবাবুর ভ্রাতৃবধূর প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ায় বাড়ির লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিমন্ত্রিত লোকেদের জন্য সুবন্দোবস্ত তখনও ঠিকমত হয়ে ওঠে নি। ঠাকুরের বিলম্বে আসার কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়িতে পদার্পণ করা মাত্র একটি কন্যাসন্তান অক্লেশে ভূমিষ্ঠ হল। কিছুক্ষণ পরে চিকিৎসক গোপেনবাবুও রোগী দেখা সেরে ফিরলেন। অবশেষে রাত্রে সকলে মহাসমরোহে আপ্যায়িত হলেন।

ঠাকুরের অকৃত্রিম ভালবাসায় এবং এই জাতীয় নানা ঘটনায় সতীশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। একদিন ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজকে নির্জনে পেয়ে তিনি অকপটভাবে বলেন,— ঠাকুর, কেউ কেউ আপনাকে মহাপুরুষ বলে, কেউ কেউ আপনাকে পূর্ণ অবতার বলে, কিন্তু আমি তো এখনও বুঝতে পারিনি।

বিশ্বাস করতেও পারিনি, তবে এটা বুঝতে পেরেছি যে আপনি আমার অন্তরের সমস্ত ব্যাপার এবং জীবনের সমস্ত গোপন ঘটনা অবগত হয়েছেন। আমি অনেক সাধুসন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের সঙ্গে মিলে-মিশে ঘুরে-ফিরে ও বহু সম্প্রদায়ের সমস্ত খবর জেনেশুনে এবং গুরুদেবের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে যথাসাধ্য সাধন-ভজন করেও অন্ধকারেই পড়ে আছি। বিশেষ কোন ফল পেলাম না। যদি সহজে সত্বরে অন্ধকার দূর হওয়ার কোন উপায় করে দিতে পারেন তবে দিন, নচেৎ আপনার কাছে আমি কিছুই চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিভরা মুখে স্নেহের সুরে বলেন,—দাদা, আমি পূর্বেই তো বলেছি, আমি মহাপুরুষ নই, অবতারও নই। তবে আপনি যা চাচ্ছেন তা হবে দাদা। আর ভয় নেই, তিক্ত, কষা ওষুধ সেবনে রোগ আরোগ্যের সময় এখন নেই। এখন সুলভ ও বিস্বাদহীন উচ্চশক্তি বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিকের মাত্র এক মাত্রা সেবনে রোগ আরোগ্যের মত আধ্যাত্মিক রাজ্যের রোগ সারাবার ব্যাপার হয়েছে। এ যুগে সাধন-ভজনের জন্য ভীষণ কঠোরতা করতে হবে না। সহজে বিনা খরচায় অতি সত্বর সংসারের সমস্ত কার্যের মধ্যেই সাধন ভজন চলতে পারবে। গাড়িতে, বাই-সাইকেলে, ঘোড়ায় চেপে, অফিসে চেয়ারে বসে, খেতে শুতে চলতে ফিরতে, আচার নিয়মের অযথা কঠোরতায় আবদ্ধ না হয়েও সাধন ভজন চলতে পারবে।

সতীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলেন—ঠাকুর, আমার গুরু আছেন, দীক্ষা নিয়েছি, আপনার কাছে পুনরায় কিছু গ্রহণ করলে গুরুত্যাগ বা মন্ত্রত্যাগজনিত পাপ হবে না তো? তিনি বলেন—প্রকৃত গুরুত্যাগ হতেই পারে না। সে গুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে। তাঁকে যা দেওয়া হয় তা দেবেন, যেমন বার্ষিক প্রণামী ইত্যাদি। আমি কারো গুরু নই, কেউ আমার শিষ্য নয়। যা প্রকৃত সত্য বলে জানি বন্ধুভাবে তা-ই বলে দিই। এখানে বংশপরম্পরার কোন সম্বন্ধ নেই। এতে কোন পাপ হবে না। যদি কোন পাপ হয় তা আমি মাথায় করে নিচ্ছি। আপনার সমস্ত পাপতাপ আমি গ্রহণ করলাম।

সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হল। দীক্ষা নিলেন সতীশচন্দ্র। বহুদিনের এক জিজ্ঞাসু মন অনেক পরখ-নিরিখের পর, সব প্রশ্নের সমাধানে নামের অনলে প্রদীপ্ত হল, তীরে এসে পৌঁছল এক দিগ্‌ভ্রান্ত তরী। দীক্ষাগ্রহণের পরই তিনি বুঝতে পারেন, নামের ক্রিয়ার সচলতা তাঁর দেহে মনে এনে দিয়েছে এক নতুন জীবন। পৃথিবী প্রতিভাত হল এক নতুন দৃষ্টিতে। জীবনকে মূল্যায়ন করতে শিখলেন নতুন করে ঠাকুরের আলোকে।

ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় একেকটি আনন্দের পরিবেশ। প্রতিক্ষণই নতুন মনে হয় চিরচেনা পৃথিবীকে, অনাবিল অফুরন্ত রসপ্রবাহে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের সমস্ত উপাদান। ঠাকুর সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন, কখনও কাউকে কাঁধে তুলে নিচ্ছেন প্রাণের উচ্ছ্বাসে, আবার কখনও বালকের মত কারও কাঁধে উঠে পড়ছেন নিজেই; তথাকথিত গুরুর মত গাম্ভীর্য নিয়ে নিজেকে

পৃথক করে রাখেন না, যেন সকলেরই প্রাণের সখা, একান্ত সুহৃদ্। প্রত্যেকেরই মনে হয়, তিনি তাঁকেই সবচাইতে বেশি ভালবাসেন। ঠাকুরের পার্ষদগণও সেই প্রেমেরই প্রতিবিম্ব; তাঁরাও প্রত্যেকেই একেক প্রেমের অবতার—সকলকে একই পরিবারভুক্ত করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। এখানে জাতিধর্মবর্ণ ভেদের কোন বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, আছে নিবিড় ভালবাসার চিরপ্রবাহ।

সতীশচন্দ্রের ইচ্ছা, তাঁর সহধর্মিণীও দীক্ষা নেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে এক দিব্য পুরুষের কাছ হতে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাই তিনি আর কোন দীক্ষা নিতে রাজি হলেন না। সদ্‌গুরুর আশ্রয় থেকে স্ত্রী বঞ্চিত থাকবেন—এই চিন্তায় সতীশচন্দ্র উদ্বিগ্ন হন। ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানান—যেন তাঁর পায়ে সহধর্মিণীর মতি হয়। মধ্যরাত্রে স্ত্রীর ক্রন্দনে ঘুম ভেঙে সতীশচন্দ্র তাঁর কাছে শোনেন যে পূর্বে যিনি তাঁকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তিনিই স্বপ্নে পুনরায় দীক্ষা দিতে চাইলেন। রাজি না হওয়ায় তিনি বলপূর্বক তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে সতীশচন্দ্র ঠাকুরের কাছে বিস্তারিত জানালে তিনি মৃদু হেসে সতীশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে আসেন। এই প্রথম সেখানে তাঁর আগমন, সতীশচন্দ্রের স্ত্রীরও প্রথম দর্শন তাঁকে; কিন্তু তাঁকে দর্শনমাত্র বিস্ময়ে, আনন্দে সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর বাক্‌রোধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বিহ্বলতা কিছুটা কাটিয়ে উঠে জানালেন যে পূর্বে যিনি স্বপ্নে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, যাঁকে পাওয়ার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও কাতরতা নিয়ে বহু তীর্থ ভ্রমণ করেও দেখা পাওয়া যায় নি, গত রাত্রে যিনি স্বপ্নে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, ইনিই তিনি। অতঃপর ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন।

সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীতে কিছু ভাগ্যবান থাকেন, যাঁদের প্রতি অবতার পুরুষের কৃপা-প্রসন্নতা অযাচিত ভাবে বর্ষিত হয়ে থাকে। তবে আপাত দৃষ্টিতে অযাচিত এবং আকস্মিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর পশ্চাতে বহু জন্ম-জন্মান্তরের আকৃতি ক্রিয়াশীল। আবার এই জাতীয় কৃপার প্রদর্শন অবতারগণের নরলীলার প্রথম দিকেই বেশি প্রকট থাকে; ভগবৎসত্তা সাধারণ্যে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত হওয়ার পর লোকোত্তর লীলা অনেকখানি সংবৃত হয়ে আসে। মহাভাগ্যবান তাঁরা, যাঁরা আসেন তৎসন্নিধানে তাঁর প্রকাশের প্রথম পর্বে।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। সতীশচন্দ্রের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ, প্রাণের কোন আশা নেই। মুমূর্ষু অবস্থায় ঠাকুরের দর্শন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি। ঠাকুর তখন সপার্ষদ্ গিয়েছিলেন খলিলপুর। রোগিণীর অবস্থা এত সংকটজনক যে টেলিগ্রাম বা অন্য কোন মাধ্যমে খবর পাঠানোর মত সময় নেই। অগত্যা ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করেন তিনি মৃত্যুপথযাত্রিণীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য। প্রার্থনার আকুলতায় শ্রীশ্রীঠাকুর শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন—মা, দেখ তোর সব সেরে গেছে। ঠাকুরের কথা শ্রবণমাত্রই রোগিণী উঠে বসে ঠাকুরকে প্রণাম করেন।

তারপর থেকেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা শুরু করেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

একবার নদীয়া জেলার আলমডাঙা বাজারে ধর্মসভায় এসেছেন সতীশচন্দ্র—কয়েকদিন এখানে থাকার কথা। ধর্মসভার আয়োজনও সম্পূর্ণ। এমন সময় ঠাকুরের একান্ত পার্ষদ অনন্ত মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে জানান যে ঠাকুর তাঁকে সত্বর হিমাইতপুর চলে আসতে বলেছেন। সতীশচন্দ্র আর কালবিলম্ব না করে পরদিনই ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। ঠাকুর তাঁকে দেখে প্রেমময় ভঙ্গিতে বলেন—আমি দেখলাম যেন আপনার খুব বসন্ত হয়েছে, আপনি দুই চার দিন আমার কাছে থেকে যান। সতীশচন্দ্র ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরদিনই সর্বদেহে যন্ত্রণা ও জ্বর হয়, সমস্ত দিন অজ্ঞানাবস্থায় কাটে। তার পরদিন শরীরে বসন্তের গুটি দেখা দিল। ঠাকুরের নির্দেশমত চিকিৎসায় খুব অল্পদিনের মধ্যেই সতীশচন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। সতীশচন্দ্র বুঝলেন, ঠাকুর কেন তাঁকে জরুরি সংবাদ পাঠিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন; নতুবা বাইরে থাকলে যে কী দুরবস্থা হত তা অনুমান করে ঠাকুরের অশেষ দয়ার কথা ভেবে তিনি পরম আনন্দে পুলকিত হন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সেসময়, অর্থাৎ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বসন্ত রোগের প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি এবং তা মহামারীর আকারে প্রাদুর্ভূত হয়ে বহু প্রাণ হরণ করত।

একবার সতীশচন্দ্র ও অন্য কয়েকজন ভক্তসহ শ্রীশ্রীঠাকুর রাতুলপাড়া গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন—এমন সময় ইষ্টভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সরকার একটি কাপড়ে বেঁধে কিছু আম নিয়ে এসে তাঁদের অনুরোধ করলেন ঐ গ্রামে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর অগ্রসর হয়ে যোগেন্দ্রনাথের হাত থেকে ঐ আমের বোঝা গ্রহণ করে নিজেই বহন করে নিয়ে চললেন। কিছুটা যাওয়ার পর সতীশচন্দ্রের কাছে ঠাকুরের বোঝা বয়ে চলাটা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল—তিনি বললেন—ঠাকুর, আম কটি আমার কাছে দিন, আমি একটু বয়ে নিয়ে যাই, পরে নাহয় আপনি নেবেন। ঠাকুর সেকথা শুনে আমের বোঝা সতীশচন্দ্রকে দিলেন। মাঠের রাস্তা পিছল, কর্দমাক্ত; তার মধ্য দিয়ে একহাতে জুতো, আর এক হাতে কাপড়ের কোঁচা এবং মাথায় আমের থলি নিয়ে অতি সাবধানে চলতে থাকেন সতীশচন্দ্র। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সতীশচন্দ্রকে বলেন—এই আম ক'টি যেভাবে বহন করছেন, আর জুতো ও কাপড় যেভাবে রক্ষা করে পথ চলছেন, ঠিক এইভাবে সংসারে থেকে সব কাজ ঠিক রেখে ধর্মকার্য ষোল আনা রকমের করতে হয়—মনে রাখবেন।

গুরুর প্রতি আকূতি, ভালবাসা ও নিঃশর্ত আত্মনিবেদন থাকলে সৎদীক্ষা ও সৎনামের প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়—তার বয়স তখন মাত্র ছ বছর। একদিন

সন্ধ্যার পর থেকে বালকের অবস্থার অবনতি হতে থাকে; বুকের দু'পাশে অসহ্য ব্যথা এবং আনুষঙ্গিক নানা কষ্টে বাহ্যত সে নিশ্চল হতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কুষ্টিয়ায় এক ভক্তের বাড়িতে। দিশাহারা সতীশচন্দ্র উপায়ান্তর না দেখে ঠাকুরের কাছে ছুটে যান। সতীশচন্দ্রকে দেখে ঠাকুর জানতে চান তাঁর মুখ অমন ভারাক্রান্ত কেন। সতীশচন্দ্র অসুখের বৃত্তান্ত নিবেদন করলে ঠাকুর বলেন, ওতে মুখ ভার করলে চলবে কেন? ও ছেলে তো বাঁচবার কথা নয়। এর আগেও সতীশচন্দ্রের কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটেছে। ব্যথাতুর পিতা তাই কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকেন—ঠাকুর আমার আর সহ্য করার ক্ষমতা নেই; হয় তুমি দয়া করে এমন ক্ষমতা দাও যে ছেলের মৃত্যু হলেও আমি যেন বিচলিত না হই, সহ্য করতে পারি, নতুবা এমন কর যেন ছেলের মৃত্যুর পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়। স্নেহললিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, তা কি হয় দাদা, যে সময়ে আপনার মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট ছিল সেদিন কেটে গেছে, আবার যে সময়ে নির্দিষ্ট হয়ে আছে তার আগে তো মৃত্যু হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সতীশচন্দ্রের কোষ্ঠীতে এই ঘটনার বহু আগেই মৃত্যুযোগ ছিল, সৎনাম গ্রহণ ও মননে তা খণ্ডিত হয়। ভক্তের আকুল আবেদনে ঠাকুর সতীশচন্দ্রের বাড়িতে যান তাঁর ছেলেকে দেখতে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, নিউমোনিয়া হয়েছে বলে মনে হয়, ডাক্তারবাবুকে (গোকুল ডাক্তার) ডাকুন তো দেখি। ডাক্তারবাবুকে ডাকা হলে গোকুল ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, ডবল নিউমোনিয়া, দু'দিকেই প্রবল আক্রমণ, জীবনের আশা বড় কম। আরও দু'জন ডাক্তারও দেখে একই মত প্রকাশ করেন। ঠাকুর শুধু বলেন, বাবা-মায়ের মনের বল, বিশ্বাস ও সৎনাম-মাহাত্ম্যে সবই হতে পারে—এ ছেলেও বেঁচে যেতে পারে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

গোকুল ডাক্তারের নির্দেশমত ছেলেটিকে ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হল—কিন্তু শত চেষ্টাতেও তা পারা গেল না। তখন সতীশচন্দ্র অনন্যোপায় হয়ে নিবিড় মনঃসংযোগ করে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত সৎনাম করতে শুরু করেন; মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এভাবে নাম চলে। তারপরে সতীশচন্দ্র সহ পরিবারের সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ভোরে ঘুম ভেঙে দেখেন, ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ। ছুটে যান তিনি ডাক্তার গোকুলচন্দ্রের কাছে এবং বলেন এ আশ্চর্য ঘটনার কথা। সব শুনে চিকিৎসক বলেন, এ তো বিজ্ঞানাতীত ব্যাপার। দিনের বেলায় নিউমোনিয়ার অমন প্রবল আক্রমণ, আর সেই রাতেই সম্পূর্ণ রিজলিউশন হয়ে রোগীর আরোগ্য লাভ—এ ব্যাপার বিজ্ঞানের অগম্য, শাস্ত্রযুক্তির অতীত। সৎনামের মাহাত্ম্য ও গুরু কৃপায়ই এ আরোগ্য সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সতীশচন্দ্র সমস্ত কথা বিবৃত করলে তিনি মধুর দৃষ্টিতে স্মিতহাস্যে বলে ওঠেন—জয় গুরু!

এই ঘটনার এক মাস পরের কথা। সতীশচন্দ্রের দৌহিত্র গৌরগোপাল ইনফ্লুয়েঞ্জা

নিউমোনিয়ায় সংকটাপন্ন। বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় তাঁর কন্যা ও জামাতা শোকে নিদারুণভাবে ভেঙে পড়েন এবং পুত্রের সুস্থতার জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করতে অনুরোধ করেন সতীশচন্দ্রকে। সতীশচন্দ্র বলেন, বার বার ঠাকুরের কাছে রোগমুক্তির প্রার্থনা করা যায় না। তোমরা তো সকলেই নাম গ্রহণ করেছ—নাম করতে থাক এবং তাঁর কাছে মনে মনে প্রার্থনা কর। সতীশচন্দ্রের কন্যা-জামাতা তাঁর কথানুযায়ী নাম করতে থাকেন। এমন সময়ে ঠাকুরের কীর্তনের সঙ্গী ও অন্যতম পার্ষদ্ কিশোরীমোহন দাস নাম-সংকীর্তন সহকারে ঐ রাস্তা দিয়ে আসছিলেন। সতীশচন্দ্র জামাতাকে বলেন, কিশোরীমোহনকে দিয়ে যদি ছেলের কাছে কীর্তন করানো যায় তবে সে নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। জামাতার আকুল অনুরোধে কিশোরীমোহন সংকীর্তনসহ বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করলেন। ভাবে মাতোয়ারা কিশোরীমোহন—তাঁর প্রেমময় পরম পবিত্র মধুর ভাব যেন এক স্বর্গীয় শোভার আলেখ্য। সে যুগে যাঁরা এই দিব্য সংকীর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁরাও এই দেবোপম ভাবের বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেননি, সে দৃশ্যের অপূর্বতা ভক্তের সানুরাগ অনুভব সাপেক্ষ। কিশোরীমোহনের সম্মুখে উঠোনে মুমূর্ষু বালকটিকে শুইয়ে দেওয়া হল। কিশোরীমোহন মিনিট দশেক বালকের চারদিকে নাম-কীর্তন করার পর তাকে ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তাকে একবিন্দু চরণামৃত দেওয়া হল; সেই রাত্রেই সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। সতীশচন্দ্রের ভাষায়—"আমার ডাক্তারি বিদ্যার গৌরব পূর্বেই পুত্রের নিউমোনিয়াতে ও অন্যান্য কয়েকটি ঘটনাতে ঘুচিয়া গিয়াছিল, এই দিন একেবারে বিদূরিত হইল।"

১৩২৭ বঙ্গাব্দ। সতীশচন্দ্র নির্জনগৃহে একাকী ধ্যান করছিলেন। ধ্যানে সম্পূর্ণ নিমগ্ন অবস্থায় দৈববাণী শুনতে পেলেন—তুমি এই স্থানে বসে ধ্যান করলে ছ'মাসেও কিছু হবে না; ঐ বাগানে ঐ স্থানে বসে ধ্যান করলে শীঘ্রই ফল পাবে। বাগান ও স্থানের ইঙ্গিত সতীশচন্দ্র সহজেই বুঝতে পারলেন। তখন সেই দৈববাণী নির্দেশিত স্থানে বসে ধ্যান করেন এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করতে থাকেন। ধ্যানের মধ্যে আবার শুনতে পেলেন, তোমার আর ধ্যান করতে হবে না। . . . মোক্তারের মেয়ের পেটের অসুখ, তিনবার লোক এসে তোমাকে খুঁজে পায়নি; তুমি এখানে রয়েছ বাড়ির কেউ জানে না। শীঘ্রই সেখানে যাও। সাধকপ্রবর তখনই বাড়ি গিয়ে শুনলেন, সেই মোক্তারের বাড়ি থেকে তিনবার লোক এসেছিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করে মোক্তারের বাড়ি গিয়ে তাঁর মেয়ের চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। তাঁতে প্রকৃত আনতি থাকলে ভক্তজন অতি সহজেই তাঁর নির্দেশ অনুভব করতে পারেন। সাধনার ফলে স্নায়ুগুলির সাড়াপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রহণ ও প্রেরণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়—মস্তিষ্ককোষের বিবর্তনগত অবস্থান মাত্র। নিষ্ঠানন্দিত নামধ্যানের ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

১৩২৭ সনের আশ্বিন মাস। পাবনার অন্তর্গত দোগাছি গ্রাম থেকে ঘোড়ার গাড়িতে হিমাইতপুর ঠাকুরবাড়িতে আসছেন সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত। দূরে বাতাবিলেবুর গাছ দেখে সতীশচন্দ্র বলেন, চিনি দিয়ে বাতাবিলেবুর সরবত খেলে বেশ আরাম বোধ হয়। প্রায় ঘন্টা দুয়েক বাদে ঠাকুর বাড়ি পৌঁছে দেখেন আকাঙ্ক্ষিত সরবত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে; ঠাকুর সরবত ভর্তি একটি গ্লাস সতীশচন্দ্রের দিকে এগিয়ে বলেন, সর্বাগ্রে আপনি খান। পরে অন্যান্য সকলকে দেওয়া হল, ঠাকুর নিজেও খেলেন। সে যুগে যে কতভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেন তিনি, সেসব কাহিনী আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। ঠাকুর আমাদের চির অতন্দ্র অন্তর্যামী— আজও তিনি প্রকৃত ভক্তের অন্তরের খবর পান এবং পোষণ দেন সেইমত।

আর একবারের ঘটনা। রাতুলপাড়া থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্ত ঘোড়ার গাড়িতে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠেছেন, ভক্তরা উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখা গেল, একটি লোক কয়েকটি 'পলো' নিয়ে যাচ্ছে। বাঁশের শলার তৈরী এই 'পলো' দিয়ে দুধের ঢাকনা দেওয়া, বিলে চুনো মাছ ধরা এসব কাজ হত। ঠাকুর সতীশচন্দ্রের দিকে চেয়ে বলেন, সতীশদা, পলো কিনবেন না? সতীশচন্দ্র জানান—পলোর দরকার নেই। ঠাকুর উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, দরকার আছে বৈকি, কিনুন না! সতীশচন্দ্র সঙ্গে পয়সা নেই বলায় ঠাকুর অপর এক ভক্তের কাছ থেকে পাঁচ আনা নিয়ে একটি পলো কিনে সতীশচন্দ্রকে দিলেন। কুষ্টিয়ায় পৌঁছে তাঁকে নিজের বাড়ি যেতে বললেন ঠাকুর। তখন তাঁর মনে পড়ল যে প্রায় দিন পনের আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটি পলো কিনে আনতে বলেছিলেন, যা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

১৩২৯ সনের প্রথম দিকের ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর সৎসঙ্গের গ্রন্থাগারের বারান্দায় বসে আছেন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে। নানা কথা আলাপ আলোচনা চলছে—এমন সময় ঠাকুর সতীশচন্দ্রকে হঠাৎ বললেন, সতীশদা, আমি যা বলব তা করতে পারবেন? সতীশচন্দ্র উত্তরে বলেন, সাধ্য হলে করব। ঠাকুর বলেন, সেটা প্রকৃত ভালবাসার কথা হল না, সাধারণ ভালবাসার কথা। সতীশচন্দ্র চিন্তায় পড়েন, অবশেষে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেড়ে কথা দেন—পারব। ঠাকুর তখন তাঁকে গ্রন্থাগারের ভেতর নিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা ছেঁড়া একজোড়া জুতো নিয়ে আসতে বলেন। সতীশচন্দ্র সেই জুতোজোড়া নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে বাইরে এলেন। এরপর ঠাকুর এক অভিনব আদেশ করেন যা সতীশচন্দ্রের কল্পনারও অতীত। ঠাকুর বলেন, ঐ জুতোর এক এক পাটি দিয়ে আমার পিঠে তিনটে করে ছ'ঘা মারুন। স্তম্ভিত সতীশচন্দ্রের সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল—এ কী আদেশ? কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বার বার কানে আসতে লাগল ঠাকুরের ঐ একই আদেশ। অবশেষে আদেশ পালনে বাধ্য হয়ে উদ্যত হলে ঠাকুর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বলেন—দেখবেন, যেন আস্তে মারবেন না, বেশ জোরে মারবেন, যেন বেশ ব্যথা লাগে। সতীশচন্দ্র ঠাকুরের কথামত তাই করলেন। ঠাকুর 'ঠিক হয়েছে' বলে হাসতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তরা দুঃখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সতীশচন্দ্রের অবস্থা আরও শোচনীয়। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সুর করে গানের ভঙ্গীতে বললেন, আমিই বুঝিতে নারি, অন্যে বলা ভার! এরপরে কথাবার্তায়, হাসিতে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই বেদনার্ত পরিবেশকে সহজ করে তোলেন ঠাকুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ঠাকুরের একান্ত পার্ষদ কিশোরীমোহনকে দিয়েও একবার তিনি নিজ দেহে পাদুকাঘাত করিয়েছিলেন। তাঁর এই আচরণের প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও অন্তরঙ্গ ভক্তদের ধারণা, অপরের কুকর্ম বা অন্যায় আচরণের জন্য তিনি নিজেই এইভাবে শাস্তি নিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার, ভগবান ইত্যাদি বললে তিনি খুব আপত্তি করতেন। বলতেন—দেখুন, আমাকে অবতার-টবতার বলবেন না, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। আবার কখনও বলতেন—আমাকে বিশ্বগুরু, অবতার ইত্যাদি বলে প্রচার করা কেন? আমি কি কোনদিন বলেছি আমি বিশ্বগুরু, অবতার ইত্যাদি? আপনারা আমাকে যে ঠাকুর বলেন, তাতেও আমি আপত্তি করেছি, তাও আপনারা গ্রাহ্য করেননি। শেষে ভেবে নিলাম, লোকে রাঁধুনী বামুনকেও তো ঠাকুর বলে। আমি বরং সেই রকম একজন। ভক্তরা কিন্তু তাঁদের এই প্রাণের মানুষটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূষণে ভূষিত করেছেন। তাঁরা যেমনটি দেখতেন, যেমনটি বুঝতেন, তেমনটি বলে আনন্দ পেতেন।

ঠাকুর একবার সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তাঁকে অবতার বলেন কেন। উত্তরে সতীশচন্দ্র বলেন—আমি আমার বিশ্বাস মতো যা সত্য বলে বুঝি, তা-ই বলি। আমার স্ত্রী মৃতবৎ অবস্থায় যাঁর কর্তৃক জীবন লাভ করতে পারে, কাতর আহ্বানে রুদ্ধদ্বার গৃহাভ্যন্তরে যিনি সশরীরে ভক্তদের দর্শন দান করে বাক্যালাপ ও শান্তিদান করেন, যাঁকে দর্শন না করেও, যাঁর নাম পরিচয় না জেনেও স্বপ্নে যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পাওয়া যায়, যাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলে সর্বপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যাঁর নামে ভোগ নিবেদন করলে তিনি চিদ্‌ঘন মূর্তিতে বা সশরীরে স্বয়ং এসে সেই নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেন, পিতামাতা অপেক্ষাও যিনি অধিক ভালবাসেন, যাঁর ভালবাসা সকলের প্রতি এমন কি সর্ব জীবের প্রতি সমান দৃষ্ট হয়, যাঁকে না দেখে এবং নাম না শুনেও স্বপ্নে পূর্ণাবতার বলে বহুলোক জানতে পেরেছেন, ভাল ভাল জ্যোতিষীগণ যাঁকে পূর্ণাবতার বলে স্বীকার করে যাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েন, যিনি বহুদূরে থেকেও আমাদের সংবাদ জানতে পারেন, যিনি বহু দূরদেশে থেকেও দৈববাণী দ্বারা আমাদের সময়ে সময়ে চালিত করেন, যাঁর দর্শনে বা স্পর্শে আমাদের রিপু শান্ত হয়ে পড়ে, যিনি ধ্যানের সময় মুরলীধর

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে—এ কথা বলতেই ঠাকুর বাধা দিয়ে বলেন ও কথা আর বলবেন না। সতীশচন্দ্র থামলেন, ঠাকুরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সতীশচন্দ্র দীক্ষা গ্রহণের পরে ঠাকুরের মূর্তি-ধ্যান অভ্যাস করেন। সেকথা জানতে পেরে ঠাকুর স্বীয় বাড়ির ঠাকুরঘরে অন্যান্য কয়েকজন পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষের ছবি দেখিয়ে বলেন যে, এ সমস্ত সদ্‌গুরু-মূর্তির যেটি ভাল লাগে তাঁরই ধ্যান করা চলে, তাঁর নিজের ধ্যান করার দরকার নেই। তখন সতীশচন্দ্র একটি কৌশল করেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন যে গুরুর সব আদেশই পালনীয় কি না। ঠাকুর ইতিবাচক উত্তর দেওয়াতে বলেন—পূর্বের অনেক সদ্‌গুরুই তো লোককে তাঁদের ধ্যান করতে নিষেধ করতেন, সে-ক্ষেত্রে তাঁদের মূর্তি ধ্যান করলে তো গুরুর আদেশ অমান্য করা হয়। প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলেন—এমন ক্ষেত্রে গুরুর আদেশ অমান্য করা চলে। সতীশচন্দ্র তখন বলেন —তবে এক্ষেত্রে আমরাও আপনার আদেশ অমান্য করতে পারি। ঠাকুর তখন "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ" এই নীতির গৌরবে হার মেনে নিয়ে চুপ করে যান।

ঠাকুর-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীও তাঁর পুত্রের মূর্তি শিষ্যরা সদ্‌গুরু- জ্ঞানে ধ্যান করে, এ ব্যাপারটি ঠিক মেনে নিতে পারেননি। সতীশচন্দ্রকে একদিন বলেন—হ্যাঁরে, তোরা ওর মূর্তি ধ্যান করিস কেন? সতীশচন্দ্র উত্তর দেন—শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা অন্য কোন সদ্‌গুরু-মূর্তিধ্যান করতে গেলেই যে আপনার ছেলের মূর্তিধ্যানে উপস্থিত হন, কী করব? মা কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে বলেন—তা যদি সত্যি হয় তো কর।

ঐদিন দুপুরে ঠাকুরের বাড়িতেই ঠাকুর, সতীশচন্দ্র ও অন্য ক'জন আহারে বসেছেন। ঠাকুর মাকে ডেকে বলেন, তাঁর আহার্য মা যেন তাঁর ইষ্টকে নিবেদন করে নিজে একটু খেয়ে প্রসাদ করে দেন, তারপরে ঠাকুর খাবেন। মা বলেন—এখন পারি না। কিন্তু ঠাকুর অবুঝ বালকের মত বারবার ঐ একই কথা বলে আবদার করতে থাকেন। মা তখন বাধ্য হয়ে ঠাকুরের আহার্য তাঁর ইষ্টকে নিবেদনের জন্য বসেন। তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যানে তাঁর ইষ্টদেবতাকে ভোজ্য নিবেদন করতে গিয়ে দেখেন তাঁর পুত্রই আজ ইষ্টের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ভোজ্য গ্রহণ করছেন। তারপর চোখ খুলে ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—এখন কি তোর এঁটো আমাকে খেতে হবে নাকি? ঠাকুর পরম বিস্ময়ে বলেন—ওমা, সে কী কথা! মা বলেন—ইষ্টকে নিবেদন করলাম, দেখলাম তো তুই-ই খেয়ে গেলি! ঠাকুর আবার একই ভাবে বলেন—ওমা, সে কী কথা! উপস্থিত সকলেই বুঝলেন—কথাটা কী। এরপরে জননীদেবী আর কাউকে কখনও তাঁর ছেলের মূর্তিধ্যান করতে নিষেধ করেননি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একবার কলকাতার উপকণ্ঠে এক ধনী ভক্তের বাগানবাড়িতে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সতীশচন্দ্রও এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁরা পৌঁছনোর দু'দিন পরে ঠাকুরও সেখানে আসেন এবং সপ্তাহখানেক অবস্থান করেন। তখনও ঠাকুরের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বহুল প্রচারের যুগ আরম্ভ হয়নি। কিন্তু সতীশচন্দ্র প্রথম থেকেই সর্বত্র ঠাকুরের কথা, বিশেষতঃ তাঁর কৃপায় কত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, সে সমস্ত কথা বলতেন। তাঁরা যখন ঐ বাগানবাড়িতে উপস্থিত হন, তখন গুরুভ্রাতাদের মধ্যেই কয়েকজন সতীশচন্দ্রকে বিদ্রূপ করে বলেন যে, তিনি সত্য-প্রচারের বদলে মানুষ-প্রচার করছেন এবং অলৌকিক ঘটনাবলির প্রচার করছেন। সতীশচন্দ্র এতে মনে ব্যথা পেলেও কিছু বলেন না। দু'দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে পৌঁছন। তাঁকে নিয়ে সকলে দোতলার একটি ঘরে গিয়ে বসেন। সতীশচন্দ্র একতলার একটি ঘরেই ছিলেন; ঠাকুর ডাকলে তবে দোতলায় যাবেন—এরকম মনে ভাবেন তিনি। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি দোতলায় উঠে প্রণাম করার পরে ঠাকুর তাঁর কাছে জানতে চান—কী হয়েছে। তিনি বলেন—সবই তো জানেন, কী বলব! তখন ঠাকুর তাঁকে একান্তে ডেকে তাঁর সব কথা শোনেন এবং বলেন—কারো কথায় অসন্তুষ্ট হবেন না। যা জ্ঞান-বিশ্বাস মতে সত্য বলে জানেন, নির্ভীকভাবে সেই সত্য প্রচার করবেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় আবার কয়েকজন সতীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঐ জাতীয় কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। সতীশচন্দ্র নীরবে বসে থাকেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করেন যে কী কথা হচ্ছে। আর এক ভক্ত অশ্বিনী বিশ্বাস বলেন—সতীশ ডাক্তার সত্যপ্রচার না করে মানুষ প্রচার করে ও অলৌকিক ঘটনার কথা বলে, তা কেউ কেউ পছন্দ করেন না, সেই কথা হচ্ছে। ঠাকুর তখন সতীশচন্দ্রের কাছে তাঁর অভিমত জানতে চান। সতীশচন্দ্র জানান যে তাঁর বিশ্বাস—সত্য যাঁর মাধ্যমে লাভ করা যায়, সেই মানুষ এবং সত্য পৃথক নয়। সুতরাং সেই মানুষটিকে গোপন রেখে শুধুমাত্র সত্য প্রচার ভণ্ডামি। ঠাকুর বলেন—যা ভাল বোঝেন বলুন, কিন্তু ধোপে টিকলে হয়! অশ্বিনী 'ধোপে টেকা' মানে কী জানতে চাওয়ায় ঠাকুর বলেন—ধোপে টেকা মানে বুক না কাঁপলে হয়। তখন অশ্বিনী এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ বুঝলেন যে সতীশচন্দ্রের প্রচাররীতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমোদিত। তখন তাঁরা নিজেদের ভ্রম স্বীকার করে সতীশচন্দ্রকে প্রাণ খুলে প্রচার করতে বলেন।

দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে সতীশচন্দ্রকে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—বহুকাল ধরে নানাপ্রকার সাধনা করে ফল পাননি, কিন্তু এই প্রণালীটি এতই চমৎকার যে একচল্লিশ দিন সাধনা করলে আশ্চর্য ফল পাবেন। দীক্ষার পর পনের দিনের মধ্যেই নানাপ্রকার উপলব্ধি হতে থাকে সতীশচন্দ্রের। মনের মধ্যে আসে তীব্র আনন্দের অনুভূতি। বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি, নাদ শ্রবণ ইত্যাদি সাধন জগতের অনুভূতিসমূহ অতি সহজেই তাঁর আয়ত্তে আসে। জীবনের অন্য সব কাজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে গভীর ও গতিময় নাম-ধ্যান ও যজন-যাজন। সতীশচন্দ্র নিজের মধ্যেই খুঁজে পেলেন এক অন্য সত্তা, ইষ্টচিন্তায় যা সর্বদাই তন্ময়।

সতীশচন্দ্র যে সময়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন আশ্রমের সে সময়টিকে বলা যায়

কীর্তনের যুগ বা মহাভাবাবস্থার যুগ। প্রকৃতপক্ষে এই সময়কে পাবনা সৎসঙ্গের ঊষা লগ্ন বলা চলে। তখনও গড়ে ওঠেনি বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠান। সম্বল ছিল শুধুমাত্র কিছু মানুষের ভালবাসা, নিষ্ঠা, আর প্রত্যয়ের অপ্রতিরোধ্য গতি। ঠাকুর ছিলেন তাঁদের ঘরোয়া সম্পদ, পরিবারের একজন। হাসিকান্না সুখদুঃখ সবই তাঁরা বন্টন করে নিতে চাইতেন ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে। এই ভালবাসার মানুষটিকে শুধু নিজেরা উপভোগ করে শান্তি পেলেন না তাঁরা, চাইলেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। শুরু হল প্রচারের যুগ। এই প্রচারের যুগেই ঠাকুরকে নিয়ে প্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন সতীশচন্দ্র জোয়ারদার। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। তখন বইটির নাম ছিল "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র"। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের নাম রাখা হয় "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র"; নামের এই পরিবর্তনের কারণ—জননী মনোমোহিনী দেবীর কথা গ্রন্থে স্বল্পই আছ। বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, ". . . . পুরুযোত্তম - লীলাপ্রসঙ্গখানি চিরদিন ভক্তহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করবে। গ্রন্থখানির সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না কেন, পুরুযোত্তমের প্রথম প্রকাশিত জীবন-আলেখ্য হিসাবে বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গণে এর মূল্য থাকবেই।"

এই গ্রন্থটি থেকে সৎসঙ্গের ঊষালগ্নের অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। যদিও এটিতে জীবনীর পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতার পরিবর্তে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশের বাহুল্য লক্ষ করা যায়, তবুও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম জীবনীকার হিসাবে সতীশচন্দ্র জোয়ারদার চির প্রণম্য হয়ে থাকবেন। তাঁর অবদান এই পুস্তক-অবলম্বনে সেকালে ফিরে যেতে ভক্ত সমাজের অসুবিধা হবে না। সতীশচন্দ্র বহুদিন আগে চলে গিয়েছেন অমৃতলোকে, কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন ভক্তহৃদয়ে যুগ যুগ ধরে।

সুশীলচন্দ্র বসু

৭ই নভেম্বর, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ — ৬ই মার্চ, ১৯৬৯

সুশীলচন্দ্র বসু

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নবীন বয়সে তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর অসাধারণ প্রেমস্বরূপ সত্তার সন্ধান যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার সম্পন্ন এবং পরম সৌভাগ্যবান। বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট না হলে তদবধি অখ্যাত একান্ত তরুণ ঐ মানুষটির আকর্ষণে জাগতিক সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথ পরিত্যাগ করে সানন্দে নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব হত না। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বসু এই উচ্চ আধার এবং লোকোত্তর সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। ধীশক্তি, কর্মতৎপরতা, সাধনা, লোকসংগ্রহ — সব দিক থেকে সুশীলচন্দ্র ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌরমণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ঠাকুরের কাছে এককে ব্যক্তি এককে ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন, এবং ঠাকুরের প্রেমশক্তিতে প্রত্যেকের দক্ষতা অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেছে। সুশীলচন্দ্রের মধ্যে ছিল সহজাত জ্ঞানানুরাগ, সংহত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অদম্য কর্মবুদ্ধি, ঠাকুরের পরশমণির ছোঁয়ায় যা অশেষ উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল। তাঁর এক বিশেষ নিপুণতা ছিল সমাজের প্রতিষ্ঠিত, মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চবর্গের লোকেদের কাছে স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের। মৃদুভাষী অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুশীলচন্দ্র ক্ষমতায় ও পাণ্ডিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে ঠাকুরের বার্তা এবং ভাবধারা নিয়ে অনায়াস কুশলতায় উপস্থিত হতেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন ঠাকুরের অমল সন্নিধানে, তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে।

সুশীলচন্দ্র বসুর আদি নিবাস যশোহর জেলার হরিণাকুণ্ড গ্রামে, পিতা প্রতাপচন্দ্র, মাতা রমণীবালা। প্রতাপচন্দ্র ব্যবসার প্রয়োজনে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে সস্ত্রীক বসবাস করতেন; এখানেই ১৮৯০-এর ৭ই নভেম্বর সুশীলচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই সুশীলচন্দ্র ছিলেন ধীর, স্থির, মেধাবী ও সাধুসজ্জন-প্রিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের মত সুশীলচন্দ্রের ভিতরেও ছোটবেলা থেকেই আধ্যাত্মিক প্রবণতা লক্ষণীয়। কলকাতা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স ও আই. এ. পাশ করেন। কলকাতায় স্কুলে পড়াকালীন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করে তাঁর অপূর্ব অনুভূতি হয়। পরবর্তীকালে কলেজে পড়ার সময় শ্রীমা সারদা দেবীর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। এছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা ও বেলুড়মঠের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রাখাল-মহারাজের সঙ্গেও সুশীলচন্দ্রের পরিচয় হয়। রাখাল-মহারাজ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে সুশীলচন্দ্র কিছুদিন ভাগলপুরে ছিলেন; সেখান থেকে বি. এ. পাশ করে এসে কিছুদিন গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন। এর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং আইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু জীবনের গতি কোন দিকে বাঁক নিতে চলেছে, তা হয়ত তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেননি।

১৯১৭ সালের ৬ই নভেম্বর সুশীলচন্দ্র কুষ্টিয়া শহরে ভগ্নীগৃহে আসেন; ভগ্নী-পতি শ্রীঅশ্বিনী বিশ্বাস। সে বাড়িতে প্রবেশ করে বাইরের ঘরে দেখেন এক সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবক খালি গায়ে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত উজ্জ্বল, অথচ কোমল, স্নেহমাখা। সুশীলচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করা মাত্র যুবকটি অনেককালের চেনা মানুষের মত এগিয়ে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেন—আমাকে কীরকম লাগে, দাদা! একান্ত আপনজনসুলভ এই আচরণে অভিভূত সুশীলচন্দ্র বলেন—আপনার সঙ্গে আমার এই যে প্রথম পরিচয় তা তো মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে আপনি আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। সুদর্শন যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, প্রথমে আপনাকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বলেই ভেবে নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন আপনিও আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভিতরে এসে ভগ্নীপতি অশ্বিনী বিশ্বাসের কাছ থেকে জানতে পারেন সুশীলচন্দ্র যে যুবকটির নাম অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তাঁরা এঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে ডাকেন। পাবনার হিমাইতপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিবাস। আরও শোনেন—কীর্তন করতে করতে এঁর ভাবসমাধি হয়, এবং সমাধিস্থ অবস্থায় বহু বাণী উচ্চারিত হয় মুখ থেকে। খানিকক্ষণ পরে সুশীলচন্দ্র আবার যান বাইরের ঘরে ঠাকুরের কাছে। সেখানে এবার এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখতে পান যারা সমাজে কুখ্যাত নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ, ফৌজদারি দণ্ডবিধির বহু ধারায় অভিযুক্ত। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন যে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে এদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে এরা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর নিরালায় একান্তে বসেন সুশীলচন্দ্র ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্ন করতে থাকেন তিনি, আর মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে অনর্গল উত্তর দিতে থাকেন ঠাকুর। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র সুশীলচন্দ্র বিস্মিত হয়ে ভাবেন—তথাকথিত উচ্চশিক্ষাবিহীন মানুষটি কীভাবে এত সহজে এত জটিল তত্ত্বের সমাধান করছেন! ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় মুগ্ধ হন সুশীলচন্দ্র। কথায় কথায় ভোর হয়ে এসেছে। হাতমুখ ধুয়ে আবার তিনি এসে বসেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি; একটা মানুষের কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে যে কত ভালবাসা থাকতে পারে তা বোঝেন ঠাকুরকে দেখে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর গভীর অনুভূতি প্রবলভাবে আলোড়িত করে সুশীলচন্দ্রের অন্তর—অভিভূত ভাবে তিনি এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বলেন, আমাকে দীক্ষা দিন, পথ দেখিয়ে দিন। ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭ দীক্ষা হয়ে গেল সুশীলচন্দ্রের, দীক্ষা দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং।

কয়েক বছর আগে ভাগলপুর কলেজে পড়ার সময় এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয় সুশীলচন্দ্রের, তিনি সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব সেনের মাতুল। সাধুটির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাঁর মনে হয়েছিল তিনি খুব উচ্চস্তরের সাধক।

একবার এক সহপাঠীকে নিয়ে যান সুশীলচন্দ্র ঐ সাধকের কাছে। সাধক ঐ সহপাঠীকে দীক্ষা দেন, কিন্তু সুশীলচন্দ্র দীক্ষা নিতে চাইলে তিনি বলেন—তোমার গুরু যিনি হবেন, তাঁর সঙ্গে আজ থেকে চার বছর পরে দেখা হবে। তিনিই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। সেই দিনটি ছিল ১৯১৩ সালের ৬ই নভেম্বর। তখন সাধুজির কথা মনঃপূত হয়নি সুশীলচন্দ্রের, কিন্তু ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর দীক্ষা নিয়ে সেকথা মনে করে রোমাঞ্চিত হন তিনি। সদ্‌গুরু গ্রহণের ব্যাপার পূর্বনির্ধারিত থাকে; সেই কারণেই শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও বেলুড় মঠের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রাখাল-মহারাজের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি সেখানে দীক্ষা গ্রহণ না করে দীক্ষা নিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে।

দীক্ষার পরের দিনটা কাটল ঠাকুরের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনা কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। ৯ই নভেম্বর সকালে ঠাকুর গেলেন রাতুল পাড়ায়, কুষ্টিয়া থেকে মাইল চারেক দূরে। সুশীলচন্দ্র কলকাতা ফিরে যাবেন ভেবে গেলেন না ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু ঠাকুর চলে যাবার পরই তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল ঠাকুরের সঙ্গলাভের জন্য। সেই দিনটি কাটল ব্যাকুলতা নিয়ে— পরদিন, অর্থাৎ ১০ই নভেম্বর সকালে রাতুলপাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলেন,—এই কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম যে, আপনি এলে খুব আনন্দ হ'ত, তাই পরমপিতা আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। সুশীলচন্দ্র বললেন—আপনি চলে আসার পরই আপনাকে দেখবার জন্য মনটা কেন জানিনা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল, তাই চলে এলাম। খুব ভাল করেছেন—বলে ঠাকুর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। নানা কথাবার্তা হল দুপুর পর্যন্ত।

সন্ধ্যায় আরম্ভ হল কীর্তন, সঙ্গে চলল নৃত্য। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুর যোগ দিলেন কীর্তনে। তাঁর যোগদানে এক অদ্ভুত মাতোয়ারা ভাব সঞ্চারিত হল সকলের মধ্যে। ভাষার অতীত অপূর্ব মনোহর নৃত্যভঙ্গী ঠাকুরের—মুখমণ্ডল জ্যোতি বিভায় উদ্ভাসিত। ইতিপূর্বে সুশীলচন্দ্র কখনও কীর্তনে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনিও আর স্থির থাকতে পারলেন না, দু'বাহু তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কীর্তনে। কীর্তন যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ ঠাকুরের দেহখানি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও বিবশ হয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি থরথর করে কাঁপছে। এই সময়ে কেউ তাঁর দেহ স্পর্শ করত না, কারণ স্পর্শে তাঁর খুব কষ্ট হত। সুশীলচন্দ্র তাঁর শিয়রের কাছে এসে বসলেন; দেখলেন—তাঁর চোখ দুটি পলকহীন, চক্ষু তারকা স্থির, অচঞ্চল, কপালটা চক্‌চক্ করছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন শরীর হিমশীতল, বুকে হাত দিয়ে হৃৎস্পন্দনের কোন লক্ষণই পেলেন না— অথচ এই তাণ্ডব কীর্তনের পর শরীরে উত্তাপ ও হৃৎস্পন্দন, দুই-ই বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।

বিস্ময়ের ঘোর না কাটাতেই ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন —"রাম, ওগো রাম, সব রক্ত—কেবল রক্ত, রক্তগঙ্গা ছুটে গেল, এখনও নীরব, নিস্পন্দ? এখনও

ঘাতকের মত ভুলে আছিস? প্রেমের সন্তান তোরা? . . . ঐ দ্যাখ ঐ দেশের মাটিতে, বুকে ধরে, হৃৎপিণ্ড দিয়ে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে? ওরে সে যে আমারই . . . নির্দয় রূপে চোরের মত ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল। আর তোরা এখনও নীরব, নিস্তব্ধ? পশুর মত কামাসক্ত, আমোদপ্রিয়?"

সময়টি ছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তখন পৃথিবী জুড়ে; সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে লক্ষ্য করেই এই বাণী, বুঝলেন সুশীলচন্দ্র। তারপর আবার বাণী নির্গত হল—"যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু কচ্ছে, সব শব্দ তরঙ্গ থেকে; চৈতন্য তরঙ্গই ব্রহ্ম। সহস্র দল থেকে বাইরের ধারা পিণ্ডে এসেছে"। সেদিনের সেই মহাভাবাবস্থা চল্লিশ মিনিটের মত স্থায়ী ছিল। বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্তে অনন্ত মহারাজের হাতে জল পান করেন। সমাধিভঙ্গের বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মনে হওয়ায় সুশীলচন্দ্র ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, আপনার যে অবস্থা কিছুক্ষণ পূর্বে দেখলাম, এটা কী? একেই কি সমাধি বলে? সাধনার চরমে কি এই অবস্থা হয়? এই অবস্থায় আপনি কথাই বা বলেন কী করে—আর যা বলেন তার অর্থই বা কী? উত্তরে তিনি বলেন, আমার এই অবস্থার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি সহজ বা স্বাভাবিক অবস্থায় যা বলি তার দায়িত্ব আমার, আমার যখন কোন জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে না, তখনকার কথার মানে আমি বলি কী করে? ওটা আপনারাই বিচার করে বুঝবেন। সুশীলচন্দ্র জানতে চান যে, ঠাকুর নির্জনে সাধনা করেন কি না। উত্তরে তিনি জানান, একান্তে বা নির্জনে বসে সাধনা তিনি কখনও করেননি। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সৎনাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়েছিল তাঁর মধ্যে এবং তিনি অহর্নিশি এই নাম জপ করতেন। তিনি ভাবতেন, সবারই বোধহয় এটা স্বাভাবিক পরে অবশ্য তাঁর এই ধারণা দূর হয়। এমন চমকপ্রদ উত্তর সুশীলচন্দ্র আশা করেননি —কোন মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষের জীবনে এমনটি ঘটেছে বলে তাঁর জানা ছিল না।

আরও অনেক কথা হল তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে; শুনলেন ঠাকুরের বাল্য-জীবনের নানা অনুভূতির কথা, যোগীর যোগসাধনায়ও যা অপ্রাপ্য। পরের দিনটিও সুশীলচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে কাটালেন, তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়। ঠাকুরের সাহচর্যের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন প্রতিমুহূর্তে, মনপ্রাণ ছেয়ে আছে এক আনন্দময়তা; তাঁর সান্নিধ্যের সুখানুভূতির স্মৃতিতে অভিভূত হয়ে আছেন সর্বদা। নামধ্যান যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে, সর্বক্ষণ তাঁরই স্মরণে-মননে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ঠাকুরের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা প্রতিক্ষণেই মনে পড়ে। কলকাতা আর কোনভাবেই আকর্ষণ করতে পারছে না, তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন সুশীলচন্দ্র। ঠিক করে নিলেন, আইনের তৃতীয় পরীক্ষাটি আর দেবেন না;এম. এ.-র পাঠক্রম শেষ হয়ে এসেছে—তাই ঠাকুরের কাছে আশ্রমে গিয়ে থাকলেও পরে এসে পরীক্ষাটা দেওয়া যাবে।

সমস্ত ভাবনাচিন্তার অবসান ঘটিয়ে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি স্থায়িভাবে চলে আসেন পাবনার হিমাইতপুর আশ্রমে। আশ্রম প্রাঙ্গণেই দেখা হল ঠাকুরের সঙ্গে। প্রণাম করতেই স্মিতহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—এসেছেন, বেশ ভালই হয়েছে। বেশ স্ফূর্তিতে থাকা যাবে। এই কথা ক'টির মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা ও আনন্দ লাভ করলেন সুশীলচন্দ্র, তা ভাষায় অপ্রকাশ্য। তখন আশ্রম বলতে বিস্তীর্ণ পদ্মাতীরে বাবলা গাছের তলায় তিনটি ছোট ঘর। ঘরের মেঝে মাটির, ছাউনি কোনটার খড়ের, কোনটার টিনের। প্রাঙ্গণটি গোবর মাটি দিয়ে তক্‌তকে করে নিকোনো। যেন একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র। পদ্মার কূল ঘেঁষে পশ্চিমমুখী ঘরটিতে বাঁশের মাচায় রাত্রে ঠাকুর ও অনন্ত মহারাজ থাকতেন—তাঁদের দুজনের মাঝে শোওয়ার স্থান ঠিক হল সুশীলচন্দ্রের।

আশ্রমের তখন আদিপর্ব। অনন্ত মহারাজ ব্যতীত আশ্রমবাসী বলতে ছিলেন মাত্র দুজন, নফরচন্দ্র ঘোষ এবং ঠাকুরের কম্পাউণ্ডার যতীন্দ্রনাথ সরকার। ঠাকুরের মা মনোমোহিনী দেবী ছিলেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী। তাঁর আচার আচরণে আপন জননীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন সুশীলচন্দ্র। রাত্রি থাকতেই উঠে নামধ্যান, সকাল হতেই ঠাকুরের স্নেহমধুর সঙ্গ, উদ্দীপনী আলোচনা, বেলা হলে ঠাকুরের সঙ্গে পদ্মানদীতে স্নান, সাঁতার কাটা, আহারান্তে বিশ্রামের পর ঠাকুরের সঙ্গে গভীর বিষয়ে আলাপ, কোন কোন দিন কীর্তন, আবার কখনও বা পদ্মাবক্ষে নৌকায় ভ্রমণ—এরকম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে সারাদিন কেটে যায় সুশীলচন্দ্রের। হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে জরুরি চিঠি পেলেন বাড়ি যাবার জন্য। বাড়ির তাগিদের কথা ঠাকুরকে বলায় তিনি বলেন, কত আবর্তনের ভিতর দিয়ে আপনি আজ এ শরীর নিয়ে এসেছেন। কত জন্মই তো গেছে—এই জন্মটা এই বামুনের কাছে দিয়ে দেখুন না কী হয়। ঠাকুরের কথায় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ভক্ত সুশীলচন্দ্রের, নিশ্চিন্ত হন তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে, ১৯১৬ সালে কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের কন্যা নিরূপমা দেবীর সঙ্গে সুশীলচন্দ্রের বিবাহ হয়। মাতা মনোমোহিনী দেবীর নির্দেশে ১৯১৮ সালের শেষ দিকে সুশীলচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে আসেন আশ্রমে। ঠাকুর তাঁকে 'রাণীমা' বলে ডাকতেন, তাই আশ্রমে ঐ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। সুশীলচন্দ্রকে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বাড়ি থেকে যেমন প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না, তেমনই তাঁর শ্বশুর মহাশয়ও জামাতাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরিরও ব্যবস্থা করেন তিনি সুশীলচন্দ্রের জন্য, কিন্তু কোন আকর্ষণই আকৃষ্ট করতে পারেনি তাঁকে। তিনি পেয়েছেন জগতের সবসেরা আকর্ষণের কেন্দ্র, যেখানে আর সব চাওয়া পাওয়াই তুচ্ছ।

ঠাকুরের পিতা শিবচন্দ্র একবার সুশীলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা ওর (ঠাকুরের) মধ্যে এমন কী দেখলে যে এত কষ্ট করে এখানে পড়ে আছ? বলি ভগবান কি আর কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে শিব চক্কোত্তির ঘরে এসেই ঢুকল? আমি

তো কিছুই বুঝতে পারি না।. . . তোমাদের মা-ও (মনোমোহিনী দেবী) তো ওর সঙ্গে সায় দিয়ে চলেন। তাঁরও তো কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তা থাকলে আর এরকম হত না।

উত্তরে সুশীলচন্দ্র বলেন—দেখুন, আপনার ছেলেকে আপনি আরও পাঁচজনের মতই মনে করেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলের মধ্যে কোন বিশেষ গুণ না থাকলে এত লোক তাঁর আকর্ষণে এখানে এসে ভিড় করবে কেন? ভগবানে আমরা যে-সব গুণ আরোপ করে থাকি, সে-সব গুণের প্রকাশ আপনার ছেলের মধ্যে দেখে বলেই মানুষ তাঁকে ভগবান বলে। যুগে যুগে তো ভগবান এমনি করেই কখনও দেবকীর গর্ভে, কখনও শচীমাতার গর্ভে, কখনও চন্দ্রমণির গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। সেরকমভাবে আপনার ঘরেই যদি এসে থাকেন তবে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আপনি মহা ভাগ্যবান। শিবচন্দ্র কথাগুলি শুনে গেলেন, কোন উত্তর দেননি।

ধীরে ধীরে আশ্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রয়োজনমত তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে চালনার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে কার্যনির্বাহক সমিতির, ১৯২৫ সালে যা প্রতিষ্ঠিত হয়। সৎসঙ্গের এই সমিতির প্রথম সম্পাদক হন সুশীলচন্দ্র বসু। বনজংলায় ঘেরা, অশিক্ষা, অন্তঃকলহ, রোগব্যাধিতে ভরা হিমাইতপুর গ্রাম কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল, পরিণত হল বাংলা তথা ভারতের এক আদর্শ গ্রামে। কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়, বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, প্রেস ও পাবলিকেশন হাউস, কুটির শিল্প বিভাগ, ব্যাঙ্ক, পূর্তকার্য বিভাগ, মাতৃসঙ্ঘ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কলাকেন্দ্র, আনন্দবাজার (ভোজনালয়), গৃহনির্মাণ বিভাগ, ফিলানথ্রপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগঠন বিষয়ে সুশীলচন্দ্র ছিলেন ঠাকুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ; ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন কর্মযোগী সুশীলচন্দ্র।

একবার উৎসবের অল্প কয়েকদিন আগে ঠাকুর বললেন—নিজেদের স্থায়ী প্যাণ্ডেল ও স্টেজ করতে হবে। হাতে সময় নেই; সতের দিন ধরে হবে উৎসব—তদনুযায়ী মজবুত হওয়া দরকার প্যাণ্ডেল। ঠাকুরের নির্দেশ, সুশীলচন্দ্র আর দেরি না করে চলে এলেন কলকাতায়। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভবতোষ ঘটককে ধরলেন লোহার স্ট্রাকচার আর করোগেটেড টিন দেওয়ার জন্য, যার মূল্য তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা। সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কোন টাকা নেই, অচেনা ব্যবসায়ী এত টাকার জিনিস ধারে দিতে রাজি নন। সুশীলচন্দ্রের মানসপটে ভেসে উঠল দয়াল ঠাকুরের শ্রীমুখখানি, তাঁর আদেশ, উৎসবের আগে প্যাণ্ডেল হওয়া চাই। ঠাকুরের কথা মনে পড়তেই দেহে ও মনে তীব্র গতি পেলেন সুশীলচন্দ্র, খুব জোর দিয়ে ঘটককে বললেন, দেশের কাজে, নরনারায়ণের ইচ্ছাপূরণে আমি এসেছি আপনার কাছে। হয় আপনি আমাকে জিনিস ধারে দেবেন, না হলে আপনাকে নামতে হবে আমার সঙ্গে কাজে। সুশীলচন্দ্রের ব্যাক্তিত্বের দৃঢ়তা ও মুখচোখের অভিব্যক্তি দেখে ঘটক বলেন—পাঁচশো টাকা এক

ঘন্টার মধ্যে এনে দিতে পারলে তিনি ধারে সব জিনিস দেবেন। পথ পেয়ে গেলেন সুশীলচন্দ্র। অপেক্ষা না করে চলে গেলেন একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কর্মী ইষ্টভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের কাছে। তাকে কোম্পানীর ইংরেজ মালিকের কাছে পাঠিয়ে পাঁচশো টাকা এনে ঘটককে দিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস আশ্রমে নিয়ে এলেন। কাজ আরম্ভ হল এবং যথাসময়ে তা সুসম্পন্নও হল।

সুশীলচন্দ্র ছিলেন সাধনাসিদ্ধ পুরুষ। নিয়মিত সুগভীর নামধ্যানের অভ্যাস ছিল তাঁর মজ্জাগত। পাবনা থাকাকালীন বিকেল চারটে নাগাদ পদ্মার তীরে চলে গিয়ে নামধ্যানে বসতেন—পরদিন সকাল ন'টায় ফিরতেন। পরবর্তীকালেও শেষরাত্রি থেকে শুরু করে সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব বসে নাম করতেন। নামে ও ইষ্টপ্রেমে তাঁর সত্তা যে কতখানি বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, পরবর্ণিত ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার একটি ঝোলায় বেশ কয়েক শিশি ওষুধ নিয়ে ট্রামে করে যাচ্ছিলেন। এসপ্ল্যানেডে নামবেন বলে ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে ট্রামের দরজার কাছে এসে একহাতে হ্যান্ডেলটি ধরে দাঁড়ালেন। এমন সময় সীট থেকে একজন উঠে হঠাৎ সুশীলচন্দ্রের হাতটি সরিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল—সুশীলচন্দ্র টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন রাস্তায়, আকস্মিক আঘাতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। পথচারীদের পরিচর্যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি এবং বিস্ময়করভাবে ঝোলার সমস্ত কাচের শিশির ওষুধ অক্ষত ছিল, কারণ অজ্ঞান অবস্থাতেও হাত উচুঁ ক'রে ঝোলাটি তুলে ধরে রেখেছিলেন তিনি— ওতে যে ঠাকুরের ওষুধ!

এক গভীর প্রশান্তি ও প্রসন্নতা বিকীর্ণ হত সুশীলচন্দ্রের সর্বাঙ্গ হতে—তাঁর সান্নিধ্যে এলেই যেন শান্তিলাভ করত মানুষ। কিন্তু এই প্রশান্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা বা কর্মশৈথিল্যের স্থান ছিল না, নিয়ত নিরলসভাবে ইষ্টকর্মে নিযুক্ত রাখতেন নিজেকে এবং ইষ্টার্থবিষয়ক যে-কোন মূঢ়তা বা বিচলন দৃঢ়ভাবে সমূলে উৎপাটিত করতেন। তাঁর মাধ্যমে সৎনামপ্রাপ্ত নব্যদীক্ষিত এক তরুণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন; শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভের বিশেষ সুযোগ তখনও তরুণটির হয়নি। তিনি সুশীলচন্দ্রকে বলেন—সুশীলদা, আমার ঠাকুরকে ধ্যান না করে আপনাকে ধ্যান করতে আরও সহজ মনে হয়। এ কথা শোনামাত্র সুশীলচন্দ্র বজ্রনাদে এমনি প্রচণ্ড তর্জন করে ওঠেন যে তরুণটি হতচকিত হয়ে পড়েন; তাঁর মত এমন একান্ত অনুগামীকে যে সুশীলচন্দ্র এমনভাবে তিরস্কার করতে পারেন, এ ছিল তাঁর কল্পনারও অতীত! পরমুহূর্তে নবদীক্ষিত তরুণকে তাঁর ঋত্বিকদেবতা সুশীলচন্দ্র বলেন—সদ্‌গুরু ছাড়া আর কেউ ধ্যেয় নয়। ঐ তরুণই পরবর্তীকালে সফল ব্যবসায়ী ও ইষ্টপ্রাণ কর্মোদ্যোগী মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁর নিজের ভাষায়—'আমাকে ঐ ধমকটা না দিলে কথাটা আমার মাথায় কিন্তু এমনভাবে ঠিকমত বসতো না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করলে তাঁর ওপর টান হবেই, কিন্তু যতক্ষণ তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ না হয়, তখন অমন ঋত্বিকেরই অবশ্য প্রয়োজন।'

সুশীলচন্দ্র মিষ্টভাষী হলেও যথাস্থানে যথাযোগ্য দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন। কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মের প্রয়োজনে বা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য সেকালের প্রখ্যাত বহু জননায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সুশীলচন্দ্র। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত সৎসঙ্গের ও সৎসঙ্গীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি; নেহরু কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে ওঠেন—এজন্য কি আমি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করব নাকি? সুশীলচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলেন—যুদ্ধ শুরু করার কথা হচ্ছে না, কিন্তু পূর্ববাংলায় যে পরিস্থিতি হয়েছে তা আপনাকে দেখতেই হবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে প্রধানমন্ত্রীর ক্রোধও প্রশমিত হয়— এরপরে সে বিষয়ে কী করণীয়, সে সম্বন্ধে নেহরু আলোচনা করেন।

যে-সমস্ত জননেতা বা খ্যাতিমান ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে সুশীলচন্দ্রের পরিচয় হত, তিনি নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং অবকাশমত ঠাকুর বিষয়ক আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁর যাজনে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করে ধন্য হয়েছেন বহু প্রথিতযশা ব্যক্তি। যাঁরা দীক্ষা নেননি, তাঁরাও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আগ্রহী এবং তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন সুশীলচন্দ্রের যাজনগুণে।

ঠাকুরকে যাঁরা যথার্থভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জীবনে এমন অনেক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, যা লৌকিক হয়েও লৌকিকোত্তর। একবার মাতা মনোমোহিনীর সঙ্গে হিমাইতপুর থেকে কুষ্টিয়ায় এসেছেন সুশীলচন্দ্র। এক গুরুভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে আগের রাত্রে। সেদিন বর ভোজন, বেলা দুটোর সময় নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রচুর খেয়েছেন। বিকেল চারটের সময় সেখান থেকে এসেছেন গোকুল বিশ্বাসের বাড়িতে। গোকুল বাবুর বাড়িতে প্রথম এসেছেন—তিনি কিছু না খাইয়ে ছাড়বেন না। কোন ওজর আপত্তি তিনি শুনতে নারাজ। আম ও প্রচুর সন্দেশ এনে দেন খাওয়ার জন্য। কোনরকমে তা গলাধঃকরণ করে সেখান থেকে সন্ধ্যায় বারাদীতে খোকা ডাক্তারের বাড়িতে আসেন সুশীলচন্দ্র। সেখানেও খোকা ডাক্তার তাঁকে খাওয়ার জন্য চেপে ধরেন। তিনি অনেক বোঝান—কিন্তু ডাক্তার নাছোড়বান্দা। অগত্যা তিনি কী খাওয়াবেন সুশীলচন্দ্র জানতে চাইলে তিনি বলেন —ভাল চিঁড়ে, ঘন দুধ আর বাড়ির গাছের মিষ্টি কলমের আম। নিরুপায় হয়ে খেতে বসেন সুশীলচন্দ্র। তিনি খেতে লাগলেন আর একটার পর একটা আম ছাড়িয়ে দিতে থাকেন খোকা ডাক্তার। এই ভাবে বাড়ির সব আম শেষ হয়ে গেল; পাশের বাড়ি থেকে আম এনে দিলেন ডাক্তার, তাও সব শেষ। এমনি করে পঁচাত্তরটি আম খেয়ে ফেললেন সুশীলচন্দ্র।

তখন খোকা ডাক্তার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললেন—আপনারা হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আপনজন, আপনারা যে এমন বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করতে পারেন, তা আমার আগে জানা উচিত ছিল। আমার দর্প চূর্ণ হল, আর কখনও আপনাকে

খাওয়ানোর জিদ করব না।

হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে থাকার সময় একবার ঠাকুর সুশীলচন্দ্রের কাছে একটি পকেট ওয়াচ চান। সুশীলচন্দ্র ওমেগা কোম্পানির ভাল ঘড়ি কিনে ঠাকুরকে দেন। ঠাকুর ঘড়িটি কয়েকদিন ব্যবহার করে সুশীলচন্দ্রের কাছে রাখতে দেন। একদিন বিকেলে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে টেবিলের উপর ঘড়িটি রেখে সুশীলচন্দ্র বাইরে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেন ঘড়িটি নেই। মন খুব খারাপ হয়ে গেল তাঁর—ঠাকুরের ঘড়ি, তিনি তাঁর কাছে রাখতে দিয়েছেন, অথচ তাঁরই অসাবধানতায় হারিয়ে গেল সেটি। তিনি স্থির করলেন, ঠিক ওরকম আর একটি ঘড়ি ঠাকুরকে কিনে দেবেন। ঠাকুরকে সেকথা বলাতে তিনি নতুন ঘড়ি কিনতে নিষেধ করলেন। এতে সুশীলচন্দ্রের মন আরও খারাপ হল; তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন—ঠাকুর, যে ঘড়িটা নিয়েছে দয়া করে তাঁর মনে এমন পরিবর্তন এনে দাও, যাতে সে আপনা হতেই ঘড়িটি ফেরত দিয়ে যায়।

পরদিন বিকেলে কোন্নগরের এক ভদ্রলোক তাঁর চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন। ছেলেটি ঠাকুরের পায়ের কাছে ঘড়িটি রেখে কাঁদতে থাকে। আগের দিন ঠাকুর-দর্শনে এসে লোভে পড়ে ঘড়িটি নিয়ে যায় ছেলেটি। সে ক্রমাগত ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। ঠাকুর তাকে কোলের কাছে বসিয়ে আদর করে ঘড়িটি নিতে বলেন, ভাল করে লেখাপড়া করে বড় হতে বলেন এবং ভবিষ্যতে আর এরকম কাজ করতে বারণ করেন। শাসনের পরিবর্তে আদরের উপঢৌকন পেয়ে তার কান্না আরও বেড়ে গেল; ঠাকুর তাকে আদর করে রসগোল্লা খাওয়ালেন, কত বোঝালেন, কিন্তু সে ঘড়িটি কিছুতেই নিল না। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর সেই ঘড়ি ঠাকুর আবার সুশীলচন্দ্রের কাছে রাখতে দেন। এর কয়েকদিন পরে ঐ ঘড়ি নিয়ে সুশীলচন্দ্র শ্যামবাজারে এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলে সেখানকার এক বালক ভৃত্য ঘড়িটি চুরি করেছিল, পরে অনুতপ্ত হয়ে ফেরত দেয়।

ঘড়িটি সম্পর্কে আর একবার আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার মুখে কার্জন পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন সুশীলচন্দ্র। গরমে জামা খুলে বসেছেন, উঠে আসার সময় লক্ষ্য করেননি ঘড়িটি পকেটে আছে কি না। ট্রামে ফেরার পথে খেয়াল হল পকেটে ঘড়ি নেই। ফিরতি ট্রামে কার্জন পার্কে এসে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না, ভাবলেন—এবার ঘড়িটা সত্যিই হারাল। পরদিন সন্ধ্যায় আবার এসে বসেছেন আগের দিনের জায়গাটিতে। দেখলেন, একটি বছর আটেকের ছেলেকে নিয়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসছেন। কাছে আসার পর কথাপ্রসঙ্গে তাকে ঘড়ি হারানোর কথা বললেন সুশীলচন্দ্র। শুনে ঐ ভদ্রলোক ঘড়িটা ফেরত দিয়ে বললেন যে গত সন্ধ্যায় বাচ্চা ছেলেটি বেড়াতে এসে এখানেই ঐ ঘড়ি পেয়েছিল। ঘড়ি ফেরত পেয়ে সুশীলচন্দ্র ওটির আনুপূর্বিক ইতিহাস ভদ্রলোককে বললেন। শুনে তিনি হেসে বলেন—ঠাকুরের ঘড়ি বলেই এমন আশ্চর্যজনকভাবে আপনার কাছে ফেরত এল। প্রসঙ্গত

উল্লেখ করা যেতে পার, পরবর্তীকালে ঘড়িটি আর হারায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি সুতীব্র অনুরাগের ফলে তাঁর সঙ্গে সুশীলচন্দ্রের সহজ একতানতা গড়ে উঠেছিল এবং সেহেতু ঠাকুরের যে-কোন অবস্থানের সংকেত তাঁর মনে আভাসিত হয়ে উঠত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একবার ঠাকুর দীর্ঘকালীন অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। কোন কিছুতেই রোগ নিরাময় না হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য জননীদেবী ও পরিবারের অন্যান্য সবাই ঠাকুরকে নিয়ে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কার্শিয়াং যান। কিন্তু তাতেও কোন সুফল পাওয়া গেল না। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল। সুশীলচন্দ্র তখন আশ্রমের জরুরি কোন কাজে হিমাইতপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ধ্যানরত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন গুরুতর অবস্থার দৃশ্য সুশীলচন্দ্রের মানসপটে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠল। দেখলেন, ঠাকুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আর্তস্বরে কাতরোক্তি করছেন। ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। আবার ধ্যানে বসলেন, আবারও একই দৃশ্য। পরপর তিন বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি—স্থির করলেন, তৎক্ষণাৎই কার্শিয়াং রওয়ানা হবেন। ঠিক তখনই ঠাকুরের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত ডাঃ শশিভূষণ মিত্র ঠাকুরের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদবাহী টেলিগ্রাম নিয়ে উপস্থিত হলেন। কালবিলম্ব না করে শশিভূষণ, সুশীলচন্দ্র ও ইষ্টভ্রাতা ডাঃ গোকুল মণ্ডল কার্শিয়াং রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে দুই চিকিৎসক ঠাকুরকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, প্রবল জ্বরের সঙ্গে গলায়, বুকে, হৃৎপিণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে ভীষণ অস্বস্তিকর নানা উপসর্গ রয়েছে।

ঘটনাচক্রে সেদিন দুপুরে বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর-জায়া শ্রীশ্রীবড়মা, ভগ্নী গুরুপ্রসাদী ও ঠাকুরের কাছে সুশীলচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। সুশীলচন্দ্র হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় যেন ক্রমশ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছেন। এই সময় তিনি সুশীলচন্দ্রকে নিজের মাথায় হাত দিয়ে ইশারা করলেন। ইশারা বুঝতে পেরে বড়মা ও গুরুপ্রসাদীকে ডেকে এনে সুশীলচন্দ্র তাঁদের সহায়তায় ঠাকুরের মাথায় তুষার-শীতল জল অবিরত ঢালতে লাগলেন। এর ফলে ঠাকুর অনেকখানি সুস্থ হয়ে ওঠেন। একটু সুস্থ হয়ে বলেন—সুশীলদা ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলেন। আর একটু দেরি হলেই গেছিলাম আর কী! সুশীলদা যে আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আমার সর্দি কাশি জ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বিচার বিবেচনা না করে, অনবরত জল ঢেলেছেন পরমপিতার দয়ায় এতেই বেঁচে গেলাম . . . ।

সেসময় নামের কম্পনের দ্বারা কঠিন রোগগ্রস্ত বা মৃতকল্প ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে Life Research Society বা জীবনগবেষণা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যরা ডাক্তার কর্তৃক পরিত্যক্ত মৃতকল্প রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে নাম কম্পনের মাধ্যমে তাদের সুস্থ করে তুলতে থাকেন। সুশীলচন্দ্র এরকম একজনকে নামের দ্বারা বাঁচিয়ে তোলার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। শ্রীকান্ত সরকার নামে সাতাশ/আঠাশ বছরের এক যুবক মেনিন্‌জাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। তখন এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না—ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। রাত এগারোটায় রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিচর্যাকারীরা নাড়ি দেখে তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। সেই অবস্থায় সুশীলচন্দ্র ও আরও পাঁচজন তাকে স্পর্শ করে অনবরত নাম করতে লাগলেন। সারারাত এভাবে চলার পর সকালবেলা রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একটু আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হল, যদিও রোগী তখনও সম্পূর্ণ অচেতন। প্রাতঃকৃত্যের সময় এঁরা ছয়জন উঠে গেলে অপর ছয়জন রোগীকে স্পর্শ করে নাম করতে বসেন। এইভাবে নিরন্তর নাম করার ফলে তিন দিনের মধ্যে রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে আসে এবং পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এবিষয়ে ঠাকুর বলেছেন—আপনারা যদি কঠিন রোগগ্রস্ত বা মৃতকল্প ব্যক্তিকে স্পর্শ করে অনবরত নামের কম্পন তার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, তাহলে রোগ নিরাময় হতে পারে, মৃতকল্প ব্যক্তিও জীবন ফিরে পেতে পারে।

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে ঠাকুর এসেছেন কলকাতায়। প্রথমে ওঠেন হরিতকী বাগানের বাড়িতে। পরে অত্যন্ত লোক সমাগম হওয়ায় ১২৪/৪এ মানিকতলা স্ট্রীটের অপেক্ষাকৃত বড় ভাড়া বাড়িটিতে উঠে আসেন ঠাকুর। ঐ সময় সুশীলচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর রসা রোডের বাড়িতে যান। সৎসঙ্গ থেকে এসেছেন শুনে দেশবন্ধু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ঠাকুর কলকাতায় আছেন শুনে সেইদিনই তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু সেদিন একটি বিশেষ সভা থাকায় ঠাকুরের কাছে যেতে পারেননি। পরে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স থেকে ফিরে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২৪ সালের ১৪ই জুন দীক্ষা হয় দেশবন্ধুর। সুশীলচন্দ্রের সান্নিধ্য পেতে তিনি সব সময়ই উৎসুক ছিলেন। ঠাকুরের কথা, আশ্রমের কথা জেনে নিতেন, বুঝে নিতেন তাঁর কাছে। দেশবন্ধুর আগ্রহে পরবর্তীকালে সুশীলচন্দ্র কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর বাড়িতেই উঠতেন। এই বিষয়ক বিস্তৃততর চিত্র পাওয়া যাবে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ' নিবন্ধে।

১৯২৫ সালের ২৩শে মে মহাত্মা গান্ধী হিমাইতপুর আশ্রমে আসেন। এই সময় সান্তাহার স্টেশন থেকে একই কামরায় মহাত্মাজির সফরসঙ্গী ছিলেন সুশীলচন্দ্র। সুশীলচন্দ্রই মহাত্মাজিকে নিয়ে আশ্রম পরিদর্শন করান। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে আগমনে এত ভিড় হয়েছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎ মাত্রই হল, আলাপ-আলোচনা কিছুই করা সম্ভব হল না। দেশবন্ধুর প্রয়াণের দু'মাস পর মহাত্মাজি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় অখিল মিস্ত্রী লেনের বাড়িতে আর একবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন।

মান্দারিন জেল থেকে মুক্তি পাবার দু'বছর পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আশ্রমে আসেন। তাঁকেও সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখান সুশীলচন্দ্র। ঠাকুরের ভাবধারা, কর্মযজ্ঞ, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন তিনি। সব দেখে শুনে

সুভাষচন্দ্র বলেন, আশ্রম বলতে লোকে অবিবাহিত সংসার বিবাগীদের স্থান বোঝে। গৃহী হয়ে আশ্রম জীবনযাপন করার দৃষ্টান্ত এযুগে আপনারাই প্রথম দেখাচ্ছেন। পরিবার পরিজনের ভার নিয়ে, অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়ে আপনারা যদি এভাবে এগিয়ে যেতে পারেন, তাহলে গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ রূপ আপনারা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও সুশীলচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের যে-পথে পরিচালিত করছেন, সেটাই সর্বকালের, সর্বমানবের পথ, এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক শাসন থেকে ভারত যখন মুক্তি লাভ করবে, তখন তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতায় আগত বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্ জীন্‌স, অ্যাস্‌টন্, এডিংটন, য়ুঙ্গ প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বসমূহের সঙ্গে সুশীলচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভারতীয় আদর্শবাদের কথা আলোচনা করেন, এবং তাঁরা বিশেষ চমৎকৃত হন তাঁর আলোচনায়, ঠাকুরের প্রতি প্রকাশ করেন সুগভীর শ্রদ্ধা।

সংগঠন যুগের প্রধান কর্মকর্তা সুশীলচন্দ্রে জনপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তাঁকে সবাই যেমন ভালবাসতো, তেমনই ভক্তি করত। সেযুগে ঠাকুরের প্রথম তিনজন লীলাপার্ষদ অনন্তনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস এবং সতীশচন্দ্র গোস্বামী—এই ত্রয়ীর পরেই সৎসঙ্গী সাধারণের কাছে তিনি ছিলেন ভক্তি ও ভালবাসার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। সুশীলচন্দ্র কখনও কাউকে কোন কাজের আদেশ করতেন না। নিজেই কাজ আরম্ভ করতেন, তা দেখে লোকজন আপনা থেকেই এসে তাঁর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সুসম্পন্ন করত। একবার আশ্রমে ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রীজ আসবেন, সমস্ত আশ্রম বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করা দরকার। ঝাড়ু হাতে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন সুশীলচন্দ্র। তাঁকে ঝাঁট দিতে দেখে দলে দলে আশ্রমিকরা ছুটে এসে তাঁকে এই কাজে নিবৃত্ত করে নিজেরাই কাজ আরম্ভ করে দেন। একে একে কুড়িখানি ঝাড়ু বেরোল, কুড়িজনকে নিযুক্ত করলেন সুশীলচন্দ্র কাউকে কাজ করার কথা মুখে কিছু না বলেই।

অপরের সুখবিধানের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল অপরিসীম। একবার মাঝরাত্রে কলকাতার সৎসঙ্গ বাড়িটিতে পৌঁছে কারো ঘুম না ভাঙিয়ে সিঁড়ির সামনে শুয়ে রইলেন। একজন ঘুম ভেঙে তাঁকে ঐখানে ঐ অবস্থায় দেখে নিঃশব্দে অন্যদের জাগিয়ে দিল। তাঁর ঘুম কেউ ভাঙালো না—নিজেরা না ঘুমিয়ে পালা করে তাঁকে হাওয়া করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল তারা। অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠা লোকদরদী সুশীলচন্দ্র এমনই ভালবাসা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন সবার কাছে।

ঠাকুরের নির্দেশে সুশীলচন্দ্র জাতিস্মর রহস্য নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের ১১ই জুন হিমাইতপুর আশ্রম থেকে

দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। সেসময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে একটি খাতায় এই বাণীটি লিখে দেন, "অনবিচ্ছিন্ন স্মৃতিবাহী চেতনা যা অমরণকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে বাস্তবভাবে অমর করে তুলতে পারে—তারই অনুসন্ধিৎসু হচ্ছি এই আমরা, এই আর্য্যজাতি—এর ভিতর দিয়েই আমরা অনন্তকে স্পর্শ করে উপভোগ করতে চাই।" সুশীলচন্দ্রের জাতিস্মরের তথ্যানুসন্ধানের বিশদ বিবরণ 'জাতিস্মরের কথা' নামক গ্রন্থাকারে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে ভাদ্র প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তাকাকারে প্রকাশের পূর্বে 'জাতিস্মরের সন্ধানে' শীর্ষক নিবন্ধমালায় সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫-এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৬ এর ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে সুশীলচন্দ্র ঠাকুরেরেই উৎসাহে ধারাবাহিকভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও দিয়ে চলেন অনর্গল সহজ সমাধান। এসমস্ত প্রশ্নোত্তর পরবর্তীকালে 'কথাপ্রসঙ্গে' নামে তিন খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের নানা সমস্যা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অবতারবাদ, সন্ন্যাস, পুনর্জন্মবাদ, বৈদিক ধর্ম, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয় তত্ত্ব, দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, অধ্যাত্ম জগতের নিগূঢ় দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত অভাবনীয় সমাধান ও বিশদ বর্ণনা। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই তিন খণ্ডের প্রথম প্রকাশ হয়। তার আগে এসমস্ত প্রশ্নোত্তর ১৩৪২ থেকে ধারাবাহিকভাবে 'সৎসঙ্গী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি সুশীলচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—অনুভূতি কী। সেদিন থেকে পরপর ক'দিন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবনে অধ্যাত্ম-রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি ও অপূর্ব দর্শনের বিশদ বিবরণ ক্রমাগত বলে যেতে থাকেন। সুশীলচন্দ্রের ভাষায় : "সে সময়ে তাঁর মুখমণ্ডলের ভাব-ব্যঞ্জনা উপনিষন্ন ভক্তগণের মনে এক অনির্বচনীয় রসাবেশের সঞ্চার করেছিল; মনে হয়েছিল—তিনি যেন বর্ণিত ভূমিতে বিচরণ করতে করতে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। এই অত্যাশ্চর্য বর্ণনা সত্যই বিশ্ব সাহিত্যে অতুলনীয় . . ."

'কথাপ্রসঙ্গে' পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা স্থির হলে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলচন্দ্রকে বলেন—আমি যা বলছি তার সমর্থনে জ্ঞানী মহাপুরুষদের উক্তি যদি কিছু থাকে, তবে তা বইয়ের পাদটীকায় সংযোজন ক'রে দেবেন।

তদনুযায়ী সুশীলচন্দ্র বিপুল অধ্যবসায়ে দিনের পর দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) -তে গিয়ে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁদের উক্তির সুগভীর অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করেন। এই গবেষণাকর্মের সময় সুশীলচন্দ্রের প্রত্যয় হয় যে কোন-কোন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের উক্তির মিল থাকলেও, ওরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ বিবরণ আর কেউ কখনও দেননি। অবশেষে উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ পাদটীকাসহ 'কথাপ্রসঙ্গে' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর মাসে।

শ্রদ্ধেয় ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের প্রণোদনায় শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক ইংরেজিতে অপরূপ বাণী প্রদানের পর সুশীলচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ইংরেজি না জেনেও এমন সুন্দর বাণী দিলেন কী ক'রে?

—আপনারা ধরে পড়লেন, আমিও ভাবতে লাগলাম। দেখলাম, নদীর জলে যেমন মাছের ঝাঁক বেরিয়ে যায়, সেইরকম ভাব-রাজি ইংরাজি ভাষায় ভূষিত হয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। আমি তাদের ধরে ধরে আপনাদের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ওসব কথার মানে যদি এখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে হয়তো আর তা বলতে পারব না।

—তাই যদি হয়, তবে তো আপনি শুধু ইংরাজি কেন, অন্য যে কোন ভাষাতে — যেমন ধরুন জার্মান ভাষাতে এরকম অনর্গল বাণী দিতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ভেবে বললেন, হয়তো তা সম্ভব, . . . কিন্তু একটা impulse দরকার।

— impulse বলতে আপনি কী mean করছেন?

— ধরুন, একজন জার্মান ভাষা জানা লোক যদি আমার কাছে থাকে আর মাঝে মাঝে ঐ ভাষার দু'একটা কথা বলতে শুরু করে, তাহলে সেটা Sufficient impulse হতে পারে আমার কাছে, — হয়তো ঐ ভাষায় বাণী দেওয়ার পক্ষে।

এ কথা শুনে সুশীলচন্দ্র পরম বিস্মিত হয়ে বলেন — বলেন কী ঠাকুর! আমরা ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজি লিখতে পড়তে আরম্ভ করেছি, তবু এত বয়সেও ইংরেজি লিখতে বা বলতে গেলে বেশ যেন একটু বেগ পেতে হয়। আর আপনি বলছেন— দু'চারটে কথা শোনার পরই আপনি যে-কোন বিদেশি ভাষায় বিশুদ্ধভাবে উত্তর দিতে পারেন? এ কথা তো আমরা ভাবতেও পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বলেন—তা কেন, ওরকম তো সবারই হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরেজি বাণীর পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ও সুশীলচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপচার্য ডঃ আর্কুহার্ট-এর কাছে যান। তিনি পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি আপনাদের উৎসব উপলক্ষে পাবনা গিয়ে দেখে এসেছি; কিন্তু আমি তো জানতাম তিনি মোটেই ইংরেজি জানেন না! এখন এই লেখা পড়ে দেখছি যে এতে কতগুলো word এমন archaic sense-এ ব্যবহার করা হয়েছে —যা একজন perfect master of the English tongue ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। It is something like a revelation to me!

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরেজি বাণীসমূহ 'The Message' নামে নয় খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ইষ্টভ্রাতা ভূষণ মিত্র ঐ বইটি তদানীন্তন ল' কলেজের অধ্যক্ষ ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। পরে সুশীলচন্দ্র ভূষণ মিত্রের সঙ্গে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলে তিনি বললেন—শুনেছিলাম

আপনাদের ঠাকুর নাকি লেখা-পড়া জানেন না। তারপরে যখন কানে এল যে তিনি ইংরাজিতে বই লিখছেন, তখন মনে করলাম, তাঁর কাছে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা আছেন, তাঁরাই হয়তো বই লিখে তাঁর নামে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার নিজেরও একটু গর্ব আছে যে আমি ইংরাজি বেশ ভালই জানি। কিন্তু বইখানা পড়ে বুঝলাম, শুধু আমি কেন, কোন University product-এর পক্ষে এ লেখা সম্ভব নয়। কাজেই মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে এ-সব শ্রীশ্রীঠাকুরেরই লেখা—and so wonderful !

প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের এরকম সর্বস্পর্শী ও সুগভীর অসাধারণ জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে বিস্মিত সুশীলচন্দ্র উপলব্ধি করেন—আদি কারণকে যিনি জেনেছেন, তাঁর পক্ষেই কেবল এরকম জ্ঞানের অধীশ্বর হওয়া সম্ভব।

সুশীলচন্দ্রের অনবদ্য স্মৃতিকথা 'মানসতীর্থ পরিক্রমা' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১০ই আগস্ট, ১৯৭২। এই স্মৃতিকথাও 'আলোচনা' পত্রিকায় আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুর সন্নিধানে তাঁর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করার প্রাপ্তিস্বরূপ ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধারাবিবরণী সমৃদ্ধ মূলত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীমূলক স্মৃতিকথা এই 'মানসতীর্থ পরিক্রমা'। তাঁর রচিত অপর একটি গ্রন্থ 'রাজস্থানের পথে' সেযুগে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল।

দেশ বিভাগের প্রায় এক বছর আগে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর চলে আসেন। সেই দিনটি ছিল ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। দেওঘর আসার তিন দিন আগে ৩০শে আগস্ট, ১৯৪৬ বিকেলে ঠাকুর সুশীলচন্দ্রকে ডেকে বলেন যে তিনি দেওঘর যাবেন; সেইমত কলকাতায় গিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করতে এবং দেওঘরে বাড়ি ঠিক করে আসতে বলেন। তখনও বোঝা যায়নি যে তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি এবং তাঁরই সৃষ্ট বিরাট আশ্রম চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। সেদিন রাত্রে বীরেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজেন মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে ট্রেন রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে ৩১শে আগস্ট রাত্রের ট্রেন ধরে দেওঘর আসেন সুশীলচন্দ্র। সেখানে স্থানীয় ইষ্টভ্রাতা সুরেন সেনকে নিয়ে 'বড়াল বাংলো' ভাড়া নেন। বর্তমানে এই বাংলোটি 'ঠাকুর বাংলো' নামে পরিচিত।

ঠাকুর ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার আশ্রমের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে নিয়ে ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট রিজার্ভড্ বগীতে রওয়ানা হয়ে ২রা সেপ্টেম্বর সকাল ন'টায় দেওঘর পৌঁছন। স্টেশন থেকে সুশীলচন্দ্র প্রমুখরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্য সবাইকে বড়াল বাংলোয় নিয়ে আসেন।

হিমাইতপুর আশ্রমের আর্থিক মূল্য তখন ছিল দেড় কোটি টাকার উপর। একবারও ঠাকুর ফিরে তাকাননি সেদিকে; কোনদিন শোনা যায়নি তাঁর মুখে বিন্দুমাত্র আফশোষ। এই নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি শুধু তাঁতেই সম্ভব।

কর্পদক শূন্য অবস্থায় দেওঘরে এসে সুশীলচন্দ্র ভেঙ্গে পড়েননি। ঠাকুরের প্রেরণায় নতুন উদ্যোগে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঠাকুর আসার পর শ'য়ে শ'য়ে ভক্তরা

আসতে থাকেন, তাঁদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান থেকে শুরু করে নানা ধরনের সমস্যার সমাধান হাসিমুখে করতে হয়েছে সুশীলচন্দ্রকে। পরবর্তীকালে দেওঘরেও গড়ে উঠেছে সুবিশাল প্রতিষ্ঠান, নানা কর্মকেন্দ্র, যার পিছনে সুশীলচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নিরন্তর প্রেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পাঁচ হাজার বিঘা জমির প্রয়োজন। ঠাকুর সুশীলচন্দ্রকে পশ্চিমবাংলায় এই বিস্তীর্ণ জমি খোঁজ করতে বলেন। অনুসন্ধান করে সুশীলচন্দ্র জানতে পারেন, পানাগড়ে ভারত সরকারের অধীনে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের হাতে ছ'হাজার বিঘা জমি আছে। দিল্লী গিয়ে উক্ত ডিপার্টমেন্টের সচিবের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুমোদন ব্যতীত এই জমি পাওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি নেহরুজির সঙ্গে দেখা করে ঠাকুরের পরিকল্পনার কথা বিশদভাবে বলেন। প্রধানমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনে ঐ ছ 'হাজার বিঘা জমি সৎসঙ্গকে দেওয়ার আদেশ দেন এবং বলেন যে জমিটি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে সেহেতু সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনও প্রয়োজন। সুশীলচন্দ্র তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করলে তিনি সব শুনে মাত্র আঠাশ বিঘা জমি দিতে রাজি হন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ স্বল্প পরিমাণ জমি গ্রহণে রাজি হননি—কারণ তাতে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না। এর পরেও পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু জমির সন্ধান বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেলেও নানা কারণে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন যুগের অন্যতম নায়ক সুশীলচন্দ্র পরবর্তীকালে সৎসঙ্গের অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র সুশীলচন্দ্র ধীর, স্থির, অমায়িক ব্যাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ছিলেন শান্ত। অনুক্ষণ ইষ্টময় ও ধ্যানপরায়ণ হয়ে থাকতেন তিনি।

এবার ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেন, সুশীলদা আজকাল এমনই হয়েছেন যে, আজ যদি তিনি গভীর বনে, পাহাড়ে, গহ্বরে অথবা মহাসমুদ্রের অজানা দ্বীপে চলে যান—আমাকেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সেখানেই বসতে হবে।

সংসারের কোন মায়ার বন্ধন তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে অসুস্থ শরীরেও সর্বদাই ইষ্টপ্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। মনের জোরও ছিল অক্ষুণ্ণ। এই বিরল কর্মযোগীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ইংরেজীর ৬ই মার্চ, ১৯৬৯ রবিবার দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের এক মাস দশ দিন পরে। দেহের অবসানে ভাবের অবসান ঘটে না। তাঁর ঠাকুরগত প্রাণময়তা সঞ্চারিত হবে যুগ যুগ ধরে ঠাকুরকে যাঁরা ভালবাসবেন তাঁদের অন্তরে। প্রেমের সাম্রাজ্যে তাঁর অস্তিত্ব অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

১২৯১ বঙ্গাব্দ — ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৫

বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

'জীবনে জীবন যোগ করা / নাহলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় প্রাণের পশরা।' জীবনগীতির সমারোহ কৃত্রিম পণ্যের সমাহারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যদি জীবনে জীবন যুক্ত না হয়। আর জীবন সফল হয়, সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদি তা যুক্ত হয় মহাজীবনে। সেই সার্থকতার অন্বেষণে এসে মহাজীবন-সংযোগের পরম সৌভাগ্য সকলের হয় না; পূর্বার্জিত সংস্কার ও অদম্য আকুলতার শক্তিতে কেউ কেউ এসে পৌঁছে যান সেই মহামানবের সাগরতীরে—বহির্জগতের দুঃখ-কষ্টের সকল কাঁটা ধন্য করে যেখানে ফুটে ওঠে অন্তরের পূর্ণতার অম্লান কুসুম। বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের জীবনে ঘটেছিল সেই বিরল যোগাযোগ—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পদতলে যুক্ত হয়ে বস্তুগত সাফল্যের কৃত্রিম পণ্যকে উপেক্ষা করে তিনি লাভ করেছিলেন প্রকৃত সার্থকতার অমল রত্ন।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর-মজিলপুরের এক স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত বিপ্র পরিবারে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যাদবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও নিস্তারিণী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরাজকৃষ্ণের জন্ম হয়। বয়স যখন তাঁর মাত্রই চৌদ্দ বৎসর, পিতা যাদবকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃব্যের অভিভাবকত্বে পিতৃহীন কিশোর জীবনপথে অগ্রসর হন। শিক্ষাজীবন সমাপন করার পর চাকুরির বদলে ব্যবসাকে স্বাধীন জীবিকা হিসাবে বেছে নেন তিনি। নিষ্ঠ, সততা ও উদ্যমের বলে ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করেন। তাঁর ব্যবসাকেন্দ্র ছিল শিলং, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল অতি সুদূর। ব্যবসার প্রয়োজনে প্রায়শই তাঁকে কলকাতায়ও যাতায়াত করতে হত।

শৈশব থেকেই বিরাজকৃষ্ণের অন্তরে আধ্যাত্মিক পিপাসা ছিল প্রবল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পিপাসার প্রাবল্যও বৃদ্ধি পায়। একুশ বছর বয়সে তিনি আগ্রা দয়ালবাগ সৎসঙ্গের স্বামীজি মহারাজের সহধর্মিণীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দয়ালবাগ থেকে প্রচুর হিন্দী পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন তিনি—সুকণ্ঠেরও অধিকারী ছিলেন। ব্যবসায়িক ব্যবস্ততার ফাঁকে ফাঁকে যথাসাধ্য নামধ্যান, ভজনগান, পুস্তকাদি পাঠ ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। কিন্তু মন তবু ভরত না, কী যেন এক ফাঁক রয়ে যেত কোথায়! সংসারধর্মের মধ্যেও আত্মিক আকূতি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত, খুঁজে বেড়াতেন সেই পরশমণি, যার স্পর্শে সোনা হয়ে উঠবে জীবনের সবখানি।

ব্যবসার সূত্রেই কুষ্টিয়ার অধিবাসী বসন্ত সাহাচৌধুরীর সঙ্গে কলকাতায় পরিচয় হয় বিরাজকৃষ্ণের; পরিচয় ক্রমে পরিণতি পায় ঘনিষ্ঠতায়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনেক কথাই হয় দুজনের মধ্যে, দুজনেই জানেন পারস্পরিক নানা বিষয়। বিরাজকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অন্বেষা বসন্তের গোচরে আসে; তিনি তখন বিরাজকৃষ্ণকে বলেন এক ঠাকুরের কথা—সবার মতনই সাধারণ মানুষ তিনি, অথচ

সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, অনন্য এক অস্তিত্ব। পূর্ব বাংলার পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে নিবাস তাঁর, অপরূপ তাঁর চলা-বলা, সর্বসমস্যাহর তাঁর বাণী-সুধা; সর্বোপরি, মানুষকে ভালবেসে তিনি মানুষের ভগবান, মানুষ-ভগবান। তাঁরই চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে কৃতার্থ হয়েছেন বসন্ত। বসন্তের কথা শুনে বিরাজকৃষ্ণের পিপাসু চিত্তে জেগে ওঠে আশার কলরোল—তবে কি পাওয়া যাবে সেই অফুরন্ত অমৃত-নির্ঝর, সমস্ত তৃষ্ণা যার ধারায় নিঃশেষে নিবারিত হয়? একই সঙ্গে আশঙ্কাও দেখা দেয় মনে—আশাহত হতে হবে না তো শেষে? নানা চিন্তার টানাপোড়েনে অবশেষে স্থির করলেন, একবার দেখে আসতে তো ক্ষতি নেই, অন্তত কৌতূহলের নিবৃত্তিও তো হবে। অতঃপর বসন্তের সঙ্গে পাবনায় যান বিরাজকৃষ্ণ ঠাকুর-দর্শনে। দেখেন, জঙ্গলে ঘেরা এক ক্ষুদ্র গ্রামে ক'টি খড়ে ছাওয়া কুটির নিয়ে পদ্মাপারে সেই আশ্রম। আশ্রমের কেন্দ্রবিন্দু এক অনিন্দ্যকান্তি মধুর-স্বভাব যুবাপুরুষ—নাম তাঁর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভক্তদের প্রীতিতে, ভক্তিতে, প্রেমে যিনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বা সংক্ষেপে 'ঠাকুর' অভিধায় সমধিক পরিচিত। তাঁর আদর্শদীপ্ত চলনে, তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর বাক্যে যেন ক্ষরিত হচ্ছে অমরার আশ্বাস-নিঃস্রব, যেন যুগযুগান্ত ধরে তিনি অপেক্ষা করে আছেন অশান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, তাপিত প্রাণের জন্য শান্তিসরিৎ-এর অমৃতকুম্ভ নিয়ে। সেই সব-ভুলানো, সব-জুড়ানো প্রেমের ধারায় নিজেকে সমর্পণ করে তৃপ্ত হলেন, ধন্য হলেন বিরাজকৃষ্ণ, এতদিনে মিলল তাঁর অন্বিষ্ট সাধন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিজেকে নিবেদন করে পাবনা থেকে ফিরলেন তিনি। কিন্তু দেহ ফিরলেও মন তো ফেরে না! ক্রমশই সমগ্র সত্তা যেন আরও বেশি উন্মুখ হয়ে উঠল ঠাকুরের অহর্নিশি সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়। সফল ব্যবসায়ী সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচর্য্যের অন্তর জুড়ে থাকে পাবনার এক অখ্যাত গ্রামের অলোকসামান্য সেই যুবার প্রেমময় মুখচ্ছবি—সব ফেলে ছুটে যেতে ইচ্ছা হয় তাঁর কাছে। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে শিলং থাকতে হত, কলকাতা থাকতে হত, স্বভূমি মজিলপুরে যাওয়া হত মাঝে মধ্যে। মজিলপুরের প্রাসাদোপম বিরাট বাড়িতে জ্ঞাতিকুটুম্বসহ থাকতেন তাঁর মাতা নিস্তারিণী দেবী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, স্ত্রী সরোজিনী দেবী ও দুটি শিশুপুত্র। ক্রমে মনের আকুলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, জমজমাট ব্যবসা, মজিলপুরের প্রভূত সম্পত্তি, সবই যেন বর্ণহীন, তাৎপর্যহীন হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কারণে-অকারণে ছুটে চলে যান হিমাইতপুর, একবার গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না সেই সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষটিকে ছেড়ে।

বিরাজ-জায়া সরোজিনী দেবী স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। মনে মনে ভাবেন—সংসার, ব্যবসা, সব ফেলে কোন আকর্ষণে মানুষটি ছুটে যান বারে বারে পাবনায়? একদিন জিজ্ঞাসাও করে ফেলেন সুযোগ বুঝে—তুমি কার কাছে পাবনায় যাও এতবার? বিরাজকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দেন—যাই আমার ঠাকুরের কাছে। সরোজিনী দেবী ছিলেন সবার্থে তাঁর সহধর্মিণী। স্বামীর এমন ভাববিহ্বল অবস্থা, বিষয়কর্মে ক্রমবর্ধমান অনাসক্তি সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন যে-কোন গৃহিণীর

পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর মনে না-ও হতে পারত। কিন্তু পতিব্রতা শুদ্ধচিত্তা সরোজিনীর মনে স্বামীর আকর্ষণের কেন্দ্র সম্বন্ধে ধীরে ধীরে জেগে উঠল প্রেমভক্তি মিশ্রিত কৌতূহল, আকূতি। মাঝে মধ্যেই মনে হয়, কেমন ঠাকুর তিনি, যাঁকে পেয়ে আমার স্বামীদেবতা এমন তন্ময়! যদি দেখতে পেতাম একবারটি তাঁকে। বিরাজকৃষ্ণ তখন অধিকাংশ সময়ই পাবনায় থাকেন। সরোজিনী দেবী সংসার সামলান, সন্তানদের লালন-পালন করেন, শ্বশ্রূমাতার সেবা করেন, আর নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করেন সেই না-দেখা ঠাকুরের কথা। অবশেষে একদিন রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে হল তাঁর অনির্বচনীয় এক অভিজ্ঞতা। স্বপ্নে দেখলেন, দরজায় করাঘাত করে কেউ দরজা খুলতে বলছেন। সরোজিনী দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, খালি গা, ধুতির কোঁচা লুটোনো এক দীপ্তিমান পুরুষ। তাঁর অঙ্গচ্ছটায় করুণার স্নিগ্ধতা, প্রাণস্পর্শী দৃষ্টিতে, মোহন হাসিতে অশেষ আশ্রয়ের আশ্বাস! মধুর হেসে বললেন তিনি—মা, তোকে দেখতে এলাম। সরোজিনীর সমগ্র সত্তা যেন বিহ্বল, অভিভূত হয়ে পড়ল—সম্মোহিতের মত সেই অপরূপ আগন্তুককে পরম সমাদরে ভিতরে নিয়ে এলেন, তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে নিজের সুদীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে পা মুছিয়ে সযত্নে বসালেন তাঁকে। কী যেন অপূর্ব আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে অন্তর, মুগ্ধ, বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন অচেনা অথচ চির-চেনা সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের মুখের দিকে। তিনি সরোজিনীকে বলে দিলেন একটি বীজনাম। স্বপ্নের মধ্যেই ঘটল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—স্বয়ং নামীর কাছ থেকে পেলেন তিনি সৎনাম।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু নামটি মনে রইল, রইল ভাবের গভীর আবেশ। এদিকে ঐ একই সময়ে পাবনায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিরাজকৃষ্ণকে ডেকে বলেন—বিরাজদা, আপনার মজিলপুরের বাড়ি দেখে এলাম। মা (বিরাজকৃষ্ণের স্ত্রী)-টির মাথায় মেলা চুল! মা আমার পা ধুইয়ে চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিল, আমি তাকে নাম দিলাম। বিরাজকৃষ্ণ অবাক হয়ে ভাবেন—ঠাকুর এ কী রহস্য করছেন? এই তো দেখছি ঠাকুর এখানেই আছেন। এর মধ্যে কখন সুদূর মজিলপুরে গেলেন, কখনই বা ফিরলেন? তিনি এরগূঢ়ার্থ বুঝতে না পেরে তখনকার মত চুপ করে রইলেন।

কিছুদিন পর মজিলপুরে ফিরলেন বিরাজকৃষ্ণ। তাঁকে দেখেই ব্যাকুলভাবে সরোজিনী দেবী জিজ্ঞাসা করেন—তোমাদের ঠাকুর কেমন দেখতে? তিনি কী নাম দেন? বিরাজকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে তাঁর এই জিজ্ঞাসার কারণ জানতে চাইলে সরোজিনী অশ্রুপ্লাবিত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর স্বপ্নের আনুপূর্বিক বিবরণ দ্যান। বিদ্যুচ্চমকের মত বিরাজকৃষ্ণের মনে পড়ে যায় ঠাকুরের সেদিনের কথা—শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরিমেয় করুণায় এবং সহধর্মিণীর পরম সৌভাগ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। ভক্তির অনাবিল স্রোতে পূর্ণ হয়, ধন্য হয় তাঁদের যুগল জীবন।

কিন্তু শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের মধ্যে এই পরম ধন প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না বিরাজকৃষ্ণ; পরিপার্শ্বে, বিশেষত তাঁর পৈতৃক ভূমি মজিলপুর ও সন্নিহিত

অঞ্চলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত ভাবধারার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও সমুন্নত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। সপার্ষদ ঠাকুর যদি একবার মজিলপুর আসেন, তবেই পূর্ণ হতে পারে তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর আগ্রহের ঐকান্তিকতায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে সতীশচন্দ্র গোস্বামী, অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সত্যচরণ দত্ত, খোকন বুনে, তরণী বুনে প্রভৃতি কীর্তনদলের সহচর-সহ শ্রীশ্রীঠাকুর মজিলপুরে বিরাজকৃষ্ণের গৃহে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষ্যে জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলে যে বিপুল ভাবান্দোলন, যে প্রাণের জোয়ার উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল, তার ঈষৎ বিস্তারিত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মজিলপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শিক্ষা-সম্পদ নির্বিশেষে অগণিত মানুষ প্রতিদিন বিরাজকৃষ্ণের গৃহে ঠাকুর-দর্শনে সমবেত হতেন। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা, প্রত্যেকের জন্যই অভিনব সমাধান। সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলী ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে নানা অধ্যাত্ম তত্ত্ব আলোচনা করতেন। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীমোহন, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সুশীলচন্দ্র বসু প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ্‌গণ সে-সমস্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আলোচ্য বিষয় সমূহ অত্যন্ত সহজভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে ড্রাম, জয়ঢাক, খোল, করতাল, কাঁসর, ঘন্টা সহযোগে তুমুল কীর্তনে মেতে উঠতেন সকলে। এভাবে কীর্তনে, গানে, সদালোচনায় বিরাজকৃষ্ণের গৃহ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মজিলপুরের জমিদার সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরকে বলেন যে, এককালে গঙ্গা ঐখান দিয়ে প্রবাহিত হত, নদী মজে গিয়ে এই গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে বলে এর নাম মজিলপুর। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই স্থান দিয়েই নীলাচলে গিয়েছিলেন। মজিলপুর থেকে সাত মাইল দূরে যে জায়গায় তিনি অবস্থান করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা 'চক্রতীর্থ' নামে পরিচিত হয়। একথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্রতীর্থ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। পরের দিন, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১৭, শ্রীশ্রীঠাকুর সদলে কীর্তন সহযোগে রওয়ানা হন চক্রতীর্থের পথে। দিনের শুরু না হতেই কীর্তনের কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠল মজিলপুর গ্রাম। বিরাজকৃষ্ণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কীর্তনের দল ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, কাঁসর, ঘন্টা ইত্যাদি বাদ্য ও উদ্দাম নৃত্যসহ অগ্রসর হতে লাগল—সকলের পুরোভাগে আছেন দু'বাহু তুলে সুঠাম নৃত্যে ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই কীর্তনের প্লাবন যে-পথে অগ্রসর হল, দু'কূল ছাপিয়ে আত্মসাৎ করে এগিয়ে চলল। কীর্তনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে, ঠাকুরের বিশ্বমোহন ভঙ্গিমায় ও নামের তড়িৎ স্পন্দনে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি যেন সম্মোহিতের মত কীর্তনের দলে যোগ দিল। সমবেত উলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল দশদিক্—দলে দলে লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবোন্মাদ মূর্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগল। ঠাকুরও যাকেই সামনে পাচ্ছেন, প্রেমালিঙ্গনে ধন্য করে দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছেন। নামস্পন্দনের

তড়িৎ প্রবাহে তাঁর কেশরাশি মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে উঠছে মাথার উপর। ঠাকুর তীব্র গতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন—অনুগামীদের প্রাণপণ গতিও তাঁকে ধরতে পারল না। সকলের আগে একাকী চক্রতীর্থে উপস্থিত হলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে ভক্তবৃন্দ সেখানে পৌঁছনোর পর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল অবিরাম কীর্তন। অর্ধভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হল একটি মহাভাববাণী: 'One is equal to various and various is equal to one.' সন্ধ্যার পর সকলে মজিলপুরে ফিরে আসেন।

বিরাজকৃষ্ণের প্রাণ আনন্দে, তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল নিজ গৃহে ঠাকুরের লীলাময় অবস্থিতির সৌভাগ্যে। মোট সাত দিন সেখানে থেকে, বিদায়কালে সমগ্র গ্রামটিকে বিদায়-ব্যথায় ব্যথিত করে শ্রীশ্রীঠাকুর সপার্ষদ্ হিমাইতপুরে ফিরে গেলেন।

মজিলপুর থেকে চলে আসার সময় সেখানকার মানুষজন শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে যে-ভাবে আবেগ উচ্ছ্বাসে তাঁর চারপাশে ভেঙে পড়েছিল তা দেখে ঠাকুরের মনে হয়েছিল—উপযুক্ত পোষণের অভাবে তিনি চলে যাওয়ার পর এই আবেগ-উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে ক্রমে একেবারেই মিলিয়ে গিয়ে গতানুগতিক জীবনধারায় পরিণত হবে আবার। মানুষের আবেগ ও উন্মাদনাকে শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুরাগী করে যদি তার প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যোগ করা না যায় তবে ঐ আবেগ-উন্মাদনায় সত্যিকারের স্থায়ী কোন লাভ হয় না মানুষের। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভাবনারই ফলশ্রুতি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির বিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের আবেগকে নিয়মিত শ্রেয়মুখী প্রেরণায় দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। এবং তা-ই ক্রমে সংহত সৎসঙ্গ আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে। মজিলপুর পর্বকে তাই সৎসঙ্গ আন্দেলনের একটা পীঠস্থান বলা যায়।

বিরাজকৃষ্ণের মন আর মজিলপুরে থাকতে চাইল না; স্থির করলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষয়-সম্পত্তি সব অর্পণ করে পাকাপাকিভাবে হিমাইতপুর নিবাসী হবেন। ভাইয়ের বিবাহ দিয়েছেন, একটি পাঁচ মাসের শিশু সন্তান তখন তার। বিরাজকৃষ্ণ তখন হিমাইতপুরে রয়েছেন। ভগবৎ সান্নিধ্যের মাধুর্যে মাতোয়ারা মন তাঁর। হঠাৎ একদিন ঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন—বিরাজদা, বাড়ি থেকে যদি এখনই কোন দুঃসংবাদ পান, তাহলে কী করবেন? মেনে নিতে পারবেন তো? তিনি ভেবে পান না, কী এমন দুঃসংবাদ হতে পারে! এই তো বাড়িতে সকলকে সুস্থ দেখে এলেন, এরই মধ্যে কী ঘটতে পারে? তবু ঠাকুরের কথায় অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। ঠাকুরের ঐ কথার কিছুক্ষণ পরই টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল যে, আকস্মিকভাবে কলেরায় তাঁর ছোট ভাইটির মৃত্যু হয়েছে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তাঁর। একে কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুশোক, তার ওপর তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এই ঘটনায়। ঠাকুর নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যান দাদা, এখন বাড়ি যান, বাড়িতে তো এখন আপনাকে খুবই দরকার।

মজিলপুরে ফিরে এলেন বিরাজকৃষ্ণ। শোকাতুরা বিধবা মা, নিতান্ত অল্পবয়সী

বিধবা ভ্রাতৃবধূ, তার শিশু সন্তান, সকলেরই দায়িত্ব তাঁর ওপর। তাছাড়া, তাঁর নিজের দুই পুত্র, এক কন্যাও তখন নিতান্তই শিশু। কিছুটা সামলে নেওয়ার পর পরিবারের সকলকে নিয়ে হিমাইতপুর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। মজিলপুরে স্বজন-জ্ঞাতির কাছে বিষয়-সম্পত্তি সমর্পণ করে সপরিবারে হিমাইতপুরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিলেন বিরাজকৃষ্ণ। বিষয়-বৈভব, জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পড়ে রইল পিছনে—তিনি এগিয়ে চললেন পার্থিব দুঃখের কাঁটা দ'লে অন্তরের অবিনশ্বর প্রেমপুষ্প-চয়নে।

হিমাইতপুর এসে আশ্রম থেকে কিছুটা দূরে জায়গা কিনে একটি ছোট গৃহ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন বিরাজকৃষ্ণ। এক বহু প্রাচীন ভাঙা কালীমন্দিরের কাছে, ফাঁকা জায়গায়, প্রায় মাঠের মধ্যে ছিল তাঁর বাড়িটি। ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে এক পরিবারের মতই সহজ সরলভাবে দিন কাটে তাঁদের। একবার কোন অজ্ঞাত রোগে দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন বিরাজকৃষ্ণ; ডাক্তাররা সন্দেহ করেছিলেন পেটে ফোঁড়া বা টিউমার জাতীয় কিছু হয়েছিল এবং কোন চিকিৎসায়ই আরোগ্য লাভ হচ্ছিল না। সেসময় ঠাকুর তাঁকে বলেন—বিরাজদা, কিছুদিন আপনি আমার বাড়ি এসে থাকেন, আমি গিয়ে থাকি আপনার বাড়ি। সেই কথামত তিনি আশ্রমে এসে জননী মনোমোহিনী দেবীর কাঠের দোতলা বাড়ির কাছেই একটা ঘরে থাকতে লাগলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে লাগলেন। এর ফলে বিরাজকৃষ্ণ ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলেন; কিন্তু তাঁর বাড়ির দাওয়া থেকে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ঠাকুরের পা মচকে গেল। তখন ঠাকুর বোলওয়ালা কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন, বাঁশের সিঁড়িতে সেই খড়ম পিছলে যায়। সেই মচকানোর ফলে ঠাকুর দীর্ঘদিন পায়ের পীড়া ভোগ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্যে জাগতিক সুখদুঃখকে অতিক্রম করে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন বিরাজকৃষ্ণ। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল। দয়ালবাগ সৎসঙ্গের যে-সমস্ত হিন্দী গীত ও ভজন বিরাজকৃষ্ণ জানতেন, সেগুলি অনন্ত মহারাজকেও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ ঘোড়ায় চড়ে ডাক্তারি করতে যেতেন। সেই ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটতে কাটতে দুই বন্ধু উদাত্ত কণ্ঠে সে-সমস্ত গীত ও ভজন গাইতেন। কাশীপুর গ্রামে সাধন-ভজনের জন্য মহারাজ যে মঠ বানিয়েছিলেন, সেই নিরালা নির্জন মঠটিতে মহারাজের সঙ্গে বিরাজকৃষ্ণও যেতেন এবং দুজনে দিনের পর দিন সাধন-ভজন, জপ-তপে নিমগ্ন থাকতেন।

সাধনভজন ও জপতপের ফলে বিরাজকৃষ্ণর মন নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁতেই সংলগ্ন হয়ে থাকত এবং যখন যেখানে থাকতেন, যাঁদের মধ্যেই থাকতেন—'কানু বিনা গীত নেই'-এর মত তাঁরও 'ঠাকুর ছাড়া কথা নেই' অবস্থা হয়েছিল। একবার নৈহাটি গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেসময় কলকাতায় অবস্থান করছেন। বিরাজকৃষ্ণ নৈহাটিতে রেলকর্মী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাসস্থানে গেছেন এক সকালে। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি নবদ্বীপে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, সুগায়কও ছিলেন তিনি।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে করতে বিরাজকৃষ্ণ স্বভাবতই ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ঈশ্বরীয় নানা গুণের, বিশেষত অন্তর্যামিত্বের কথা বর্ণনা করেন। শুনতে শুনতে সুরেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন—আচ্ছা বিরাজবাবু, আপনার ঠাকুর তো অন্তর্যামী, ডাকুন তো তাঁকে, দেখি তো আপনার ডাকে তিনি কলকাতা থেকে এখন নৈহাটি আসেন কিনা? বিরাজকৃষ্ণ জানতেন এভাবে পরীক্ষার জন্য ঠাকুরকে ডাকা অবিধেয়, তাই তিনি প্রথমে চুপ করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সকলের সংশয়াত্মক অনুরোধের অতিশয্যে অবশেষে তিনি চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন সেখানে আবির্ভূত হতে। কিছুক্ষণ পরেই আবার সুরেন্দ্রনাথ অবিশ্বাসী কৌতূহলে প্রশ্ন করেন,—আপনার ঠাকুর এখন কোথায় বলুন তো? বিরাজকৃষ্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেলেন— মনে হয় ঠাকুর এখন শিয়ালদা স্টেশনে, ট্রেনে উঠছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর নৈহাটি এসে উপস্থিত হন। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ দীক্ষাগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এক্ষেত্রে ইংরেজি প্রবাদ "You can drag the horse to the water, but you cannot make him drink it"-টিই মনে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়ত-কর্মী, তন্নিষ্ঠ বিরাজকৃষ্ণ সহপ্রতিঋত্বিকের পবিত্র পাঞ্জা প্রাপ্ত হন; যাজন-কার্য এবং দীক্ষাদান ছিল তাঁর অস্তিত্বেরই অঙ্গ। ঠাকুরের অমিয় ভাবধারা প্রচারের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিস্মৃত হলে ইতিহাসের প্রতি তঞ্চকতার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। ঠাকুরের আদেশে তিনি নদীয়া জেলার সৎসঙ্গ আন্দোলনের জেলা-তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কাজে তাঁকে প্রায় সারা বছরই বাইরে বাইরে ঘুরতে হত। তিন মাস অন্তর ঋত্বিক অধিবেশনে আশ্রমে তথা বাড়িতে আসতেন। সে যুগ আশ্রমের এবং কর্মীদের চরম আর্থিক কৃচ্ছ্রতার যুগ; একদা বিপুল সম্পদের অধিকারী বিরাজকৃষ্ণকেও পরিবার-পরিজনসহ হাসিমুখে সেই কৃচ্ছ্রতা বরণ করতে হয়েছে। উপরন্তু, মজিলপুর থেকে আনীত যা কিছু যৎসামান্য বিষয়বস্তু ছিল, উপর্যুপরি আটবার চুরি হওয়ায় সেসবই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

তিনি যাজন-কাজে সবসময়ই নানা স্থানে ব্যাপৃত থাকতেন; তাঁর সহধর্মিণী সরোজিনী দেবী ছেলে মেয়ে নিয়ে আশ্রম সংলগ্ন বাড়িতে বাস করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহছায়ায় অভাব-অনটনের মধ্যেও মনের প্রসন্নতা ছিল অটুট।

একবার চৈত্রের শুরু থেকেই দিন আর চলে না। পূজার সময় এসে বিরাজকৃষ্ণ যেটুকু যা ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন, তা শেষ হয়েছে অনেক দিনই। ছেলেটি সংসারের হাল ফেরাবার আশায় পার্বতীপুরে গিয়ে চাকুরি বা ব্যবসার চেষ্টা করছে। সরোজিনী দেবী প্রায় জঙ্গলের মধ্যে সেই বাড়িতে দুটি মেয়েকে নিয়ে অসহায়ভাবে ঠাকুরের নাম নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মুগকলাই সিদ্ধ, শাকপাতা সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে; পরপর সাত দিন মেয়েদের মুখে ভাত দিতে পারেননি

সরোজিনী; পয়সার অভাবে কেরোসিন কেনা হয় না কতকাল—সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ডুবে যায় ঘরদোর সব, নির্জন নিশীথে এটা সেটা গল্প করে, ঠাকুরের কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করেন মেয়েদের। বড় মেয়েটি তবু খানিকটা বোঝে, মুখ বুজে সহ্য করে সব, ছোট মেয়ে কিন্তু কেবল বায়না করে ভাতের জন্য। অবশেষে অসহায়া জননী বড় মেয়েকে বলেন ঠাকুরপদ-র দোকান থেকে ধারে সব কিনে আনতে। কিন্তু সে কিছুতেই ধার করবে না, বলে—ধার করলে শোধ করব কোথা থেকে, এই তো অবস্থা! তখন ছোট মেয়েকে তিনি এই বলে ভোলান—এই তো ১লা বৈশাখে উনি আসবেন, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলে সব আবার ভরে উঠবে। কত কিছু আনবেন উনি—তখন ভাত খেতে কত মজা লাগবে!

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল। রান্নাবাড়ার পাট নেই। দরজা বন্ধ করে মেয়েদের নিয়ে চৌকির নীচে গিয়ে আশ্রয় নিলেন সরোজিনী। হাওয়ার দাপাদাপিতে ঘর যেমন হেলছে দুলছে, কখন ভেঙে মাথায় পড়ে ঠিক নেই। পাশের বাঁশঝাড় নুয়ে পড়ছে ঝড়ের দাপটে। রান্নাঘরের বেড়াটা গেল পড়ে। এই প্রচণ্ড দুঃসময়ে দিশেহারা বিরাজ-জায়া আকুল হয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় কেটে গেল এইভাবে—দুঃখের প্রহর দীর্ঘ বোধহয় আরও বেশি। মেয়ে দুটোও আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে গেছে কখন। একসময় শান্ত হল পবনদেবতার রোষ, থামল ঝড়। নিস্তব্ধ চারিধার। হঠাৎ সদরের বাঁশের দরজা খোলার শব্দ হল ক্যাঁ-চ করে। চোর-বদমাশ কারও আগমনের শঙ্কায় ভীত সরোজিনী বন্ধ ঘরের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে রইলেন। অল্প পরেই দরজায় আঘাত করে কেউ বলতে লাগল—মা-ঠাকুরন, দোরটা খোলেন। নানা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলেন সরোজিনী দেবী যে, আগন্তুক অসদুদ্দেশ্যে অসেনি। দরজা খুললেন তিনি। আগন্তুক বলল—মা-ঠাকুরন, একটা বাতি ধরায়ে জিনিষগুলো ঘরে তোলেন।

— আর বাবা বাতি! তা, তুমি কোথা থেকে এলে, কী জিনিষ, আর কে-ই বা পাঠাল?

— আর বলেন কেন! বার হইছি সে ঝড়ের আগেই। এমন হুড়মুড়ায়ে ঝড় আলো! এসব পাঠায়েছেন বনমালী চৌধুরীর বাড়ির মা-ঠাকুরন। তেনার কী ব্রত ছিল, তার ভুজ্যি। বলেন—এসব বিরাজদার বাড়ি দিয়ায় গা (দিয়ে আয় গিয়ে)। এই রাখেন চাল, ডাল . . . .

একে একে নামিয়ে রাখতে লাগল মানুষটা অন্ধকারেই। শেষে বলল—এই রাখেন মা, ছ'টা পয়সা—দক্ষিণা। যাওয়ার সময় বলে গেল—আলো জ্বালেন মা, অন্ধকারে কি মানুষ থাকবের পারে?

সরোজিনীর মনের সমস্ত অন্ধকার তখন দয়ালের করুণার স্নিগ্ধ কিরণে দূরীভূত হয়ে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল অন্তর—দু'চোখে নেমে এল বাঁধভাঙা অশ্রুর প্লাবন। এমনি করেই দুর্যোগের অমা পরমত্রাতার কৃপারশ্মিতে কেটে যায় ভক্তের জীবনে, দেশে দেশে কালে কালে।

নিরলস ইষ্টব্রতে নিরত বিরাজকৃষ্ণ তিন মাস অন্তর ঋত্বিক সম্মেলন উপলক্ষে যখন হিমাইতপুরে ফিরতেন, তখন প্রায়ই দেখা যেত পরিবার-পরিজনের জন্য নানারকম জিনিষপত্রের পরিবর্তে তিনি নিয়ে আসতেন থলে ভর্তি হরিতকী, দক্ষিণা হিসাবে যজমানরা তখন যা দিত। ইষ্টকর্মের আনুষঙ্গিক কৃচ্ছ্রতা-পালন তাঁর কাছে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ মূর্ত করাই ছিল তাঁর কাছে পরম প্রাপ্তি।

আশ্রমে যতক্ষণ থাকতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য-সুধা উপভোগ করতেন প্রাণ ভরে, মনের নানা প্রশ্নের ডালি তাঁর পায়ে নিবেদন করে তৎপ্রদত্ত অমিয় সমাধানে পূর্ণ করে নিতেন অন্তরের ভাণ্ডার।

ঠাকুর-সান্নিধ্যের এমনই এক মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায় 'আলোচনা প্রসঙ্গে' মহাগ্রন্থে, ২২শে জুলাই, ১৯৪২-এ:

বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য) — ঠাকুর! বিশ্বাসটা পাকা হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস জিনিসটা শ্বাসক্রিয়ার মতো সহজ। ওটা এতই পাকা যে ও-সম্বন্ধে সন্দেহ, অবিশ্বাস বা প্রশ্ন আসে না। কারণ, ওটা প্রত্যক্ষ। মানুষের ভালবাসা যাতে, বিশ্বাসও তাতে। ঐ তার জীবন। তাতে অবিশ্বাস আসলে সে তো আর নেই। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ Positively (বাস্তবে) যতটুকু তাঁকে follow (অনুসরণ) করে—Unexpectantly (অপ্রত্যাশী হয়ে), out of love (ভালবেসে)—তার ভিতর দিয়ে তার যে experience (অভিজ্ঞতা) হয়, সেই experience (অভিজ্ঞতা)-ই তাকে বলে দেয় যে, বিশ্বাসের অমনতর স্থল আর নেই। কারণ, মানুষ জীবনে অত সুখ আর কিছুতেই পায় না, অতো স্বস্তি আর কিছুতে পায় না। ঐটুকুই তার জীবনের অমৃত। তাই বিশ্বাস না করে সে যাবে কোথায়? অনেকের Love at first sight (প্রথম দেখাতেই ভালবাসা) হয়। তাদের বিশ্বাসও হয় স্বতঃ। বিশ্বাস যাকে বলে, তা একবার হলে, কখনও নষ্ট হয় না। বিশ্বাস সম্বন্ধে সত্যানুসরণে অনেক কথা আছে।

বিরাজদা—তার অনেকগুলি আমার মুখস্থ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কন্ তো দেখি।

বিরাজদা—বিশ্বাসই বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়।

বিশ্বাস যুক্তি-তর্কের পার, যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তি-তর্ক তোমায় সমর্থন করবেই করবে। তুমি যেমনতর বিশ্বাস কর, যুক্তি-তর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ সুন্দর তো!

বিরাজদা—আরও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কন্।

বিরাজদা—ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি-তর্ক বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব মানে জানেন তো? ভাব মানে হওয়া। হওয়ার পিছনে থাকে

করা। যার করা যত বেশী থাকে, তার ভাব বা হওয়াও হয় ততখানি। আবার ভাবের মানে অনুরাগও হয়। অর্থাৎ, ইষ্টের জন্য করা ও ভালবাসা যার যত বেশী, তার বিশ্বাসও তত গভীর।

বিরাজদা—সব জানাশোনা সত্ত্বেও যে অনেক সময় মন টলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের রাজ্যে মানুষের ওঠাপড়া আছেই। ওদিকে খেয়াল দিতে নেই। বিশ্বাসের প্রতিকূল চিন্তা যখন মনে জাগে, তাকে কিছুতেই আমল দিতে নেই। তার অনুকূল চিন্তা যেগুলি, সেগুলিকে তখন দৃঢ়ভাবে মনের উপর আরোপ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে বলতে হয়, করতে হয়, লিখতে হয়, গান গাইতে হয়। তখন আর সেটা দাঁড়াতে পারে না। গভীর বিশ্বাসী যারা, তাদের সঙ্গ করলেও ভাল ফল হয়। বিশ্বাস হারালেই কিন্তু মানুষ নিঃসম্বল, দেউলিয়া। তার বল, শক্তি, জ্ঞান কিছু থাকে না, সে দিনে দিনে নিস্তেজ ও জড় হয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে মৃদু-মৃদু হেসে বলছেন—একটা লোক চোর, ধাউড়, গুণ্ডা, বদমায়েস বা লুচ্চা হয়েও যদি একনিষ্ঠ হয়, তার বরং গতি আছে। কিন্তু সে বহুনৈষ্ঠিক, যে wabbler (অস্থিরমতি), সে যদি moralist (নীতিপরায়ণ) ও হয় তবু তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রত্নাকর বা বিল্বমঙ্গল type (ধরন)-এর যারা, তাদের জন্য কোন ভাবনা নেই। ভাবনা হলো তাদের নিয়ে, যাদের মধ্যে খোলামেলা রকম নেই, ভালবাসা নেই।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর চলে আসার পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত বিরাজকৃষ্ণ হিমাইতপুরেই ছিলেন। দেশভাগের পর নৈহাটীতে এসে তাঁর যজমান সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রদত্ত একটি বাড়িতে ওঠেন। অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বিরাজকৃষ্ণ জ্যোতিষচর্চাও করেছিলেন। তিনি জানতেন, চৌষট্টি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুযোগ আছে, এবং এও জানতেন যে সদ্‌গুরু সান্নিধ্যে থাকতে পারলে তা কেটে যাবে। তাঁর যখন চৌষট্টি বছর বয়স, তখন স্ত্রীপুত্র সহ মজিলপুরে ছিলেন তিনি। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর কোষ্ঠীফলের কথা চিন্তা করে দেওঘরে ঠাকুরের কাছে আসেন। তখনও দেওঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থিতি নিতান্ত অসংগঠিত অবস্থায় ছিল; নানা লোকজন, অনেকেরই অবস্থা এলোমেলো। বিরাজকৃষ্ণ ঠাকুরকে বিব্রত না করে আপন চেষ্টায় সেখানে থাকার প্রয়াস করেন; কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে তা সম্ভব না হওয়ায় মজিলপুরে ফিরে যান।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন ইষ্টস্বার্থী, ভক্তপ্রবর বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পরমপদে বিলীন হন—পূর্ণ হয় একটি জীবনবৃত্ত, স্তব্ধ হয় এক কর্মচাঞ্চল্যময় ইষ্টপ্রাণ সত্তার ঐহিক প্রকাশ। কিন্তু 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'—তাঁর পার্থিব তনুর লয় হলেও তাঁর তন্ময় ইষ্টাসঞ্চারী সত্তা ইষ্টসঞ্চারণার মধ্যেই চিরবিরাজমান হয়ে থাকবে।
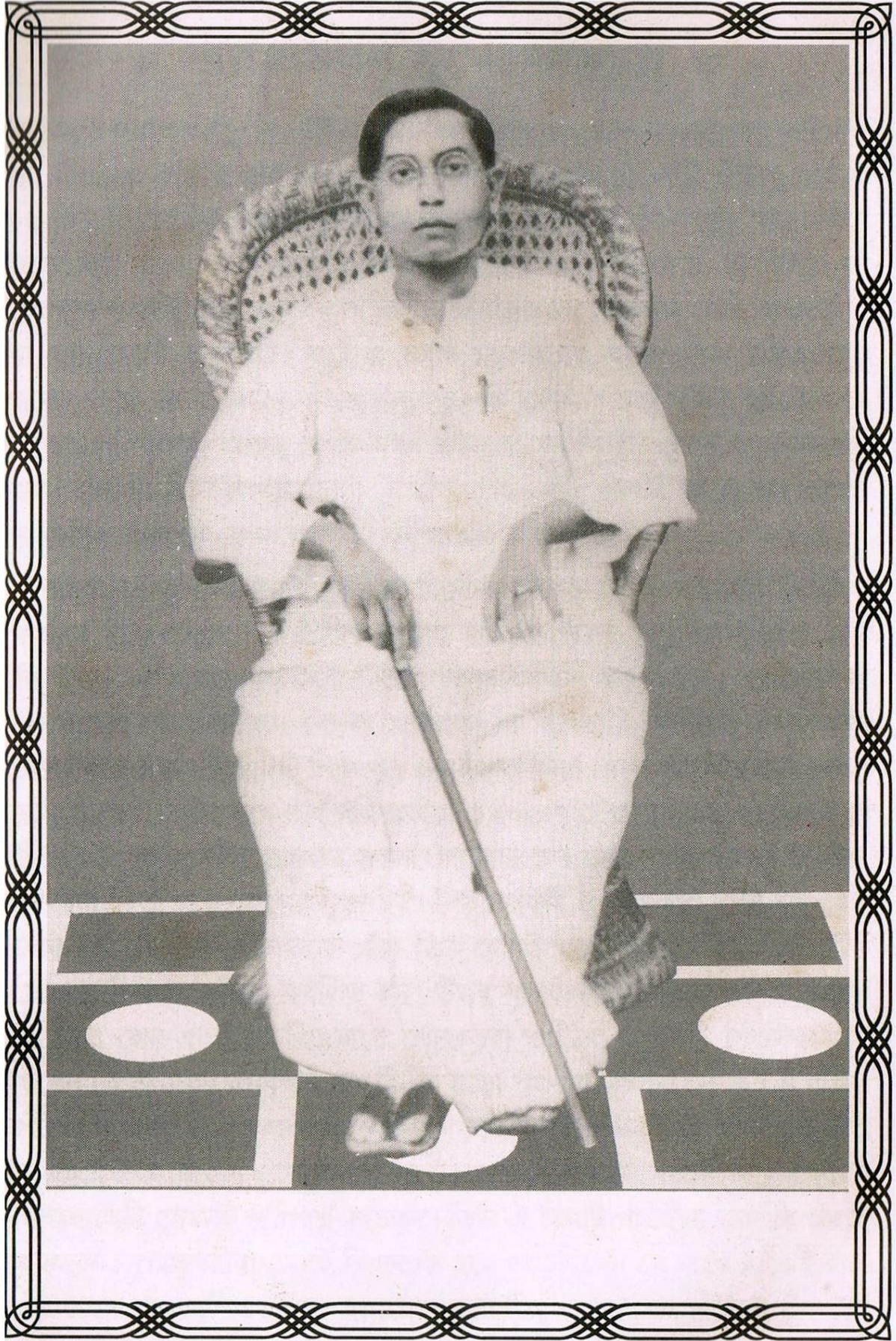
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ — ৪ঠা অগাষ্ট, ১৯৪০

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে আয়ু এবং জীবন সমার্থক প্রতিভাত হলেও আয়ুষ্কালের পরিমাপ এবং জীবনের পরিধি এক নয়। অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য্য, কবি কীটস্, সমাজ সংস্কারক ডিরোজিও, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের স্বল্পকালীন আয়ুষ্কালের মধ্যে যে মহাজীবন বিম্বিত হয়েছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা বহুসংখ্যক শতাতিক্রান্ত মানুষের সম্মিলিত জীবনের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফলদায়ী। তবে এ সমস্ত মহাপ্রাণের আয়ুর সীমা বর্ধিত হলে জগতের পক্ষে তা অধিকতর কল্যাণপ্রসূ হত—এ ভাবনা স্বতঃই উদিত হয়। সৎসঙ্গ জগতের পরিমণ্ডলে অল্পায়ু অথচ মহৎ জীবনের অধিকারী এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মেধাবী বিজ্ঞানী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—যাঁর জীবনী আলোচনা করলে তাঁর অকাল প্রয়াণের বেদনা আজও যেন আচ্ছন্ন করে আমাদের।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুর্বপুরুষ ছিলেন হালিশহরের বাসিন্দা। তাঁর পিতামহ নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় এক ব্রিটিশ সংস্থায় কর্মরত ছিলেন; চাকুরির সুবিধার জন্য তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। শ্যামাচরণের পিতা নগেন্দ্রনাথ তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আবগারি বিভাগের কালেকটর ছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী একটি শিশু পুত্র ও নবজাত কন্যা রেখে পরলোকগমন করার পরে দুর্গাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন দুর্গাসুন্দরীর একমাত্র সন্তান। শ্যামাচরণের বয়স যখন সাত বছর মাত্র, তখন তাঁর পিতা নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। শিখরবাসিনী ও মায়ালতা নাম্নী দুই বোন ছিলেন দুর্গাসুন্দরীর—ঘটনাচক্রে এঁরা তিন বোনই অল্প সময়ের ব্যবধানে পতি-বিয়োগের নিদারুণ দুর্ভাগ্য-কবলিত হন। উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে চারনম্বর ঈশ্বর মিল লেন-এ এঁদের পিত্রালয়ে শোকাতুরা ভগ্নীত্রয় কয়েকটি শিশুসন্তানসহ থাকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতা পূজনীয় ক্ষেপুদা সেসময় ঐ বাড়ির একটি অংশ ভাড়া নিয়ে কলকাতায় আইন পড়তেন। ঠাকুর জননী মনোমোহিনী দেবী মাঝে মাঝেই কলকাতায় এসে ঐ বাড়িতে উঠতেন। মাতা মনোমোহিনী ছিলেন যেমন ব্যক্তিত্বশালিনী তেমনই পরিপার্শ্ব-সচেতন। তিনি ঐ তিনটি পতিহীনা তরুণীর অবস্থা লক্ষ করেন। দুর্গাসুন্দরীরা এমনই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে মাঝে মাঝেই রান্না খাওয়াও বন্ধ থাকত;শিশুগুলিকে হয়তো সামান্য কিছু খাওয়াতেন, নিজেরা উপবাসে শোকাচ্ছন্নতায় দিন কাটাতেন। মাতা মনোমোহিনী একরকম জোর করেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর অসাধারণ মমতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাঁদের আপন করে নেন। যেদিন দেখতেন তাঁদের রান্নাবান্নার উদ্যোগ নেই, সেদিন গিয়ে বলতেন—আজ ভাবছি তোমাদের সঙ্গে একমুঠো খাব, অসুবিধে হবে না তো? তাঁকে ফেরানোর সাধ্য দুর্গাসুন্দরীদের ছিল না। অপরিসীম ভালবাসা এবং প্রবল জীবনীশক্তির

অভিঘাতে জননী মনোমোহিনী তাঁদের অবসাদ মোচন করতে থাকেন; ধীরে ধীরে হিমাইতপুরের সৎসঙ্গ আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে তিন বোনের। মাতা মনোমোহিনীকে এঁরা 'দিদি' বলে ডাকতেন। মাতৃদেবী তাঁদের কাছে নিজ পুত্র অনুকূলচন্দ্রের কথাও বলেন—অনেকেই যে অনুকূলচন্দ্রকে গুরু স্বীকার করে 'ঠাকুর' অভিধায় অভিহিত করেন, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের সন্ধান পান তাঁর ভক্তবৃন্দ, বলেন সে কথাও। এঁরা তিন বোন যখন প্রথম অনুকূলচন্দ্রকে দর্শন করেন, তখন তিনি নিতান্তই যুবা; কান্তির কমনীয়তার জন্য তাঁর বয়সের চেয়েও কম দেখাত তাঁকে। তাঁকে দেখে দুর্গাসুন্দরী মাতা মনোমোহিনীকে বলে ওঠেন—দিদি, এর কথাই এত শুনি? এ তো দেখছি আমার গোপালী! তিনি তাঁর পুত্র শ্যামাচরণকে 'গোপাল' বলে ডাকতেন। মাতৃদেবীকে 'দিদি' সম্বোধন করতেন বলে ঠাকুর ঐ ভগ্নীত্রয়কে 'মাসিমা' সম্বোধন করতেন; সে কারণে আশ্রমে এঁরা শেখরমাসিমা, দুর্গামাসিমা এবং মায়ামাসিমা পরিচয়েই খ্যাত ছিলেন। এঁরাও ঠাকুরকে 'গোপালী' বলেই ডাকতেন এবং 'গোপালী'-ই হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের প্রাণের ধন, জীবনের কেন্দ্র।

এরপর থেকে প্রায়শই দুর্গাসুন্দরী হিমাইতপুরে থাকতেন। কলকাতায় অবশ্য আসাযাওয়া ছিল সবসময়েই—কারণ শ্যামাচরণ কলকাতায় থেকেই পড়াশুনো করতেন। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন মাতা মনোমোহিনী দেবী তাঁকে সৎনামে দীক্ষা দেন। এটি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে হিমাইতপুর আশ্রমে যেতেন। তাঁর মা-মাসিমাদের পরম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ ঠাকুরের প্রতি আশৈশব সহজ স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল তার মনে। তবে তারুণ্যের প্রবল জোয়ারে সেসময়কার বাংলার বিপ্লবী রাজনীতির ছোঁয়াও সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর অন্তরে।

হিমাইতপুর আশ্রমে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্মকাণ্ডের যুগ চলছে। অখ্যাত এক পল্লীর প্রত্যন্ত প্রদেশে বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, মেক্যানিকাল ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নানা অভাবনীয় বিজ্ঞানমুখী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। রসায়নবিদ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (একমুখ দাড়ির জন্য যিনি 'দাড়ি-বীরেনদা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন) ঠাকুর-প্রদত্ত ফর্মুলা বাস্তবায়িত করে 'প্রিভেন্টিনা' মলম তৈরির প্রয়াস চালাচ্ছেন সেসময়। মলমের দাহ্য অংশের স্বচ্ছতা কিছুতেই আসছিল না। শ্যামাচরণ তখন কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এস সি. পড়ছেন—আশ্রমে এসে কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এ গেছেন 'প্রিভেন্টিনা' তৈরির অগ্রগতি দেখতে। প্যারাফিন নিয়ে কাজ হচ্ছিল তখন—রসায়নের ছাত্র শ্যামাচরণও হাত লাগিয়েছেন তাতে, হঠাৎ আগুন লেগে ভয়ানকভাবে ঝলসে গেল তাঁর সর্বাঙ্গ। সেই সময়েই ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ডাক্তার সুবোধ সেন আশ্রমে এসেছেন। তাঁকে ঠাকুর বলেন—দ্যাখ, দ্যাখ, ওষুধ তৈরি করতে গিয়ে কী অবস্থা!

ডাক্তার বললেন— ওষুধ ওর জন্যই তো বানানো হচ্ছিল, না? ঠাকুর হাসেন— কী যে কও তুমি! কিন্তু ঐ প্রিভেন্টিনা লাগিয়েই শ্যামাচরণের দগ্ধ ক্ষত সম্পূর্ণ নিরাময় হল।

স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এস সি. পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এস. সি. পড়তে শুরু করলেন শ্যামাচরণ। সুন্দর চেহারা, মেধাবী ছাত্র, সম্ভ্রান্ত বংশ, পরিশীলিত আচরণ ও বচন। কিন্তু বাহ্যত শান্ত যুবকটির অন্তঃস্থলে দেশজোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন এমনভাবে সংক্রামিত হয়েছিল যে অভিভাবক পরিজনবর্গের অগোচরে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। হঠাৎ একদিন বাগবাজারে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়, সরকারি মতে আপত্তিজনক কাগজপত্রের সন্ধানে। তীক্ষ্ণধী শ্যামাচরণের সতর্কতায় তেমন কিছু অবশ্য পাওয়া গেল না—কিন্তু তাঁর গোপন সন্ত্রাসবাদী চলন অভিভাবকবৃন্দের, বিশেষত তাঁর মায়ের গোচরে আসে। শঙ্কিতা মা ছেলেকে নিয়ে যান তাঁর গোপালী অর্থাৎ ঠাকুরের কাছে। শ্যামাচরণ এ ব্যাপারে ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনায় আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। আবাল্য পরিচিত স্বজনের প্রতি যেমন সহজ ভালবাসা থাকে, ঠাকুরের প্রতি তাঁরও ছিল তেমনি; কিন্তু কিছু উদাসীনতা বা গুরুত্বহীনতার ভাবও ছিল হয়তো নবীনত্বের স্বাভাবিক নিয়মে —বিশেষত, স্বাধীনতা সংগ্রামই যে প্রতিটি ভারতবাসীর তৎকালীন মুখ্য কর্তব্য, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ় নিশ্চিত। তবুও মায়ের জোরাজুরিতে ঠাকুরের কাছে গেলেন শ্যামাচরণ। ঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন করেন—দেশ তো স্বাধীন করবি, স্বাধীন দেশে কী করবি, ঠিক করেছিস কিছু? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে ছিল না। এরপরে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠাকুর তাঁকে বোঝান প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কী এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায়। আরও বলেন, ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে কারও কোন প্রকৃত লাভ হয় না, বরং ওই ধরনের কাজ যে করে তার মনুষ্যত্ব বিধ্বস্ত হয়। গঠনাত্মক সদর্থক চলনই মানুষকে আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি এনে দিতে সক্ষম এবং গঠনমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত মানুষ গড়ে তোলাই প্রকৃত স্বাধীনতার বাস্তব ভিত্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্য বিশ্লেষণী বক্তব্যে শ্যামাচরণের সম্বিত ফেরে; বিস্মিত হয়ে ভাবেন—এতো সহজ সত্য তো কারও কাছে শুনিনি! তাঁর একান্ত কাছের এতদিনকার দেখা মানুষটি যেন এক আশ্চর্য আলোকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন তাঁর কাছে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ঠাকুরকে গ্রহণ করলেন শ্যামাচরণ—তাঁর জীবনের সবখানি হয়ে ওঠেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে রসায়নশাস্ত্রে এম. এস সি. পাশ করার পরে জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়েছিলেন গবেষণার জন্য, কিন্তু মা দুর্গাসুন্দরীর সম্মতি না থাকায় জার্মানি যাননি শ্যামাচরণ। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছে ওঁকে দিয়ে গবেষণা করানোর—অতঃপর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অধীনে

রিসার্চ শুরু করেন। আশ্রমের সঙ্গে বন্ধনও বাড়তে লাগল। ১৯২৭-এ তৎকালীন সৎসঙ্গ সেক্রেটারি সুশীলচন্দ্র বসু কার্যান্তরে বেশ কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যান— তখন সৎসঙ্গের সেক্রেটারি হন বাইশ বছরের যুবক শ্যামাচরণ।

ইত্যবসরে নবদ্বীপের অশ্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পঞ্চদশী রেণুর সঙ্গে শ্যামাচরণের পরিণয় সম্পন্ন হয়। পাত্রী নির্বাচনের জন্য জননী দুর্গাসুন্দরী বেশ কিছু সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী পাত্রীর ফটো সংগ্রহ করেছিলেন—রেণুর ফটোও ছিল তার মধ্যে। তবে রূপের বিচারে তিনি অন্যান্য কয়েকজনের তুলনায় ন্যূন ছিলেন। দুর্গাসুন্দরীর খুব সাধ ছিল রূপবান একমাত্র পুত্রের জন্য পরমা সুন্দরী বধূ আনবেন। কিন্তু ঠাকুরের সম্মতি ছিল যে-কোন কাজের প্রথম শর্ত। দুর্গাসুন্দরী সব ক'টি ফটো নিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে কাকে নির্বাচন করবেন। ঠাকুর রেণুর ফটোটি নির্বাচন করলেন। দুর্গাসুন্দরী বললেন—এ তো তেমন সুন্দরী নয়, এর চেয়ে আরও কত সুন্দরী রয়েছে . . .। ঠাকুর বললেন—না, না, ঐ ভাল, ঐ ভাল। ব্যাস, পাত্রী স্থির হয়ে গেল।

রেণু বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যান এবং বাড়িতে পিতার তত্ত্বাবধানে ম্যাট্রিক পর্যায়ের বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর আশ্রমে মেয়েদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং তাদের তিন বছরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা করেন। এই প্রকল্পে অপর আরও কয়েকজনের সঙ্গে রেণুও ছিলেন প্রথম ব্যাচের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনীদের একজন। এরপরে তিনি ঠাকুরেরই ইচ্ছানুযায়ী আই. এস সি. এবং বি. এস সি. পাশ করেন এবং বৈজ্ঞানিক স্বামীর গবেষণাকর্মে সহায়তা করে সর্বার্থে প্রকৃত সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন।

তখন হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে বিভিন্ন ওষুধের জন্য উপযোগী গাছগাছালির বাগান ছিল—সেখান থেকে যে-সময়ে যে-গাছের গুণ সর্বাধিক পাওয়া সম্ভব সে-সময়ে সে গাছ তোলা হত ওষুধ তৈরির জন্য। এই উদ্দেশ্যে গাছ বা লতার নির্যাস নিষ্কাশিত করা হত অ্যাকটিভ অ্যালকোহলের দ্বারা। ঠাকুর শ্যামাচরণকে এই অ্যালক্যালয়েড এক্সট্রাকশন পদ্ধতিটির সরলীকরণ করার কথা বলেছিলেন। রসায়নের ছাত্র হিসাবে বিভিন্ন ভেষজ রাসায়নের গুণাগুণ বিচার এবং তাদের আরোগ্য ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা গবেষণা করেন তিনি ঠাকুরের নির্দেশে হিমাইতপুর আশ্রমের সীমিত পরিসরের ল্যাবোরেটরিতে।

আশ্রমের কর্মকাণ্ড বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের সংখ্যাও বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল বাড়িঘর। সব মিলিয়ে এক বৃহদায়তন ক্রিয়াযজ্ঞ, যার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এসময় জানা গেল গ্রামে গ্রামে ডীপ টিউবওয়েল বসানোর জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট টেণ্ডার আহ্বান করেছে। আশ্রমিক রাধারমণ জোয়ারদার ছিলেন এ

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ—তিনি বললেন, কোটেশন দেওয়া হোক। ডীপ টিউবওয়েল বসাতে গেলে দেড়শ ফুট থেকে তিনশ ফুট পর্যন্ত খনন করতে হত। সবাই তিনশ ফুটের হিসাবেই কোটেশন দিত। রাধারমণ বললেন, আমরা দেড়শ ফুটের কোটেশন দেব। সেই হিসাবে টিউবওয়েলের দাম পড়ে গেল অবিশ্বাস্য কম। নিম্নমূল্যের কোটেশন দেওয়াতে সৎসঙ্গই টেণ্ডার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হল। কিন্তু অত কম খরচে কীভাবে হবে—এ বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ সন্দিহান ছিলেন। শ্যামাচরণ ছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগকারী। তিনি এই সন্দেহের কথা জানিয়ে রাধারমণকে কিঞ্চিৎ সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিই এত কম খরচে হবে তো? রাধারমণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়ই হবে। আপনি সরকারকে জোর দিয়ে বলুন—নিশ্চয়ই হবে। শ্যামাচরণ সেভাবে জানানোর পরে কর্তৃপক্ষ একটি শর্তসাপেক্ষে সৎসঙ্গকে টেণ্ডারটি দিতে রাজি হলেন। শর্তটি হল—ঐ খরচের হিসাবে পাঁচটি গ্রামে নমুনা নলকূপ বসিয়ে দেখাতে হবে। যদি ঐ পাঁচটি নমুনা যথাযথভাবে জল তুলতে পারে তাহলে ঐ পাঁচটির দাম সহ পুরো টেণ্ডার সৎসঙ্গকে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটি সার্থক না হয় তাহলে ঐ পাঁচটির দামের লোকসান সৎসঙ্গকেই বহন করতে হবে। সেই শর্ত অনুযায়ী পাঁচটি গ্রামে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ঐ খরচে নমুনা নলকূপ বসানোর পরে টেণ্ডার সৎসঙ্গের করায়ত্ত হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নলকূপ বসানোর কাজ তৎপরতার সঙ্গে সমাপ্ত করার ফলে সৎসঙ্গের তহবিলে কিছু টাকা এল। কিন্তু টাকার প্রয়োজন বেড়েই চলল। বেশ কিছু স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরির একটি সরকারি পরিকল্পনাও জানা গেল। পূর্বোক্ত কর্মসমাপনের সুনামের সুবাদে এবারে টেণ্ডার সহজেই পাওয়া গেল এবং এবারেও কম খরচে কম সময়ে উন্নত মানের কর্মদক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেলেন সৎসঙ্গের কর্মীবৃন্দ। এ সমস্ত কাজ যে এত সুষ্ঠুভাবে নৈপুণ্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন হত তার কারণ এসব কাজে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আসা উন্নত গুণমানসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এঁরা ছিলেন আশ্চর্যরকমের আত্মস্বার্থবোধশূন্য; তাঁদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অসীম ভালবাসাই ছিল তাঁদের সর্ববিধ কর্মপ্রণোদনার চালিকা শক্তি।

সমসময়েই পদ্মানদীর উপর দিয়ে সারা ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইংরেজ সরকার। এই প্রকল্প রূপায়ণে বহু তরতাজা প্রাণ বলি হয় অশান্ত পদ্মার খরস্রোতে। কিন্তু সারা ব্রিজ তৈরি হলে ইংরেজের ব্যবসার পথ আরও সুগম হবে—সুতরাং যে-কোন মূল্যে এই ব্রিজ সমাপ্ত করতে ইংরেজের বণিক বুদ্ধি কৃতসংকল্প ছিল। সারা ব্রিজের উপর দিয়ে রেললাইন পাতা হবে লাইন—যাবে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত—সেই লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের তক্তা বা স্লিপারের জন্য টেণ্ডারের আহ্বান করা হল। এই টেণ্ডারের ব্যবস্থাপক ছিলেন রেলের ইঞ্জিনীয়ার অমলেশ চট্টোপাধ্যায়—তিনি শ্যামাচরণের শ্যালক। শ্যামাচরণ তাঁকে গিয়ে ধরলেন—এই টেণ্ডার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: শান্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সৎসঙ্গের চাই। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রয়োজন বিপুল আর্থিক সঙ্গতি, তা তো সৎসঙ্গের নেই; কীভাবে এত বড় দায়িত্ব তাদের দেওয়া সম্ভব? কিন্তু সৎসঙ্গীবৃন্দের অভিধানে সেসময় অসম্ভব শব্দটি ছিল না। সৎসঙ্গের কর্মকুশলতার সুনামের জোরে এবং শ্যামাচরণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আংশিক টেণ্ডার পাওয়া গেল। দায়িত্ব পাওয়া তো গেল—সময়ের তুলনায় কাজের আকার এবং দায়িত্ব এবারে অনেক বেশি, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যসিদ্ধির পন্থা রূপায়িত করতে হবে। অবিলম্বে শ্যামাচরণ সমস্ত কাজটির পরিকল্পনা করে ফেললেন। একজনকে পাঠানো হল তরাই অঞ্চলে, সেখান থেকে বড় বড় গাছ কেটে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি করে বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হল নদীতে—গঙ্গা, পদ্মা হয়ে তা পৌঁছল হিমাইতপুর। পদ্মার ঘাট থেকে ঐ বড় বড় গাছের গুঁড়ি আশ্রম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল গড়িয়ে গড়িয়ে। ব্যাপারটি যত সহজশ্রাব্য, আদৌ তেমন সহজসাধ্য নয়, এ কথা বলা বাহুল্য। কাঠ তো পৌঁছল, কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যে কাঠ চিড়ে অত তক্তা বানানো হস্তচালিত করাতের সাহায্যে সম্ভব নয়, শক্তিচালিত দ্রুতগতি করাতের ব্যবস্থা করা না গেলে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু শক্তি পাওয়া যাবে কোথা থেকে? সৎসঙ্গে তখনও ইলেকট্রিক ডায়নামো আসেনি। শ্যামাচরণ আবার গেলেন শ্যালক অমলেশের কাছে,—তোমাদের পরিত্যক্ত ইঞ্জিন একটা দাও। কয়েকটা রেললাইনও দিতে হবে। টাকা দিতে পারব না, কাজ শেষ হলে আমাদের পাওনা টাকা থেকে শোধ হবে।

তাঁর কথায় ইঞ্জিনীয়ার অমলেশ চ্যাটার্জি একটি বাতিল হয়ে যাওয়া ইঞ্জিন এবং কিছু রেল লাইন ওয়াগনে করে পাঠিয়ে দিলেন ঈশ্বরদি স্টেশনে। ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে পাবনা শহর, শহর থেকে হিমাইতপুর আশ্রম—প্রায় একুশ মাইল দূরত্ব। রেলপথ ছাড়া ঐ বিপুল ওজনের ইঞ্জিন কীভাবে এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করবে? আবার স্মরণ করা যায়—সৎসঙ্গীদের তখনকার অভিধান থেকে অসম্ভব শব্দটি মুছে গিয়েছিল। যে রেললাইন গুলি চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে এক জোড়া দু পাশে পাতা হল, বহু কসরৎ করে ঐ লাইনের উপর ইঞ্জিনটি ঠেলে তোলা হল, তারপর সবাই মিলে ঐ লাইনের উপর দিয়ে ইঞ্জিনকে ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুটা এগোনোর পর আবার সামনে আরেক জোড়া রেল পেতে ইঞ্জিনকে তার উপর দিয়ে গড়ানো হতে লাগল, ততক্ষণে পিছনের দিকের রেলগুলি খুলে আবার সামনে পাতার ব্যবস্থা হল। এভাবে রিলে পদ্ধতিতে ঠেলতে ঠেলতে ঐ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইঞ্জিন নিয়ে পৌঁছনো হল আশ্রমে। পাবনা শহরের চওড়া পিচের রাস্তার উপর দিয়ে রেললাইন পেতে তার উপর দিয়ে একটি ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন একদল ভদ্রলোক, যাঁদের মধ্যে বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার, মস্ত ডিগ্রিধারী পণ্ডিত, ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রত্যাখ্যান করা মানুষ, এমনকী স্বয়ং ঠাকুরও আছেন—এমন অভাবনীয় দৃশ্য বা ঘটনা আজকের প্রযুক্তি-সর্বস্ব একান্ত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আত্মস্বার্থী পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কল্পনায় আনাও কষ্টসাধ্য। বস্তুত, একটি মানুষের ভালবাসা যে অতগুলি মানুষকে কীভাবে সব-ছাপানো, সব-ভোলানো প্রেমের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাঁদের সফল সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে তুচ্ছতায় পর্যবসিত করে নিতান্ত কৃচ্ছ্রতা-সংকুল আশ্রমিক জীবনে অবিশ্বাস্য সব কর্মকাণ্ডে তাঁদের মাতিয়ে তুলতে পারে—আজকের সংকীর্ণ দুনিয়াদারির প্রেক্ষাপটে তা যেন অবিশ্বাস্যই মনে হয়!

যাহোক, ইঞ্জিন তো পৌঁছল। ইঞ্জিনের বয়লারে জ্বালানি হিসাবে দেওয়া হল অনেক পরিমাণে কাঠ—কয়লা ছিল দুষ্প্রাপ্য। সেই বয়লার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সেই শক্তিচালিত চক্রাকার করাতের সাহায্যে কাঠ কেটে তক্তা বানিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ নিষ্পন্ন হল। তীক্ষ্ণধী শ্যামাচরণের সুব্যবস্থিত পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ক্রিয়াযজ্ঞটি সম্পাদিত হয়।

সুনিপুণ কর্মকুশলতা ও সহজাত নেতৃত্বই শুধু নয়, শ্যামাচরণের অসাধারণ হৃদয়বত্তাও ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। একবার কলকাতা থেকে হিমাইতপুর ফিরছেন, বর্ষাকাল; পাবনা থেকে চার মাইল কর্দমাক্ত পথ ভেঙে যেতে হবে। তাঁর পরিধানে ছিল প্যান্ট-শার্ট, জুতোমোজা। একটি সিমেন্টের বেদিতে বসে জুতো মোজা খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে তৈরি হচ্ছেন হাঁটার জন্য—অঝোরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। হঠাৎ লক্ষ করেন একজন রমণী তাঁর সামনে এসে হাত মেলে দাঁড়াল—তিনি পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা হাতে উঠল দিয়ে দিলেন তার হাতে। কিন্তু সেই রমণী দাঁড়িয়েই রইল— হাতখানি মুঠি করতেও যেন খেয়াল নেই তার। শ্যামাচরণ তার দিকে তাকিয়ে দেখেন মধ্যবয়স্কা এক প্রৌঢ়া, অদ্ভুত এক শূন্য চোখের দৃষ্টি, যেন স্থান-কালেরও বোধ নেই তার, বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে তার সারা শরীর। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—কী মা, আপনার কী হয়েছে? প্রৌঢ়া যন্ত্রচালিতের মত বলে—আমার একমাত্র ছেলে গত সপ্তাহে মারা গেছে—আমার আর কেউ নেই!

শ্যামাচরণ তার বাহুটি ধরে কোমল স্বরে বলে—এই বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে যাচ্ছেন, চলুন মা, আমি আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।—উত্তরে সেই মা জানায় যে তার বাড়িঘরও কিছু নেই, খাজনা না দিতে পারায় জমিদার বাড়ি নিয়ে নিয়েছে। উদ্বিগ্ন শ্যামাচরণ তখন তাকে তাঁর সঙ্গে আশ্রমে যেতে বলেন। সে বলে—সে কোন্ কাজে লাগবে যে আশ্রমে তার স্থান হবে! শ্যামাচরণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—আমাদের ঠাকুরের আশ্রমে সবার জন্য কাজ আছে, সকলের আশ্রয় আছে।

এই কথা বলে সেই মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথ পাড়ি দিয়ে জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নিয়ে গিয়ে বলেন—ঠাকুর, এই মা-টির ছেলে মারা গেছে গত সপ্তাহে—

এ-কথা শুনেই সেই রমণী এতক্ষণ পরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ঠাকুর মধুর গভীর

স্বরে বলেন—মারে, এই তো আমি তোর ছেলে, তোকে যে আমার ভীষণ দরকার! যা, এখন ভেতরে গিয়ে নেয়েধুয়ে আয়।

শ্যামাচরণ লক্ষ করেন—ঐ একটি কথায় সে পুত্রশোকাতুরা বিভ্রান্ত রমণীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল—আশ্বস্ততার ও নির্ভরতার ছবি ফুটে উঠলো সেখানে। তদবধি সে ঠাকুরের আশ্রয়েই ছিল।

১৯৩৫-এ একবার বাংলার তৎকালীন গভর্নর জন অ্যাণ্ডারসন পাবনায় আসেন কোন কার্যোপলক্ষে; সেসময় তিনি পদ্মাবক্ষে বজরায় কিছুদিন বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন। সৎসঙ্গের সেক্রেটারি শ্যামাচরণ স্থির করলেন—অ্যাণ্ডারসনকে একবার সৎসঙ্গ আশ্রম দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। সুন্দর ধুতি পাঞ্জাবীতে সজ্জিত হয়ে, তাঁর একটি সোনা বাঁধানো ছড়ি ছিল, সেইটি হাতে নিয়ে একখানি নৌকায় করে গভর্নর-এর বজরার কাছে গেলেন। সামনে গভর্নরের রক্ষী নৌকা ছিল—তারা তাঁর নৌকা আটকাল। তিনি বললেন, তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে চান। রক্ষীরা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না—কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে তারা তাঁকে অ্যাণ্ডারসনের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে দেন। সেক্রেটারির হাতে শ্যামাচরণ নিজের ভিজিটিং কার্ড দেন। ঐরকম গ্রাম্য পরিবেশে একজন সুসজ্জিত মানুষকে দেখে এবং তাঁর কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড পেয়ে সেক্রেটারি অবাক হয়ে যান। পরে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের পর তাঁর পরিমার্জিত ইংরেজি শুনে সেক্রেটারির বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পায় এবং গভর্নর অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। অ্যাণ্ডারসন শ্যামাচরণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা এবং বিশেষত রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত এবং প্রীত হন। শ্যামাচরণ তখন তাঁকে একবার সৎসঙ্গ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। অ্যাণ্ডারসন জানান যে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী নির্দিষ্ট থাকায় সেবারে তিনি যেতে পারবেন না, তবে তিন/চার মাস পরে আর একবার তাঁর ঐ অঞ্চলে আসার কথা, সেসময় তিনি অবশ্যই সৎসঙ্গ দর্শনে যাবেন। তিনি কথা রেখেছিলেন—নির্দিষ্ট সময়ে সৎসঙ্গ আশ্রম দেখতে এসেছিলেন। সময়টি ছিল বর্ষাকাল, কাঁচা মাটির রাস্তা সেসময়ে এমন কর্দমাক্ত হয়ে থাকে যে তাতে গাড়ি চলাচল করা মুস্কিল। গভর্নর আশ্রমে যাবেন বলে তাঁর যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাবনা শহর থেকে হিমাইতপুর আশ্রম পর্যন্ত কাঁচা মাটির রাস্তা সরকারি উদ্যোগে পিচ ঢেলে পাকা করে দেওয়া হল। যথাসময়ে অ্যাণ্ডারসন আসেন এবং আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর মুগ্ধতা ও প্রসন্নতা ফুটে ওঠে তাঁর মন্তব্যে — ". . . . The Satsang is doing excellent work in Education, Art, Social Service and Religion.

. . . . .I am sure the Asram is a force with great potentialities

for the moral and physical betterment of Bengal and I wish it every success in surmounting the difficulties which face it. As far as it may lie in my power to do so I shall be glad to assist in this connection."

আশ্রমের কলাকেন্দ্রের চিত্রশিল্পী অ্যাণ্ডারসনের একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। পরে শ্যামাচরণ তাঁর মাসতুত ভাই হরেরাম চক্রবর্তী এবং আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই তৈলচিত্রটি কলকাতার রাজভবনে পৌঁছতে যান। রাজভবনে যে-ঘরে গভর্নরের দর্শনার্থী বিভিন্ন বিশিষ্ট এবং সমাজের উচ্চবর্গের ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে প্রথমে তৈলচিত্রটি নিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেন। শ্যামাচরণ ভিজিটিং কার্ড পাঠানোর পরে অন্যান্য দর্শনার্থীদের বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সামনে আগে শ্যামাচরণকে ডেকে পাঠান অ্যাণ্ডারসন। তৈলচিত্রটি ভিতরে পৌঁছে দিয়েই হরেরাম ও অপরজন বাইরে চলে আসেন; শ্যামাচরণ থেকে যান অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল দশ মিনিট, কিন্তু কথাবার্তার পরে তিনি যখন বেরোলেন তখন আধ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে সুসংহত চলনের মধ্য দিয়ে শ্যামাচরণের সহজাত সুন্দর ব্যক্তিত্ব এমন এক অনন্য মাত্রা অর্জন করেছিল যে, যে-কোন শ্রেণীর মানুষই তাঁর সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হতেন, তাঁর সান্নিধ্য ছিল সকলের পক্ষেই কাম্য।

প্রায় শূন্য থেকে যেভাবে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম সমাজের সর্বস্তরের অতগুলি মানুষকে নিয়ে অকল্পনীয় কর্মকাণ্ড সাধন করে বেড়ে উঠতে লাগল, তা অনেকের পক্ষেই ঈর্ষণীয় ছিল। বিশেষত মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো এবং অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলার যে প্রগতিশীল পদক্ষেপ শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন, সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তা প্রায়শই নিন্দিত হত। তাই ঠাকুরের প্রতি এবং আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। আশ্রমের মিথ্যা অপযশ ছড়ানোর জন্য এদের যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আশ্রমের মধ্যে নানাধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সাধিত হয়, মেয়েদের নিয়েও যথেচ্ছাচার চলে—এ ধরনের নিন্দাবাদ পল্লবিত হতে হতে সরকারি পর্যায়ের উচ্চস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়। পাবনা তখন প্রশাসনিক ভাবে রাজশাহী ডিভিশনের অন্তর্গত ছিল। রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আই. সি. এস. অফিসার এফ. ডব্লু. রবার্টসন। তিনি ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে একদিন হঠাৎ করে কোন পূর্ব অবগতি ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে এলেন পরিদর্শনে। উদ্দেশ্য—আশ্রম বিষয়ক অপবাদগুলি হাতেনাতে যাচাই করা। এসে দেখেন, কুঁড়েঘরে টিমটিমে আলোয় বসে একান্ত ঘরোয়া অল্পবয়সী ক'জন গৃহবধূ ক্যালকুলাস করছেন। কোথাও

মেয়েদের সেলাইয়ের ক্লাস হচ্ছে, কোথাও বা পঞ্চাশ ষাট বছরের মহিলারা পড়াশুনো করছেন। তপোবন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলেন ছেলেরা এখানে ওখানে মাটি কোপাচ্ছে, কোথাও ক্লাস হচ্ছে। সেক্রেটারি শ্যামাচরণ সঙ্গে করে তাঁকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। রবার্টসন বিস্ময় বিমুগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কী স্বপ্নপুরী নাকি? কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এ নিয়ে গিয়ে রসায়নে সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ কোন গাছ থেকে কোন ওষুধ কীভাবে হয় বোঝালেন। দৃশ্যতই বিমূঢ় রবার্টসন বলেন—এসব কী দেখছি! আপনাদের ঠাকুর এখানে শুধু ফিলজফির চর্চা করান না? তপোবন ঘুরে বলেন—এখানে পড়াশুনার ধারার সঙ্গে আমাদের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ ধারার মিল আছে। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে তখন বিরাট ডায়নামো ছিল। একদিকে লেদের কাজ হচ্ছে, আর একদিকে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। রবার্টসন যত দেখেন তত অবাক হন। সপ্রশংস গভীর বিস্ময়ে বলেন—এই অজ পাড়াগাঁয়ে আপনাদের ঠাকুর এত কিছু করান? শ্যামাচরণ সপ্রত্যয় বিনয়ে উত্তর দেন—আজ্ঞে হ্যাঁ; আমাদের ঠাকুর বলেন —ইংরেজ তাড়িয়ে তো স্বাধীনতা হয় না, এই হল প্রকৃত স্বাধীনতা।

রবার্টসনকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একটি পরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরে বসেছিলেন ঠাকুর। রবার্টসনকে একটি চেয়ারে বসতে বলা হল। যে দুর্ধর্ষ কমিশনারের সামনে বড় বড় ইংরেজ অফিসাররাও কাঁপত, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে তাঁর মধ্যে এমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হল যে তিনি চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসে পড়তে চাইলেন। অনেক অনুরোধে তাঁকে চেয়ারে বসানো হল। রবার্টসন ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন, দোভাষীর কাজ করেন শ্যামাচরণ—ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন— মনে হচ্ছে যেন একটা নীল আলো দেখতে পাচ্ছি। পরে শ্যামাচরণকে বলেন—ইয়ং ম্যান, তোমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া রইল, সৎসঙ্গের জন্য যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে যাবে। তিনি প্রকৃতই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রবার্টসন মন্তব্য করেন, "The Asram will prove a real force in the province for combating unemployment and improving the condition of the people both materially and morally. I shall be glad to give the Asram all the help in my power."

পরবর্তীকালে রবার্টসন রাইটার্সে চীফ সেক্রেটারি হয়ে যান। ঠাকুর বাংলা ভাগ রোখার জন্য বহু আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান অনুপাত যাতে সমান সমান হয় সে উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে হিন্দু এনে বসানোর কথা বলেছিলেন। এজন্য তিনি অন্তত দুই আড়াই হাজার বিঘা জমির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বাংলায় তখন ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। লীগ মন্ত্রিসভার সৎসঙ্গকে জমি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল;তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবার্টসন সৎসঙ্গকে প্রচুর পরিমাণে জমি দিয়েছিলেন। বাইরে থেকে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবারকে সেসব জায়গায় বসানো হল। কিন্তু এত বড় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে সংঘবদ্ধ বৃহৎ উদ্যোগের

প্রয়োজন, ঠাকুরের অথবা সৎসঙ্গের একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর জনসংঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই পরিকল্পনার কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যথাযথ গুরুত্ব দিলেন না বিষয়টিতে, দিলে ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হতো হয়তো।

একবার হিমাইতপুর আশ্রমে জ্যোতিষ চর্চার বিশেষ ঝোঁক হয়। শ্যামাচরণ নিজেও এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ভাল ঠিকুজি কোষ্ঠীও প্রস্তুত করতে পারতেন। নিজের কোষ্ঠীও তিনি করেছিলেন এবং যে-বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে, বিস্ময়করভাবে সে-বয়স পর্যন্তই কোষ্ঠীফল গণনা করেন, তারপর আর কোন গণনা তাতে করেননি। যাহোক, ঠাকুরের ভৃগুকোষ্ঠীও সংগৃহীত হয়েছিল ভক্তবর সুশীলচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায়। সেই কোষ্ঠী বিচার করে কোন জ্যোতিষী বলেন, ঠাকুরের সময় খারাপ, হীরে ধারণ করলে হয়তো বা কিছুটা প্রতিকার হতে পারে। তখন দু'বেলা সকলের পর্যাপ্ত আহারেরই সংস্থান ছিল না, হীরের আংটি স্বভাবতই বিবেচনা-বহির্ভূত। শ্যামাচরণ কর্মোপলক্ষে প্রায়ই হিমাইতপুর থেকে কলকাতা যেতেন। একবার কলকাতা গিয়ে কিছুদিন বাদে যখন ফিরলেন, ঠাকুরের জন্য একটি হীরের আংটি এনে তাঁকে ধারণ করতে বললেন। আংটি কীভাবে যোগাড় হল—সে বিষয়ে প্রশ্ন করেও বিশেষ সদুত্তর পাওয়া গেল না তাঁর কাছে।

এর কিছুদিন পরে শ্যামাচরণের জননী দুর্গা দেবী জ্যেষ্ঠ পুত্র পান্নালালের (নগেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান) কাছে বাগবাজারের বাড়ির দলিলটি চান। নগেন্দ্রনাথেরা মোট বারো ভাই ছিলেন—তাই একেক জনের ভাগে বাড়ির কিছু কিছু অংশ ছিল। নগেন্দ্রনাথের অংশটির দলিল জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছেই থাকত। দুর্গাসুন্দরী দলিল চাইলে তিনি বলেন—মা, দলিল তো আমার কাছে নেই, গোপাল (শ্যামাচরণের ডাক নাম) নিয়ে গেছে। দুর্গাসুন্দরী অবাক হয়ে বলেন—সেকী! ও দলিল নিয়ে কী করবে? পান্নালাল বলেন—তা তো জানি না! এরপর দুর্গাদেবী শ্যামাচরণের কাছে দলিল চাইলে তিনি বলেন—দলিল তো আমার কাছে নেই, এখন দিতে পারব না। মা জিজ্ঞাসা করেন—কী হয়েছে দলিলের, কোথায় তা? শ্যামাচরণ নিরুত্তর থাকেন। বহুবার প্রশ্ন করেও উত্তর না পেয়ে মা শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কাছে গিয়ে নালিশের সুরে বলেন—গোপালী, তোমার আশকারা পেয়েই ছেলেগুলো এমন হয়েছে; দলিল কোথায়, কিছুতেই বলছে না গোপাল। ঠাকুর তখন শ্যামাচরণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—গোপাল, দলিল নিয়ে কী করেছিস? অগত্যা শ্যামাচরণ উত্তর দেন—ওটা বন্ধক দিয়ে আপনার জন্য হীরের আংটি গড়িয়েছি। শুনে ঠাকুর তো স্তম্ভিত! বলে কী পাগলটা! বাড়ি বাঁধা দিয়ে হীরের আংটি! শ্যামাচরণ বলেন—তা কী করব—আপনার সময় খারাপ, হীরের আংটিতে যদি উপকার হয় . . .। ঠাকুর তো একেবারে সোরগোল ফেলে দিলেন—ওরে, গোপালের বাড়ি বাঁচা

তোরা সবাই মিলে—। তখন সবাই মিলে চাঁদা তুলে চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে টাকা দিয়ে বাড়ির দলিল ছাড়ানো হল।

এরপর দুর্গাসুন্দরী তাঁর নিজের এবং পুত্রবধূ রেণুর প্রায় সমস্ত গহনা বিক্রি করে উত্তর কলকাতার ডাফ লেন-এ একটি বাড়ি কেনেন; কিন্তু এ বাড়ি যে তাঁদের, একথা শ্যামাচরণকে জানাননি। তাঁকে বলা হয়েছিল বাড়িটি তাঁর ভগ্নী (মাসি শিখরবাসিনীর কন্যা) ঈশ্বরীর বাড়ি এবং তা জেনে শ্যামাচরণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই ভুল ধারণা আমৃত্যু ছিল। কী তীব্র ইষ্টানুরাগ এবং কত মহৎ অন্তঃকরণ ছিল তাঁর, এ ঘটনা তার অন্যতম উদাহরণ। ডাফ লেনের সেই বাড়িতেই কিছুকাল আগে পর্যন্তও শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপণ্ডিত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ অরুণাদিত্য মুখোপাধ্যায় বাস করতেন।

ঠাকুরের আশ্রয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নানাধরনের মানুষ ছিলেন এবং সকলের অভিপ্রায় বা দৃষ্টিভঙ্গী সবসময় স্বচ্ছ ছিল না। এর ফলে ঠাকুরকে এবং তাঁর একান্ত কাছের যাঁরা তাঁদের বহু বেদনাময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়েছিল। এমনই একটি ঘটনা এখানে বিবৃত হচ্ছে। সৎসঙ্গের কোন একটি তহবিলে একবার বারো হাজার টাকা জমা পড়ার কথা। শ্যামাচরণ সেই অর্থ অপর একজনের মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য পাঠান। কিন্তু যে-কোন অজ্ঞাত কারণে সে টাকা যথাস্থানে জমা পড়েনি। সৎসঙ্গের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা পূজনীয় ক্ষেপুদা বিষয়টি ঠাকুরের গোচরে আনেন এবং সর্বসমক্ষে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যাতে শ্যামাচরণই যেন এ ব্যাপারে দায়ী, এমনটি প্রতিপন্ন হল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিকটজনের দোষের শাস্তি দিতেন নিজেকে আঘাত করে; এক্ষেত্রেও তিনি নিজের পাদুকা দিয়ে নিজেকে আঘাত করলেন সর্বসমক্ষে। বেদনায়, বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল নিরপরাধ শ্যামাচরণের অন্তরাত্মা, নীরবে নিজ গৃহে ফিরে এলেন তিনি। তারপরই তাঁর জ্বর হল, সঙ্গে কাশি এবং অপরিসীম শারীরিক দুর্বলতা। হিমাইতপুরে চিকিৎসায় বিশেষ ফল না হওয়ায় সপরিবারে কলকাতা গেলেন শ্যামাচরণ। স্ত্রীর পিত্রালয়ে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাগবাজারের বাড়িতে রইলেন। বিখ্যাত বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ নেতাজি সুভাষ-অগ্রজ ডাঃ সুনীল বসু তাঁকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর যক্ষা হয়েছে। এ কথা জেনে নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্পূর্ণ পৃথক করে নিলেন, ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দিলেন না এবং স্ত্রীকে খবর পাঠালেন পুত্রসহ পিতৃগৃহেই থাকতে। ঠাকুরকে সমস্ত সংবাদ জানানো হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সবাইকে নিয়ে শ্যামাচরণকে হিমাইতপুর ফিরে আসতে বলেন। শ্যামাচরণ তাই করলেন। আশ্রমিক হোমিও চিকিৎসক অমরলাল বসু (যিনি টালার কর্তা নামেই পরিচিত ছিলেন)-কে ডেকে ঠাকুর ইগনেশিয়া নামক ওষুধটির গুণাগুণ ভালভাবে দেখতে বললেন। তিনি দেখে জানালেন যে গভীর মানসিক আঘাতজনিত কারণে শারীরিক পীড়ায় এ ওষুধ বিশেষ কার্যকর। ঠাকুর তখন শ্যামাচরণকে ইগনেশিয়া

দিতে বললেন এবং ঐ ওষুধেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্যামাচরণ যে নির্দোষ এ কথা ঠাকুর খুব নিশ্চিতরূপেই জানতেন, কিন্তু যাঁরা তাঁকে অপরাধী সাজিয়ে নিজেদের আড়াল করতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের আঘাত করার জন্যই নিজেকে আঘাত করেছিলেন। পরে শ্যামাচরণ এ সত্য অনুভব করেন।

শ্যামাচরণের গভীর ধীশক্তি এবং প্রগাঢ় মননশীলতা তাঁর রচিত "Nature's Dharma" নামক একটি ইংরেজি পুস্তিকার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট হয়েছে। নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে ইষ্টাদেশ পালনের সামান্য ব্যত্যয়ে ভয়ঙ্কর জীবনাবসান না ঘটলে তাঁর কাছ থেকে মানবজাতির আরও বহু প্রাপ্তি হতে পারত। তিনি ইংরেজিতে পুস্তিকাটি লিখলেও এটির বঙ্গানুবাদ যে অত্যন্ত প্রয়োজন, তা অনুভব করে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর সুযোগ্য ভক্ত প্রফুল্লকুমার দাসকে বলেছিলেন ঐ বাংলা অনুবাদের কাজটি করতে। প্রফুল্লকুমার দাস যথাযথভাবে সে অনুবাদকর্ম সমাধা করেন। তা "প্রাকৃত ধর্ম্ম" নামে প্রকাশিত হয় শ্যামাচরণের প্রয়াণের পরে। "প্রাকৃত ধর্ম্ম" থেকে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে শ্যামাচরণের স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং আদর্শপ্রাণতার দৃষ্টান্তরূপে।

মানবজাতির যথার্থ মঙ্গলের স্বরূপ এবং তা সাধনের উপায়ই তাঁর রচনাটির উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে জীবনের মৌলিক শক্তি অনুরাগ বা সুরতের প্রকৃতি নিরূপণ করে তার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশের মাধ্যমে জগতের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের পন্থা নির্দেশ করেন তিনি নিম্নরূপে —

"আমরা এখন অনুরাগের মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ এর উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব—কারণ জীবনের যথার্থ উন্নতির সারকথা ও মর্মবাণী এতেই নিহিত। গোড়ার কথা হচ্ছে, একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার সুরত অর্থাৎ আসক্তিধারা তার আকর্ষণের একমাত্র বস্তু মায়েতেই যুক্ত থাকে। তারপর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাবা এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যা'দিগকে তার মা শ্রদ্ধা করেন, ইত্যাদিকে ভালবাসতে সুরু করে। মাতার প্রভাব এম্‌নি করে অজ্ঞাতসারে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মানুষের সহজ সুরত মাতা হতে উদ্ভূত হয়ে এক পরিপূরক হতে আর এক পরিপূরকের দিকে অগ্রসর হয়ে চলে, এবং শেষটা যে মহাপুরুষ তার সমগ্র সত্তাকে অনুরঞ্জিত করতে পারেন, তাঁতেই নিবদ্ধ হয়। আসক্তির পাত্র যত নিখুঁত হবেন—আমাদের পূর্ণতাও হবে তত গভীরতর; চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত পরমপরিপূরণী শক্তিসম্পন্ন যুগপ্রবর্তকের প্রতি যদি কেউ ভক্তি ন্যস্ত করতে পারে, তার পক্ষে তখন শ্রেষ্ঠ সাফল্য ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে—কারণ তিনিই পরমপিতার প্রিয় সন্তান, মানুষের মুক্তির একমাত্র রাজপথ। . . . .

. . . বর্তমান যুগে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের চরিত্র এত কুটিল ও জটিল হয়ে উঠেছে, ব্যক্তির সুখশান্তির ধারণা এত বিকৃত হয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের

মারণাস্ত্র সকল এত দ্রুতগতিতে উদ্ভাবিত হচ্ছে, পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদসমূহ দেশে এমন প্রাধান্য লাভ করছে যে এমনতর পারিপার্শ্বিকতায় জীবনধারণ যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। . . . . এখন প্রয়োজন-পীড়িত জনসমক্ষে জানাবার দিন এসেছে যে সহস্র সহস্র ক্লিষ্ট মানবের আকুল প্রার্থনার ফলে এমন এক ব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছেন, যিনি ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নিজে যে আদর্শ প্রচার করেন, বাস্তবজীবনে তা কাঁটায় কাঁটায় পালন করেন এবং তিনিই সৎসঙ্গ আন্দোলনের প্রাণপ্রদীপস্বরূপ! . . . হিন্দু তাঁকে স্বীয় আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ হিসাবে গ্রহণ করে, তাঁকে দেখে মহম্মদকে গভীরভাবে অনুভব করা যায় বলে মুসলমানরা তাঁর ভক্ত হয়, যীশুখ্রীষ্টের প্রকট প্রকাশজ্ঞানে খ্রীষ্টানরা তাঁকে অনুসরণ করে। . . . তাঁর মতে তথাকথিত ধর্মান্তরগ্রহণ মহাপাপবিশেষ, কারণ এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ নিহিত। ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের সাহায্যে উদ্বুদ্ধকরতঃ প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক তাকে জীবনবৃদ্ধির উন্নত পরিক্রমণায় পরিচালিত করাই তাঁর সহজ পদ্ধতি। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্যের প্রভাবে আজ সহস্র সহস্র লোক তাঁর আকর্ষণে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তঁৎপ্রবর্তিত সহজ সরল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতামূলক মত ও পথের অনুসরণে নিজেদের জীবনগঠনে ব্যাপৃত। শ্রীশ্রীঠাকুরই এই সৎসঙ্গ-আন্দোলনের প্রাণবস্তু এবং কেন্দ্রশক্তি! . . .

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ধর্ম কখনও বহু হতে পারে না। ধর্ম এক এবং সর্বপ্রকার ধর্মমতের মূলতত্ত্ব অভিন্ন। . . . ধর্মই জীবনের আদিম উপাদান—দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনকে কৃতকার্য করে তুলতে হলেও ধর্মই প্রধান প্রয়োজন—কারণ ধর্মই আমাদের জীবনকে সর্বভাবে ব্যাপ্তি, বিকাশ ও উপভোগে উদ্বেল করে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে গভীর ও ব্যাপকতম অনুভূতিসম্পন্ন কোন পুরুষের নিকট হতে দীক্ষা-গ্রহণ জীবনের অবশ্যকরণীয়—কারণ দীক্ষার ভিতর দিয়ে যুগপৎ শরীর ও মনের অনুশীলন-দ্বারা দক্ষতা অর্জনের বাস্তব কৌশল সঞ্চারিত হয়। দীক্ষার মূল কথা হল সত্যিকার শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও উপাসনা নিয়ে নিজেকে প্রিয়পরমে যুক্ত করা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত দীক্ষাপদ্ধতিতে জপধ্যানের প্রথা জানিয়ে দেওয়া হয়। নিয়মিত জপ মানুষের মস্তিষ্ক-কোষকে সাড়াপ্রবণ করে তোলে এবং যথাবিধি ধ্যান মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে; সুতরাং জপধ্যান একত্রে সমগ্র মস্তিষ্কের সংবেদনশীলতা এবং গ্রহণসামর্থ্য ফুটিয়ে তোলে।

. . . আমরা শুধু নিজেদের যুগের জন্যই দায়ী নই, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। . . . আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের গুণাবলী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—এবং আমাদেরও উচিত সন্তান-সন্ততিকে মহত্তর দীপ্তি দান করা। সুতরাং সুপ্রজননের দৃঢ় ভিত্তিতে এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করা প্রয়োজন যাতে পূর্বপুরুষের সাধনার ধন সর্বসমাধানী আর্যবিধান অনন্তকাল ধরে

বিবাহ, ধর্ম ও কৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিধিবদ্ধভাবে সঞ্চার ও সঞ্চালন করবার মত উপযুক্ত সুসন্তানের আবির্ভাব হতে পারে।

. . . আর্যসমাজ বিশিষ্ট চার বর্ণে বিভক্ত, যথা (১) বিপ্র, এঁরা ব্রাহ্মণের ঔরসজাত, ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় সম্ভাব্যতা এঁদের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় আছে; (২) ক্ষত্রিয়, মানুষকে রক্ষা করা এবং দুঃখ ও ক্ষত হতে ত্রাণ করা এঁদের কাজ; (৩) বৈশ্য, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে সমাজকে সেবা করা এঁদের কাজ; এবং (৪) শূদ্র, অর্থাৎ শুচীকৃত অনার্য। আদিমকাল হতে এই চার বর্ণ আর্যসমাজে বাস করছেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অনুশীলনের সাহায্যে যাতে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছতে পারেন, এটাই ছিল তাঁদের লক্ষ। সৎসঙ্গ আজ তাই বিশেষ করে এই কথা বলছে যে যুগ যুগ ধরে ঋষিদের সতর্ক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলে সমাজবিধানের যে নিখুঁত জীববিজ্ঞান-সম্মত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেদিকে লক্ষ না রাখলে কখনও সমাজে সত্যকার শ্রেষ্ঠ ও উন্নত সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, একটা বৃক্ষকে সতেজ সুস্থ ও ফলবান করতে গেলে যেমন নূতন সারের প্রয়োজন হয়, মানবসমাজের ক্ষেত্রেও তেমনই উন্নত সন্তান লাভ করতে গেলে পোষণীয় পরিস্রুত নূতন রক্ত ক্রমিকভাবে সঞ্চারিত করতে হয়। তাঁর প্রণিধানলব্ধ অভিমত যে উচ্চবর্ণের নারী যখন নিম্নবর্ণের পুরুষে উপগত হয়, তখন সন্তান অবশ্যই হীন হয়, কিন্তু নারী যখন শ্রদ্ধাভক্তিতে মুগ্ধ ও বুদ্ধ হয়ে উচ্চবর্ণোদ্ভূত গুণবান পুরুষকে বরণ করে, তখন তার যে সন্তান হয় সে স্বাস্থ্যে, বীর্যে, বিদ্যায় উল্লম্ফী হয়েই চলে। বংশপরম্পরায় সমাজকে দৃঢ় বর্ধিষ্ণু ও সক্রিয় রাখতে হলে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ অবশ্য প্রবর্তনীয়।

. . . জন নিয়েই জাতি—তাই জাতির উন্নতি করতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, চারিত্র্যে উন্নত করে তুলতে হবে—পরিপূরক নেতা বা প্রেরিত পুরুষের পতাকাতলে তাদের সমবেত করে প্রত্যেককে বাস্তবভাবে আদর্শানুবর্তিতায় উদ্দাম করে তুলতে হবে। তারপর এই আন্দোলন ব্যক্তিগত বিকাশকে সমাজে চিরন্তন করে এমন এক মহান জাতি সৃষ্টি করতে চায়, যা ধর্ম, কৃষ্টি ও উন্নতিপ্রবণতাসহ অনন্ত ভবিষ্যৎকাল ধরে স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবে। . . . সৎসঙ্গের এই সপারিপার্শ্বিক ব্যষ্টি-আন্দোলন আজ শুধু নীতিতেই নিবদ্ধ নয়, পরন্তু এর দৈবী নেতার অমানুষিক উৎসাহ ও প্রযত্নের ফলে আজ এই আন্দোলন বাস্তবতায় মূর্ত ও প্রতিফলিত। সামনে বাকি আছে শুধু ক্রমবর্ধমান বিস্তার, যার ফলে সঙ্ঘসেবকগণের চরম ও পরম মঙ্গল অবধারিত। সৎসঙ্গের সমষ্টি সম্বলিত ব্যষ্টি-আন্দোলনের প্রত্যেক উৎসাহী কর্মীর কাছে অস্তিত্ব অসাড়, আড়ষ্ট বা নীরস নয়, বরং তা উদ্দেশ্যমুখর, কর্মময়, প্রাণচঞ্চল। তার জীবন আজ আর নিষ্ফল, নিশ্চল, ক্লীবত্ব-দুষ্ট নয়—আজ তা বিস্তার, বিবর্তন ও উপভোগে প্লাবমান, বীর্যবান, আপনহারা, পাগলপারা—এই অমর অভিযান এমনতরই

সৃজনমুখী এবং দুর্জয় শক্তিশালী! তাই এ আন্দোলন ভীরু বা স্থবিরদের জন্য নয়—সাহসী এবং অভ্যুদয়লিপ্সু লোকেরাই এতে যোগদান করে জীবন সার্থক করে তুলবে।”

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মত সর্বার্থে ইষ্টসর্বস্ব মানুষেরও ইষ্টনির্দেশ পালনের সামান্য শিথিলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করে নিয়তির করাল বাহু, আকস্মিক বেদনার্ত আয়ুসমাপ্তি ঘটে এই মহৎ প্রাণের। “আলোচনা-প্রসঙ্গে” মহাগ্রন্থের সংকলক নমস্য প্রফুল্লকুমার দাস রচিত অসাধারণ স্মৃতি-কথা “স্মৃতি-তীর্থে” এবং “আলোচনা-প্রসঙ্গে” থেকে তাঁরই অননুকরণীয় বর্ণনায় সে অপরিসীম বেদনার ঘটনা বিবৃত হচ্ছে।

“১৯৪০ সালের বর্ষাকালে গোপালদা (আশ্রমের তৎকালীন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়) ও আশ্রমকর্মী দুর্গাচরণদা (সরকার) বিশেষ প্রয়োজনে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীতে যান শ্রীযুত প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাদ্দিগকে পই পই করে বলে দেন তেসরা আগষ্টের মধ্যে আশ্রমে ফিরতে, কিছুতেই যেন দেরী না করেন। দুজনেই সেই সংকল্প করে রওয়ানা দেন। গোপালদা রাজবাড়ী গেলে প্রমথদা তাঁকে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধ'রে পড়েন তাঁর এক প্রিয়জনের চাকরির জন্য একবার কলকাতায় গিয়ে তদ্বির করতে। গোপালদার মিষ্টিমধুর মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের দরুণ তাঁর অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল হোমরাচোমরা সাহেবসুবাদের মহলে। যাহোক গোপালদা বললেন, ‘ঠাকুর তিন তারিখের মধ্যে আশ্রমে ফিরতে বলেছেন। তার অন্যথা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।’ গোপালদার অনমনীয় মনোভাব দেখে প্রমথদা দুর্গাচরণদাকে ধরলেন গোপালদাকে ব'লে ক'য়ে রাজী করাতে। কলকাতায় যাওয়ার খরচ বাবদ প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা তাঁর হাতে গছিয়ে দিলেন। বললেন, ‘আমি টাকা কিছু বেশিই দিলাম। আমার অনুরোধ, কলকাতা থেকে আশ্রমে ফেরবার পথে ফুলমার জন্য একখানা পছন্দসই শাড়ি নিয়ে যাবেন।’ প্রমথদা চতুর মানুষ। তিনি জানতেন কাকে দিয়ে কেমনভাবে কাজ বাগাতে হয়। ফুলমা দুর্গাচরণদার দ্বিতীয়া পত্নী, তাঁকে খুশি করবার ধান্দায় তিনি সর্বদা একপায়ে খাড়া। এই মোক্ষম ওষুধ পড়ায় দুর্গাচরণদা প্রচণ্ড যাজন শুরু করে দিলেন গোপালদাকে—গুরুভাইদের সেবাসাহায্য করা তো ঠাকুরেরই নির্দেশ। আপনার অমুক সাহেবকে বলে দেওয়ায় একজন বেকার যুবকের যদি চাকরি হয় তাহলে মালিক দারুণ খুশি হবেন। আর আমরা তো কলকাতায় দেরী করব না। আপনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যতক্ষণ, তার পরের গাড়িতেই তো আমরা সোজা পাবনা রওয়ানা দেব। গোপালদা বললেন—ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করা কি ভালো হবে?

দুর্গাচরণদা বললেন—গুরুভাইয়ের আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়ার কথা তো ঠাকুর নিত্য বলেন। সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন গোপালদা? আপনি তো মহাপণ্ডিত বোদ্ধা ব্যক্তি। আপনি ঠাকুরের আদর্শের স্পিরিটটা বুঝে চলবেন তো।

এতে দেখবেন ঠাকুর আপনার ওপর বেশি খুশি হবেন।

অগত্যা গোপালদা দুর্গাদা একসঙ্গে কলকাতায় রাত্রির গাড়িতে রওয়ানা দিলেন। ঐদিন ভোররাত্রে মাজদিয়া স্টেশনে ট্রেন কলিশনে গোপালদা দুর্গাদা ও আরও অনেক যাত্রী মারা যান। এতে শ্রীশ্রীঠাকুর একবোরে ভেঙে পড়েন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শ্রীশ্রীঠাকুর অবিরাম দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করতে থাকেন। . . . ” (স্মৃতি-তীর্থে, ১ম সং, ২৩-২৫ পৃঃ)

“. . . তাঁর অবিশ্রান্ত আর্ত ক্রন্দন, করুণ বিলাপ ও বুকফাটা আর্তনাদে আশ্রমের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। শ্রাবণের দুর্যোগের সঙ্গে এক গভীর বিষাদের কালো ছায়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। দিনরাত কাঁদতে-কাঁদতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ফুলে ওঠে, গলা ভেঙে যায়। তবু কান্নার বিরাম নেই। যিনি সবার সান্ত্বনা, তিনি আজ শোকে অধীর, তাঁকে সান্ত্বনা দেবে কে? তাঁর এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে গোপালদার মা ও মাসিমারা এসে বললেন—গোপালী! আমরা যে তোমার এ অবস্থা আর চোখে দেখতে পারি না। আমাদের মুখ চেয়ে তুমি শান্ত হও। কী আর করবে? ভাগ্যে যা ছিল তা হয়েছে। এখন তুমি ভাল না থাকলে, কার মুখ চেয়ে আমরা দাঁড়াব?

তাঁদের নিরন্তর প্রবোধনায় শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে শান্ত হলেন। ...” (আলোচনা - প্রসঙ্গে, ১৩/৮/১৯৪০)

“. . . গোপালদা দুর্গাদা মারা যাওয়ার পর আশ্রমে গুঞ্জন উঠল, গোপালদার মত ভক্তরাজের এভাবে জীবনাবসান ঘটল কেন? ঠাকুর কেন এটা ঠেকাতে পারলেন না?

ঠাকুর তখন বলতেন, ‘গোপাল, দুর্গাচরণ গেল, সেইটেই মানুষ দেখছে, কতজন যে যমের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, তা তো আর কেউ দেখছে না। সে-খবর জানেন একমাত্র পরমপিতা। আমাকে হ্যানডেল না দিলে আমি কিছুই করতে পারি না। হ্যানডেল হাতে পেলে সবার কুষ্ঠি ওলটপালট ক'রে দিতে পারি। নির্বিচারে আমার কথা মেনে চলে যে সে লাখ মূর্খ হ'লেও মহাজ্ঞানী। আর নিজ খেয়ালে চলে যে, সে মহাজ্ঞানী হ'লেও বাস্তবে পাগল ও বেকুব।

গোপালের সব ঠিক ছিল। কিন্তু দুর্গাচরণের ওপর ওর একটা দুর্বলতা ছিল। তাই ওর কাল হ'য়ে দাঁড়াল, রন্ধ্রগত শনির মতো কাজ করল।’. . .” (স্মৃতি-তীর্থে, ১ম সং, পৃঃ ২৫)

শ্যামাচরণের প্রতি ঠাকুরের অন্তঃকরণে ছিল সুগভীর প্রত্যয় ও প্রীতির উৎসারণ। আদর্শ নিয়ন্ত্রিত মানুষের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ‘আলোচনা-প্রসঙ্গে’-তে শ্যামাচরণের সম্বন্ধে বলেন — “... গোপালের তো কথাই নেই। আমার হাতের লাঠির মত ছিল, আমার ইঙ্গিত বুঝে চলতে চেষ্টা করত। যেমন ছিল বিদ্যে, তেমনি ছিল বুদ্ধি।

তক্ষকের মত তুখোড় ছিল। আমার চোখের একটা ইশারা দেখেই বুঝত, কী আমি বলতে চাই।. . .” (আলোচনা-প্রসঙ্গে, ১৩/৮/১৯৪০)

তাঁর মত সুযোগ্য ভক্তকে অকালে হারানোর বেদনা ও আক্ষেপ ঠাকুরের অন্তরে গভীরভাবে রয়ে গিয়েছিল। শ্যামাচরণের মৃত্যুর দীর্ঘ ষোল বছর পরেও 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' উল্লিখিত ঠাকুরের এই উক্তিতে তারই প্রকাশ ঘটেছে— 'বাঘ যেমন শিকারের জন্য ঘোরে, ও (শ্যামাচরণ) তেমন নতুন মানুষের জন্য ঘুরতো। খুব চতুর ছিল, মানুষ পেলেই কাত করে ফেলত। ব্যাপারটা ছিল তার কাছে খেলার মত। ও কখনও আমার কথা না-শোনা হ'ত না। দুর্গাচরণের বুদ্ধিতে কলকাতায় গেল, তা যাওয়া উচিত ছিল না।. . . (আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৮/২/১৯৫৬)

এরও ছ'বছর পরে তাঁর আর একটি মন্তব্য— “. . . গোপাল যদি বেঁচে থাকত, তাহলে এতদিনে এ্যাটম বোমা না হোক, অন্তত এ্যাটমিক এনার্জিটা বের করে ফেলত ঠিকই। তারপর আর ওরকম মানুষ পেলাম না। কী কী করত! বেলা বারোটা/একটার সময় ছাতা মাথায় দিয়ে মাঠে রোদের মধ্যে বসে থাকত। কী সব দেখত! ওখানে বসে আবার অঙ্কও কষত।. . .” (দীপরক্ষী, ২০/৬/১৯৬২) এছাড়াও কথাপ্রসঙ্গে আরও বহুবার বহু স্থানে ঠাকুর তাঁর এই অকালে বৃন্তচ্যুত ভক্তটির যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে মন্তব্য করেছেন।

ইষ্টাদেশ পালনে তিলমাত্র বিচ্যুতির ফলে অকালে অসময়ে থেমে গেল বিপুল সম্ভাবনাময় জীবনের দুর্বার যাত্রা। কিন্তু যে নিবিড় ইষ্টানুরাগ, দীপ্ত কর্মপ্রেরণা এবং উজ্জ্বল মনীষা তাঁর মধ্যে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, তার বিনাশ নেই—কাল অতিক্রম করে তা' প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত এবং প্রবাহিত হয়ে চলবে শাশ্বত ছন্দে।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।
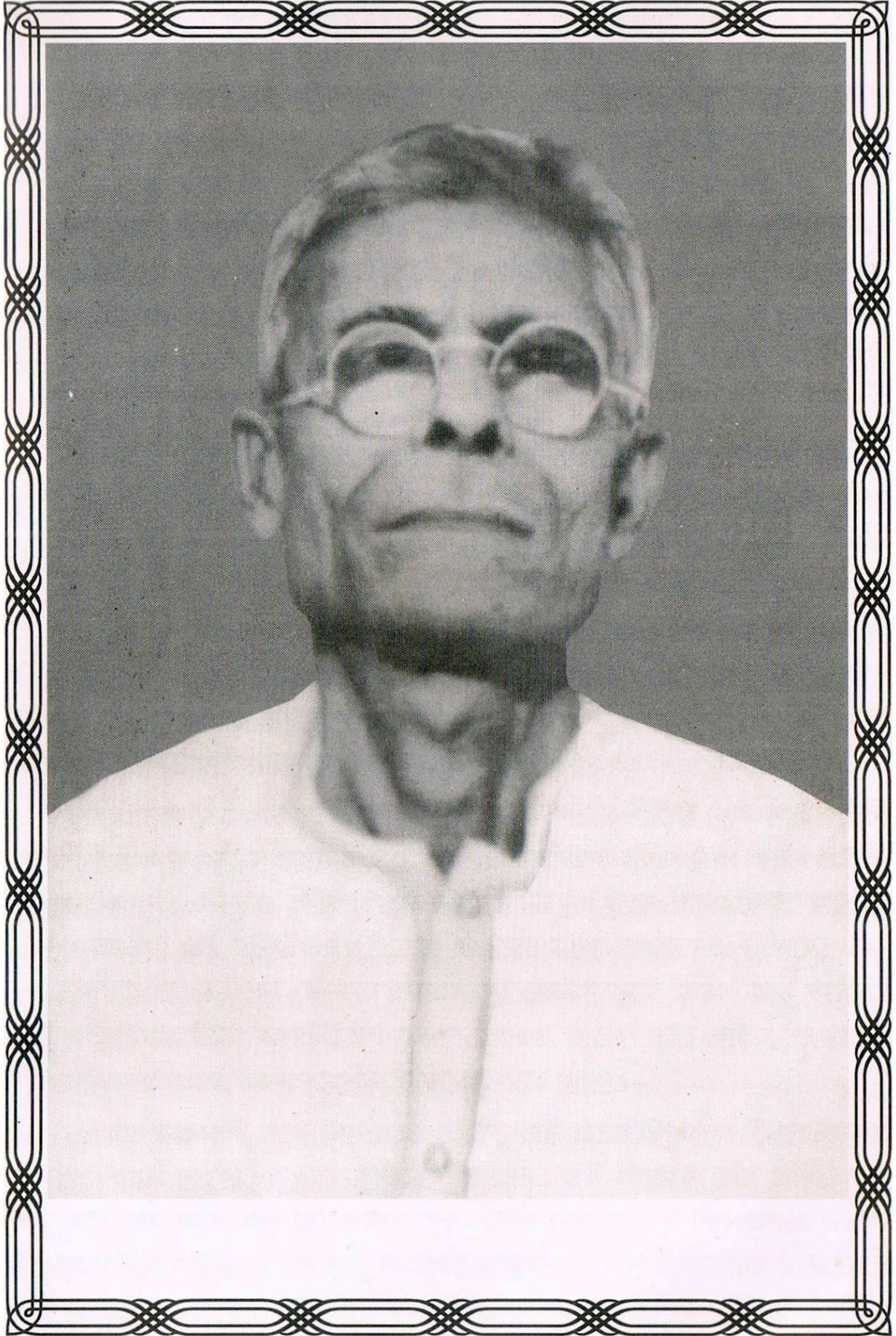
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

১লা অগ্রহায়ণ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ — ১লা আষাঢ়, ১৩৮০

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

মানবকল্যাণার্থে মর্ত্যে অবতরণকারী অবতার পুরুষ তাঁর কল্যাণযজ্ঞের ঋত্বিককুল সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর অভীষ্ট-পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় পরার্থব্রতী উচ্চ আধারের কিছু ব্যক্তিসত্তা, যাঁরা তাঁকে কেন্দ্র করে নিত্য চলৎশীল হয়ে থাকেন, মনের উচ্চ বৃত্তিসমূহ নিয়োজিত করেন তাঁরই স্বার্থে, যিনি তাঁদের প্রিয়পরম পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমও তাঁদের ছলে-বলে কৌশলে ইষ্ট-অজ্ঞাবাহী করে জীবমঙ্গলব্রতে নিযুক্ত করেন অফুরান প্রেরণার উৎসরূপে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকল্যাণ-মহাব্রতের এমনই একজন ঋত্বিক তাঁর প্রথম যুগের অন্যতম পার্ষদ, গুপ্ত তাপস, তাঁরই বার্তাবহ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

ফটিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বগলাসুন্দরী দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান ত্রৈলোক্যনাথ ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাইকারা গ্রামে। শিক্ষা-জীবনের শেষে ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামে 'হোমিও রিসার্চ লেবরেটরি' নামে একটি দেশীয় ওষুধের কারখানা করেন। এই ওষুধের প্রচারের জন্য তাঁকে বিভিন্ন জেলায় ডাক্তার মহলে যেতে হত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তিনি যাতায়াত করতেন। এই সময় তিনি লক্ষ করেন, স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব, তাদের মানসিকতা নিতান্তই পরনির্ভরশীল; কোনরকমে চাকুরি পাওয়াই যেন পরমার্থ তাদের কাছে।

স্বাধীনচেতা ত্রৈলোক্যনাথ এরকম মানসিকতায় অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেন। তিনি বিদেশী রঞ্জক দ্রব্যের সাহায্য না নিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে সুতিবস্ত্র রং করার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও কুটির শিল্পের মাধ্যমে নব নব উদ্ভাবনী বিষয়ে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করেন। তাঁর স্বনির্ভরতার চেতনা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে এবং হাতেকলমে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জেলার স্কুলে স্কুলে যেতে থাকেন। এই কর্মসূচীতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন ১৩২৪ সালে। তাঁর কুটির শিল্পের ও বিজ্ঞান পর্বের প্রচারাভিযান সাবলীল গতিতে চলতে থাকে।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এই প্রচার উপলক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে পাবনা শহরে ও পরে কুষ্টিয়ায় আসেন। এই সময়েই তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে শুভ যোগাযোগ হয়। যোগাযোগের পূর্ব দিন অর্থাৎ ৩১শে বৈশাখ কুষ্টিয়া হাইস্কুলে "জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ"—এই বিষয়ের উপর তিনি বক্তৃতা করেন। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক ছাড়াও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরদিন সেখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার এলেন। তিনি জানান, তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশে এসেছেন ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁর গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর গুরুদেব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ডাঃ জোয়ারদার।

ঐদিন বিকেলে সতীশচন্দ্র ভক্ত অশ্বিনী বিশ্বাসের বাড়িতে ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে যান। সতীশচন্দ্রের গুরুদেব অর্থাৎ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তখন ঐ বাড়িতেই ছিলেন। বাইরের ঘরে বসে আছেন ঠাকুর, প্রবেশ করলেন ত্রৈলোক্যনাথ। প্রথম দর্শনেই মনে হল—এমনটি আর দ্বিতীয় কোথাও দেখেননি। ঠাকুর তাঁর সুমিষ্ট সম্ভাষণে বলেন—বসুন ত্রৈলোক্যদা। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে সতীশচন্দ্রের পাশে গিয়ে বসেন। নয়ন ভরে দেখতে থাকেন তাঁকে, তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে দেহ ও মন, যেন কিছুটা আত্মহারা ভাব পেয়ে বসে তাঁকে।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে ঠাকুরকে বলতে থাকেন ত্রৈলোক্যনাথ—সংসারের ভিতরে থেকেই ভগবানকে চাই। পিতামাতা-স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে শীততাপে কষ্ট পাওয়া বা নিষ্কর্মা ভবঘুরে সেজে দেশে দেশে নিরর্থক ভ্রমণ করার ইচ্ছা আমার নেই। পূরক-কুম্ভকাদি কসরৎ করে শেষকালে হাঁপানি-যক্ষায় ধরুক, এমনও আমি চাই না। আর ভগবান যদি ভাবহীন বোধাতীত বা সাড়াহীন নিনড় কিছু হন, তবে তাঁকে পেয়েই বা আমার লাভ কি? আমি চাই কর্মময় মানুষ ভগবান, যিনি প্রতি কর্মে আমার হাত ধরে চালিয়ে নেবেন—যেমন হনুমানের রাঘবেন্দ্র, অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ। আর এমন ভগবান তো সংসারে থেকেই পাওয়া যায়।

ঠাকুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিলেন—আমারও সংসারী সন্ন্যাসী চাই, ত্রৈলোক্যদা! জঙ্গলের সন্ন্যাসী চাই না—নিতাই চাই। সন্ন্যাস মানে বনে যাওয়া নয়কো, সন্ন্যাস হয় মনে, ইষ্টযুক্ত কর্মই সন্ন্যাস। ভগবান পেতে হলে পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে হবে কেন, কসরতরেই বা প্রয়োজন কী? তিনি আছেন আপনার কাছেই—screen খানা একবার সরে গেলেই হয়। ঠাকুরের এই কথায় ত্রৈলোক্যনাথ কিছুটা ভরসা পেলেন।

এই সময় একজন ভক্ত বছরের নতুন ফল, কিছু লিচু এনে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। ঠাকুর তার অর্ধেক ত্রৈলোক্যনাথকে দিয়ে নিজে কয়েকটা লিচু খান। তারপর হাতমুখ ধোওয়ার জন্য কুয়োর পাড়ে গিয়ে তিনি নিজেই ত্রৈলোক্যনাথের হাতে জল ঢালতে গেলে ত্রৈলোক্যনাথ সসংকোচে নিজেই জল নিয়ে নেবেন বলেন; উত্তরে ঠাকুর অন্তরঙ্গ মধুর স্বরে বলেন, আপনি নিজে নেওয়াও যা, আমি দেওয়াও তাই। তাঁর এই কথার মধ্যে কী মমত্ববোধ, তা গভীরভাবে অনুভব করেন ত্রৈলোক্যনাথ। ঠাকুর জল ঢালতে ঢালতে অস্ফুট স্বরে বলেন—আপনি করিয়ে সেবা, অপরে করায়। শিক্ষা পেলেন নবাগত, নিজে সেবাপরায়ণ হলে তবেই অপরকে সেবা করার উপদেশ দেওয়ার অধিকার জন্মায়।

ক্ষণিকের দর্শনের জন্য এসেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ, কিন্তু অদ্ভুত এক ভাল লাগার আকর্ষণে তাঁর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়। পুনরায় তিনি ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। বহুদিন পর হারানো সন্তানকে ফিরে পেলে মা যেমন আকুল

উন্মাদনায় তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখেন, কিছুতেই ছাড়তে চান না, ঠাকুর ত্রৈলোক্যনাথকে সেইভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখলেন। এই সময় সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ এক অপরিসীম আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন রইলেন। এই অবস্থায় ঠাকুর তাঁকে কয়েকবার 'নাম' শোনালেন। প্রায় দশ বারো মিনিট এভাবে কাটল।

ত্রৈলোক্যনাথ কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে শ্রীশ্রীঠাকুর শব্দতত্ত্বের অবতারণা করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে সাধনার মাধ্যমে মস্তিষ্ক কোষগুলিকে সাড়াপ্রবণ করে তুলতে পারলে এই শব্দতত্ত্ব অনুভূতির আয়ত্তে আনা সম্ভব।

ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া এই নাম ত্রৈলোক্যনাথ পূর্বেই স্বপ্নাবস্থায় পেয়ে নামের মহিমায় মৃতকল্প অবস্থা থেকে পুনর্জীবন লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর war-fever-এর সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। তখনকার সময়ে এই রোগের প্রতিষেধক না থাকায় বহু লোকই মারা যেত এই অসুখে। ১৩২৫ সনের আশ্বিন মাসে এই নিদারুণ ব্যাধির শেষ প্রান্তে ত্রৈলোক্যনাথ, প্রাণের কোন আশা নেই। অন্তিম লগ্নে নিরূপায় হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। ঐ অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন এক উজ্জ্বলকান্তি দিব্যপুরুষ সহসা আবির্ভূত হয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখলেন এবং একটি মন্ত্র বলে অন্তর্হিত হলেন। ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অন্তর্জপ চলতে থাকে ঐ মন্ত্রের এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রোগের লক্ষণগুলি কমতে থাকে। নিদ্রাভঙ্গের পর সুস্থ বোধ করলেও নামের স্মৃতি অবচেতন স্তরে চলে যায়। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে পুনরায় সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেন।

নতুন পথে যাত্রা শুরু হল ত্রৈলোক্যনাথের—আনুষ্ঠানিক দীক্ষার আর প্রয়োজন হয়নি। সতীশচন্দ্র জোয়াদার আনুষ্ঠানিক দীক্ষার কথা উত্থাপন করলে ঠাকুর স্বয়ং বলেন — দীক্ষা হয়ে গেছে, এখন অশ্বিনীদার সঙ্গে আলাপ করলেই হয়। সৎনাম যে সর্বোচ্চ এবং সমস্ত বীজনামের আদি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে তিনি বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন। আনুপূর্বিক দীক্ষার সব ঘটনা জানিয়েছেন পরিবারস্থ সকলকে; সবাই মেনে নিয়েছেন সানন্দে। তাঁর ব্যবহার কথাবার্তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তা পাড়া প্রতিবেশী সকলের নজরে এসেছে; এক প্রদীপ থেকে সহস্র দীপ জ্বলে ওঠার মত ত্রৈলোক্যনাথকে দেখে তাঁর পরিজন-প্রতিবেশী বন্ধুস্বজন ঠাকুরের বিষয়ে অবগত হয়ে ছুটে গেছেন তাঁর কাছে অমৃতসিন্ধু হতে অমৃত আহরণের জন্য।

তখন আশ্রম বলতে পদ্মাতীরে দুখানি টিনের চালের ঘর এবং সেখান থেকে আনুমানিক একশ গজ দূরে ঠাকুর পরিবারের টিনের চালের বসতবাড়ি। চারদিক বাবলাগাছের জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ ছিল। শিয়াল, সজারু, বরাহ, বাঘডাঁশা প্রভৃতি

জন্তু সেখানে দিনের বেলাতেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াত। রাত্রে মাঝে মধ্যে বাঘের ডাকও শোনা যেত। 'আনন্দবাজার' নামে সাধারণ ভোজনালয়ের ব্যবস্থা তখন হয়নি, আশ্রমবাসী ও অভ্যাগত সকলেই ঠাকুরবাড়িতেই আহার করতেন। তখন আশ্রমবাসী ছিলেন ছ'জন। অপর ভক্তরা আশেপাশের গ্রাম থেকে সুবিধামত ঠাকুরের সঙ্গ করতে আসতেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে প্রত্যেকেই আপ্লুত হয়ে থাকতেন। কখনও তিনি কারও কোলে বসতেন, কারো বা হাঁটুতে অর্ধশায়িত হতেন, আবার কখনও সাদরে কারও গলা জড়িয়ে ধরে কথা বলতেন। ভক্তদের স্বহস্তে তেল মাখিয়ে দিয়ে পদ্মায় স্নানের সময় গাত্রমর্দন ও স্নানান্তে স্বহস্তে জুতো পরিয়ে দিতেন। সেকালের এই বালসুলভ লীলারস উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের। ঠাকুরকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চান না কেউ। সর্বদাই তাঁর সঙ্গসুধা উপভোগের তীব্র নেশা।

নামের নেশা পেয়ে বসেছে ত্রৈলোক্যনাথকে। চলতে ফিরতে স্নানে আহারে নিদ্রায় জাগরণে 'নাম' হয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। শেষ রাত্রে ধ্যানে বসেছেন, অকস্মাৎ শিহরণ সর্বাঙ্গে, কম্পন সমস্ত শিরা উপশিরায় ও স্নায়ুমণ্ডলে তীব্র আলোড়ন—যার বর্ণনা ভাষার অগম্য। মস্তিষ্ক কোষগুলি আগের চেয়ে অনেক সতেজ ও সূক্ষ্ম সাড়াপ্রবণ হয়েছে, তা তিনি নিজেই বোধ করতে থাকেন। পূর্বে যা বোধগম্য ছিল না, এখন তা সহজবোধ্য হতে থাকে। গাছপালা-আকাশ-মাটি যেদিকে দৃষ্টি পড়ে তাতেই যেন এক নতুন প্রতীতি। এক অফুরন্ত ভালবাসায় মন সিক্ত হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। নাম এবং নামীই তাঁর একমাত্র উপভোগ্য বিষয়।

ভক্তরা অনেকেই চান ত্রৈলোক্যনাথ যাজনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। বিশিষ্ট ভক্ত সুশীলচন্দ্র বসুও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এ ব্যাপারে। ত্রৈলোক্যনাথ বিনীতভাবে বলেন, সৎসঙ্গে তিনি নতুন আগন্তুক, কিছুটা জেনে বুঝে পাকা হলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন কাছেই, উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন—আগুন তো ধরানো হয়ে গেছে , এখন লেগে গেলেই হয়। হনুমানের মত লেজে মুখ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও লঙ্কা জয় করা চাই। একবার কাজে লেগে দেখুন তো ত্রৈলোক্যদা, পারেন কিনা সেটা পরে বোঝা যাবে।

দিনটা ছিল ইংরেজির ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন, সোমবার। নতমস্তকে ঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করেন ত্রৈলোক্যনাথ এবং নিয়ত কর্মীরূপে তাঁর ভাবধারার যাজন ও বিস্তারে আত্মনিয়োগে বদ্ধপরিকর হন।

বহুধা বিস্তৃত বর্তমান ঋত্বিকমণ্ডলীর প্রথম ঋত্বিক ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। ঠাকুর যে তাঁর প্রতি কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা পরবর্তীকালে কথিত ঠাকুরের কথাতেই বোঝা যায়। ১৯৬৬ সালের নববর্ষ উৎসব, ঠাকুর বসে আছেন পার্লারে অসুস্থ শরীরে, ত্রৈলোক্যনাথ এসে প্রণাম করতেই তিনি উপস্থিত

একজন সেবকের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁরে . . ., ইনি আমার প্রথম ঋত্বিক না? ওনার একটা ফটো এক্ষুনি তুলে রাখ; আমার শাণ্ডিল্য ইউনিভার্সিটি হলে, সেই ছবি তার front gate- এ টাঙানো থাকবে।" দেশ ভাগের পর ১৯৪৯ এ দেওঘরে ত্রৈলোক্যদাকে দেখে ঠাকুর বলেন, "কাছে-কোলে একটা জায়গা পেতাম, তা হলে ত্রৈলোক্যদাকে সেখানে নিয়ে আসতাম। কিন্তু ন স্থানং তিলধারণং। ত্রৈলোক্যদা কাছে না থাকলে জমে না। এক গ্লাসের ইয়ারের মত কিনা।"

ঠাকুরের কাছ থেকে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ঠাকুরের নির্দেশে আর কিছুদিন থেকে গেলেন হিমাইতপুর আশ্রমে। এই সময়ে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ইষ্টভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ছিলেন রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার। বিশ্বগুরু উৎসবের আগে থেকেই তিনি আশ্রমে ঠাকুরের আশ্রিত। দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। হাঁপানির টান বাড়ায় ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরকে ওষুধ নির্বাচন করে দিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর মৃদু হেসে বলেন—আপনি নিজে এত ওষুধের আবিষ্কারক, আপনি ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। শ্রীশচন্দ্র ব্যাকুলভাবে বলেন—ঠাকুর যখন আপনাকে ওষুধ দিতে আদেশ করেছেন তখন আপনি যা দেবেন তাতেই আমি রোগমুক্ত হব, এ বিশ্বাস আমার আছে। অগত্যা তাঁর কথার উপর নির্ভর করে একটি অজ্ঞাত আগাছার সরু একটি ডাল ভেঙ্গে চার টুকরো করেন ত্রৈলোক্যনাথ। একটি করে টুকরো পর পর তিন দিন বেটে খেতে বলেন এবং চতুর্থটি মাদুলিতে ধারণ করে নিত্য স্নানকালে 'নাম' সহ জলপানের বিধান দেন।

এরপর একাদিক্রমে তিন বছর ব্রহ্মদেশে যাজনে নিযুক্ত থাকার পর ফিরে এসে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে জানতে পারেন, ঐ ওষুধেই তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ সাক্ষাতের কয়েক মাস পর থেকেই ত্রৈলোক্যনাথ প্রবলভাবে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। ছ'মাস রোগভোগের পর ডাঃ শশিভূষণ মিত্র (ঠাকুরের মাস্টার মহাশয়)-র চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন।

কিন্তু ইষ্টনির্দেশ ব্যতীত কোন আকস্মিক এ ধরনের ওষুধ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত সমীচীন নয়। কারণ এতে ব্যক্তি-অহং-এর প্রাধান্য এবং প্রকৃতির ওপর খবরদারির নেশা পেয়ে বসার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অর্থ, মান, যশের লোভে ইষ্ট বা মঙ্গলের পথ থেকে বিচলন ঘটতে পারে। একবার ত্রৈলোক্যনাথ যাজনকর্মে পাবনার সাজাদপুরে যান। সেখানে জমিদার কাছারির ম্যানেজার সতীশচন্দ্র মুখার্জি কাছারির কর্মচারি রাজনাথ দত্তের মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান একবার তাঁর বাড়ি আসার জন্য। রাজনাথের কাছে ত্রৈলোক্যনাথ জানতে পারেন, ম্যানেজারবাবুর এক কন্যা ফিটের অসুখে আক্রান্ত এবং তাঁর অপর এক কন্যা স্বপ্ন দেখেছে পাবনা থেকে বিশ্বগুরুর শিষ্য এসে ওষুধ দিলেই অসুখ সেরে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যরা ঠাকুরের জন্মোৎসব

বিশ্বগুরুর আবির্ভাব উৎসবরূপে কুষ্টিয়ায় মহাসমারোহে পালন করেন। ত্রৈলোক্যনাথের এই অসুখের কোন ওষুধ জানা নেই বলা সত্ত্বেও কর্মচারিটি একথা কিছুতেই বিশ্বাস না করায় অগত্যা তাদের মনস্তুষ্টির জন্য অচেনা একটি গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ রোগিণীর গলায় সেটিকে মাদুলি করে পরিয়ে দিতে বলেন এবং প্রতিদিন স্নানের পর মাদুলি ধুয়ে তিন গণ্ডূষ জল পান করতে নির্দেশ দেন। এই ঘটনার দু'বছর পরে রাজনাথ দত্ত পাবনা আশ্রমে এসে ত্রৈলোক্যনাথকে জানান যে ঐ মাদুলি ধারণ ও জলপানে মেয়েটির ফিটের অসুখ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। ঠাকুরকে এ কথা জানানোয় তিনি বলেন, যেখানে-সেখানে ঐভাবে ওষুধ দেওয়া ঠিক নয়। ত্রৈলোক্যনাথ বুঝলেন, শ্রীশচন্দ্রকে হাঁপানির ওষুধ দিয়েছিলেন ইষ্টনির্দেশে, কিন্তু এখানে পরিস্থিতির চাপে তিনি যা করেছেন তা আদৌ উচিত হয়নি।

ত্রৈলোক্যনাথের যাজন-পরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কুমিল্লার হরিসভায় দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতার আয়োজন হয়েছে। সভাপতিত্ব করছেন চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বক্তৃতার পর বিশিষ্ট গায়ক ক্ষীরোদ সাধুর কীর্তনের ব্যবস্থা। ত্রৈলোক্যনাথের বক্তৃতা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু শ্রোতা কীর্তন শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে সভাপতিকে সেই মর্মে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয়ও বিচলিত হয়ে বক্তৃতা সংক্ষেপ করতে বলেন। বাধ্য হয়ে বিষয় অসমাপ্ত রেখে ত্রৈলোক্যনাথকে বক্তৃতা শেষ করতে হয়। কিছু বিশিষ্ট শ্রোতা এভাবে মাঝপথে বক্তৃতা বন্ধের প্রতিবাদ করেন। এদিকে ক্ষীরোদ সাধুকে কীর্তন পরিবেশনে অনুরোধ করায় তিনি 'আমার গানের অন্তর্নিহিত ভাবরাজি এঁর বক্তৃতাতেই পরিস্ফুট হয়েছে' বলে গাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন, আগামী দিনে অন্য কোন অনুষ্ঠানের পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলার সুযোগ দেওয়া হবে। এরপরে সকলের অনুরোধে ক্ষীরোদ সাধু অল্প সময়ের জন্য কীর্তন করলেও তা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়নি। তিনি বলেন, পূর্ব-ঘটনায় চিত্তবিক্ষেপ হেতু এই অবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে যথাসময়ে পুনরায় ত্রৈলোক্যনাথের বক্তৃতা হয়েছিল—এবং বক্তৃতার পর অনেকেই তাঁর সঙ্গে একান্তভাবে আলোচনার জন্য আসেন।

যাজন পরিক্রমায় একবার ত্রৈলোক্যনাথ মুক্তাগাছায় আসেন, উদ্দেশ্য সেখানকার হাইস্কুলে বক্তৃতা দেওয়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে তিনি আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। সুরেনবাবু কিন্তু সংশয় প্রকাশ করে বলেন—চেহারা দেখে তো মনে হয় না আপনি বক্তৃতা দিতে পারবেন। এই মন্তব্যে বিচলিত না হয়ে নম্রভাবে ত্রৈলোক্যনাথ বলেন, — কাজ না দেখেই এমন করে বলেন কেন দাদা, আগে আমায় বলার একটু সুযোগ দিন, পরে যা বলার বলবেন। প্রধান শিক্ষক উত্তরে বলেন—আমি আপনার যোগ্যতা বিচার করার কে? তবে স্কুলে উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন শিক্ষক আছেন এবং আমন্ত্রণ করলে জমিদার বাড়িরও কেউ কেউ হয়তো

আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে অপ্রস্তুত যাতে না হতে হয়, সেই চিন্তা করেই আমি ও-কথা বলেছি। ত্রৈলোক্যনাথও ছাড়বার পাত্র নন, বললেন—এসে যখন পড়েছি তখন আমায় বিমুখ করবেন না দাদা, বলতে যদি না-ই পারি তবে খানিকটা হাস্যরসের অবতারণাও তো হবে।

অগত্যা তিনি রাজি হলেন এবং বক্তৃতার সময় নির্ধারণ করে ক্লাসে ক্লাসে নোটিস পাঠিয়ে দিলেন। বক্তৃতা এতই মনোগ্রাহী হয়েছিল যে বক্তৃতার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় ত্রৈলোকনাথকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং ঠাকুর বিষয়ক আলাপ আলোচনায় তৃপ্ত হয়ে সৎনাম গ্রহণ করেন।

একবার যাজন-উপলক্ষ্যে ফরিদপুরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ত্রৈলোক্যনাথ, এমন সময় নিবারণ বাগচিকে দিয়ে ঠাকুর ডেকে পাঠালেন তাঁকে এবং ফরিদপুর যেতে নিষেধ করলেন। এদিকে আশ্রম থেকে ঈশ্বরদি স্টেশনে যাওয়ার বাসে টিকিট বুক করা ছিল, কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশে যাওয়া স্থগিত হল। সন্ধ্যার আগে নিবারণ বাগচিকে দিয়ে আবার ত্রৈলোক্যনাথকে ডেকে পাঠিয়ে ঠাকুর অবিলম্বে ফরিদপুর যেতে বলেন। তদনুযায়ী ঈশ্বরদি স্টেশনে পৌঁছে জানতে পারেন, সকালের ট্রেনটি ভেড়ামারা স্টেশনে একটি মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বহু লোক আহত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ বুঝলেন, কেন ঠাকুর সকালের যাত্রা বন্ধ করেছিলেন। দৃষ্টি যাঁর অনন্ত তিনিই তো ভজমান, মানুষের ভগবান। তাইতো যুগে যুগে ভক্ত তথাকথিত পার্থিব ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর চরণতলে আশ্রয় পেতে চায়। তিনিও স্থান দেন ব্যাকুল হৃদয়কে। তাঁর আহ্বান ভক্তের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে বোধক্ষম ও বহনযোগ্য করে তোলে।

রাজশাহী জেলার দীঘাপাতিয়ার রাজবাড়ি দয়ারামপুরে যাজন কাজে গিয়ে একবার অপ্রিয় পরিস্থিতিতে পড়তে হয় ত্রৈলোক্যনাথকে। সেখানে অবস্থানের সময় তিনি সেখানকার স্কুল বোর্ডিং-এ ছিলেন। দয়ারামপুর হাইস্কুলে বক্তৃতা দেওয়ার পর দুজন শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র দীক্ষা গ্রহণ করে। তখন ছাপানো দীক্ষাপত্রের প্রবর্তন হয়নি, সাদা কাগজে দীক্ষিতদের স্বাক্ষরসহ বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া হত। এভাবে স্বাক্ষর নিতে দেখে বিরুদ্ধবাদী কয়েকটি ছাত্র ও শিক্ষক একত্রিত হয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন যে, ত্রৈলোক্যনাথ ইংরেজ সরকারের গুপ্তচর, সুতরাং অবিলম্বে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হোক। প্রধান শিক্ষকও সত্যাসত্যের অনুসন্ধান না করে ঐ রাত্রেই তাঁকে স্কুল বোর্ডিং পরিত্যাগে বাধ্য করেন। সে যুগ ছিল স্বদেশী যুগ। অপরিচিত নবাগতদের পুলিশ ভাবত বিপ্লবী, আর সাধারণ মানুষ মনে করত সি. আই. ডি.-র লোক।

ময়মনসিংহ জামালপুর দয়াময়ী কালীবাড়িতে ত্রৈলোক্যনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সৎনাম গ্রহণ করলে মাছ-মাংস বা মাদক গ্রহণ করা উচিত নয়। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,—মাদক দ্রব্য যে নিষিদ্ধ এ কথা আপনি বলছেন, কিন্তু

মদ-গাঁজা-আফিং-এর দোকানে আপনাকে অহরহ দেখতে পাই, অতএব মাদকদ্রব্যের কোন্‌টি যে আপনার বাদ আছে তা তো বুঝি না। ঐ ব্যক্তিটির বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ঐ সব দোকানের মালিকরা একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,—আমরা এঁর মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণ করেছি। আমাদের সময়ের নিতান্ত অভাব, সেজন্য আমাদের অনুরোধে ইনি গদিতে এসে সৎ আলোচনায় আমাদের তৃপ্ত করেন। নেশা-ভাঙ তো দূরের কথা, চা সিগারেট পর্যন্ত ইনি সেবন করেন না। সমবেত প্রতিবাদে অগত্যা সে-যাত্রায় ত্রৈলোক্যনাথ মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে রেহাই পেলেন।

যাজন-পরিক্রমায় ত্রৈলোক্যনাথ তখন সিরাজগঞ্জে। যজন-যাজন ইষ্টভ্রাতাদের নিয়ে ভালই কাটছিল দিনগুলি। একদিন ইষ্টভ্রাতা জয়কুমারদার বাড়ি থেকে খবর এল, তার ভ্রাতুষ্পুত্রের অবস্থা খুব খারাপ। খবর পেয়ে ত্রৈলোক্যনাথ সেই বাড়ি গিয়ে দেখেন, বালকটির মুমূর্ষু অবস্থা, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, কণ্ঠনালী শ্লেষ্মায় অবরুদ্ধ, চোখ কপালে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথ উপস্থিত হলে ছেলেটির পিতা ও জয়কুমারদার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে আবেগাপ্লুত হয়ে বলতে থাকেন যে ত্রৈলোক্যদার কৃপায় ছেলেটি রক্ষা পেতে পারে। তিনি ছেলেটিকে স্পর্শ করে 'নাম' করলে সে ঠাকুরের দয়ায় বেঁচে উঠবে—গৃহকর্তাও এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। অবশেষে সবার অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ ছেলেটির মস্তক স্পর্শ করে 'নাম' শুরু করেন। এভাবে নাম করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির নাক-মুখ দিয়ে অনর্গল শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকে; দু তিন মিনিট শ্লেষ্মা নির্গমনের পর তার শ্বাসকষ্ট কমে যায়, চোখও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ছেলেটি ধীরে ধীরে বিপদমুক্ত হয়। নামের কম্পনেই যে আরোগ্য লাভ হয়, এ বিষয়ে উপস্থিত সবাই নিশ্চিত হন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে এই ভক্ত তাপসের প্রথম সাক্ষাত হয়। আনন্দময়ী মা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও আশ্রমের সম্বন্ধে বিশেষ অবগত ছিলেন। একবার হিমাইতপুর আশ্রমে মা একাদিক্রমে তিন দিন ছিলেন, সেসময় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। কিশোরীমোহন দাসের নৃত্যসহ কীর্তন দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। ঠাকুর, মাতা মনোমোহিনী দেবী ও আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আনন্দময়ী মা ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে নাটমন্দিরে আসেন। তখন নাটমন্দিরে মায়ের কীর্তন হচ্ছিল, মা তাঁকে কিশোরীদার মত নৃত্যসহ কীর্তন করতে অনুরোধ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যানমগ্ন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে "পতিতপাবন নাম রাধা রাধা বল" —এই তান ধরে কীর্তন শুরু করেন। যাঁরা এতক্ষণ মায়ের কীর্তন করছিলেন তাঁরাও 'রাধা বল' বলে দোহার দিতে থাকেন। ক্রমশ কীর্তন তুঙ্গে উঠলে তিনি নাচতে আরম্ভ করেন; এক ঘন্টা এভাবে নৃত্যসহ কীর্তনের পর ক্লান্ত হয়ে তিনি আসরে শুয়ে পড়েন। আনন্দময়ী মা তখন দ্রুত সেখানে এসে ভক্তের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে নিজ হাতে পাখার বাতাস করতে থাকেন। ত্রৈলোক্যনাথ পিপাসার্ত বুঝতে

পেরে মা ভিতরে গিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ এনে স্বহস্তে তাঁকে খাইয়ে দেন।

যাজন পরিক্রমায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় বিভিন্ন সময়ে—কখনও কখনও মিথ্যা সন্দেহ, অপযশের তিক্ত পরিস্থিতি, আবার কখনও বা আনন্দময়ী মায়ের মত স্নেহমধুর আপ্যায়নের স্মৃতিসুধায় অবগাহন। কিন্তু কোন বিরুদ্ধতা বা বিরূপতার ক্লেশ এই সন্ন্যাসীপ্রতিম সাধককে স্পর্শ করতে পারত না—কারণ ঠাকুরকে খুশি করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, ক্লেশসুখপ্রিয়তা তাই ছিল তাঁর মজ্জাগত। নিজের কষ্ট অসম্মান ইত্যাদি তাঁর কাছে ছিল একান্ত তাৎপর্যহীন।

যাজন-কার্যের পথিকৃৎ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে আসাম, ত্রিপুরা, বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত যে ব্যাপক যাজন-যজ্ঞ সমাধা করেন, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে তা অকল্পনীয়। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, প্রতিকূল পরিবেশে রীতিমত যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গুরুর বিজয়-পতাকা বহন করে এগিয়ে চলা একমাত্র গুরুর কৃপাতেই সম্ভব, প্রগাঢ় ইষ্টনিষ্ঠাতে যে কৃপার উৎসমুখ উৎসারিত হয়। চরম বিপরীত বা বিরুদ্ধ পরিবেশে কখনও দুষ্কৃতীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ, কখনও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের নীচ ঈর্ষাপ্রসূত বিরুদ্ধতা, আবার কখনও রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজের রক্তচক্ষুর আস্ফালনকে উপেক্ষা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিজয় রথ এগিয়ে নিয়ে চলেন ত্রৈলোক্যনাথ সাফল্যলক্ষ্মীর কৃপামাল্য গলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অকাট্য টানের প্রভাবে নামময়তা ত্রৈলোক্যনাথকে সাধনস্তরের কত উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করেছিল, একটি ঘটনার উল্লেখে তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। একবার ত্রৈলোক্যনাথ ইষ্টভ্রাতা সতীশচন্দ্র জোয়ারদারের সঙ্গে কুমারখালিতে গেছেন আম কেনার জন্য। আম কেনার পর্ব শেষ করে উভয়ে সন্ধ্যার আগে কুমারখালি স্টেশনে পৌঁছলেন। সেখানে বিনতি-প্রার্থনা ও নামধ্যানের পর কিছুটা বিরতি দিয়ে স্বল্প কিছু আহার করেন। ট্রেন আসতে অনেক দেরি—শেষ রাত্রে, রাত তিনটেয়। অনেকখানি সময় হাতে—ঘুমিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছেন; কিন্তু ঘুম আসছে না—অবিরাম নাম চলছে ত্রৈলোক্যনাথের অন্তরে আর শুনতে পাচ্ছেন কাঁসর-ঘন্টা-শঙ্খের মিশ্রিত নানা ধ্বনি। ভাবলেন—বাইরে কোথাও কোন মন্দিরের শব্দ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলেন এ ধ্বনিস্রোত তিনি একাই শুনতে পাচ্ছেন এবং এই ঝংকার বাইরের ধ্বনি প্রবাহ নয়, তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরই হয়ে চলেছে। ঘুম আর হল না—তবু কোন ক্লান্তির বোধ নেই, মনের মধ্যে বয়ে চলেছে এক অফুরন্ত আনন্দের ধারা, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে উঠেছে মন-প্রাণ। মনে পড়ে, ঠাকুর প্রথম দর্শনের দিনেই বলেছিলেন সাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হলেই এই শব্দ সাধকের অন্তরে স্বতঃই ধ্বনিত হয়। মহাভাববাণী-গ্রন্থ 'পুণ্য-পুঁথি'-তে আছে, "শব্দ প্রথমে একটু একটু শোনা যায়। ডানপাশে নয়, সোজাসুজি একটু ডানে। ঐ শব্দের মধ্যে বিশেষত্ব আছে, লক্ষ্য

করা লাগে। একটু পরেই ঘন্টাধ্বনি পাওয়া যায়! ওঁম্ ছাড়িয়ে যেতে হবে। ওঁম্ তো কাছেই—ঐ পার হলেই ক্রমে ক্রমে রাধাস্বামী! আস্তে- আস্তে!" (ভাববাণী, তৃতীয় দিবস।)

গভীর ইষ্টানুরাগ এনে দেয় অভ্রান্ত চলন এবং সাধনপথে দ্রুত অগ্রগমন। শব্দশ্রবণ বা জ্যোতিদর্শন, এ সবই সাধন জগতের এক-একটি স্তরের অবস্থান মাত্র—ঠাকুর বলেছেন, এসবের আশায় নামধ্যান করতে নেই, নামধ্যান ঠিকমত হলে এগুলি আপনিই এসে যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ-জননী বগলাসুন্দরী দেবী কুলগুরু প্রথায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু পুত্রের কাছে নিয়ত ঠাকুর-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে সৎনাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি তখন চলৎশক্তি রহিত, চোখে ছানি পড়ে দৃষ্টি ক্ষীণ। এ অবস্থায় ঠাকুরদর্শনে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। ঠাকুরকে সব কথা চিঠিতে লিখে জানালেন ত্রৈলোক্যনাথ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকেই নির্দেশ দিলেন মাকে দীক্ষাপ্রদানের। সে আদেশ শিরোধার্য করে ত্রৈলোক্যনাথ মাকে সৎনাম প্রদান করেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বগলাসুন্দরী দেবী সর্বদাই ইষ্টনাম জপ করতেন। ক্রমে জরায় আরও জীর্ণ হয়ে যেতে থাকে দেহখানি—দীপনির্বাপণের সময় সমাসন্ন। একদিন বালিকার মত আব্দার করেন, খিচুড়ি আর পায়েস খেতে সাধ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খিচুড়ি আর পায়েস প্রস্তুত করে ঠাকুরকে নিবেদন করে যখন তাঁকে দিতে যাওয়া হল, তিনি বললেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই—এই তো ঠাকুর এসেছিলেন, দিব্যকান্তি যুবাপুরুষ—ফল, মিষ্টি, পায়েস নিজ হাতে আমাকে খাইয়ে এইমাত্র চলে গেলেন। বগলাসুন্দরীর চোখে-মুখে রোগযন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই, আনন্দে, তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত মুখখানি! এর সাতদিন পরই তাঁর ঐহিক জীবনের অবসান হয়। ভালবাসার দায় বড় দায়—স্বয়ং ভগবানকেও ছুটে আসতে হয় ভক্তের ছোট্ট অপূর্ণ বাসনা পূরণ করতে!

শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থে বলেছেন, "জীবনের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে ভগবান যেন জাগ্রত থাকেন আমাদের ভিতর, তবেই তো চলে স্ফূর্তি, কয়ে স্ফূর্তি, করে স্ফূর্তি।" তিনি জাগ্রত থাকা মানেই তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত থাকা। এবং এই অবস্থায় সাধকের কাছে কিছুই আর অসাধ্য থাকে না—সবকিছুই আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ে। সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। যাজন-পরিক্রমায় ত্রৈলোক্যনাথকে বিভিন্ন সময়ে নানা বিরুদ্ধ ও অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়—ভগবানকে নিজের মধ্যে সদাজাগ্রত রেখে সেসমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। ১৩২৮ সনে একবার মুক্তাগাছায় হরিসভায় বক্তৃতার আমন্ত্রণ পান ত্রৈলোক্যনাথ। আলোচ্য বিষয় ছিল, "বীজতত্ত্ব ও মন্ত্র-চৈতন্য।" বক্তৃতা চলাকালীন এক ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথকে নানাভাবে বাক্যবাণে আক্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল না হওয়ায় অর্থাৎ যুক্তি ও বিচারে ত্রৈলোক্যনাথের মত সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ায় ব্রহ্মচারী

নতুন পন্থায় তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। সভাশেষে ত্রৈলোক্যনাথ মঞ্চ থেকে নেমে আসতে উদ্যত হলে ব্রহ্মচারী বেশ নরম সুরে তাঁকে বলেন, আপনি প্রচারক, দীক্ষাও দিয়ে থাকেন শুনেছি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ। তাই পঞ্চদশ অধ্যায়ের —

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।

— এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমরা আপনার কাছে শুনতে চাই।

ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য ছিল ত্রৈলোক্যনাথকে সভাসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা; তাঁর মনে হয়েছিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিবিড়ভাবে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হন এবং স্বতোৎসারিত অপূর্ব ব্যাখায় সকলের মন জয় করে নেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "এইভাবে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর এক অপূর্ব সাড়া পাইলাম, শ্লোকের অর্থ যেন অভাবনীয়ভাবে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।" অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে তিনি ঐ শ্লোকার্থ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন এবং তা প্রকাশ করেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ঐ ব্যাখ্যার অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেন।

এই ঘটনার তিন/চার মাস পরে আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেলে ঠাকুর বলেন, ব্যাখ্যা যথাযথই হয়েছে। একান্ত যুক্ত অবস্থায় যা করা যায়, আশ্চর্য্যভাবে তা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে; তারপর স্মিত হেসে অস্ফুট স্বরে বলেন —

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বামহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।

ত্রৈলোক্যনাথ একবার বার্মার(অধুনা মায়ানমার) কামায়ুটে গিয়েছেন যাজন পরিক্রমায়। সেখানে বার্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইষ্টভ্রাতা নিবারণচন্দ্র দত্তের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর প্রতিবেশী কিরণচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও পরিচয় হয়। যাজনকার্য চলাকালীন কিরণচন্দ্রের বাড়িতে কোন কোন দিন রাত্রিবাসও করতে হয় ত্রৈলোক্যনাথের। একদিন সেখানে নিবারণচন্দ্রও উপস্থিত আছেন, পূণ্য-পুঁথি থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। কিছুটা শোনার পরই কিরণচন্দ্র হঠাৎ বলে ওঠেন, ওঁ-কার সবার ওপরে, তার ওপরে আর কিছু থাকতে পারে তিনি বিশ্বাস করেন না। নিবারণচন্দ্র উত্তরে বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববাণীর প্রতিটি কথাই সত্য, আর শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলা আছে তার সমর্থন পূর্ববর্তী সন্তগুরুদের বচনেও পাওয়া যায়; অতএব তাবৎ মহাপুরুষের কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। একথায় কিরণচন্দ্রের পরিবর্তন তো হলই না, বরং বইখানি তাঁর হাতে দিতে গেলে তিনি উত্তেজিত হয়ে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে থেকে চলে যান।

এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের দেখা হয় স্টেশনে। কিরণচন্দ্র অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে জানান যে তাঁর সেদিনকার গর্হিত আচরণে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। আরও অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে। ত্রৈলোক্যনাথ বলেন —গীতা, ভাগবত, চণ্ডী যেমন শ্রদ্ধার জিনিস, আমাদের কাছে পুণ্যপুঁথিও ততখানি আদরের। কথাপ্রসঙ্গে কিরণচন্দ্র আরও জানান যে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা বইপত্র পড়া এবং অপরের কথার ওপর কথার ভিত্তি করে, নিজের সাধনালব্ধ অনুভূতি থেকে নয়। নানা আলাপ-আলোচনার পরে সেদিনের উগ্র কিরণচন্দ্র এতটাই মুগ্ধ হলেন যে সেদিনই দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ঐদিন সন্ধ্যাতেই তাঁর দীক্ষা হয়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কামায়ুটে কিরণচন্দ্রের বাড়িতে বার্মার প্রথম অধিবেশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

কিরণচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের প্রায় দেড় মাস পরে তাঁর স্ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় ধ্যান আরম্ভ করামাত্র তাঁর শরীরে স্বেদ-পুলক-কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং দুই চোখে অনবরত অশ্রুধারা বইতে থাকে। ক্রমে শরীর নিশ্চল হয়ে যায়। কিরণচন্দ্র স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন; তখন দীক্ষাদাতা ত্রৈলোক্যনাথ তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, নামের শক্তিতে অনেক সময় এরকম অবস্থার উদ্ভব হয়। মিনিট পনের পরে কিরণচন্দ্রের স্ত্রী প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন, ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীঠাকুর জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ এক তুলনাহীন সুগভীর আনন্দস্রোত—যার হয়, সে-ই বোঝে। জগতের সমস্ত প্রাপ্তির চেয়ে সেরা প্রাপ্তি এই অনাবিল আনন্দঘন অনুভব। দীক্ষাদাতা যিনি তাঁর ভাবের গভীরতা এবং দীক্ষাগ্রহীতার উন্নত পূর্ব-সংস্কার এবং উচ্চ ভাবমুখিনতা থাকলে তবেই নামের স্পন্দন ক্রিয়াশীল হয়ে এমন অপরূপ অনুভবের উন্মেষ ঘটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের কী অপরিসীম নির্ভরতা ছিল তা নিম্নোক্ত ছোট ঘটনার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত। ইষ্টভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও কিরণচন্দ্র ঘোষের আমন্ত্রণে তিনি দ্বিতীয় বার যখন রেঙ্গুনে আসেন তখন পরপর সভাসমিতি করার পর তাঁর মনে হল, এই বিরাট শহরে একক প্রচারে সাড়া পেতে যথেষ্ট সময় নেবে; তার চেয়ে মফঃস্বল শহরগুলিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে এবং ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচার কার্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করায় নিবারণ দত্ত ও কিরণ ঘোষ জানান যে বার্মায় সৎসঙ্গীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়; মফঃস্বলে ঘোরাফেরা ব্যয়সাপেক্ষ এবং এই ব্যয়ের সম্পূর্ণ ভার তাঁদের পক্ষে বহন করা সাধ্যাতীত। উত্তরে সাধকপ্রবর বলেন, একাধিক ধর্মীয় সংস্থা সর্বসাধারণের আর্থিক সহয়তায় প্রচারকার্য চালায়। প্রত্যেকের মধ্যেই ধর্মের চাহিদা আছে, মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে পারলে তারাই সাড়া দেবে—অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই। কিরণচন্দ্র উত্তরে বলেন, এইভাবে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করলে লোকে বিরক্ত হতে পারে, তাতে উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় দেখা দেবে। সুতরাং এই প্রচেষ্টা

থেকে বিরত থাকই সমীচীন। ত্রৈলোক্যনাথ তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ঠাকুরের বার্তা বহনের জন্য এদেশে এসেছি, তিনিই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাকে পরিচালনা করছেন, একথা আপনারা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করুন এবং আমি যাতে অবাধে স্বাধীনভাবে যাজনকার্য চালিয়ে যেতে পারি তাতে সহায়তা করুন। ত্রৈলোক্যনাথের এই দৃঢ়তার অভিব্যক্তি তাঁর সমস্ত শরীরে এমনভাবে প্রতিফলিত হল যে তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সব দ্বিধা নিমেষে দূরীভূত হল—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠার গভীরতার প্রকাশে আর কোন 'কিন্তু'-র অবকাশ রইল না, সফল হল ত্রৈলোক্যনাথের বার্মা পরিক্রমা, বিভিন্ন প্রান্তে সৎনাম গ্রহণে ধন্য হলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ।

বার্মার প্রচারকার্যের সাফল্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতা মনোমোহিনী দেবী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট আশ্রমিকবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। অনন্ত মহারাজের পত্রে ত্রৈলোক্যনাথ এই সংবাদ পান। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'FORWARD' দৈনিক পত্রিকায় (27th May 1925) প্রকাশিত নিম্নোক্ত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

Dr. T. N. Chakrabarty of Dacca, a member of the Universal Satsang of Himaitpur, Pabna, has been deputed by the authorities to Rangoon in Burma, where there is a Branch Satsang and has been doing excellent work at Kamayut, Tharrawaddy and other neighbouring places. Many Burmeses and Marwaries, Punjabis and Bengalees domiciled in Burma have accepted the ideals of Satsang. A silent worker like Dr. Chakrabarty has attracted the notice of the elites of Rangoon and many pleaders, engineers and like have gathered round to help Tapovan, Viswa-Vigyan Kendra and various other institutions of the Central Satsng at Pabna. We hope he will soon return to Pabna with laurels from Burma.

বার্মায় ত্রৈলোক্যনাথের যাজন-পরিক্রমার প্রভাব শুধুমাত্র ভারতীয় বা বর্মীদের মধ্যেই সীমায়িত ছিল না, এমনকি দূর পাশ্চাত্যের ইংরেজও দীক্ষাগ্রহণে ধন্য হন। বার্মার খোমিওতে তখন ত্রৈলোক্যনাথ। সেখানে একসময়ে বার্মা গভর্নরের গ্রীষ্মাবাস ছিল—খোমিওকে বলা হত বার্মার দার্জিলিং। এখানে এক ইংরেজ বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকতেন—পূর্বজীবনে ইংল্যাণ্ডের স্কারবরো ইউনিভার্সিটি কলেজে মনোবিজ্ঞানের এই অধ্যাপকের পূর্বনাম ছিল জন স্টিফেন। প্রথম মহাযুদ্ধে গোলার আঘাতে তাঁর একটি পা পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবসর পেয়ে চলে আসেন সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) এবং সেখানে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে দ্রৌজি প্রজ্ঞানন্দ নামে অভিহিত হন।

প্রথম পরিচয়েই তাঁর ভাল লাগে ত্রৈলোক্যনাথের যাজন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁকে "Discourses on Radhaswami Faith" নামে একটি বই পড়তে দেন। তিন/চার

দিন পর আবার তাঁর কাছে গেলে সেই ইংরেজ বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথকে বলেন— "This is a book on highest realisation; I have never come accorss such practical lesson. I wonder how one can put these into practice."

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সমস্ত অনুসন্ধিৎসার যথাযথ উত্তর দেন; ঠাকুর বিষয়ক নানা আলাপ-আলোচনার পর তিনি "নাম" নিতে ইচ্ছুক হন এবং পরদিন সকালে বেঙ্গল ক্লাবে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মদেশ বা বার্মায় ত্রৈলোক্যনাথের যাজন-কাল ১৩৩০ থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দ — এই দীর্ঘ বারো বছর বিস্তৃত ছিল। তবে তা একাদিক্রমে নয়, সর্বসাকুল্যে তিনি সেখানে পাঁচবার যান। প্রথমবার ১৩৩০-এর মাঘ মাস থেকে ১৩৩১-এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে রেঙ্গুন শহরের কাছে ইষ্টভ্রাতা ব্রজেন চ্যাটার্জির আবাসস্থলে ওঠেন। এই চার মাস তাঁর কর্মস্থল রেঙ্গুন, যোগন ও কামায়ুটে সীমাবদ্ধ ছিল। কামায়ুটে অবস্থানকালে তিনি ছিলেন বার্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইষ্টভ্রাতা নিবারণ দত্তের গৃহে। 'রঞ্জন কুটির' নামে এই বাড়ির একটি ঘর সাপ্তাহিক অধিবেশন কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায় বৈশাখ, ১৩৩২ থেকে আশ্বিন, ১৩৩৪। এই সময়ে তাঁর যাজনক্ষেত্র ছিল লোয়ার বার্মার ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং আপার বার্মা। তৃতীয় দফায় তাঁর স্থিতিকাল ছিল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০—এই এক বছর। ১৩৪০-এ মোগং ও কাথায় যে উৎসব হয়েছিল. তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পরবর্তীকালে মাঘ, ১৩৪০ থেকে শ্রাবণ, ১৩৪১ পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়ে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের বিধ্বংসী বিহার ভূমিকম্পের পর অর্থ সংগ্রহের জন্য বার্মা থেকে চলে আসেন। ঐ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে আছে যোগন-এ তপোবন-বিদ্যালয় স্থাপন। এরপর আসেন ভাদ্র, ১৩৪১-এ, স্থিতিকাল ছিল ভাদ্র, ১৩৪২ পর্যন্ত। এই সময়ের বিশেষ উল্লেখ্য—রেঙ্গুনে নবনির্মিত সৎসঙ্গ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং বৃহদাকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন।

যাজন-কার্যের এই প্রথম যুগের অভিজ্ঞতার কথা ঠাকুরের নির্দেশে লিপিবদ্ধ করে রাখেন তিনি। ১৩৫০ সনে শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দেশ্যে বলেন — প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইতিবৃত্ত থাকা খুবই দরকার, ভবিষ্যতের কর্মীদের পক্ষে তা পথের আলো। আবার একবার দেওঘরে বড়াল বাংলো (অধুনা ঠাকুর বাংলো)-র সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলেন,—এই যে বিরাট বাড়িখানা দেখছেন, —যে ভিতের উপর এটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আর কেউ দেখতে পায় না; এখনই যদি সৎসঙ্গের ইতিবৃত্ত না লেখা যায়, তাহলে সৎসঙ্গের গোড়ায় যারা ছিল, তাদের খবর আর কেউ পাবে না। . . . ত্রৈলোক্যনাথ লেখক ছিলেন না, তবু ঠাকুরের নির্দেশে তিনি লিখেছেন, বই ছাপাও হল ১৩৬০-এর নববর্ষ উৎসবের সময়। ঠাকুরের শ্রীহস্তে বইখানি দিয়ে তিনি প্রণাম করলে ঠাকুর ডান হাতখানি তুলে আশীর্বাদ করে বলেন,—'ত্রৈলোক্যদা, পরমপিতার অভয় হস্ত অদৃশ্যভাবে আপনাদের মাথার উপর সর্বদা প্রসারিত রয়েছে,

একবার তাকালেই হয়।' ঠাকুরের বাণীলেখক, 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সংকলক প্রফুল্লকুমার দাস তখন ঠাকুরের কাছেই ছিলেন, বইটি খানিক নাড়াচাড়া করে ঠাকুর তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'দ্যাখ প্রফুল্ল, আজ এই যে সৎসঙ্গের ইতিবৃত্ত তৈরী হল, ভবিষ্যৎ ইতিহাস একে ভিত্তি করেই হবে।' বইটি তিন খণ্ডে 'যাজন পথে' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কিছু সম্পাদনা করে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে। আশ্রম জীবনের প্রথম পর্বে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি গান রচনা করেন এবং তা ঠাকুরকে শোনান। ঠাকুর গানগুলি শুনে তৃপ্ত হয়ে সেগুলি ছাপানোর কথা বলেন। 'সন্ত গীতা' নামে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে গানগুলি প্রকাশিত হয়।

জীবনের শেষ প্রান্তে ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতায় কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর কাছে বাগবাজারে থাকতেন; সেখান থেকেই ঠাকুর-দর্শনে দেওঘরে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পরেও ঋত্বিক সম্মেলন অথবা উৎসবাদি উপলক্ষ্যে তাঁর দেওঘরে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ১৯৭৩-এর নববর্ষ উৎসবেও গিয়েছিলেন দেওঘরে, সেখান থেকে ফিরে সেবারে হঠাৎ বলেন,—আর বোধহয় আমার দেওঘর যাওয়া হবে না। কনিষ্ঠা পুত্রবধু গোলাপ (সৎসঙ্গ হাসপাতালের ডাক্তার, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা) একথা শুনে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—অমন কথা বলেন কেন, বাবা? আপনার শরীর তো ভালই আছে, আবার যাবেন দেওঘরে।

এর কিছুদিন পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি গোলাপ একদিন লক্ষ করেন, ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সামনে বসে দু'হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কী যেন বলছেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—বাবা, ঠাকুরের কাছে কী বলছিলেন? ত্রৈলোক্যনাথ এড়িয়ে গিয়ে বলেন—ও তেমন কিছু না। পুত্রবধূও নাছোড়বান্দা—না, আপনাকে বলতেই হবে, অমন ক'রে কী বলছিলেন ঠাকুরের কাছে। আপনার মনে কি কোন কারণে দুঃখ হয়েছে? অবশেষে ত্রৈলোক্যনাথ মৃদু হেসে বলেন, ঠাকুরকে বলছি, যা যা কাজ ছিল, সবই তো হয়ে গেছে, আর তো এই দেহে তাঁর কাজ কিছু করার ক্ষমতা নেই, এবারে তিনি নিয়ে নিলেই পারেন। একথায় প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে গোলাপ বলে ওঠেন—না, না, ওসব কী কথা! অমন কথা একদম বলবেন না! ত্রৈলোক্যনাথ তেমনই হাসিমুখে বলেন, আমার কাজ শেষ হয়েছে রে, আর তোরা মায়া বাড়াস না, এবারে মায়া কাটা।

এর পরে ক'দিন ধরেই মাঝে মাঝে বলতে থাকেন, এবারে মায়া কাটিয়ে ফেলার পালা। তাঁর শরীর কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ। ১৫ই জুন, ১৯৭৩ রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুত্র প্রসাদকে কাছে ডেকে বলেন—ঐ ট্রাঙ্কে একটা নতুন থানধুতি আছে, ওটা তোর সেজদাকে দিস। প্রসাদ বলেন, সেজদা এলে তুমি নিজেই দিও। তিনি বলেন—নারে, ওর লাগবে তো! এ ছাড়াও আরও কতগুলো জিনিস কোনটা কাকে দিতে হবে, তাও বলেন। প্রসাদ বলেন—এখন এসব কথা বলছ কেন? রাত হয়েছে,

তুমি ঘুমোও।

পরের দিন ১৬ জুন সকালে ছেলেকে বলেন—তাড়াতাড়ি বাজারে যা, ফেরার পথে ডাক্তারকে বলে আসিস যেন একবার আসে, এই দ্যাখ, হাতে একটু কেমন চুলকানি মতন হয়েছে। প্রসাদ হাতখানা দেখে বলেন, কই, কিছু তো দেখছি না। তিনি তাড়া দিয়ে বলেন—তুই যা না, তাড়াতাড়ি যা। অগত্যা প্রসাদ বেরিয়ে যান। এর পরে পুত্রবধূ তাঁর জন্য এক কাপ হরলিকস নিয়ে এলে তাকে বলেন—তোর ছেলের পরীক্ষা, সে পড়ছে, তুই তার কাছে যা। পুত্রবধূ কিন্তু যান না, বলেন—আপনার খাওয়া হোক, তারপর যাব। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তুই যা না ছেলের কাছে। কিন্তু শ্বশুরের প্রতি পুত্রবধূরও ছিল সন্তানের মত মমতা, তিনি আবারও বলেন, আপনার খাওয়া হোক আগে। পরের মুহূর্তেই একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বলেন—আজ খুব গরম পড়েছে, নারে? বধূমাতা উত্তর দ্যান—আষাঢ় মাস পড়ল তো, তাই গুমোট। ত্রৈলোক্যনাথ অস্ফুট স্বরে 'তাই হবে হয়তো' বলতে বলতে নীরব হয়ে গেলেন—মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ল। তাঁর ভঙ্গী দেখে পুত্রবধূ চিৎকার করে ওঠেন 'বাবা' 'বাবা' বলে—কিন্তু জাগতিক কোন ডাক আর তাঁর শ্রবণে পৌঁছল না, স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সব মায়া কাটিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ চলে গেলেন তাঁর কাছে, যাঁর বার্তা বহন করে ফিরেছেন সম্পূর্ণ জীবন। সম্ভবত মায়াডোর ছিন্ন করার জন্যই প্রয়াণমুহূর্তে কোন প্রিয়জনকে কাছে রাখতে চাননি তিনি।

তাঁর মৃত্যর পর সৎসঙ্গ আশ্রমের মুখপত্র আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ - শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যথাযথভাবে তাঁকে 'গুপ্ত তাপস' অভিধায় অভিহিত করে বলা হয়—"... শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ মূর্ত্ত ক'রে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। বহু বাধা বিঘ্ন ও সংগ্রামের দরিয়া পার হয়ে তিনি ইষ্টনিষ্ঠাকে অচ্যুত করে রেখেছিলেন। বলতে গেলে, তিনি ছিলেন গুপ্ত তাপস। ..."

তাপস ত্রৈলোক্যনাথের ইষ্টার্থ-প্রচার-তপস্যার সুফল দেশান্তরে যুগান্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে নিত্যগতিশীল হয়ে রয়েছে।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।
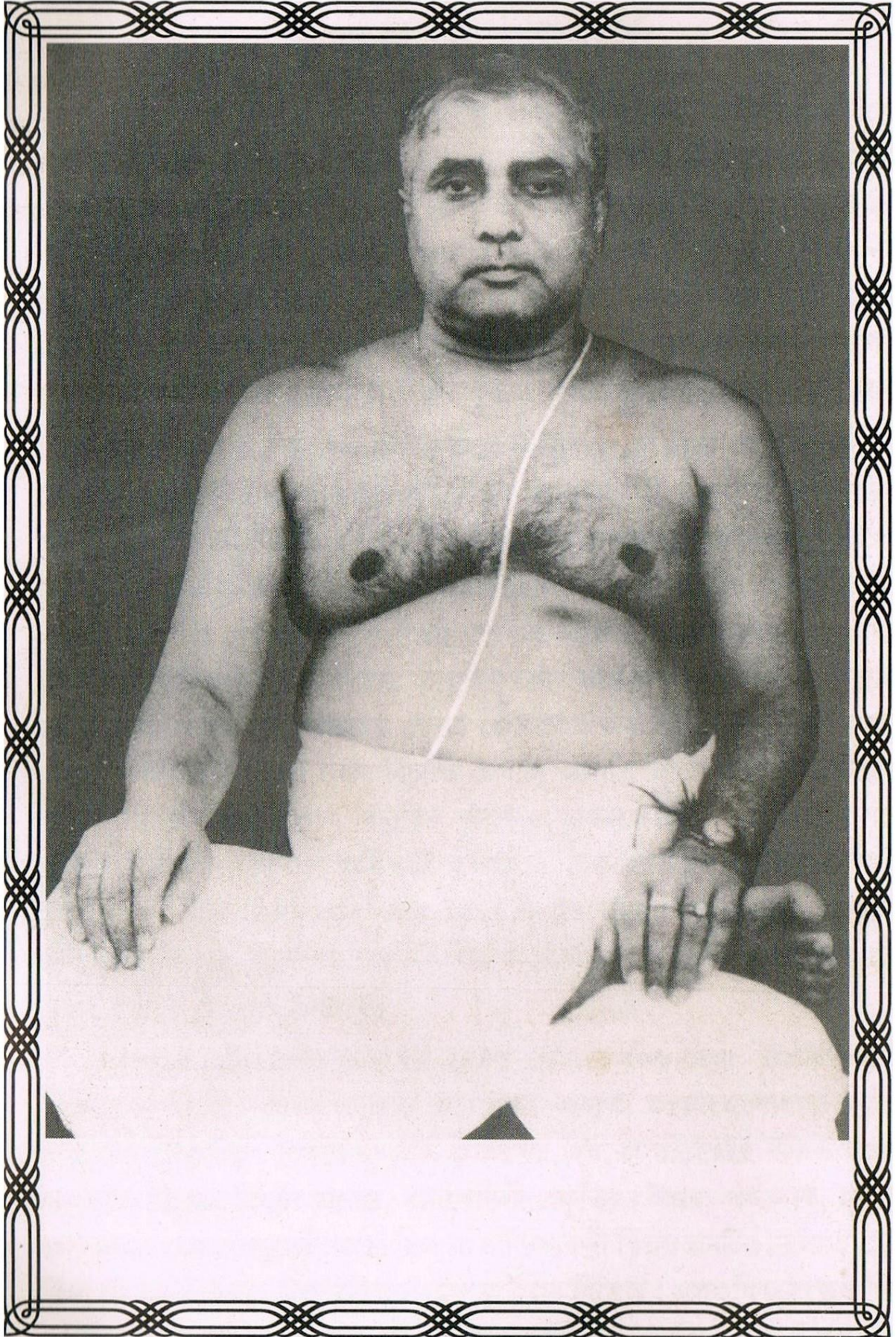
কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

২৮শে পৌষ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ — ২৪শে চৈত্র, ১৩৬৯

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ বিশেষ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানকে বলে বিজ্ঞান। এই জ্ঞানের যিনি বেত্তা, তিনি হলেন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি তাই সর্বদাই থাকে তত্ত্বের প্রতি, কারণের প্রতি। সি. ভি. রমনের প্রিয় শিষ্য, অসাধারণ মেধাবী বিজ্ঞানী কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে সর্বসত্তার যিনি মূল কারণস্বরূপ, তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর অশেষ জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানমনস্ক সন্ধানী যাবতীয় কৌতূহল পরম সমাধানের সমাপ্তি খুঁজে পেয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের লোকোত্তর প্রজ্ঞার মধ্যে।

বস্তুত, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে এক অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের রত্নভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম মাণিক্য বললে অতিশয়োক্তি হয় না। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটির জ্ঞান-গরিমা, আভিজাত্য, সুতীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তি, অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা, বাক্‌নৈপুণ্য, সর্বোপরি ঠাকুরের বক্তব্য ও জীবনদর্শনের সহজ অনুধাবন-শক্তি তাঁকে এক পৃথক উচ্চতায় আসীন করেছিল। শিশুর সারল্য, স্নেহ কোমল অন্তর ছিল তাঁর মধ্যে; অপরদিকে ইষ্টার্থ পূরণে ছিলেন অনন্য, কঠোর। ঠাকুরের কোন আদেশ পালনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি অথবা সাধনভজনের ক্ষেত্রে কোনরকম অবহেলার সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করেননি। কারও কোন বিচ্যুতি দেখলে আলাপ আলোচনায় তার উদ্ভাবনী শক্তি বাড়িয়ে ধরিয়ে দিতেন বিচ্যুতির কারণ ও সাধনক্ষেত্রের অবহেলাকে। সহজ অথচ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কৃষ্ণপ্রসন্ন, ঠাকুরের প্রিয় 'কেষ্টদা'-র বিচরণ ছিল সর্বত্র অবাধ। বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যতি আশ্রম, বক্তৃতামঞ্চ ইত্যাদি সর্বস্থানেই দৃঢ়চেতা মানুষটি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রাণ, ঠাকুর বিষয়ক প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয় ২৮শে পৌষ ১৩০১ ঢাকা জেলার অন্তর্গত দিগ্‌বাজার গ্রামে। পিতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন। শৈশবে মাতৃহীন কৃষ্ণপ্রসন্ন, হয়তো মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই, ছিলেন কিছুটা অশান্ত, খামখেয়ালী প্রকৃতির। ঈশ্বর, পরলোক, দেবতা-অপদেবতা কোন কিছুতেই আস্থা ছিল না নাস্তিক্যবাদী বিপ্রসন্তানটির। বলতে গেলে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বিপ্র পরিবারে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। এসব কিছু সত্ত্বেও পিতা কালীপ্রসন্ন বলতেন,—দেখিস, এই কেষ্টই একদিন এমন আস্তিক হয়ে উঠবে, এমন ভগবদবিশ্বাসী হয়ে উঠবে যে তার তুলনা মিলবে না। উত্তর জীবনে পিতার এই ভবিষ্যদ্-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভিতরকার স্বাভাবিক নেতৃত্ব প্রকাশিত হয়; লাইব্রেরি,

ক্লাব ইত্যাদি গড়ে তোলা, থিয়েটার করা প্রভৃতি নানা গঠনমূলক কাজে নিজেও মেতে উঠতেন, বন্ধুবান্ধবদেরও মাতিয়ে রাখতেন। পড়াশুনোর জন্য বাইরে থাকতে হত, ছুটি পড়লেই চলে আসতেন গ্রামে আর তিনি এলেই যেন উৎসব লেগে যেত। আরম্ভ হত চড়ুইভাতি, থিয়েটারের রিহার্সাল, খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান। আড্ডা, হৈ-চৈ, সব মিলিয়ে আনন্দের এক বিরাট বাতাবরণ। এম. এ. পরীক্ষার আড়াই মাস আগে একটি বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীরূপে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে বাড়ি ফিরে দেখেন পিতার রুদ্রমূর্তি। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার অল্প আগে পড়াশুনো না করে আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন পুত্রকে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেই মুহূর্তে সংকল্প করেন, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে হবে। তাঁকে আশৈশব মাতৃস্নেহে পালন করেন তাঁর দিদি, যাঁকে তিনি 'দিদিমণি' সম্বোধনে ডাকতেন। তাঁর ঐ সংকল্পটি একটি কাগজে লিখে দিদির হাতে দিয়ে বলেন—দিদিমণি, এটা রাখ্, এখন দেখবি না, আমি যখন বলব, তখন দেখবি। তারপর হিসেব করে দেখলেন, দিনে বাইশ ঘন্টা করে পড়লে প্রথম হওয়ার উপযোগী পড়া হয়। চলল সেইমত পাঠাভ্যাস। 'দিদিমণি'-ই স্নান করিয়ে, খাইয়ে, যা প্রয়োজন যথাসাধ্য করিয়ে দিতেন তাঁর নয়নমণি ভাইটিকে। আর কৃষ্ণপ্রসন্নের কাজ ছিল নিরবচ্ছিন্ন পাঠ। সংকল্প অনুযায়ী এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন, লাভ করলেন স্বর্ণপদক। পরে দিদির কাছে রাখা কাগজ খুলে সকলকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য।

অল্প বয়স থেকে অপরের মনের মধ্যে প্রবেশ করা এবং অন্যের মনের ভাব জানার একটা স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই ক্ষমতার অনুশীলন করতে করতে এমন অবস্থা হল যে কাউকে দেখলেই তার মনের কথা তক্ষুনি বলে দিতে পারতেন। এই অভ্যাস শেষে একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। ফলে বন্ধুবান্ধবেরা কেউ আর তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইত না, এড়িয়ে চলত। পরবর্তীকালে আশ্রমে এসে ঠাকুরের কাছে এই বিদ্যার কথা বলায় তিনি কৃষ্ণপ্রসন্নকে এটি করতে নিষেধ করেন। তখন থেকে এই অভ্যাস ত্যাগ করেন তিনি। অনেক বছর পর সাধনভজনের পথে অগ্রসর হয়ে যখন ঠাকুরের ভাবধারায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অভিষিক্ত করে তুলেছেন, তখন ঠাকুর বলেছিলেন—এখন অবশ্য আরম্ভ করতে পারেন। কিন্তু ঐ স্পৃহা তখন তাঁর ভিতর থেকে পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে।

তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন ছিল দেশসেবা করার। কিন্তু দেশের কাজ করতে হলে শক্তি দরকার। এই শক্তি পাবেন কোথা থেকে—ভাবতেন সে কথা। কোন এক ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলেন যে এমন শক্তি লাভ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

সেই শক্তি লাভের আশায় অনেক সাধুসন্ন্যাসীর কাছে গেছেন, কিন্তু পান নি কিছুই। স্থির করলেন, শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাবেন যোগসাধনার উদ্দেশ্যে। ঠিক এমনি সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু কথা পাঠ করে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে এলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁর এতদিনের স্বপ্নকে রূপায়িত করার পথ খুঁজে পেলেন।

মজিলপুরের অধিবাসী ধীরেন চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন কলকাতার অখিল মিস্ত্রি লেনে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। কৃষ্ণপ্রসন্নর চৌম্বক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট ধীরেন চক্রবর্তী ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্নর বিশেষ অনুরাগী এবং প্রীতিভাজন। মজিলপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণে যে বিপুল ভাবতরঙ্গের আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাতে অংশ নিয়ে ধীরেন চক্রবর্তী সৎনামে দীক্ষিত হন এবং কলকাতায় এসে সোচ্ছ্বাসে কৃষ্ণপ্রসন্নর কাছে ঠাকুরের কথা বর্ণনা করেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন স্বভাবসুলভ পরিহাসের সুরে বলেন— তোর চেহারা দেখেই তো তোর ঠাকুরের চেহারা বুঝতে পারছি! ধীরেন চক্রবর্তী ছিলেন শ্যামবর্ণ, সাধারণ আকৃতির মানুষ। তিনি কিন্তু হাল ছাড়লেন না—ঠাকুরের বাণী সম্বলিত একখানি প্রকাশনা দিলেন কৃষ্ণপ্রসন্নকে। পরদিনই সেটি ফেরৎ পেলেন — দেখলেন, বাণীগুলির তলায় বহু জায়গায় দাগ দেওয়া আছে, অর্থাৎ, গভীরভাবে পঠিত হয়েছে সেগুলি। এরপরই ধীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে পাবনা আশ্রমে ঠাকুর-দর্শনে গেলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন, এবং বলা যায়—"প্রথম আঘাতেই ধরাশায়ী"।

বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র কৃষ্ণপ্রসন্ন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হন। তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য ঠাকুর এমন সাবলীলভাবে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিত করেন, যা তরুণ বিজ্ঞানীর কাছে অভূতপূর্ব এবং অকল্পনীয় বলে বোধ হয়। বিজ্ঞানের যে বিষয়ে তিনি তখন গবেষণারত, তার সবটাই যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টির অন্তর্গত; অতএব এই মহাবিজ্ঞানীর কাছে তিনি যে সম্পদ পাবেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই যে তা দিতে পারবে না, তা তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন।

পুরী যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ঠাকুর তখন কলকাতার হরিতকী বাগান লেনে কিছুদিন ছিলেন; এখানেই কৃষ্ণপ্রসন্নর দীক্ষা হয়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করেন। প্রথম থেকেই ঠাকুর তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, যথা- ইলেকট্রন-বাদ, আলোকতত্ত্ব, মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান, বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎপ্রবাহের আধান ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতেন, যা তাঁকে গভীরভাবে বিস্মিত ও আলোড়িত করত। এই সময় হুগলি কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অধ্যাপক রমনের কাছে 'Electric Properties of Flames.'—সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী থেকে আশ্রমে ফেরার পর কৃষ্ণপ্রসন্ন আবার এলেন হিমাইতপুর।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

এই সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎপ্রবাহের আধান বা Atmospheric electricity-কে ধরে তাকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা নিয়ে ঠাকুরের কাছে অনেক কথা শুনলেন। তিনি বিষয়টি প্রথমে ভালভাবে অনুধাবন করতে না পারায় ঠাকুর ছবি এঁকে গাণিতিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। আশ্রমে Atmospheric electricity সংক্রান্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর বলে কলকাতায় ফিরে এসে কৃষ্ণপ্রসন্ন অধ্যাপক রমনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অধীনে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু রমন তাতে সম্মত হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিপ্রেত গবেষণার সুযোগ না থাকায় তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে স্থায়ীভাবে আশ্রমে চলে আসেন এবং গবেষণার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে BI-WEEKLY BENGALEE পত্রিকায় দেখেন, হাঙ্গেরীয় এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বায়ুমণ্ডল থেকে তড়িৎপ্রবাহ ধরার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই বিষয়ে ঠাকুরের ধারণার অভ্রান্ততা প্রমাণিত হল।

ধীরে ধীরে হিমাইতপুর আশ্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ‘বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র’ নামে একটি গবেষণাগার তৈরি হল। আনানো হল বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণার ব্যাপারে তাত্ত্বিক পরামর্শ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিষয়ে উপদেশ দিতেন স্বয়ং ঠাকুর, এবং প্রধান গবেষক ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; তার সহায়ক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। অত দিন আগে নিতান্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে তাঁরা বস্তুত এক বিজ্ঞান-বিপ্লবের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে যার প্রকৃত মূল্যায়ন, দুর্ভাগ্যক্রমে, হয়তো প্রচার বিমুখতার কারণেই হয়ে ওঠে নি।

বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মপ্রবাহ ছাড়াও আশ্রমের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করেন কৃষ্ণপ্রসন্ন। আশ্রমের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত ধর্মজিজ্ঞাসু ও কৌতূহলীদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে বিদেশীরাও। বিদেশীদের ঠাকুরের বাণী ও ভাবধারা পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবধান অসুবিধা সৃষ্টি করত। অনুবাদের সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করা হলেও প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে তাতে কিছুটা বাধা হত। এ কারণে কৃষ্ণপ্রসন্ন ঠাকুরের শ্রীচরণে ইংরেজিতে বাণী দেওয়ার অনুরোধ করেন। ঠাকুর সে-কথা শুনে চমকে উঠে বলেন—সে কী কথা! আমি মুখ্যু মানুষ। লেখাপড়া জানি নে। আমি কব ইংরেজি? কেষ্টদা কয় কী? কিন্তু কেষ্টদা ঠাকুরকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি জানতেন ঠাকুরকে ঠিকমত উদ্দীপ্ত করতে পারলে যে কোন ভাষাতেই তিনি কথা বলতে পারেন। তাই নাছোড়বান্দা হয়ে সময় সুযোগ বুঝে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ক্রমাগত ঠাকুরকে বলতে থাকেন—আপনি বললেই হয়ে যাবে, ও কিছু না। তাঁর কথাগুলি মৌলিক ইংরেজি ভাষাতে পাওয়া যে আজ জগতের কাছে কতখানি প্রয়োজন তা বারবার তুলে ধরতে থাকেন বিভিন্নভাবে। ক্রমে ক্রমে ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হতে থাকে। কিন্তু এজন্য বাহ্যিক কোন প্রস্তুতি নিতে হয় নি ঠাকুরকে, নিত্যকার আলাপ-আলোচনা, আহার-নিদ্রা বা কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়া সবই করতেন স্বাভাবিকভাবে নিত্যকার নিয়মে। উপরে সব শান্ত, সব স্বাভাবিক, অথচ ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছে এক স্বতঃউৎসারিত প্রস্রবণের ধারা। হঠাৎ একদিন শৌচালয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর চিৎকার করে ডাকলেন,—কেষ্টদা, এসে গেছে! কৃষ্ণপ্রসন্ন ছুটে এলেন। ইংরেজি ভাষা অবলম্বনে ফুটে উঠল তাঁর প্রথম বাণী :

" The booming commotion
of Existence
that rolls
in the bosom of the Beyond ..."

সৃষ্টির আদিমতম অবস্থার বিবরণ। নির্ঝরের উৎস উৎসারিত হওয়ার পর বহে গেছে বাণীর স্রোতস্বিনী—জীবনের সমস্ত দিক সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় বলে গেছেন বহু কথা। ক্রমে ক্রমে ইংরেজি বাণীর সংখ্যা দাঁড়াল দু'হাজার চারশো সাতষট্টিতে, পরে যা 'The Message' নামক গ্রন্থে নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই অমূল্য সম্পদ আহরণে কৃষ্ণপ্রসন্নের ভূমিকা চিরকাল মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন,—আমি জানি না আমাকে দিয়ে কী করে ইংরেজিতে এত কথা বলালেন কেষ্টদা, এত ছড়া বলালেন, ওসব কেষ্টদার কেরদানী। আবার কখনও বলেছেন, কেষ্টদাই উসকিয়ে দিয়ে অমনতর আদায় করে নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দেওয়া বাণী প্রসঙ্গে বলেছেন,—ওগুলি আমার কাছে যেমনভাবে এসেছে আমি তাই বলেছি। এছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না। আমি বুদ্ধি করে কিছু বলিনি। আমি যদি লেখাপড়া জানতাম তবে আমার আর এ Originality থাকত না। এখন এ কথাগুলি ল্যাংটা হয়েছে। আমার কোন অধিকার এর ওপর নেই।

প্রতি বছর নববর্ষ ও শারদীয়া বিজয়া উৎসব উপলক্ষে বাণী প্রদান করেছেন ঠাকুর। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে আশীবাণী দিয়েছেন। এই আশীর্বাণীগুলি সাহিত্যরসে পূর্ণ এক অনবদ্য সৃষ্টি; পরবর্তীকালে এগুলি গ্রথিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এগুলি সহজে আসত না। আদায়ের কৌশলটি বিশেষভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন। যেমন—নববর্ষের আশীর্বাণীর সময়ে বৈশাখ, বিশাখা, নিদাঘ ইত্যাদি শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা হত। আলোচনা চলত গ্রীষ্মের বিশেষ অবস্থা নিয়ে। কখনও বা ঋতুসংহার কাব্য থেকে গ্রীষ্ম বর্ণনা পড়ে শোনানো

হত। কৃষ্ণপ্রসন্ন এগুলি ক্রমাগত করে চলতেন। একসময়ে ঝরনাধারার মত নেমে আসত মন্ত্রতুল্য শব্দরাশি শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে। কৃষ্ণপ্রসন্নের এই উদ্দীপক গুণটির প্রশংসা করতে গিয়ে ঠাকুর বলতেন,—'কেষ্টদা পানাতে জানে'। দুধ দুইবার আগে বাছুরকে দিয়ে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে চুষে চুষে টুঁ মেরে দুধ আনানো হয়, এটাকে চলতি কথায় পানানো বলে। ঠিক তেমনি কৃষ্ণপ্রসন্ন ঠাকুরকে ক্রমাগত উদ্দীপিত করে ঠিক জিনিসটি বের করে নিতে পারতেন।

কৃষ্ণপ্রসন্ন বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রশ্নের মাধ্যমে যে-সব সমাধানী উত্তর পেয়েছিলেন, তা 'নানাপ্রসঙ্গে' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুর প্রদত্ত উত্তরগুলির সমর্থনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দের সমজাতীয় উক্তিসমূহের পাদটীকা সংযোজন করেন তিনি। প্রথম খণ্ড ন'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কর্ম ও ধর্মের সমন্বয়, নামধ্যানের ক্রিয়া, জন্মমৃত্যু সম্পর্কিত রহস্য, সমাজ-সংস্কার, বিবাহে নারী, স্ত্রীশিক্ষা, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, মহাপুরুষ, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয় এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে।

'নানাপ্রসঙ্গে'-র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৯৩৯-এ। এই খণ্ডেরও অধ্যায় ন'টি। স্বাধীনতা ও রাজনীতি, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন, সমাজ ও বিবাহ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, জাতির স্বাস্থ্য সংস্কার, কৃষক ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। যথাক্রমে ছ'টি ও পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঐ দুই খণ্ড। আত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, যাগযজ্ঞ, ধ্যান, বিদ্যা, অবিদ্যা, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, চতুরাশ্রম, আর্য্য ও আর্য্যকৃষ্টি, দারিদ্র্যব্যাধি এবং সাধনভজন সংক্রান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরসমূহ বিষয়ক আলোচনা রয়েছে তৃতীয় খণ্ডে। চতুর্থ খণ্ডে সুসন্তানের আবির্ভাবের কারণসমূহ, সৎ চালক ও ইষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা সুগ্রথিত।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংকলিত অপর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ইসলাম প্রসঙ্গে'। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থে প্রশ্নকর্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং মোহাম্মদ খলিলর রহমান, উত্তরদাতা শ্রীশ্রীঠাকুর। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশ যে তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বইটি পাঠে অকপটে বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িকাতার এমন সুষ্ঠু সমাধান আর কিছু হতে পারে না এবং মাত্র এই ভিত্তিতেই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র জনমণ্ডলী ভাগবত ঐক্যের অমৃত সূত্রে গ্রথিত হয়ে উঠতে পারে'। বর্তমানকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক হোসেনুর রহমান এবং জাস্টিস এ. এস. মাসুদ 'ইসলাম -প্রসঙ্গে'-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইসলাম ধর্মের

সার্বজনীন স্বরূপ এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে এই ধর্মের মৌলিক সাদৃশ্য উদ্ভাসিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সংকলিত বা প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অনুসৃতি, চলার রীতি, যজনিকা, যাজক নীতি, যাজন সংকেত, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও সৎসঙ্গ আন্দোলন (ইংরেজি সংস্করণসহ), সৎসঙ্গের স্বস্তি অভিযান এবং মনের পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রসন্নের দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন,—'দেখিস, কেষ্টদার একটা জিনিসও যেন এদিক ওদিক না হয়, সব যত্ন করে রেখে দিস। কেষ্টদার লেখাগুলি সব গুছিয়ে ঠিক করে রেখে দিবি। টুকরো-টুকরো কাগজগুলোও যেন কোনটা নষ্ট না হয়—ভাল করে লক্ষ রাখবি।' ঠাকুরের এই উক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্নের দেহাবসানের বহু বছর পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী প্রীতিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন 'দিনপঞ্জী' শীর্ষক গ্রন্থ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত এই দিনপঞ্জীর পরিসর কাল। ধারাবাহিকতার কিছু অভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এই মহামূল্য গ্রন্থটি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে অন্যতর আলোকপাতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়াও তাঁর আরও কিছু অপ্রকাশিত রচনা আছে, যার মূল্যায়নে ভবিষ্যৎ গবেষকরা এগিয়ে আসবেন।

কৃষ্ণপ্রসন্নের কমনীয় কান্তি, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, আড়ম্বরহীন সহজ সপ্রতিভ আত্মপ্রকাশ—সবই ছিল দৃষ্টি আকর্ষক। ঠাকুরের কাছে সরল শিশুর মত কৌতূহলী এবং আগ্রহভরা দৃষ্টিতে একপাশে বসে থাকতেন। জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থীর মত সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন গুরুর দিকে। সমস্ত দেহমনের অভিব্যক্তিতে আত্মনিবেদনের স্নিগ্ধ শান্ত রূপ। আবার ভিন্ন পরিবেশে প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বে সুকঠিন, জ্ঞানে সমৃদ্ধ, সংকল্পে অটল, সাধনায় অনড়, আভিজাত্যে সমুন্নত, নেতৃত্বে অগ্রগামী। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে নাগাল পাওয়া কঠিন। তিনি বহুর মধ্যে থেকেও বহুর ঊর্ধ্বে, জনতার মধ্যে জননেতা, তপস্যায়, মনীষায়, পুরুষকারে পুরুষসিংহ।

বর্তমানে সৎসঙ্গে বক্তার অভাব নেই। কিন্তু এমন দিন গিয়েছে যখন বক্তা বলতে কেবল তিনি। আসর মাতিয়ে রাখতেন একাই। যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ওজস্বিনী ভাষায় যথেষ্ট পরিমিতি সহকারে ঠাকুরের অবদানের একটি সুস্পষ্ট ছবি সবার সামনে তুলে ধরার অতুলনীয় ক্ষমতা তাঁর ছিল। পরিবেশ অনুধাবন করে কী বলতে হবে, কতটুকু বলতে হবে এবং কেমন করে উপস্থাপন করলে ফলদায়ী হবে, মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতেন তিনি।

একবার শ্রীরামপুর টাউনহলে সভা। আলোচ্য বিষয়—শিক্ষা । উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই বেশি; অধ্যাপকও আছেন কয়েকজন, এছাড়া

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও সমবেশ ঘটেছে। সভা আরম্ভ হয়েছে। কয়েকজনের বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর সর্বশেষ বক্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। সভাপতি আহ্বান জানালেন সৎসঙ্গের ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন এসেছেন খালি গায়ে। কাঁধে শুধুমাত্র উত্তরীয়। পরনে কোমরে বাঁধা ধুতি, হাতে মোটা লাঠি, মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, তার মধ্যে বিরাট এক শিখা। আধুনিকতার চিহ্ন নেই, উপরন্তু 'ঋত্বিগাচার্য্য' উপাধিটি রীতিমত সংস্কৃত ঘেঁষা। শ্লোতৃমণ্ডলী তাঁকে একজন তথাকথিত টোলের পণ্ডিত বা ঐ জাতীয় কিছু একটা আঁচ করে নিয়েছে। ছাত্রমহলের মুখে বিদ্রূপাত্মক চাপা হাসির অবজ্ঞামিশ্রিত গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। অবস্থাটা মুহূর্তে বুঝে নিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন। এরা সব নব্যশিক্ষিতের দল। অশিষ্ট দাম্ভিকের দম্ভকে গোড়াতেই যদি চূর্ণ করা না যায়, তবে শোনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না।

তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন,—'পদার্থবিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিটি নিয়ে যখন প্রথম স্থান অধিকার করে বেরিয়ে এলাম, তখন ইউনিভার্সিটি পরিয়ে দিল সোনার মেডেল, সেটা সবাই দেখল . . .। অর্থাৎ শুরুতেই নিজের পরিচয়টি বুঝিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে শ্রোতাদের চাপা গুঞ্জন থেমে গিয়ে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের চিহ্ন। মুহূর্তের মধ্যে সভাকক্ষ নিস্তব্ধ।

তিনি বলে চললেন—কিন্তু তার সঙ্গে অদৃশ্য আর একটি মালা পরিয়ে দিল যা রইল সবার দৃষ্টির অগোচরে, সেটা হচ্ছে অহমিকার মালা। এলাম ঠাকুরের কাছে, তিনি বললেন—বা রে শিক্ষা! যত বেশি ডিগ্রিধারী তত বেশি আনএডুকেটেড। বিদ্যা বিনয় দান করে, এ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ, আর বিদ্যা অহংকারের পুষ্টি দেয়, তা হচ্ছে আমাদের নব্য-ইউরোপীয় শিক্ষার ধারা . . .।

তারপর চলল অগ্নিগর্ভ ভাষণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার আদর্শ নিয়ে তুলনামূলক বিচার, জীবনের প্রয়োজনে তার মূল্য নিরূপণ এবং সর্বশেষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষাধারার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট অবদান বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করে দিলেন।

আর একবার জামশেদপুরে মিলনী হলে সভার আয়োজন হয়েছে। সভাপতিত্ব করবেন টাটা কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার। ওয়ার্কস ম্যানেজারের কৃপাদৃষ্টিতেই অফিসারদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সেই ম্যানেজার যেখানে সভাপতি, বলা বাহুল্য সেই সভায় অফিসারদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের হাবেভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে সৎসঙ্গের আদর্শ জানবার চেয়ে ওয়াকর্স্ ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণের আগ্রহ তাদের সমধিক।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সভা আরম্ভ হল। কয়েক জনের পর কৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা দিতে উঠে বলতে আরম্ভ করলেন—জামশেদপুরে এসে দেখলাম এখানে এক মহাজাতির সম্মেলন হয়েছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি এসে জড়ো হয়েছেন। বহির্ভারতের সুদক্ষ কর্মীগণেরও সমাবেশ ঘটেছে। বিরাট শহরের বুকে বহু বিচিত্র জাতির মেলা। এখানে যেমন একটা শহরকে কেন্দ্র করে এমন বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে, ঠিক এত বড় না হলেও এমনতরই আর একটা সমাবেশ দেখার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছে। কোন শহর নয়, শিল্পনগরী নয়, বাংলার এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম হিমাইতপুর। সেখানে একজন মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র—তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বহির্ভারতের বিদ্বৎজনের এমনতরই সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ আছে, সেইটুকুই আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

এখানে সবাই এসে মিলিত হয়েছেন উদরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আর সেখানে সবাই এসে মিলিত হয়েছে অন্তরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য। জন্তুর আদিম চাহিদা যে ক্ষুধা সেইটুকু মেটাতে পারলে এখানে পরিতৃপ্তি আর সেই উপকরণ সংগ্রহের জন্যই এখানে প্রতিযোগিতার সংগ্রাম। আর সেখানে আদিম ক্ষুধা ছাপিয়ে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য, বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য শত শত মস্তিষ্ক সঞ্চালিত।...

এমনি করে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরলেন আদর্শবাদের অপরিহার্যতা। ফিলসফি অব হাঙ্গারের পাশে ফিলসফি অব আইডিয়ালিজম্, তথাকথিত সাম্যবাদের বিক্ষোভের পাশে ঋষিবাদের প্রজ্ঞার দীপ্তি।

জুলিয়াস সীজারের 'ভিনি, ভিডি, ভিসি', অর্থাৎ এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—তাঁর ক্ষেত্রে ছিল আক্ষরিক অর্থে সুপ্রযোজ্য। যেখানেই যেতেন, সেখানেই সবার অন্তর জয় করে আসতেন, তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দিতে সবার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। সকলের সঙ্গে সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের সত্তাকে জয় করে নেওয়ার মত আচরণ ও ব্যবহার ছিল তাঁর সহজাত, ঠাকুরের চৌম্বক ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে যা বহুগুণ বর্ধিত হয়ে উঠেছিল।

অভিজাত বংশের সন্তান, যাঁর সুপণ্ডিত পিতা ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, যাঁর বাড়িতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন সরকারের মত মনীষীদের সহজ আনাগোনা, যিনি প্রশান্ত মহলানবীশ ও সি. ভি. রমনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের প্রিয় ছাত্র এবং সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অতি ঘনিষ্ঠ, আবাল্য কলকাতা মহানগরীতে লালিত প্রখর বুদ্ধি, যুক্তি, মননশীলতার অধিকারী এ-হেন কৃষ্ণপ্রসন্ন বৈষয়িক দিক থেকে বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন পিছনে ফেলে রেখে কীসের প্রেরণায় ছুটে গেলেন ক্ষুদ্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এক পল্লীর আয়াসসাধ্য জীবনে, তা বাহ্যত বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তখন সৎসঙ্গের না ছিল প্রতিষ্ঠা, না ছিল ঐশ্বর্য বা খ্যাতি বা বস্তুগতভাবে আকর্ষণীয় কোন কিছু। আর্থিক অসচ্ছলতা, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবর্জিত জীবনযাপন আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করে একদল নরনারীর সহজ বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসার উৎসার, নামধ্যান, কীর্তনের আনন্দের উচ্ছলতা—এই ছিল তখন হিমাইতপুর আশ্রমের জীবন। কিন্তু তারই মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন খুঁজে পেয়েছিলেন অস্থির জীবনজিজ্ঞাসার স্থির প্রত্যয়ী উত্তর পরম সমাধানকারী পুরুষোত্তমের চরণপ্রান্তে।

তাঁর স্বজনমণ্ডলী, অগণিত বন্ধুবান্ধব, গুণমুগ্ধ ও ঘনিষ্ঠজনের কাছে এভাবে বৈষয়িক ও পার্থিব সাফল্য ত্যাগ করে তাঁর গুরু সান্নিধ্য প্রাপ্তির ব্যাপারটি স্বভাবতই বিস্ময়কর লেগেছিল। অনেকেই এতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন, অনুরোধ-উপরোধ, আদেশ -নির্দেশে চেষ্টা করেন তাঁকে ফিরিয়ে নিতে, কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর প্রত্যয়ের বিন্দু থেকে একচুলও নড়াতে পারেনি। তাঁর নিষ্প্রশ্ন গুরুনিষ্ঠার এক চরম নিদর্শন রয়ে গেছে তাঁর পিতার মৃত্যুকালীন ঘটনায়। পিতা কালীপ্রসন্ন যখন অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ, তখন কৃষ্ণপ্রসন্ন উজীরপুরে পিতার রোগশয্যাপার্শ্বে যান, কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাবনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুমূর্ষু পিতা বারবার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় বাড়ির সকলে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁকে বলেন যে কালীপ্রসন্নর ওষুধ আনতে বরিশাল শহরে গেছেন। ক্রমে কালীপ্রসন্নর চৈতন্য বিলুপ্ত হয় এবং তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে ঠাকুরের একটি চিঠি উজীরপুরে পৌঁছয় যাতে তিনি কৃষ্ণপ্রসন্নকে অবিলম্বে পাবনায় চলে যেতে বলছেন —

“ . . . দাদা! যদি আপনার পিতার নিকট আপনার অন্যান্য ভাইরা থাকেন আর আপনি সুবিধা করতে পারেন, তবে রামচন্দ্রের মতন—পিতার মৃত্যুকেও উপেক্ষা করে পিতারই জন্য—চলে আসতে চেষ্টা করুন আর তা যত শীঘ্র পারেন—এমন কী এখনই। . . . ”

বিস্ময়ের কথা এই যে, চিঠি পাওয়ার আগেই কৃষ্ণপ্রসন্ন অন্তরে গুরুর আদেশ উপলব্ধি করে পিতার মৃত্যুসময় আসন্ন বুঝেও সেখান থেকে গুরুর কাছে যান মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায় পূরণার্থে। বাহ্যত অস্বাভাবিক মনে হলেও, এবং আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নিন্দিত হলেও, কৃষ্ণপ্রসন্ন জানতেন—তাঁর গুরুর আদেশের পিছনে আছে গূঢ় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, যার অন্যথা করতে গেলে অনর্থ বাড়বে বই নয়। ঠাকুরের লেখা চিঠিটি পরে কৃষ্ণপ্রসন্ন-জায়া সুষমা দেবী কৃষ্ণপ্রসন্নকে দিয়েছিলেন। চিঠিটি পরে ‘তাঁর চিঠি’ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

কৃষ্ণপ্রসন্নর কোষ্ঠীতে আনুমানিক ঊনত্রিশ/ত্রিশ বৎসর বয়সে নিশ্চিত মৃত্যুযোগ ছিল। তিনি তখন পাবনা আশ্রমে ঠাকুরের সান্নিধ্যে চলে এসেছেন। ঐ বয়সে

মরণব্যাধি টাইফয়েড—যা তখন দুরারোগ্য ছিল—রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর নিজের বাড়ি বরিশালের উজীরপুরে তাঁর পিতা এবং দিদি ঐ সময়ে কোষ্ঠীফলের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছেন দুর্ভাবনায়। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতা মনোমোহিনী দেবী বিনিদ্র শুশ্রূষায় তাঁকে ঘিরে রেখেও ভাবছেন—বুঝি আর শেষ রক্ষা হল না! কোন চিকিৎসাই বস্তুত তখন ছিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে চলল। কিন্তু কীভাবে যেন অকস্মাৎ চরম অবস্থা থেকে একটু একটু করে প্রাণের দিকে ফিরে গেল গতি—ধীরে ধীরে লাভ হল পূর্ণ আরোগ্য। সর্ব গ্রহদোষভঞ্জন বৃহস্পতি অর্থাৎ গুরু কেন্দ্রে থাকাতেই অনিবার্য কোষ্ঠীফলও এভাবে নিবারণ করা সম্ভব হয়।

গম্ভীর, রাশভারি, প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষটির অন্তরে ছিল রসের ফোয়ারা। একবার এক দুঃসম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র দেওঘরে এসে তাঁর বাড়িতে ছিল কিছুদিন। একদিন সকালে তাঁর ছেলেমেয়েরা তখনও পড়তে বসেনি, একটু হৈ-হল্লা চলছে ভাইবোনে মিলে, অন্য ঘরে সেই ভাইপোটি বই নিয়ে বসে পড়েছে। তিনি ছেলেমেয়েদের বললেন—তোরা পড়তে বসিসনি এখনও, দ্যাখ্ তো, ও কেমন পড়ছে। এ কথা শুনে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে ভাইপো-রত্নটি একখানি গীতা কৃষ্ণপ্রসন্নর সামনে নিয়ে গিয়ে বলে—জ্যাঠামশাই, 'আত্মা' মানে কি? কৃষ্ণপ্রসন্ন আয়ত চক্ষু আরেকটু বিস্ফারিত করে ছেলেদের ডেকে বলেন—ওরে, কে আছিস, বাগানের মধ্যে উঁচু করে একটা দড়ি বেঁধে তার ওপর দিয়ে এটাকে হাইজাম্প দেওয়া—সাতসকালে এসেছে 'আত্মা'-র মানে বুঝতে!

তাঁর পুত্র প্রীতিপ্রসন্নর জবানিতে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতির মধ্যে তাঁর সরস মনের পরিচয় মেলে—"বাবার মেজাজ আমরা ধরতে পারতাম না। একদিন সকালে বকুনি দিলেন পড়াশুনো করি না বলে। পরদিন সকালে খুব বৃষ্টি পড়ছে, আমরা তাড়াতাড়ি বইপত্র নিয়ে বসে পড়েছি বাবাকে সন্তুষ্ট করতে। বাবা বললেন—আচ্ছা বেরসিক তো তোরা, এমন চমৎকার বৃষ্টি হচ্ছে আরা তোরা বর্বরের মত বই নিয়ে বসে আছিস? কোথায় তবলা, নিয়ে আয়, মান্তুনকে (ডাঃ দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণপ্রসন্নের অপর পুত্র প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সুগায়ক) ডাক, গান বাজনা হোক এখন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার তাঁর জীবনী লেখার কথা বলতেন কৃষ্ণপ্রসন্নকে, কিন্তু ঠাকুরের জীবনী তিনি লেখেননি। না লেখার সপক্ষে তাঁর ছিল এক অপূর্ব যুক্তি, যা একমাত্র তাঁকেই মানায়। বলতেন—মহাপুরুষের জীবনী লেখা সম্ভব নয়, ঠাকুরের জীবনী লেখা যায় না। লেখা চলে কেবল কিছু ঘটনা, কিছু কথা। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি, তাঁর বাচনবৈশিষ্ট্য, তাঁর কণ্ঠস্বরের জাদু, অপরূপ দেহভঙ্গিমা কে বর্ণনা করতে পারবে? তাছাড়া প্রতিবার যখনই তাঁর সামনে যাই, মনে হয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম,

নূতন অনন্য একজন মানুষ। এঁর জীবনী লিখব কি করে? কিছু লেখা মানেই তো আরও বিপুলতর কিছু বাদ পড়ে যাওয়া!

অগাধ জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কৃষ্ণপ্রসন্নর প্রকৃতিরই একটি অংশ। যে-কোন বিষয়ে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনো করতেন, এবং যখনই পড়তেন, আদর্শ ছাত্রের মত পড়তেন। দেওঘরে আসারও বেশ কিছু পরে ঠাকুরের নির্দেশে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। একজন পাণিনি পণ্ডিতের খোঁজ পাওয়া গেল দেওঘরের কাছাকাছি কোন গ্রামে। তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে—ধূলিধুসরিত গ্রামবাসী সেই পণ্ডিত মহাশয়কে অতি যত্নে বসিয়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বাধ্য ছাত্রের মত পাঠ শুরু করেন প্রৌঢ় কৃষ্ণপ্রসন্ন। আর একবার তাঁর প্রাক্তন সহপাঠী একজন গণিতের অধ্যাপক এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়ে তাঁকে বললেন—তুমি এসেছো, ভালই হল, ক'দিন বেশ অঙ্কের চর্চা করা যাবে, সব ভুলে গিয়েছি। ঐ অধ্যাপক যতদিন তাঁর বাড়িতে ছিলেন ততদিন রীতিমত নিয়ম করে তাঁর সঙ্গে দুরূহ গাণিতিক তত্ত্বের চর্চা চলত। জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত যেকোন আলাপ-আলোচনা ছিল তাঁর কাছে একান্ত বিনোদন।

কৃষ্ণপ্রসন্নর পুত্রগণ প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে কখনও প্রথামাফিক শাসন-পীড়ন করেননি। পরীক্ষায় ভাল ফলের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, চেষ্টা করতেন তাদের আগ্রহটি গজিয়ে দিতে। নির্ভুল উচ্চারণ, ভাবগ্রাহী পাঠ, এসমস্ত বিষয়ে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাদর্শ বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল তাঁর অতি নিকটস্থ যোগ্য সহচর কৃষ্ণপ্রসন্নর জীবন-চলনার মধ্য দিয়ে।

পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট অনেক মানুষ কৌতূহলী হয়ে পরিমাপ করতে চেয়েছে তাঁকে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির মানদণ্ডে; কিন্তু তিনি ছিলেন সাধারণ মাপকাঠির ঊর্ধ্বে, ধরাছোঁয়ার সীমারেখার বাইরে। কেবলমাত্র ঠাকুরগত প্রাণ নিয়ে এলে পাওয়া যেত তাঁর অন্তরের সন্ধান। ঠাকুরই ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের ধ্যান ও ভাবনা। তিনি বলতেন, —'ঠাকুর আমাদের জন্য কত পরিশ্রমই না করেছেন। বলতে গেলে একেবারে হাত ধরে সব কাজে অভ্যস্ত করিয়েছেন। কখনও বলে দিতেন, এখন খুব দম দিয়ে জপ ধ্যানে লেগে যান। শেষ রাত্রের দিকে আবার হয়তো হাঁক দিয়ে বলে দিচ্ছেন, উঠে পড়ুন, নাম করতে বসে যান। তখন কেবল অনুভূতির কথা, জপধ্যান, জ্যোতিদর্শন, অনাহত ধ্বনি শ্রবণ, এই সব নিয়ে আলোচনা—কত নেশায় মশগুল হয়ে থাকতাম। আশ্রম তখন গড়ার মুখে। পয়সাকড়ির খুব টানাটানি। দু'বেলা খাওয়াই জোটে না। তার মধ্যে হয়তো কোন কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা—তার জন্য টাকার প্রয়োজন। পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়, বলে দিলেন, যান,

ভিক্ষে করে সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন। অবস্থা তখন এমনতর যে কলকাতা যাবার পাথেয়টা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। এমন কি ভদ্রগোছের জামাকাপড় পরে যাব, তা সংগ্রহ করাটাও সমস্যা। আবার কখনও হয়তো বললেন, দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। প্রস্তাব শুনে ভড়কে যাবার মত কথা। দেশবন্ধুর তখন দেশ-জোড়া নামডাক। তাঁর কাছে যাই কোন ভরসায়? কিন্তু ঠাকুর নাছোড়বান্দা। বুক তো একটু দুরু দুরু করবেই, কিন্তু তা না হলে যাজন করে স্ফূর্তি কই? নিজের বিশ্বাসের পরীক্ষা কই? এমনি করেই শ্রেষ্ঠ যাজী হওয়ার কৌশলটা মনে হয় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিলেন।. . . ঠাকুরের ইচ্ছা হল, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। দিবারাত্রি একদলের পর একদল পড়িয়েই গেছি, এতটুকু বিশ্রাম ছিল না। অনেক ছেলে মেয়ে পার হয়ে গেল। ঠাকুর তখন নিজেই দেখিয়ে দিতেন কেমন করে ছাত্রদের মধ্যে Interest সৃষ্টি করতে হয়। . . .'

ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন লীলা একমাত্র তাঁরই পরিকল্পিত, তাঁর দ্বারাই নির্দিষ্ট। বহু জীবনের শুভ সংস্কার মানুষকে উপযুক্ত করে তোলে তাঁর লীলার সহকারী হিসেবে। আবার তাঁর সাহচর্যে হয় আরও ব্যাপ্তি, আরও প্রসার, যা ক্রমাগত উন্নয়নের পথে পরিচালিত করে। প্রিয়পরমের বুঝটুকু যখন মানুষের মধ্যে আসে তখন সে হয় নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত; একমাত্র তাঁর আশা-পূরণের মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। এই সার্থকতাই পেয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

ধীরে ধীরে আশ্রমের পট পরিবর্তন হল। ঠাকুরের ইচ্ছায় সৎসঙ্গে কর্ম্মমুখর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, বিপুল গ্রন্থরাজির প্রণয়ন হল, গড়ে উঠল ঋত্বিক সংঘের ব্যাপক আন্দোলন। এ সবকিছুতেই ঠাকুরের সহচর ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ঋত্বিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় ঠাকুর ছয়জন ঋত্বিক, অর্ধশতাধিক প্রতিঋত্বিক এবং কয়েক শত সহপ্রতিঋত্বিককে দীক্ষাদানের অনুমতি দেন। তাঁদের সর্বাধিনায়করূপে মনোনীত করেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে—তাঁকে ভূষিত করেন 'ঋত্বিগাচার্য্য' উপাধিতে। ১৩৪৬ সালে দীক্ষার পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করে 'ঋত্বিক' বই ছাপা হয় এবং আষাঢ় মাসের অধিবেশনে দীক্ষাদানের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিটি কর্মীকে দেওয়া হয়। ঋত্বিক সংঘের কলেবর ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে যে বিশাল আকার ধারণ করেছে, তার পুরোধা ছিলেন ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে চৈত্র আটষট্টি বছর বয়সে দেওঘরস্থ বাসভবনে এই মহাতাপসের মানবদেহের চির বিশ্রাম ঘটে। তাঁর তিরোধানের পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে আয়োজিত শোকসভায় বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ দেবপ্রসাদ ঘোষ স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, তাঁদের সমসময়ের এক অসাধারণ দীপ্তিমান বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

কৃষ্ণপ্রসন্ন। হঠাৎ তাঁরা জানতে পারেন যে কৃষ্ণপ্রসন্নের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এবং তিনি কোথাকার এক আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেওঘর আশ্রমে গিয়ে তাঁর (দেবপ্রসাদের) এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, অনন্ত শক্তির উৎসের কাছেই কৃষ্ণপ্রসন্ন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠায় ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্নর নিরসল সংগ্রামের বহু ইতিহাস আজ সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবু সৎসঙ্গের বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশে আছে তাঁর অস্তিত্ব, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে রয়ে গেছে তাঁর অচ্ছেদ্য প্রণোদনা; ঐহিক অস্তিত্বের সীমানা পেরিয়ে ইষ্টাত্ম তাঁর চির অবিনশ্বর সত্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবান্দোলনের মধ্যে নিত্য বহমান।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বঙ্কিমচন্দ্র রায়

অগাষ্ট, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ — ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৬

বঙ্কিমচন্দ্র রায়

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের খুব কাছের মানুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে বাহিত হত যাঁদের তৎপরতায়, তাঁরা সম্ভবত অতিনৈকট্যের কারণেই, প্রদীপের নিম্নস্থ অংশের মত, কিছুটা যেন সকলের অগোচরে, নীরবে থেকে গেছেন। তাঁরা ঠাকুরের নিত্যমুহূর্তের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের এমনভাবে একীভূত করে নিয়েছিলেন যে যেন তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব আর দৃশ্যমান ছিল না, ঠাকুরের নিয়ত-পরিপার্শ্বেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। এ-কথাটির তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায় ঠাকুরের অন্যতম নিত্য-সহকারী বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের জীবনরেখা অনুসরণ করলে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সাবডিভিশনের অধীনস্থ বল্লভদি গ্রামের এক বিপ্র পরিবারে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম—পিতার নাম বরদাকান্তি রায়। গ্রামের মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পরে, মাতুলালয় কার্ত্তিকপুরের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। একান্ত অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে একটি বহির্জগৎ-মুখী প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, ছিল কিছুটা অস্থিরতা। পারিবারিক বন্ধনের সীমার মধ্যে ছটফটিয়ে উঠত প্রাণ তাঁর, বাইরের বিরাট পৃথিবী যেন হাতছানি দিত নিয়ত। মাত্র পনের বছরের কিশোর বঙ্কিম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স-এর 'মিলিটারি কোর'-এ যোগ দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে চলে যান সুদূর মেসোপটেমিয়ায়, বাবা-মা এবং অন্যান্য গুরুজনদের আপত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েই। জীবনের বাস্তব পৃষ্ঠা থেকে লাভ করেন অভিজ্ঞতার মূল্যবান শিক্ষা। ফিরে এসে পরে কোচবিহার থেকে আই. এস সি. এবং কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এস সি. পাস করেন।

১৯২২-এর শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময়ে ১/১সি, হরিতকী বাগান লেন-এ ঠাকুরের অনুগামী বেশ কিছু তরুণ ও যুবকের আবাস ছিল। ঠাকুরের মাসতুত ভাই সতীশ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে বঙ্কিমও তখন ঐ বাড়িতে থাকতেন। বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির সভাপতিত্বে 'বিদ্যার্থী সংঘ' স্থাপিত হয় ঐ বাড়িতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই। সচিব হন আইনজীবী অমূল্য ভট্টাচার্য্য এবং সহকারী বনবিহারী ঘোষ। এই সংঘের সভায় ঠাকুরের ভাবধারা ও জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত—সভ্য বেশির ভাগই কলেজ পড়ুয়ার দল, যাদের মধ্যে অ্যানার্কিস্ট দলের উৎসাহী সদস্যও ছিল বেশ কিছু। ডাঃ সুবোধ সেনও বিশেষ

ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই সংঘের, পরে তিনি সেক্রেটারিও হন। শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় এলে তখন ঐ হরিতকী বাগানের বাড়িটিতে উঠতেন।

বঙ্কিম নিজে বিদ্যার্থী সংঘের সভ্য ছিলেন না। তবে অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল সংঘের মধ্যে, তাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে সংঘের মিটিং-এ যোগ দিতেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আখড়ার সঙ্গে তখন বিশেষ ছিল ঘনিষ্ঠতা বঙ্কিমের। ঐ বছর কালীপুজোর আগের দিন রাত্রে মিনার্ভা থিয়েটার হলে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে অন্যান্যদের সঙ্গে বঙ্কিমও যান। আগুন নিভিয়ে ভিজে কাপড়ে ফিরছিলেন—সে অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা, ঠাকুর এসে উঠেছেন ঐ বাড়িতে। বঙ্কিমকে দেখামাত্র বলে উঠলেন তিনি— 'অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি'—। বঙ্কিমের মনে হল তাঁরই মনের কথাটি বললেন ঠাকুর। বাহ্যত বঙ্কিম বরাবর কিছুটা উচ্ছ্বাসহীন; এবং কারোর প্রতি হঠাৎ করে আকৃষ্ট হওয়ার মত প্রকৃতি তাঁর নয়। কিন্তু ঐ সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ মানুষটির সঙ্গ কেন যেন বড় কাম্য মনে হতে লাগল বঙ্কিমের, সবসময়ই তাঁর কাছে কাছে ফিরতে লাগলেন, কিছুটা যেন নেশার মত লাগে। ঠাকুর পুরী গেলেন, উঠলেন হরনাথ লজ-এ, সেখানেও বঙ্কিম সঙ্গী; একান্ত ব্যক্তিগত কাজে সহায়তা করতে লাগলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর উপরে কেউ কিছু আরোপ করে দিতে পারত না বাইরে থেকে, নিজে যেমনটি বুঝতেন, চলতেন তেমনই। কলকাতা ও পুরীতে ঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁর আপাত-কঠোর আবরণের অন্তঃস্থলে হয়তো কোন আলোড়ন তুলেছিল, যার স্বরূপ নিজেও সেদিন বোঝেননি, কিন্তু তারই সাক্ষ্য ছিল তাঁর পরবর্তী জীবন জুড়ে।

বি. এস সি. পাস করার পরে সরকারি চাকুরি কিংবা ব্যবসা, কিছু একটা করতে হবে—এরকম অভিপ্রায় নিয়ে কলকাতায় হরিতকী বাগানের বাড়িতে থাকতে লাগলেন বঙ্কিম। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে সৎসঙ্গ আশ্রমে তপোবন বিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভক্তপ্রবর সুশীলচন্দ্র বসু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রস্তাব দিলেন কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত নাট্য সংস্থা মনোমোহন থিয়েটারের মালিক মনোমোহন পাঁড়ের কাছে 'বেনিফিট নাইট'-এর আবেদন করার। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের থিয়েটারের এক রাত্রির উপার্জন তপোবন-বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে দান করবেন—এই ছিল সুশীলচন্দ্রের অভিপ্রায়। প্রস্তাব শুনে ঠাকুর বলে উঠলেন—বাঃ, খুব ভাল কথা। মনোমোহন থিয়েটারকেএখানে (অর্থাৎ হিমাইতপুরে) নিয়ে এলে আরও ভাল হয়।

এ-কথায় সুশীলচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলেন যে অত বড় থিয়েটারের দল গ্রামে আসতে রাজি হবে কি না সন্দেহ—বিশেষত রাজি হলেও খরচ এত বেশি পড়বে যে লাভ বিশেষ কিছু হবে না। কিন্তু ঠাকুরের এবং তাঁর অনুগামীদের অভিধানে 'অসম্ভব'

অথবা 'না' শব্দ তো ছিল না—তাঁর ইচ্ছায় সুশীলচন্দ্র অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। মনোমোহন থিয়েটারকে দলীয় বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী সহ হিমাইতপুরে সৎসঙ্গে আনলেন এবং যাবতীয় ব্যবস্থাও হল। কলকাতা থেকে মনোমোহন থিয়েটার হিমাইতপুরে নিয়ে যাওয়ার সময় সুশীলচন্দ্র তরুণ বঙ্কিমকে সহযোগী হিসেবে সঙ্গে যেতে বললেন। বঙ্কিম "সাত দিনের জন্য যাব" এই শর্তে সঙ্গে গেলেন।

বঙ্কিমদের পরিবারের যজমান ছিলেন তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল সুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ। তিনি বঙ্কিমের জন্য পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর পদে চাকুরির ব্যবস্থা করেন, ২৮শে নভেম্বর ঐ চাকুরির ইন্টারভিউ ছিল। আর সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে তিনি হিমাইতপুর যাত্রা করেন ১৮ই নভেম্বর; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সাত দিনের মধ্যে কলকাতা ফিরে আসার গরজ ছিল। কিন্তু তার পরবর্তী ঘটনা কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল, সে-প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্র বসুর অনবদ্য স্মৃতিকথা 'মানসতীর্থ পরিক্রমা' থেকে সামান্য অংশ উল্লেখ একান্ত প্রাসঙ্গিক: "... তখন বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে এলাম। সেই দিন ছিল ১৯২৩ সালের ১৮ই নভেম্বর। তার সে সাত দিন আজও পূর্ণ হয়নি; নিয়ত কর্মী হিসাবে সেই থেকে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গেই হয়তো তার সেই সাত দিনের মেয়াদ পূর্ণ হবে।..." ঋষি-প্রতিম কর্মযোগী সুশীলচন্দ্রের এই অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল।

মনোমোহন থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত অস্থায়ী প্রদর্শনী-স্থলের গেটে গেটকীপারের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বঙ্কিম; ভারী কড়া গেটকীপার, টিকিট ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেন নি—এমনকী ঠাকুরকেও আটকেছিলেন টিকিট পরীক্ষার জন্য।

থিয়েটার শেষে দল ফিরে গেল কলকাতায়, কিন্তু বঙ্কিমের আর ফেরা হল না। তাঁর চিরকালের ঘর-পালানো বাউণ্ডুলে মন এক আশ্চর্য মুক্তিময় বন্ধনে ধরা দিল স্বেচ্ছায়, থেকে গেলেন ঠাকুরের প্রেম-প্রাঙ্গণে। তপোবন বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন বঙ্কিম রায়। বেশ ঘোর গাত্রবর্ণ, রোমশ দেহ, ঘন ভ্রূ, তীক্ষ্ণ চোখ এবং বাহ্যত নিরাবেগ ঈষৎ রুক্ষ ভাবভঙ্গী— ছাত্রদের ভীত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরের শুদ্ধতা এবং ইষ্টাবেগ ছোটদের সহজ বোধে সম্ভবত প্রতিফলিত হত, তিনি তাদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ আত্মজ পূজ্যপাদ বড়দা তাঁকে 'মাষ্টারমশাই' সম্বোধন করতেন।

সে-সময় তপোবনে শিক্ষা হত হাতে-কলমে। আশ্রমে আবাদি জমি জ্যামিতিক খোপে কাটা থাকত—একেক দল ছাত্র একেক অংশ চাষ করে ফসল ফলিয়ে নিজেরাই আশ্রমের বাজারে বিক্রি করত। লাভক্ষতির হিসাব, কোন ফসল ভাল না হলে তার কারণ কী, সবই ছেলেদের বুঝতে হত। এরকম বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক

শিক্ষাপদ্ধতিই ঠাকুরের মনোমত ছিল। তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন এই অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার শরিক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে যাজনকাজেও পরিক্রমা করেছেন বিভিন্ন অঞ্চল। যশোরের খ্যাতনামা ইষ্টকর্মী ডাঃ সুবোধ সেনের সঙ্গে যাজন সংক্রান্ত পরিক্রমায় গেছেন বহু স্থানে। যশোরে সুবোধ সেনের বাড়ি সৎসঙ্গ আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল; সেখানে রাত্রিবেলায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলোচনা অথবা বিতর্কের আসর বসত। ডাঃ সুবোধ সেনের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তের ভাষায় "রাত্রিবেলায় প্রায় দুটো/আড়াইটে পর্যন্ত একটা আলোচনা অথবা বিতর্কের আসর বসত। বাবা থাকতেন—বঙ্কিম-কাকাবাবু থাকতেন—আরো যাঁরা কর্মী বা ঋত্বিক থাকতেন, তাঁরাও উপস্থিত হতেন। দুটো পক্ষ হত। বঙ্কিম-কাকাবাবু বিপক্ষ দলের মুখপাত্র হতেন। নিজেদের ধারণা পরিস্ফুট করার জন্য অনেক কূট প্রশ্নের অবতারণা করতেন। যাঁরা পক্ষের লোক হতেন—তাঁদের উত্তর দিতে হত। বিচারের আসরে বিজ্ঞান, সমাজ, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র, শাস্ত্র কোন বিষয়ই বাদ পড়ত না। ঠাকুরের কাজ করার জন্য তাঁরা নিজেদের তৈরী করেছিলেন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সৈনিকদলের মত।"

এই সৈনিকদলের নিজেদের বুঝটি এতখানি পাকা হত বলেই এঁরা অপরকে বোঝাতে পারতেন গভীর প্রত্যয়ে। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক রাশভারী পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন—তাঁর সামনে কেউ এগোতে সাহস করত না। কিন্তু সুবোধ সেন ও বঙ্কিম রায় তাঁকে ঠাকুরের কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের যাজনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হেমচন্দ্র দীক্ষা তো গ্রহণ করেনই, ক্রমে আশ্রমের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। তাঁর পুত্র শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন ও বাণীর অনুলিখন, সম্পাদনা এবং ইষ্টকেন্দ্রিক নানা সাহিত্যকৃতির জন্য সৎসঙ্গ সমাজে বিশেষ সম্মান ও সমাদরের অধিকারী।

বঙ্কিমের আশ্রমে চলে আসা তাঁর পরিবারের কাছে স্বাভাবিকভাবেই কাম্য ছিল না। তাঁর পিতা বহুবার লোক-মারফত এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে ছেলেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা পরিবারস্থ অন্য সবাইকে নিয়ে একটি নৌকা করে এসে উপস্থিত হন আশ্রমে। সৎসঙ্গ আশ্রম এবং তার প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করে তাঁদের মনের বিভ্রম দূর হয়। ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পেরে মা নিজেই রয়ে গেলেন আশ্রমে ঠাকুরের আশ্রয়ে পরিবারসহ।

সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারেও অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বঙ্কিম। এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ "... কেমিক্যাল ইত্যাদি যে করলাম, আমার কি কিছু ছিল? এর বাড়ির হাঁড়ি ওর বাড়ির

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

ড্যাগ নিয়ে বাগানের গাছ-গাছড়া দিয়ে কাজ শুরু করলাম। আর ছিল বঙ্কিম। সে efficient-ও খুব ছিল। সি. আর. দাশ বলেছেন—অমন পাঁচটা মানুষ পেলে হত।..."

১৯৪০-এর আগস্ট মাসে তৎকালীন সৎসঙ্গ সেক্রেটারি শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর সময় বঙ্কিম কার্যোপলক্ষে পাবনার বাইরে ছিলেন। ঐ দুর্ঘটনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর টেলিগ্রাম করে বঙ্কিমকে ডেকে পাঠান এবং সেক্রেটারির কার্যভার তাঁকে গ্রহণ করতে বলেন। ঠাকুরের নির্দেশে বেশ কিছুদিন তিনি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ গুরু দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেসময়কার মানুষের স্মৃতি থেকে। ডাঃ সুবোধ সেনের কন্যা শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তের স্মৃতি অনুসরণ করে তখনকার একটি খণ্ড চিত্র পাওয়া যায় —

"আমাদের পাবনার বাড়ির সামনে দিয়ে একটা রাস্তা সোজা আশ্রমের দিকে চলে গিয়েছিল। আর সামনে ডান দিক দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সোজা পদ্মার চর পর্যন্ত। সেখানে পদ্মা সরু খালের মত ছিল। তার উপর দিয়ে একটা বাঁশের সাঁকো ছিল নড়বড়ে মত। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে বড় চর—আর তার ওপাশে বড় পদ্মা। ঐ চর ধরে হাঁটলে আশ্রমের সামনের চরে পৌঁছনো যায়। কিন্তু আমরা ওখান দিয়ে যেতাম না। খুব নিরাপদ ছিল না। আশেপাশের মানুষজনেরা ভরসা করার মত ছিল না। আমরা সামনের সোজা রাস্তা দিয়েই আশ্রমে যেতাম।"

"একদিন ছোটপিসির সঙ্গে পরামর্শ হল—আজ চরের উপর দিয়ে আশ্রমে যাব। আমরা সেই দিক দিয়ে সেই নড়বড়ে সাঁকো পার হয়ে চরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। খুব অস্বস্তি আছে। গা ছমছম করছে। পিসি বললেন—দ্যাখ, দূরের থেকে ঐ ছেলেগুলো অনেকক্ষণ আমাদের ফলো করছে। ওরা ছোট চরের রাস্তায় ছিল। চরগুলো ঢেউ খেলানো—ওদের সব সময় দেখা যাচ্ছিল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। নির্জন চরের রাস্তায় আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রমে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলাম। আশ্রমের বাঁধের সিঁড়ির উপর দেখি বঙ্কিম-কাকাবাবু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—"এরকমভাবে—এসময়—এ রাস্তায় আসা হল কেন?"

আমরা বললাম—"তুমি জানতে নাকি যে আমরা এদিক দিয়ে আসছি?"

— "তোমাদের পাহারা দিয়ে আনবার জন্য ছেলেদের পাঠাল কে?"

—"ওরা তোমার পাঠানো ছেলেরা ছিল? আমরা ত ভাবলাম—"

—"এরকম আর কোরো না।"

কম কথার মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের এরকমই ছিল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাপনা। পরবর্তীকালে তিনি হয়ে ওঠেন ঠাকুরের নিত্যমুহূর্তের সঙ্গী—তাঁর নিয়ত প্রয়োজনের অনুক্ষণের যোগানদার। ঠাকুরের অঙ্গন ছিল সকলের জন্য অবারিত। কিন্তু তাঁর মানুষী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দেহটির তো কিছু সীমা ছিল, আহার-বিশ্রাম ও একান্ত ব্যক্তিগত কর্মের জন্য কিছু সময়ের আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু উন্মুখ ভক্তকুলের বোধে তা ধরা দিত না। ঠাকুর যেহেতু 'ঠাকুর', সেহেতু যে-কোন সময়ই তাঁকে দর্শন করার অথবা তাঁর কাছে হৃদয়ের প্রার্থনা নিবেদনের দাবি নিয়ে অবিরাম জনস্রোত ধাবিত হত সর্বদা।

তখন প্রয়োজন অনুসারে সে-স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন এবং অপ্রিয় কাজ বঙ্কিম স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ঠাকুরের স্বস্তিবিধানের জন্য। তাঁর আপাত-রুক্ষ শক্তপোক্ত চেহারা, রোমশ দেহ, ঝাঁকড়া ভুরুর তলায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁর পাহারাদারির কাজের সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর প্রতি ছোটদের মনোভাব কিন্তু নিছক ভয়ের ছিল না। এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শৈশবের স্মৃতিচারণায় জানা যায়, বাবার সঙ্গে দেওঘরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও প্রণামের পরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় বালকটি মুখে হাত দেয়। বঙ্কিম ছিলেন বেশ কিছু দূরে, হঠাৎ করে দ্রুতবেগে কাছে এসে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটু দূরে কলের পাশে হাত ধুইয়ে আবার সযত্নে তাকে তার বাবার পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। প্রথমে কিছুটা হতচকিত হলেও ছেলেটি বুঝে যায় যে মুখে হাত দিলেই হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। এভাবে সদাচারের প্রথম পাঠের একটি বিষয় তার মনে গেঁথে দেন বঙ্কিম তাঁর তীক্ষ্ণ নজরদারি দিয়ে। তাঁর হাঁকডাক, গম্ভীর মূর্তি সত্ত্বেও কোনও প্রয়োজন হলেই ছোটরা কিন্তু তাঁর দরবারেই গিয়ে হাজির হত। কারণ তারা জানত যে তাদের প্রয়োজন সঙ্গত হলে তা পূরণ করবেন ঐ কড়া মানুষটিই। আবার কোন বিচলন দেখলে তার প্রতিবিধানে যথাযোগ্য সাজা দিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিবারাত্রির প্রতিক্ষণ ছিল ঠাকুরের দৈনিক চলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ থেকে শুরু করে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত ঠাকুরের যাবতীয় কৃত্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত ছিলেন বঙ্কিম। এমনকী, রাত্রে ঘুমোতেনও ঠাকুরেরই ঘরে। ঠাকুরের ঘুম খুব সহজে আসত না—হাতের অতি মৃদু কম্পন সৃষ্টি করে তাঁর শরীরটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাঁপাতে থাকলে ধীরে ধীরে ঘুম আসত। এই কম্পনবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বঙ্কিম। ঠাকুরের এতটুকু স্পর্শ লাভ করা ভক্তমণ্ডলীর কাছে চির আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বঙ্কিম ছিলেন সে দিব্যদেহ নিত্যস্পর্শের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

হিমাইতপুর আশ্রমে বঙ্কিম যখন আসেন, তখন আশ্রম গঠনের প্রাথমিক পর্যায় চলছে। তৎকালীন একটি সরস ঘটনার উল্লেখ করেছেন ভক্ত লেখক শ্রীসঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পূর্ণের প্রাঙ্গণে' শীর্ষক রচনায়, যার মধ্য দিয়ে আশ্রমের তখনকার সহজ অনাড়ম্বর আন্তরিকতা এবং বঙ্কিমের একান্ত আত্মপর-ভেদ-বোধ-হীনতা, দুই-ই ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষায়: "তখন আশ্রম গঠনের কাজ চলছে। দ্বি-প্রহরে পরম

পূজনীয়া বড়-মা (শ্রীশ্রীঠাকুর জায়া) তাঁর চওড়া পাড় শাড়ী ধুয়ে-কেচে দড়িতে মেলে দিয়েছেন শুকোবার জন্য। বিকালে শাড়ী দুখানা তুলতে এসে দেখেন, একখানা শাড়ী চুরি হয়ে গেছে। হৈ হৈ কাণ্ড—বড়-মার শাড়ী কে চুরি করল! খোঁজ চলতে লাগল। একটু বেলা পড়লে একজন আবিষ্কার করল—ছাতিম গাছের নীচে চাদর পেতে বঙ্কিমদা বড়-মার শাড়ী পরে শুয়ে আছেন।

— ও বঙ্কিমদা! উঠুন! করেছেন কী?

— কী হয়েছে? এত হাঁকডাঁক কেন?

বঙ্কিমদা আড়মোড়া ভাঙছেন।

— বড়-মার শাড়ী পরে আছেন কেন? খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

— হৈ চৈ কেন? আর একটা শাড়ী তো ছিল। বড়-মা সেটা পরুন গিয়ে।

বঙ্কিমদার কাছে কত সহজ সমাধান! মায়ের দুটো শাড়ী ছিল—তার একটা পরে সত্যিই তো তিনি কোন ভুল করেননি। এখানেই ছিল আশ্রমের বৈশিষ্ট্য।..."

ঠাকুরের এতটুকু সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে তিনি ছিলেন একমুখী, আপোষহীন। দেওঘরে আশ্রমে প্রথমটিকে একটি গোল তাসুর ঘর ছিল—তার পুবদিকে ছিল একটি ছাউনি। ঠাকুর ঐ তাসুর ঘর থেকে এসে মাঝে মাঝে ছাউনিতে বসতেন। তাসুর ঘরের কাছে ছিল এক বেল গাছ—ছোট ছোট বেল হত তাতে। গাছটির একটি শিকড় মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঠে ছিল। ঠাকুর একদিন একপাশে অন্যতম সহচর ডাঃ প্যারীমোহন নন্দী ও অপরপাশে বঙ্কিম-সহ তাসুর ঘর থেকে বেরিয়ে ছাউনিতে যাচ্ছিলেন, পথে ঐ উঠে থাকা বেলগাছের শিকড়ে বেশ জোরে হোঁচট খেয়ে ঠাকুরের পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল, বেশ আঘাত লাগল পায়ে। যাহোক, নিজেই সামলে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিম কোথাও চলে গেলেন। ঠাকুর একটু পরেই ভারী ব্যস্ত হয়ে খোঁজ নিতে লাগলেন বারবার—বঙ্কিম কোথায়? অবশেষে বঙ্কিমকে ডেকে নিয়ে আসা হলে ঠাকুর প্রশ্ন করলেন—কোথায় ছিলি? প্রথমে উত্তর এড়িয়ে যেতে চাইলেন বঙ্কিম—কিন্তু ঠাকুরের উদ্বিগ্ন কাতরতা দেখে শেষে জানালেন যে তিনি লোক সঙ্গে নিয়ে ঐ শিকড়টি কেটে ফেলার ব্যবস্থা করছিলেন। ঠাকুর এই ঘটনার আশঙ্কাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, বেদনার্ত মুখে আকুলভাবে বঙ্কিমকে বললেন—তোমার হাত যদি কাটা যায় তবে কেমন লাগে, লক্ষ্মী? দোষ তো গাছের নয়, দোষ আমার। আমারই দেখে চলা উচিত ছিল।

ঠাকুরের সর্বাত্মবোধের এমন প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্তব্ধ, অভিভূত হয়ে গেলেন বঙ্কিম। এমন করে তাঁর সঙ্গে নিত্যমুহূর্তে জড়িত থেকে তন্ময় হয়ে উঠেছিলেন বঙ্কিম।

তাঁর মা, ভাই, বোন ইত্যাদি পরিবারের পরিজন আশ্রমে ঠাকুরের আশ্রয়ছায়ায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঠাকুরের সঙ্গ ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন না। অকৃতদার

মানুষটি আক্ষরিকভাবে ঠাকুর-সর্বস্ব ছিলেন। তাঁর ইষ্টভৃতির ধরনও ছিল বিচিত্র। একটি ঝুড়িতে করে প্রতিদিন সকালে তরিতরকারি, আলু, ইত্যাদি বড়মার রান্নাঘরে দিয়ে আসতেন—আমরণ এভাবেই ইষ্টভৃতিপালন করেছেন তিনি।

১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে ঠাকুরের দেহাবসানের পরে বঙ্কিম শিশুর মত আকুল হয়ে কাঁদতেন, অঝোরে জল পড়ত তাঁর দু'চোখ বেয়ে, এ দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন তখন অনেকেই। তাঁর বাহ্যিক কঠোরতার অন্তরে যে কতখানি নিবেদিত কোমল প্রাণ ছিল, তা প্রকাশিত হয়েছিল তখন। ১৯৭৬-এর ২৬শে এপ্রিল পার্থিব বিরহের পালা সাঙ্গ করে পরমপ্রিয়-সঙ্গে চিরমিলনে যাত্রা করেন বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

ব্রজগোপাল দত্তরায়

৭ই চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ — ২৯শে পৌষ, ১৩৭৮

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ব্রজগোপাল দত্তরায়

মানবসভ্যতার ইতিহাস এক অর্থে মহামানবের জীবনেতিহাস। জন্ম-মৃত্যুর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী পরিসর জুড়ে প্রতিটি মানুষের জীবনায়ন; কিন্তু বেশির ভাগ জীবনের ব্যক্তিক তথা পারিবারিক সীমানার বাইরে কোন তাৎপর্য নেই; বৃহত্তর পরিবেশে তার অস্তিত্বের বিশেষ অবদান থাকে না। তাদের জীবন-কথা তাই প্রায়শই একটি অপরটির পুনরাবৃত্তি, এবং ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গুরুত্বহীন। মুষ্টিমেয় কিছু অস্তিত্ব তার ব্যতিক্রম। সামগ্রিক পরিপার্শ্বের কল্যাণমুখী বিনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত মহাপ্রাণের আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের জীবন এবং জীবনী বিবর্তনের দিশারী। তাই মহাপুরুষের জীবনী-রচনা দাবি করে বিশিষ্ট দক্ষতা, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ, ধীশক্তি, পরিশ্রম-সামর্থ্য এবং সর্বোপরি গভীর অনুধ্যান। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র এসেছিলেন পরিবেশ-পরিপ্লাবী, বৈচিত্র্যের রহস্যে ভরা, অলোকসামান্য এক জীবন নিয়ে, আপাত দৃষ্টিতে যার মধ্যে তথাকথিত নাটকীয় উপাদান তেমন কিছু নেই। তাঁর জীবন সহস্রতলযুক্ত হীরকের মত, যার প্রতিটি তল থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার আলোক বিচ্ছুরিত হয়। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিক প্রদর্শক আলোকবর্তিকাস্বরূপ এ হেন জীবনের ইতিহাস রচনার জন্য মহামানব-জীবনীকারের উপরোক্ত গুণাবলি ছাড়াও আরও কিছু প্রয়োজন—তা হল সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও অহংশূন্যতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীকার ভক্তপ্রবর ব্রজগোপাল দত্তরায়ের মধ্যে দুর্লভ ঐ গুণরাজির সমাবেশ ঘটেছিল।

অধুনা বাংলাদেশস্থিত ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বনগ্রামের জগৎচন্দ্র দত্তরায় ও বসন্তময়ী দেবীর পুত্র ব্রজগোপাল ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে মাতৃহারা হন, কৈশোরে ঘটে পিতৃবিয়োগ। গৌরবময় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় ময়মনসিংহ শহরে ও পরে কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। স্নাতকোত্তর পাঠ্যজীবনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষিবৃন্দের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার জজকোর্টে ব্যবহারজীবীরূপে কর্মজীবন শুরু করে অতি অল্প সময়ে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কর্মজীবনের সাফল্য, গতানুগতিক সংসারযাত্রা নির্বাহ, কোন কিছুই পূর্ণতা এনে দিতে পারে না ব্রজগোপালের অন্তরে; কী এক বিরাট শূন্যতা চারিদিকে—কী যেন না পাওয়ার বেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। বাড়িতে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলার নিত্যপূজা হত, তাতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। পূজার্চনায় আনন্দ পেলেও পূর্ণতা পান না; অন্তরের সহজাত ভক্তিভাব আরও কিছুর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

অনন্ত যিনি, তাঁর স্বরূপ জানার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয় মন।

দীক্ষা নিয়ে নামজপপরায়ণ হয়ে চললে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে বোধ হয়। দীক্ষা কোথায় নেবেন—এ কথাও মনে হয়। সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে সাধনভজনে নির্ভুলভাবে পরিচালিত করতে পারেন কেবলমাত্র সদ্‌গুরু। কিন্তু সদ্‌গুরু সন্ধানের জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্য তাঁর তখন ছিল না—কালবলিম্ব না করে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই উদ্দেশ্যে কুলপুরোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারেন যে, যে-কোন সংক্রান্তির দিন দীক্ষা নেওয়া চলে। তখন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে শুভ কর্মের সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরোহিত মহাশয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বনগ্রাম থেকে কর্মক্ষেত্র ময়মনসিংহ ফিরে আসেন।

আবার কর্মজীবনের শুরু। কয়েক দিন পর বার লাইব্রেরিতে এসে টেবিলের উপর হাতে লেখা একটি কাগজ পড়ে থাকতে দেখে অন্যমনস্কভাবে সেটি দলা পাকিয়ে ফেলে দেন। ঘন্টা দুই পরে কোর্টের কাজ সেরে এসে ঐ ফেলে দেওয়া কাগজটি তুলে পড়ে দেখেন যে সেটি একটি ধর্মসভার বিজ্ঞপ্তি—স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে হওয়ার কথা ধর্মসভাটির। জিজ্ঞাসু, পিপাসু মন; যথাসময়ে বন্ধু উমেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে সেখানে হাজির হন। সভায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ধর্ম সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। বক্তা কর্তৃক নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় রচনাটির উল্লেখ ব্রজগোপালকে ভাবিয়ে তোলে :

উত্তমো ব্রহ্মসদ্‌ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমোভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ।।

তাঁর মনে কৌতূহল হয়—স্তুতিজপ, বাহ্যপূজার অতিরিক্ত প্রকৃত সদ্‌গুরুর সন্ধান কি বক্তা পেয়েছেন? সভাশেষে জানতে পারেন বক্তা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। তিনি পাবনা হিমাইতপুর আশ্রম থেকে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; তিনিও ঠাকুরের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। তাঁর সঙ্গে ঠাকুর ও দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। সদ্‌গুরু বলতে এঁরা ঠাকুরকে বোঝেন। সদ্‌গুরুর বিভিন্ন লক্ষণ ও গুণাবলি সম্বন্ধে ব্রজগোপালকে অবহিত করে তাঁরা তাঁকে দীক্ষাগ্রহণের অনুরোধ জানান।

সদ্‌গুরু তীব্র আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই, তাই এঁদের সংসর্গে মন স্বভাবতই চঞ্চল ও অধীর হয়ে ওঠে। ভাবেন, তিনি যদি সদ্‌গুরু হয়ে থাকেন, তবে এ সুযোগ কোনমতেই হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। যুগযুগান্তের সঞ্চিত আকুলতা যদি কূল খুঁজে পায়, তবেই জীবন হবে সার্থক, সব চাওয়া বিলীন হবে অনন্তে। ঠাকুরের ভক্তদের কাছে ঠাকুরের

গ্রন্থাবলি বিষয়ে জানতে চান ব্রজগোপাল। তাঁরা তাঁকে 'সত্যানুসরণ' নামে একটি ছোট পুস্তিকা এবং 'অমিয় বাণী' ও 'পুণ্যপুঁথি' নামে দুটি গ্রন্থ দেন। সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত প্রথম প্রকাশিক পুস্তক। ছোট ছোট কথায় চলমান জগতের দিক্ নির্ণয় পন্থা সহজভাবে বিধৃত। অমিয়বাণী শাস্ত্র, দর্শন, সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথনমূলক গ্রন্থ। মহাভাবসমাধি অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর-উক্ত বাণীর সঞ্চয়ন পুণ্যপুঁথি।

বইগুলি অভিনিবেশ সহ পাঠ করতে শুরু করেন তিনি। 'সত্যানুসরণ' পুস্তিকার প্রথম বাণীটি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে—'সর্ব্বপ্রথম আমাদের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হ'তে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ঐ দুর্ব্বলতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার, ঐ রক্তশোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক Vampire-কে। . . .' সমস্ত পুস্তিকাটি এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে যায়, মনে আসে গভীর বিস্ময়। এত সহজভাবে গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা, সাবলীল সমাধান, দৈনন্দিন জীবনে চলার এমন সুষ্ঠু এবং সহজ উপায় নির্দেশ এর আগে কোথাও পাননি তিনি। 'অমিয় বাণী'-র মনোজ্ঞ আলোচনাভঙ্গী তাঁর বিশ্বাসকে জাগ্রত করে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। 'পুণ্যপুঁথি'-র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রবক্তার সুগভীর আশ্বাসভরা দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রজ্ঞা: 'সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ'; 'তোদের আত্মাতেই আমি জেগে উঠব। সকলকে বল, ভয় নাই, চিন্তা নাই . . . অভীরভীরভীঃ'; 'ছুটে আয়, আমি তোদের শান্তি দিব, আমি তোদের স্থান দিব, আমি নরকে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত করে দিব।'; 'আমি পরম কারণ। অনন্ত কোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সভা—আমিই সব,'; এ সমস্ত বাণী পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ ব্রজগোপালের অন্তর্লোকে স্বতই উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে—এতদিনের জমে থাকা দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সংকোচ, অবসাদ দূর হয়ে যায়, আশা, উৎসাহ, প্রেরণায় দীপ্ত হয়ে ওঠে সত্তা, প্রশ্নশূন্য, নিশ্চিন্ততার আশ্রয় পান তিনি।

সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান—আর বিলম্ব সয় না। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৮শে শ্রাবণ তিনি সস্ত্রীক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর মাধ্যমে সৎনাম গ্রহণ করে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে গুরুরূপে বরণ করেন।

জীবন দেবতার সন্ধান পেয়েছেন, আনন্দে উপছে যায় অন্তরের পাত্রখানি। সব-সময়েই একটা তরতরে, নির্ভাবনা, উৎফুল্ল ভাব, জীবনীশক্তিতে ভরপুর। এখনও তাঁকে দর্শন করা হয়নি, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই সময়ে পুরুষোত্তম জননী মাতা মনোমোহিনী দেবী ময়মনসিংহ শহরে এলেন। খবর পেয়ে সস্ত্রীক ব্রজগোপাল

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

মাতৃ-সন্দর্শনে আসেন। মা খুব খুশি হন তাঁদের দেখে; তাঁর আন্তরিক, মধুর ব্যবহারে তাঁরাও অপার আনন্দ লাভ করেন। মাতৃদেবীর কাছে আশ্রমিক জীবনযাপনের অভিপ্রায় জানালে স্নেহকোমল কণ্ঠে মা বলেন, 'তোদের কোলে কচি শিশু, ও আর একটু বড় হোক, আর কিছু দিন পরে বরং যাবি। ওখানে যে খুব দুঃখকষ্ট সহ্য করে থাকতে হয়। কয়েক দিন পরে আমি আশ্রমে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে অনুকূলের কাছে তোদের কথা বলব।'

এদিকে ঠাকুর-দর্শনের বিলম্ব অস্থির করে তোলে ব্রজগোপালকে। গুরুপদে বরণ করে যাঁর পায়ে জীবন সঁপেছেন, তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবে না পাওয়া পর্যন্ত তৃপ্ত হয় না মন; শুধু ভাবজগতে বিচরণ নয়, চাই প্রেমসমুদ্রে প্রত্যক্ষ অবগাহন। অবশেষে একদিন একাই আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১৩৩০, ১০ই পৌষ। বড়দিনের ছুটি তখন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপীঠতলে পুরো ছুটিটাই কেটে গেল যেন চোখের নিমেষে। তাঁর দিব্য সান্নিধ্যের অবর্ণনীয় আনন্দসুধায়, নানাধরনের আলাপ আলোচনার রত্ন আহরণে অসীম তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল মন। ছুটি ফুরিয়ে এল, বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু বিদায়ের বেদনা অসহ্য বোধ হয়, দেহমন বিষাদে অবসন্ন হয়ে যায়। ব্রজগোপাল দত্তরায়ের নিজের ভাষায় :

"... তাঁহার আসনের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া আছি। দেখিলাম, আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। মমতা জড়ানো সে করুণ চাহনি আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। মনে হইল, বিস্ফারিত লোচনের সেই অকম্পিত স্নেহসিক্ত দিব্য দৃষ্টিপাতে তিনি আমার বিগত লক্ষ লক্ষ জীবন, আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ জীবন সকলই নিরীক্ষণ করিতেছেন, আমার সমগ্র সত্তাকে সুরলোকের সুধাধারায় অভিস্নাত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার দরদভরা সজল আঁখিতারা আমাকে যেন অব্যক্ত ভাষায় এই কথাই বারংবার সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতেছে,—তিনি আমার জন্মজন্মান্তরের চিরসাথী, তিনি আমার চিরবন্ধু, তিনি আমার প্রিয়পরম—সারা দুনিয়ায় তিনিই আমার একমাত্র আপনার জন। স্বর্গীয় বিভামণ্ডিত ঠাকুরের সেই ভাবগম্ভীর প্রশান্ত বদনমণ্ডলের প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছি, এমন সময় কী এক অলৌকিক আনন্দের উচ্ছল আবেগে অভিভূত হইয়া আমি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলাম, পুলক-স্পন্দনে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষুযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, রোরুদ্যমান অবস্থায় সংজ্ঞাহারা হইয়া আমি ভূতলে পড়িয়া গেলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ অনন্তনাথ রায় আমার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সস্নেহ শুশ্রূষায় বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলাম। ঠাকুর তখন ছলছল নয়নে বাষ্পজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে,—'এবার যান, আবার চলে আসবেন'—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কোনমতে শুধু এই কথা কয়টি বলিয়া সেবারের মত বিদায় দিলেন।”

বড়দিনের ছুটির শেষে কর্মস্থলে ফিরে আদালতে কর্মে যোগদান করেছেন ব্রজগোপাল। কিন্তু কাজে আর মন বসছে না, সর্বক্ষণের চিন্তা কবে আবার আশ্রমে গিয়ে ঠাকুরের চরণতলে স্থায়িভাবে বাস করবেন। অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হাতের সমস্ত মামলা বন্ধু উকিল উমেশচন্দ্র সেনকে অর্পণ করেন এবং বিষয় সম্পত্তি সহোদর ভাইদের বুঝিয়ে দেন। এক মাসের মধ্যে অত্যাবশ্যক কাজ যথাসম্ভব সমাধান করে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের শেষদিকে স্ত্রী ও শিশুপুত্রসহ পাবনার হিমাইতপুর পল্লীর ঠাকুর বাড়িতে চলে আসেন। তখন থেকেই দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণতলে তাঁকে কেন্দ্র করে জীবনীকার ব্রজগোপাল দত্তরায়ের জীবন আবর্তিত হতে লাগল।

অল্প বয়সে ব্রজগোপালের ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরাগের অভাব ছিল। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে মহম্মদ ও যীশু প্রচারিত ধর্মমতের সারবত্তা অনুভব করেন তিনি। ঠাকুরের সাহচর্য ও শিক্ষাই জগতের সমস্ত মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধাবনত করে তুলেছিল তাঁকে। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, পরম দয়াল মহম্মদ, মহাপ্রাণ যীশু, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলেরই দীন সেবক রূপে নিজেকে অনুভব করেন তিনি। ঠাকুরকে দেখে উপলব্ধি করেছেন—পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের জীবনের মহামঙ্গলব্রত সম্যক্‌ভাবে উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন।

মানুষের জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা তিনি পেয়েছেন। জীবন চলনার সঙ্গে রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কীভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত, সে-সম্বন্ধে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। ঠাকুরের কাছে প্রাণায়াম, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতির আলোচনা থেকে আরম্ভ করে ওঙ্কার পর্যন্ত সকল স্তরের এবং ওঙ্কার পরবর্তী ‘সত্য লোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক’ ইত্যাদি বিভিন্ন ধামের প্রত্যক্ষীভূত অনুভূতিরাজির অপূর্ব অনবদ্য বিবরণ শোনার পরম সৌভাগ্য হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। মন সর্বদাই উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করে ব্রজগোপালের। সর্বজীবে প্রেম ও একাত্মবোধ এখন তাঁর অস্তিত্বের সমার্থক। তিনি বুঝেছেন সাধনার মাধ্যমে মনের মধ্যকার সুপ্ত ধারণাগুলি জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তীব্র নামধ্যানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরের সংস্কারগুলি জেগে ওঠে। তখন বোঝা যায় নিজের স্বরূপ।

সেই সময়টি ছিল আশ্রম গঠনের আদিপর্ব। আশ্রম বলতে কয়েকটা কুটির মাত্র আর জনাকয়েক স্থায়ী আশ্রমিক। তখনও গড়ে ওঠেনি বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, শিল্প কেন্দ্র, তড়িৎ ভবন, কলা ভবন, চিকিৎসালয়, মুদ্রণালয়, গ্রন্থশালা, নাট্যশালা, সাধন মন্দির, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। ঠাকুরের প্রেরণায় এবং কর্মীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

নানা কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম বিশাল কর্মকেন্দ্রে পর্যবসিত হল। কর্ম ও ধর্মের এক নতুন প্রকাশ ঘটল, যা সম্পূর্ণ অভিনব ও অভূতপূর্ব।

আশ্রমের এই সাংগঠনিক পর্বে তিনি আশ্রমের গঠন ও পরিচালনার নানা বিষয়ে এবং দেশদেশান্তরে ঠাকুরের ভাবধারা ও কর্মপরিকল্পনার প্রচারে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ব প্রত্যন্তের বার্মা থেকে পশ্চিম প্রান্তের মুম্বই পর্যন্ত যাজন পরিক্রমায় প্রায় সর্বত্র ঘুরেছেন। সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির তিনি ছিলেন সহ-সম্পাদক। ঠাকুরের নির্দেশে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন দীর্ঘকাল। পরবর্তীকালে দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমের তপোবন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন বহু বছর। সৎসঙ্গে ঋত্বিক আন্দোলন প্রবর্তিত হলে তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে প্রতিঋত্বিকের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিপুল ও বিচিত্র কর্মপ্রবাহে নিরন্তর নিযুক্ত থেকেও তারই মধ্যে ব্রজগোপাল রচনা করে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীগ্রন্থ তথা সৎসঙ্গের কর্মধারার ইতিহাস। অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন অমূল্য তথ্যাদি যা চিরকাল অমিয় পথের সন্ধান দেবে। ভবিষ্যতের গবেষকরা এই গ্রন্থটি থেকে শত শত গ্রন্থ রচনার উপাদান পাবেন। এই প্রামাণ্য সুবৃহৎ জীবনী গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থের আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" নামক এই অমূল্য জীবনী বর্তমানে তিন খণ্ডে প্রকাশিত। এছাড়া, ঠাকুরেরই নির্দেশে পুরুষোত্তম জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীরও জীবনী রচনা করেন তিনি। "পুরুষোত্তম জননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী" নামক এই গ্রন্থটিকেও ইতিহাসের ধারক গ্রন্থ বলা চলে। সে-যুগের বহু বিষয় এখানে বিশদভাবে বিবৃত আছে। এই দুটি অসাধারণ জীবনী গ্রন্থ ছাড়াও 'শ্রী অনুকূলচন্দ্র', 'বাণীশতক' এবং 'আর্যবাদ ও জীবন বেদ' নামে তাঁর তিনটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত রচনা এখনও কিছু রয়েছে। তবে তাঁর "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" প্রন্থটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সর্বাধিক।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। শ্রীশ্রীঠাকুর নাট্যমণ্ডপে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। সুশীলচন্দ্র বসু, যতীন দাস, কাশীশ্বর রায়চৌধুরী, গোপেন রায়, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, উপেন বসু, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কালু আইচ, সুরেন দাস, প্রেসের মোহিনীদা, তারাপদ রায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই আছেন। বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর ব্রজগোপাল দত্তরায় রচিত "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" গ্রন্থ প্রসঙ্গে কথা উঠলে ঠাকুর বলেন—ব্রজগোপালদা তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। চেষ্টার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ত্রুটি করেনি। ওতে যা material আছে, তা পরবর্তীদের কাজে লাগবে। সেই হিসাবে এর সার্থকতা আছে। আমার জীবনী—আমার কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু আমার mission সম্বন্ধে আগ্রহ অশেষ। সেই mission চারাতে জীবনীর প্রয়োজন আছে। তা যত যথাযথ-সমন্বয়ী ও বাস্তব তাৎপর্য-সমন্বিত হয়, ততই ভাল। ভাল জীবনী থাকলে আমার কথাগুলিও লোকের বুঝতে সুবিধা হবে। কারণ, আমি এমন কথা কইনি বা কই না, যা আমার বাস্তব অনুভব বা অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই। আমি তো আর পণ্ডিত না, করা কুড়িয়েই আমার যা কিছু পাওয়া ও কওয়া।

ঠাকুরের ইচ্ছাপূরণই ছিল ব্রজগোপালের জীবনের লক্ষ্য। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে কোন বাধাই তাঁকে বিরত করতে পারেনি। ঠাকুরের আনন্দে, খুশিতে তৃপ্তিতে ভরে উঠত মন। তাঁর কোন আদেশ বা নির্দেশের ব্যাখ্যা বা বিচার করতে যাননি কোনদিন—তিনি দয়া করে আদেশ করেছেন, সেটাই বড় কথা, পরম সৌভাগ্য ভক্তের কাছে। ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন এই সম্পর্ক প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যাপ্তির মধ্যেই যে আনন্দ তা তাঁরা বুঝেছেন ঠাকুর-গ্রহণে এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে তাঁকে বহন করে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রজগোপাল স্থায়িভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আশ্রমে চলে আসার পর থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তাঁর অক্লান্ত ইষ্টকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড সুবিদিত। কিন্তু ১৯৩৯— ১৯৫৩, এই চৌদ্দ বছর ব্রজগোপালের জীবনেতিহাসে এক আশ্চর্য অধ্যায়—যা অধিকাংশ মানুষেরই অগোচরে থেকে গেছে।

১৯৩৯-এ তাঁর পুত্র রজতবরণ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একদিন একান্তে ডেকে বললেন— ব্রজগোপালদা! ছেলেকে মানুষ করা বাবার প্রধান কর্তব্য। রজতকে নিয়ে আপনি আশ্রম ছেড়ে চলে যান—ওর পড়াশুনোর ব্যবস্থা করুন। আমি ওকে কত ভালবাসি তা আপনি জানেন। আমি খরচা দিয়ে ওর পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে পারি, সে সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু এক পয়সাও আমি দেব না; আমি চাই, আপনারা বাপ-ব্যাটায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে উঠে দাঁড়ান। রজতের পড়া শেষ হলে, ওর কাজকর্মের ব্যবস্থা হলে একটা বাড়ি করুন, ওর বিয়ে দিন, তারপর আবার আমার কাছে আসবেন।

শুরু হল নিষ্প্রশ্ন ভক্তের কঠোর পরীক্ষা। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে—কোথায় থাকবেন, কী করবেন, কিছুই স্থির নেই। সুপ্রতিষ্ঠিত যে-সংসার আত্মীয়-পরিজনকে সমর্পণ করে চলে এসেছিলেন, সেখানে ফিরতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা প্রাপ্তি হল ব্রজগোপালের, সহায়তা কিংবা আশ্রয়ের ঘরে শূন্য! একান্ত নিকট আত্মীয়বর্গের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিচয় প্রতিভাত

হল তাঁর কাছে। কিন্তু যে গভীর বন্ধনে তিনি চিরবন্ধনে বাঁধা পড়েছেন সেই নিত্যমুক্ত পুরুষোত্তমের সঙ্গে, সে বাঁধন কোন কিছুতেই এতটুকুও শিথিল হল না—বরং ক্রমবর্ধনার পথে চলল তা। বিচলিত না হয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় বিস্তর বিঘ্নের মধ্য দিয়ে পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সংসার প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিরলসভাবে করে চললেন তথ্যসংগ্রহ। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-সংক্রান্ত যথাসম্ভব তথ্য যে-কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করে চয়ন করে চললেন তিনি। দয়ালেরই অলক্ষ্য কৃপায় টালমাটাল সংসার-তরণী ভেসে চলে; কখনও অযাচিতভাবে পেয়ে যান শিক্ষকতার কর্ম, কখনও বা গৃহশিক্ষকতার কাজ—দিনান্তে যেখানে একমুঠো চিঁড়ে আর গুড় জোটে, মাসান্তে দশটি টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়ায় তখন পৃথিবীর আকাশ অন্ধকার; ভারতে—বিশেষত বাংলার বুকে হতমান ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আন্দোলনের অস্থির অভিঘাত। বিশ্বযুদ্ধজনিত সংকটে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রাণশক্তি নিষ্পেষিত। এমনই এক অশান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিপ্রেক্ষিতে যখন সুস্থিত প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহই বিপর্যস্ত, পরাভূত—তখন একটি পরিবার সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কীভাবে ইষ্টার্থপূরণের লক্ষ্যে অবিচলিত থেকেছে, এ রহস্য সাধারণ বোধের অগম্য। কোন বিপর্যয়, সমস্যা বা অসুবিধার বিবরণ কোন অবস্থাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিয়ে তাঁকে বিব্রত করেননি ব্রজগোপাল। তিনি আশ্রম ছেড়ে যেতে বলেছেন, যা করতে বলেছেন, যেভাবেই হোক তা নিষ্পন্ন করতে হবে, এই ছিল ভক্তপ্রবরের মনোভাব।

১৯৪৪-এ একবার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যক্তি ব্রজগোপাল-তনয় সুমেধাবী ছাত্র রজতবরণের অধ্যয়নের আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণে আগ্রহী হন—তবে তাঁর আগ্রহ নিঃশর্ত ছিল না। বর্ণ, বংশ সবদিকেই মিল রয়েছে, তিনি রজতবরণকে জামাতারূপে পেতে চাইলেন। তাঁর কন্যাটিও রূপেগুণে বরণীয়া। ব্রজগোপাল সব শুনে বললেন—আমার গুরুর সম্মতি পেলে বিয়ে হবে, নাহলে নয়। সেই ভদ্রলোক ভাবলেন —পাত্রপক্ষের যখন আপত্তি নেই, তখন এ সম্বন্ধ একরকম স্থির। নিয়মরক্ষার্থে গুরুদেবকে একবার জানিয়ে দিলেই হবে। তিনি "ঠিক আছে, আপনি আপনার গুরুর সম্মতি নিয়ে আসুন" — এ কথা বলে বিয়ের প্রায় যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

ব্রজগোপাল ঐ একবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করে হিমাইতপুরে তাঁর কাছে গেলেন। ঠাকুর বসেছিলেন মাতৃমন্দিরের সামনে। কতদিন পরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলেন অন্তরতম পরমপ্রিয়কে—মন পূর্ণ হয়ে উঠল আনন্দে। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। শ্রদ্ধেয় শরৎ হালদার, ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

প্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্ষদ্‌বর্গ ছিলেন সেখানে। ব্রজগোপালকে দেখে ঠাকুর বলে উঠলেন —ব্রজগোপালদা তো এবার ছেলের বিয়ের কথা বলবেন! ব্রজগোপাল স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। অন্য সকলে চলে গেলে একান্তে ঠাকুরকে সব নিবেদন করে বললেন—ঠাকুর, মেয়েটির ফটোও নিয়ে এসেছি সঙ্গে, আপনাকে দেখাব? ঠাকুর শুধু বললেন—না, না, দেখাবেন না, দেখলে যদি আবার পছন্দ হয়ে যায়!

ব্রজগোপাল বুঝলেন—এ বিয়ে দয়ালের অভিপ্রেত নয়। তিনি চলে এলেন। আবার অনিশ্চয়তার দাঁড় বেয়ে চলল অকূল যাত্রা। কিন্তু শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও দৃঢ় নিষ্ঠা ও আন্তরিক বিশ্বাসের বলে ক্রমে ক্রমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ হতে লাগল। রজতবরণ বি.এ. অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলেজে অধ্যাপনায় বৃত হলেন—কায়ক্লেশে বারাসতে একটি বাড়িও হল। এর মধ্যে কেটে গেছে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের মত চোদ্দটি বছর। ১৯৫৩ সালের প্রথমদিকে আবার দেওঘরে ফিরে এলেন ব্রজগোপাল—ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশিত সুলক্ষণা সুযোগ্যা পাত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহও দিয়েছেন। তিনি ফিরে আসার পরে ঠাকুরের আনন্দ যেন আর ধরে না—খুব আহ্লাদ করে দুখানি ঘরের একটি বাড়িতে তাঁকে থাকতে দেন, বলেন—একটা ঘরে আপনি সস্ত্রীক থাকবেন, আর যখন ব্যাটা আসবে বৌ নিয়ে, তখন তারা আর একটা ঘরে থাকবে। সরকারি কলেজে অধ্যাপনার জন্য রজতবরণকে তখন নানা জায়গায় বদলি হতে হত।

আশ্রম ছেড়ে যাওয়া এবং পুনরায় ফিরে আসার মধ্যকার সংগ্রামসংকুল চৌদ্দ বছরের গূঢ় রহস্য কিন্তু ব্রজগোপাল কখনও কারও কাছে প্রকাশ করেননি—এমনকী, নিজের পরিবারেও না। ইষ্টভ্রাতা অনেকেরই ধারণা ছিল, ব্রজগোপাল পুত্রের পড়াশুনোর জন্য আশ্রম এবং ঠাকুরকে ত্যাগ করে গেছেন; এ বিষয়ে নানা ভ্রান্তিমূলক গুঞ্জনও কানে এসেছে তাঁর, কিন্তু কখনও কাউকে কোন কথা বলেননি। ঘটনাচক্রে তাঁর পুত্রবধূ ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবহিত হন।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাস। পুজো উৎসব উপলক্ষে ব্রজগোপালের পুত্রবধূ আশ্রমে এসেছেন। একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন—শ্রদ্ধেয় শরৎ হালদার, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ অনেকে উপস্থিত আছেন। নানা আলাপ-আলোচনা চলছে। একটু দূরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ব্রজগোপালের পুত্রবধূও বসে আছেন, শুনছেন অমিয় আলোচনার ধারা। 'যোগ্যতা' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ঠাকুর দেবীপ্রসাদকে অভিধান নিয়ে আসতে বললেন। দেবীপ্রসাদ অভিধান নিয়ে এলেন। হঠাৎ ঠাকুর বললেন—যোগ্যতা কাকে বলে জানেন? এই যেমন ব্রজগোপালদা। আমি তাকে বললাম আশ্রম ছেড়ে গিয়ে ছেলের পড়াশুনোর

ব্যবস্থা করতে, ছেলের চাকরি হলে একটি বাড়ি করতে, ছেলের বিয়ে দিতে, তারপর আবার আমার কাছে ফিরে আসতে। ব্রজগোপালদা তা-ই করল। একেই বলে যোগ্যতা। ঠাকুরের এই কথায় অনেকেরই বহুদিন যাবৎ লালিত একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটল। ব্রজগোপালের তরুণী পুত্রবধূর মনও বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় এবং গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

মানুষের পূর্বসঞ্চিত বহু প্রারব্ধ সদ্‌গুরু লাভের ফলে দ্রুত ক্ষয় হয়—তাই অনেক সময় দেখা যায় দীক্ষাগ্রহণ করা এবং তন্নিষ্ঠ চলনে চলার পরেও নানা দুর্বিপাক দেখা দেয়। কিন্তু যে-কোন অবস্থার মধ্যে তাঁতে আস্থা অনড় থাকলে সে দুর্গতির অবসানও হয়। আবার নানা-দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে দয়াল-ভয়াল-পরমলীলাময় বাজিয়ে নিতে চান ভক্তটিকে, দেখতে চান, কতখানি দুরবস্থার মধ্যেও তাঁর প্রতি ভালবাসা অটুট থাকে।

১৯৩৬-'৩৭ নাগাদ একবার ব্রজগোপালের পরিবারে নেমে আসে রোগরূপী মহাবিপদের বিপর্যয়। ব্রজগোপাল নিজে অর্শের রোগী ছিলেন ; সে-সময়ে সে-রোগ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তার সঙ্গে দেখা দেয় সারা গায়ে ছোট ছোট স্ফোটক—একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। সহধর্মিণী প্রিয়লতা আক্রান্ত হন 'বেরিবেরি' রোগে, একই সঙ্গে পুত্র রজতবরণের হয় প্লুরিসি। সে এক অবর্ণনীয় দুর্দশা। তিনজনই শয্যাগত, কে কার সেবা করে—কে বা করে পথ্য প্রস্তুত, আর চিকিৎসাই বা হবে কোন উপায়ে! ব্রজগোপাল কোন অবস্থাতেই নিজের দুরবস্থা ঠাকুরের গোচরে এনে তাঁকে বিমর্ষ করে তুলতে চান না। কিন্তু অবস্থা যখন সীমানায় গিয়ে ঠেকেছে, তখন প্রিয়লতা কোনমতে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরও যেন কিছুতেই ধরা দেবেন না—একবারও তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না, চোখে চোখ পড়তে গেলেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছেন। তারপর হঠাৎই উঠে পড়ে হনহন করে চলতে শুরু করলেন। প্রিয়লতাও তখন মরীয়া হয়ে কোনরকমে তাঁর সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এবং সংক্ষেপে সমগ্র অবস্থা বর্ণনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রিয়লতাকে ঘরে যেতে বলে অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রমস্থ চিকিৎসক সবাইকে নিয়ে একেবারে সদলে এলেন ব্রজগোপালের ঘরে। জঙ্গল-পরিবেষ্টিত একটি উত্তরমুখী অপরিসর ঘরে থাকতেন ব্রজগোপাল। অচিরেই সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তরিত করে জোর কদমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুর। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন ব্রজগোপাল-ঘরণী প্রিয়লতাকে দেখে গিয়ে চিকিৎসক প্যারীমোহন নন্দী ঠাকুরকে জানালেন—শেষ অবস্থা, বোধহয় রাত কাটবে না। শোনামাত্র ঠাকুর ছুটে এলেন রোগিণীর কাছে, নিজে ওষুধ দিলেন এবং যেখানে যত চিকিৎসক জানা আছে, সবার কাছে লোক পাঠিয়ে, টেলিগ্রাম করে সম্ভাব্য যতরকম চিকিৎসা হতে

পারে, তার ব্যবস্থা করলেন। চব্বিশ ঘন্টা স্নানাহার ইত্যাদিও করেননি শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থেকেছেন প্রিয়লতার চিকিৎসার ব্যাপারে। অবশেষে ধীরে ধীরে সংকট কাটল—রুদ্রের প্রসন্ন মুখের দাক্ষিণ্যে পুনর্জীবন লাভ হল প্রিয়লতার। দীর্ঘ রোগভোগের পর একে একে সকলেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর বলেন, বড় খারাপ যোগ ছিল তখন; প্রথমে যেত ব্রজগোপালদা, তারপর রজত, তারপর রজতের মা। পরমপিতার দয়ায় রক্ষা হয়েছে।

সংসারজীবন ত্যাগ করে আশ্রমিক জীবনে প্রবেশ করার অর্থই ছিল তখন স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া। তবু সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সন্ততির নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের আশ্বাস হেলায় ত্যাগ করে, রুষ্ট আত্মীয়-পরিজনদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কোন্ ঐশ্বর্যের টানে ভক্তদল ছুটে এসেছেন মানবদেহধারী এক আশ্চর্য পুরুষের পদপ্রান্তে, তা "যার খেলা হয়, সে জানে।" এমন সময় গেছে, যখন বস্ত্রাভাবে ঘরের বাইরে বেরোনোর উপায় ছিল না ব্রজগোপাল ও তাঁর পরিবারের। অর্ধাহারের পর অনাহারও গেছে বহুদিন। তারপর হঠাৎই একদিন সকালে প্রসাদী-পিসিমা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভগ্নী পূজনীয়া গুরুপ্রসাদী দেবী) অনেক জামাকাপড় খাবারদাবার নিয়ে এসে হাজির—ঠাকুর পাঠিয়েছেন। এও পরীক্ষারই অঙ্গ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের চরম অভাবেও ইষ্টানুরাগে অবিচলিত থাকার পরে পরীক্ষক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

নিবন্ধারম্ভে ব্রজগোপালের শিক্ষাজীবন প্রসঙ্গে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভের উল্লেখ আছে। বিষয়টি আরও বিশদ বিবরণের দাবি রাখে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন ব্রজগোপাল। তিনি অঙ্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ যখন প্রায় সমাপ্ত করেছেন, এম. এ. পরীক্ষার বাকি আর ছ'মাস, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ তাঁকে ডেকে বলেন বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে সে-বছরই প্রথম এম. এ. পরীক্ষা চালু হতে চলেছে আশুতোষেরই একান্ত আগ্রহে। ইংরেজির অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনকেও আশুতোষ বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বলেন। উপাচার্যের ইচ্ছানুযায়ী ছ'মাসের প্রস্তুতিতেই পরীক্ষায় বসেন ব্রজগোপাল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাংলার এম. এ. উত্তীর্ণদের অন্যতম হওয়ার দুর্লভ ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন, দ্বিতীয় স্থান ব্রজগোপাল দত্তরায়।

আশ্রমে চলে আসার পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানান। উত্তরে তিনি জানান যে, যে-ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি

পেয়েছেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পদে আসীন হয়েই তার তুল্য আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয়; তাই তিনি সসম্মানে এবং সবিনয়ে স্যার আশুতোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরে আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে নিয়োগ করে আশ্রমেই পরীক্ষার খাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষকতার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণায় তাঁর পরিবার-প্রতিপালনে কিছু সহায়তা হত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাংশে নিখুঁত। যে-কোন জিনিষই পরিপাটি পরিচ্ছন্ন না হলে তাঁর ভাল লাগত না। হিসাবপত্রের ব্যাপারেও তিনি নির্ভুল ও যথাযথ হওয়া পছন্দ করতেন। তাঁর প্রবর্তিত ফিলানথ্রপি অফিস তাঁর নিখুঁত নিপুণতার একটি দৃষ্টান্ত। ঠাকুরের নিকটস্থ নিত্য পার্ষদ যাঁরা, তাঁদের অনেকের মধ্যেই তাঁর এই সুনিপুণ কর্মকৌশল সঞ্চারিত হয়েছিল। ঠাকুর চাইতেনও তাই। ব্রজগোপালের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ঠাকুর খুব পছন্দ করতেন ;বলতেন, ব্রজগোপালদার মত করে হিসাব রাখতে হয়। ব্রজগোপাল ফিলানথ্রপি থেকে কোন অ্যালাওয়েন্স নিতেন না। উল্লেখ করা যায়, পরিস্থিতির চাপে অ্যালাওয়েন্স প্রথা অনুমোদন করলেও ফিলানথ্রপি থেকে অ্যালাওয়েন্স নেওয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল না। মানুষ-সম্পদের ওপর নির্ভর করেই ঋত্বিক, যাজন ও সমস্ত আশ্রমকর্মী চলুন, এ-ই ছিল তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা। ব্রজগোপাল তাঁর এই ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছিলেন। খরচ বাবদ যে যা নিত ফিলানথ্রপি থেকে, সবই লেখা থাকত। একবার হিসাব পরীক্ষায় দেখা গেল—তিন মাসে খরচের জন্য ব্রজগোপাল নিয়েছেন দু'টাকা। তাই দেখে ঠাকুরের সে কী হাসি! জনে জনে ডেকে হেসে বলেন—তিন মাসে ব্রজগোপালদার খরচ লেগেছে দু'টাকা! আর একবার যাজনকার্যোপলক্ষে যাওয়ার সময় ব্রজগোপাল ফিলানথ্রপি থেকে কিছু অর্থ নিয়েছিলেন; হিসাব করে দেখলেন, সে অর্থ থেকে পাঁচ টাকা ফেরত আসবে। সচরাচর অনেকেই উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরতদিতেন না। কিন্তু ব্রজগোপালের সেই উদ্বৃত্ত অর্থ খরচ হয়ে যাওয়ায় ছেলের সাইকেল বিক্রি করে তার থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে ফিলানথ্রপিতে জমা দেন। অনেকেই তাঁকে এ কাজে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন—কিন্তু তিনি ইষ্টার্থপূরণে যা করণীয় বলে বোধ করতেন, তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা যেত না।

দয়ালের নানা রসরহস্যেরও কোন শেষ ছিল না। আশ্রমে থাকা মানেই নিরবচ্ছিন্ন বৈষয়িক অভাবে থাকা—এ ছিল স্বতঃসিদ্ধ। ব্রজগোপাল যাজন-পরিক্রমায় ঘুরে বেড়াতেন, আশ্রমে তাঁর সহধর্মিণী প্রিয়লতা শিশুপুত্রটিকে নিয়ে কোনক্রমে দিন কাটাতেন। তবে মনে ছিল অফুরন্ত আনন্দের, উৎসাহের জোয়ার। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করে প্রণাম করে এলেন হয়তো, পরমুহূর্তেই মনে হত—অনেকক্ষণ তাঁকে

দেখিনি, যাই, একবার দেখে আসি। এ অভিজ্ঞতা ছিল আশ্রমস্থ প্রায় সকলেরই। একবার ব্রজগোপালকে কেউ কিছু সম্মানী অর্থ দিয়েছেন—তা থেকে পনের টাকা তিনি মানি অর্ডার করে পাঠিয়েছেন প্রিয়লতাকে। টাকাটা পেয়ে প্রিয়লতা খুবই খুশি হলেন—ছেলেটার গায়ের কোন গরম জামা নেই, শীত আসছে, একটা কিছু কেনা যাবে। আরও কত কী হিসেব হয়ে গেল টাকা হাতে পাওয়া মাত্রই। একটু পরে ঠাকুর-দর্শনে যেতেই ঠাকুর রহস্যভরে হেসে বলেন—মারে! আমায় দশটা টাকা দিতে পারবি? আছে? ব্যাস, হয়ে গেল সব হিসেবনিকেশ, সানন্দে তাঁর চরণে দিয়ে এলেন সেই পনের টাকা থেকে দশ টাকা।

আশ্রমে স্থায়িভাবে এসে বাস করতে শুরু করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তপোবন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে শুরু করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন ব্রজগোপাল। তার মধ্যে প্রেসের অধ্যক্ষের কাজটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে নানা অভাবনীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষীরোদা স্মৃতি প্রেস অন্যতম। তখনকার পক্ষে আধুনিক সমস্ত পদ্ধতিই ছিল প্রেসটিতে। এই প্রেসের কর্ণধার ছিলেন শ্রদ্ধেয় ইষ্টভ্রাতা সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বর্ষীয়ান এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র প্রেসটিকে অন্তরের পূর্ণ মমতা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। বয়োবৃদ্ধিজনিত কারণে তিনি প্রেসের দায়িত্বভার পালনে ক্রমে অসমর্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর অতিপ্রিয় প্রেস-এর দায়িত্ব যে-কোন ব্যক্তিকে দিতে রাজি ছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সুরেশচন্দ্র বলেন—ব্রজগোপাল যদি দায়িত্ব নিতে রাজি থাকে, তবে ওর হাতে আমি প্রেস-এর চাবি দিতে পারি। ঠাকুরও সানন্দে সম্মতি জানান এ প্রস্তাবে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন ব্রজগোপাল। পরবর্তীকালে কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডের নিকটবর্তী ঘোষ লেন-এ একটি সৎসঙ্গের শাখা স্থাপিত হয়। সেখানে একটি প্রেসও হয়; 'বিবর্দ্ধন' পত্রিকা ছাপানো এবং অন্যান্য অনেকভাবে এই প্রেস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলকাতার এই প্রেস হওয়ার পর সুদক্ষ পরিচালনার জন্য হিমাইতপুর থেকে ব্রজগোপালকে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় প্রেরণ করেন এবং এখানেও তাঁর কর্মকুশলতার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়।

একবার হিমাইতপুর থেকে যাজনোপলক্ষে কলকাতা এসেছেন ব্রজগোপাল। দাড়ি কাটতে গিয়ে ক্ষুরের আঘাতে গালে একটি ক্ষত হয়ে সেটি দূষিত হয়ে ওঠে। সেই ক্ষতদূষণ উপশমে তাঁর কোমরে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হয়—কিন্তু ইন্‌জেকশন্‌টি ঠিকমত দেওয়া হয়নি। ইন্‌জেকশনের জায়গাটি ফুলে পেকে আরও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় হিমাইতপুর ফেরেন ব্রজগোপাল। আশ্রমে দুই চিকিৎসক নিজেদের বিচার অনুযায়ী সেই ক্ষতস্থানটিতে অস্ত্রোপচার করেন

অবশ না করে। ক্ষতটি ছিল কাঁচা এবং অপারেশনের অযোগ্য। তার ওপর অবশ না করে অস্ত্রাঘাত করায় তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েন ব্রজগোপাল। তারপরে জানতে পারেন—এই অস্ত্রোপচারে ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না, জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করা হয়েছে। শোনামাত্র তিনি একটি ট্রলি আনতে বলেন। আশ্রমের অভ্যন্তরে অসুস্থ ব্যক্তির গমনাগমনের জন্য ট্রলির ব্যবস্থা ছিল। ট্রলি আনা হলে তাতে করে সরাসরি ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হন, সঙ্গে প্রিয়লতাও ছিলেন। ঠাকুরের পাশে তাঁর জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীও ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন ব্রজগোপাল—ঠাকুর, তোমার নাকি এ অপারেশনের ইচ্ছা ছিল না, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ হল কেন? লক্ষণীয় যে অন্য সময় তিনি ঠাকুরকে 'আপনি' সম্বোধন করতেন, ঠাকুরও তাঁকে তাই করতেন। কিন্তু সেসময় আবেগে মথিত হয়ে তিনি ঠাকুরকে 'তুমি' সম্বোধন করেন। আবার বলেন—তোমার ইচ্ছায় যদি এ অপারেশন হত, তাতে আমার যত যন্ত্রণাই হোক, আমার কিছু মনে হত না ; কিন্তু তোমার ইচ্ছা নেই, তেমন কাজ আমার ওপরে কেন করা হল? বল?

ঠাকুর ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বলেন—আমি তো ভোটে চলি—বেশির ভাগের যা মত—

ঠাকুরের কথা শেষ করতে না দিয়ে আবার গর্জে ওঠেন তিনি—কীসের ভোট? তোমার ইচ্ছাই ভোট, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার ভোট কী? তোমার যাতে মত নেই, সে কাজ কেন হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রিয়লতাকে বললেন ব্রজগোপালকে ঘরে নিয়ে যেতে। পরে মাকে বলেন—দেখলি মা, এমন করে কইল যে পরমপিতার আসন টলে গেল!

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই চিকিৎসার ভার নিলেন। তাঁর প্রেসক্রিপ্‌শন্ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ সেই ক্ষত পরিপক্ক হল এবং তারপর অপারেশন করায় সম্পূর্ণ নির্মূল হল।

ব্রজগোপালকে ঠাকুর একদিন বলেন—ব্রজগোপালদা, আমি যা বলব, আপনি তাই করতে পারবেন।

— আজ্ঞে হ্যাঁ!

— কোন দ্বিধা করবেন না তো?

— আজ্ঞে না।

— যদি বলি, আমার সামনে বস্ত্রত্যাগ করুন, পারবেন তো?

— নিশ্চয়ই পারব।

শুধু বলা নয়, ঠাকুরের নির্দেশে তাই করেছিলেন তিনি। আত্মসর্পণ, আত্মনিবেদনের

চূড়ান্ত রূপ ছিলেন ব্রজগোপাল। ঠাকুরের সম্মুখে যখন বসে থাকতেন, যেন সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর সান্নিধ্যসুধা উপভোগ করতেন নিঃশেষে—কোন প্রশ্ন, কোন সংশয় বা দ্বিধা জাগত না অন্তরে। ঠাকুরকে বলেছিলেন তিনি—আমি আপনার সম্বন্ধে প্রশ্নশূন্য।

বার্মায় প্রচারকার্যে গেছেন ব্রজগোপাল। রেঙ্গুনের স্টীমার ধরবেন এক জায়গা থেকে—স্টীমারঘাটে পৌঁছে দেখেন স্টীমার ছাড়ার উপক্রম হচ্ছে। দ্রুতগতিতে টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটকে গিয়ে দেখেন ভাড়ার চেয়ে পাঁচ টাকা কম পড়ছে। এদিকে স্টীমারের ভোঁ বেজে উঠল। ঐ স্টীমারে যেতে না পারলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে; ইষ্টনাম ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে আসছে না সেই সংকটের মুহূর্তে। কাউন্টারে যে ভদ্রলোক টিকিট দিচ্ছিলেন, তাঁর কী মনে হল কে জানে, তিনিই পাঁচটি টাকা দিয়ে ভাড়ার অঙ্ক পূরণ করে দিয়ে টিকিট দিলেন ব্রজগোপলকে।

পাবনা থেকে কলকাতা যেতে তখন ঈশ্বরদি পর্যন্ত বাসে গিয়ে ঈশ্বরদি থেকে ট্রেন ধরতে হত। একবার একটি জরুরি কাজে কলকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন ব্রজগোপাল ঠাকুরেরই নির্দেশে; সঙ্গে যাবেন ইষ্টভ্রাতা বাসুদেব গোস্বামী—'লাটিমদা' নামে যিনি সমধিক পরিচিত। দুটি বাস ছাড়ে সকালের দিকে ঈশ্বরদির উদ্দেশ্যে; প্রথমটি ধরতে পারলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে মনে করে সকাল সকাল রওয়ানা হয়েছেন দুজনে—ব্রজগোপাল খানিক এগিয়ে গেছেন, বাসুদেব আসছেন একটু পরেই। হঠাৎ বাসুদেবকে ডাকলেন ঠাকুর। ডেকে আপাত দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন অনেক গল্প করতে শুরু করলেন। এদিকে ব্রজগোপাল অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছেন বাসুদেব না এসে পৌঁছনোতে। বাসুদেবও ভেতরে ভেতরে উসখুস করছেন—কিন্তু ঠাকুর কথা বলছেন, সেখান থেকে তো চলে আসা যায় না। ঠাকুরেরও গল্প যেন আর ফুরোয় না—এটা, ওটা, সেটা অপ্রয়োজনীয় হাজার কথা বলে চলেছেন। অবশেষে যখন বিদায় দিলেন তখন অনেকখানি সময় পেরিয়ে গেছে। ব্রজগোপাল বাসুদেবকে দেখে উত্তেজিত হয়ে দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ঠাকুরই আটকে রেখেছিলেন এতক্ষণ। দুজনে দ্রুত বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দেখেন আগের বাসটি ছেড়ে গেছে। কী আর করা যাবে—পরের বাসেই রওয়ানা হলেন। ঈশ্বরদি স্টেশনে যেতে বাসটিকে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হত; লেভেল ক্রসিংয়ের বেশ খানিকটা আগেই বাস দাঁড়িয়ে পড়ল, আর যাবে না, কারণ আগের বাসটি লেভেল ক্রসিং-এ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছে, বহু লোক হতাহত। দুজনেই মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলেন, চতুরচূড়ামণি কীভাবে রক্ষা করেছেন তাঁদের! কিছুটা হেঁটে স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা পৌঁছন তাঁরা।

এদিকে আশ্রমে খবর পৌঁছে গেছে দুর্ঘটনার, এবং সকলেই ভাবছেন যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতেই ব্রজগোপাল ও বাসুদেব ছিলেন। মাতা মনোমোহিনী নিজের

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন—পরমপিতা! আমি কী পাপ করেছি যে আমার এমন ক্ষতি হল? সমগ্র আশ্রমের পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠল। ব্রজগোপাল-জায়া প্রিয়লতা একবার ছুটে যাচ্ছেন ঠাকুরের কাছে, আর একবার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ছেন। শিশু রজতের তখনও বোধ জন্মায়নি তত—সে নির্বিকারভাবে বাড়ির কাজের মেয়েটিকে ডেকে বলছে, জানো আবেদের মা, আমার বাবা না মরে গেছে! আবেদের মা ধমক দিয়ে বলে—চুপ কর, অমন অলক্ষুণে কথা কয় না! ঠাকুর বসে আছেন গম্ভীর মুখে—কিন্তু তাঁকে দেখে বিশেষ বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।

কলকাতা পৌঁছেই ব্রজগোপালদের মনে হয়—এই দুর্ঘটনা নিয়ে আশ্রমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ নিরাপদ পৌঁছসংবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেন। টেলিগ্রাম আসাতে আশ্রমের ওপর থেকে আশঙ্কার জগদ্দল ভার অপসারিত হল।

সাধন-ভজন ও কর্মপ্রবাহের মধ্যে দেখতে দেখতে পেরিয়ে এসেছেন জীবনের সত্তরটি বছর। দেশ ভাগ হয়েছে, ঠাকুর চলে এসেছেন দেওঘরে দেশ ভাগের ঠিক এক বছর আগে। ব্রজগোপাল সহ অন্যান্য ভক্তরাও তখন দেওঘরেই আছেন। হঠাৎ একদিন ঠাকুর প্রখ্যাত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ডেকে ব্রজগোপলের কোষ্ঠী দেখতে বলেন। পণ্ডিত মহাশয় কোষ্ঠী বিচার করে ঠাকুরকে জানান, তিয়াত্তর বছর বয়সে একটা খুব বড় ফাঁড়া আছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, তারপর? পণ্ডিত মহাশয় জানান যে গুরুর কৃপায় ঐ ফাঁড়া কেটে গেলেও সাতাত্তরে নিশ্চিত মৃত্যুযোগ। ঠাকুর সব শুনলেন, কিছু বললেন না। আরও সাত বছর অতিক্রান্ত হল। ব্রজগোপল নির্বিঘ্নে তিয়াত্তর পার করে সাতাত্তরে উপনীত হলেন। সাভাত্তর পূর্ণ হতে তখন আর মাস তিনেক বাকি। ঠিক এমন সময় ঠাকুরের আদেশ হল মায়ের জীবনী লেখার জন্য। মায়ের অর্থাৎ মাতা মনোমোহিনী দেবীর জীবনী।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রাতে নিত্যদিনের মত জীবনীকার গিয়েছেন ঠাকুর দর্শনে। ঠাকুর তখন বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। ঐ দিনই ঠাকুর তাঁকে মায়ের জীবনী লেখার কথা বলে জিজ্ঞাসা করেন—'মনে থাকবে তো?' ঠাকুর কী বললেন ভালভাবে তা না বুঝেই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঠাকুরের কাছে অন্য প্রসঙ্গ ওঠায় ঠাকুর কী বললেন তা আর জেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এক অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটতে লাগল ঠাকুরের আদেশ ঠিকমত না বোঝার জন্য। বিকেলে আবার এলেন ঠাকুর বাড়ি, কিন্তু ঠাকুরের শরীর সেসময় বেশি অসুস্থ থাকায় কথা বলায় সুযোগ হল না।

পরদিন ২রা ডিসেম্বর সকালে ঠাকুর প্রণামে এলেন, ঠাকুর তখন পার্লারের

ভিতরে ছোট ঘরটিতে ছিলেন অর্ধশায়িত অবস্থায়। খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে তাঁকে;ঐ অবস্থায় আর কিছু জিজ্ঞাসা না করা শ্রেয় মনে করে প্রণাম করে চলে এলেন তিনি। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার অল্প সময় পরে আমেরিকান ইষ্টভ্রাতা হাউজারম্যান এসে জানালেন যে ঠাকুর তাঁকে ডাকছেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই ঠাকুর উচ্চ স্বরে আকুল হয়ে মাতা মনোমোহিনী দেবীর জীবনীর কথা বলেন। তাঁর আকুলতায় লেখক অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলেন,—আপনার জীবনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তো আমি শ্রীশ্রীমা-র জীবনের সবই যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি। একথা শোনার পর ঠাকুর অবুঝ শিশুর মত বারবার মায়ের জীবনীর উল্লেখ করতে থাকেন। ব্রজগোপাল বুঝলেন, ঠাকুর মায়ের পৃথক পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার কথাই বলছেন। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করেন—ঠাকুর, শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনীগ্রন্থ রচনাই কি আপনার ইচ্ছা? এই কথায় ঠাকুর স্বস্তি বোধ করেন এবং বারবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। ব্রজগোপাল বলেন—ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, আপনার দয়ায় নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছা পূরণ করে উঠতে পারব। এ কার্য সাধনে আমার প্রাণপাত পরিশ্রমের এক বিন্দুও ত্রুটি হতে দেব না। সেখানে উপস্থিত ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র পূজনীয় প্রচেতারঞ্জন ঠাকুরকে বলেন—বাবা, তুমি শান্ত হও, মাস্টারমশাই যখন ভার নিয়েছেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ঠাকুরের অন্যতম বাণীলেখক দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে বলেন, ব্রজগোপালদা যখন এই কাজ হাতে নিয়েছেন, নিতান্ত সুষ্ঠুরূপেই তিনি তা সমাপ্ত করবেন, আমরাও তাঁকে সাহায্য করব। আপনি সুস্থির হোন। এর পরে ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতিস্থ হলেন।

একে একে সবাই চলে গেলে ব্রজগোপাল পুনরায় ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন—ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, অগৌণেই যেন আপনার ইচ্ছা পূরণ করে উঠতে পারি। ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

সেদিন থেকেই মায়ের জীবনী লেখার কাজ শুরু হল। সমস্ত দুপুর এবং গভীর রাত পর্যন্ত লেখা চলল। পরদিন অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বর বেলা একটা পর্যন্ত একটানা কাজ হল। দুপুরে প্রচেতারঞ্জন এলেন ঠাকুরের কাছে যেতে বলার জন্য। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে গেলে তিনি মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলেন—সকলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যত সত্বর পারেন কাজটা সেরে ফেলুন। আর, মা'র ব্যাপারে তো আপনার বেশ ভালই জানা আছে। তাঁর আদেশ, উপদেশ ও আশিস লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে খুশি মনে ফিরলেন ব্রজগোপাল।

এরপর ঠাকুরের সঙ্গে যখনই তাঁর দেখা হয়েছে, ঠাকুর স্মিতকণ্ঠে শুধু বলতেন,

—কেমন, চলছে তো? জোর চালিয়ে যান।

জীবনী রচনার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে—বেশ কিছুদিন হল এ কাজে ব্যস্ত থাকায় ঠাকুরের কাছে বিস্তারিত জানানো হয়নি অগ্রগতির কথা। ২৬শে জানুয়ারি সকালে ঠাকুর তখন পার্লার সংলগ্ন ছোট ঘরটিতে বিশ্রাম করছেন। ব্রজগোপাল গেলেন ঠাকুর-প্রণামে। সেখানে তখন আর কেউ না থাকায় তিনি ঠাকুরের খুব কাছে গিয়ে বসেন। ঠাকুরের চোখেমুখে এক সুগভীর প্রশান্তি, মুখে মৃদু হাসি, সানন্দে সাগ্রহে জীবনীকারকে অভ্যর্থনা করেন ঠাকুর। অপরিসীম আত্মতৃপ্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন তিনি, আনন্দে বিভোর চিত্তে নিবেদন করলেন—ঠাকুর, আপনার দয়ায় শ্রীশ্রীমার জীবনীর কাজ ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। দশটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। পাঁচটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ একরকম সারা হয়েছে। অপর অধ্যায়গুলির উপাদানও যথেষ্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থে ষোলখানা ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ছবির ব্লকগুলিও সব যোগাড় করা হয়েছে, সেগুলি ছাপানোর জন্য কলকাতার প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি। এগুলির প্রুফও শীঘ্রই পাওয়ার আশা করছি। গ্রন্থমুদ্রণের ব্যাপারেও চেষ্টা চলছে। ... ঠাকুর স্মিত হাস্যে প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে বলতে থাকেন—খুব ভালো! খুব ভালো! জীবনীকার করজোড়ে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করেন,—ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, এইবার গ্রন্থখানার মুদ্রণ সত্বর সমাধা করে আপনার শ্রীকরে অর্পণ করে আমার জন্ম ও জীবন যেন সার্থক করতে পারি।

গ্রন্থরচনার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঠাকুরের শ্রীহস্তে অর্পণ করা সম্ভব হয়নি; ঐ দিনই শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্ত্যলীলার অবসান ঘটে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে সেই অনুপম মাতৃজীবনীসুধার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যার মধ্য দিয়ে লেখকের তন্নিষ্ঠা এবং জননীদেবীর আলোকসামান্য ব্যাক্তিত্বের দ্যুতির স্ফুরণ কিছুটা উপলব্ধি করা সম্ভব।

"দেশবন্ধুর অনুরোধে মহাত্মাজী বঙ্গদেশ ভ্রমণ-কালে একবার শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে সৎসঙ্গ-আশ্রমে আগমন করেন। ...

মহাত্মাজী প্রাতঃকালে আশ্রমে শুভাগমন করিলে খদ্দর পরিহিত আশ্রমিকগণ শ্রীশ্রীজননীদেবীকে পুরোভাগে রাখিয়া সচন্দন পুষ্পমাল্যাদি অর্ঘ্য উপচারে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করেন। জননীদেবী ও মহাত্মাজীর পরস্পরের কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জননীদেবী আপন বাহুবন্ধনে মহাত্মাজীর গলা ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ধীরপদে আশ্রম বাটিকার সর্বত্র ঘুরিয়া কুটীরশিল্পাগার, বিজ্ঞানকেন্দ্র, তপোবন বিদ্যালয়, কারখানা, ছাপাখানা, তড়িদ্‌ভবন, ভৈষজ্যালয়, কলাভবন প্রভৃতি

কর্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করান। জননীদেবী হিন্দী ভাষায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলেন। জননীদেবীর কথায় মহাত্মাজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জনকল্যাণকর অপূর্ব ভাবরাজি এবং বিচিত্র কর্মধারার বিশদ পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অজস্র প্রশংসা করেন। আশ্রমপরিদর্শনে বাহির হইয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে জননীদেবী মাতৃসুলভ আদর ও সোহাগের সুরে একবার তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"মহাত্মাজী, পরমপিতার আশীর্বাদে তুমি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বটে, তবে তুমি কিন্তু আমারই ছেলে।" জননীদেবীর ঈদৃশ অনাবিল অপূর্ব সন্তানবাৎসল্যের স্নেহল স্পর্শে মহাত্মাজী আহ্লাদে আটাখানা হইয়া স্মিতমুখে গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,— "হ্যাঁ, মা, সত্যিই তাই, আমি তো আপনার ছেলেই।" বহুক্ষণ ধরিয়া সৎসঙ্গের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য নানা বিষয়ে জননীদেবীর সহিত কথাবার্তায় মহাত্মাজী তাঁহার হৃদ্য আলাপন, মধুর আচরণ এবং পরমাত্মীয়তুল্য প্রাণখোলা মেলামেশায়, সর্বোপরি তাঁহার অপূর্ব মাতৃত্ব ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহার অন্তরে চিরদিনের মত একটি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। মহাত্মাজী অতঃপর যখনই যেখানে যাইতেন, জাতীয় উন্নতিসাধনে জনসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে সৎসঙ্গের উন্নত আদর্শ ও বিচিত্র কর্মধারার কথা সানন্দে উল্লেখ করিতেন এবং তৎসঙ্গে সৎসঙ্গ-জননী মনোমোহিনী দেবীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "I have never seen a masterly woman of such wonderful personality in my life"—অর্থাৎ, "এমন অদ্ভুতব্যক্তিত্বসম্পন্না সুদক্ষা নারী আমি জীবনে আর দেখি নাই।"

বহুকাল পূর্বের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-প্রচারকার্যে আমি একবার পশ্চিম ভারতে গিয়াছিলাম। তৎকালে আমেদাবাদে অবস্থানকালে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'সবরমতী' আশ্রমে যাই। আমি 'পাবনা সৎসঙ্গ' হইতে গিয়াছি শুনিবামাত্রই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তখন চড়কায় সূতাকাটায় রত ছিলেন। তাঁহার সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি উল্লসিত কণ্ঠে অধীর আগ্রহে জননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বাঙ্গীণ কুশলসংবাদ জানিতে চাইলেন। প্রায় এক ঘন্টাকাল তাঁহার সঙ্গে আমার সৎসঙ্গ আশ্রম সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা হইল। গভীর মনোযোগের সহিত তিনি আমার সকল কথা শুনিলেন এবং বিশেষ কৌতূহলী হইয়া নানা প্রশ্ন করিয়া আশ্রমের আরব্ধ কার্যাবলীর খুঁটিনাটি কত কথা জানিতে চাইলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তায় ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি যে, সৎসঙ্গ-আশ্রমের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি অন্তরে কী গভীর আগ্রহ এবং জননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কী উচ্চধারণা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই না

পোষণ করেন।”

“পুরুষোত্তম জননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী” নামক গ্রন্থটি বহু পরে ১৯৮৬-র অক্টোবর মাসে ব্রজগোপলের উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রণ এবং প্রকাশনা না দেখে যেতে পারলেও গ্রন্থসমাপ্তির মহাতৃপ্তিতে তিনি উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত, এই বইখানি রচনার জন্যই যেন তাঁর আয়ু অবশিষ্ট ছিল। ঠাকুরের ঐহিক লীলানিবৃত্তির পর ব্রজগোপল বারাসতে পুত্রের কাছে অবস্থান করে মায়ের জীবনীর বাকি অংশ রচনার কাজ সমাধা করেন। ঠাকুরের আদেশ পাওয়ার পর এই গ্রন্থ রচনার কাজে তিনি প্রায় তিন বছর ব্যাপৃত ছিলেন, এবং রচনাকার্য সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই ২৯শে পৌষ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে তাঁর ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুশয্যায় তাঁর শেষ কথা ছিল—"I have kept my word, I have kept my word"! প্রিয়তমকে দেওয়া কথা—মাতৃজীবনী রচনার কথা, তিনি যে রাখতে পেরেছিলেন, এই বিপুল সৌভাগ্যে আপ্লুত হয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করেন ব্রজগোপল, সূক্ষ্ম সত্তায় বিলগ্ন হন পরমপ্রিয় পুরুষোত্তমের চরণপ্রান্তে।

ব্রজগোপাল দত্তরায়ের মুখ্য পরিচয় জীবনীকাররূপে পৃথক মর্যাদা পেলেও নিরলস সুদক্ষ কর্মী, সংগঠক, প্রচারক এবং কৃতী শিক্ষকরূপেও সৎসঙ্গের ইতিহাসে তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকবেন বিশেষভাবে। মৃদুভাষী, শান্ত অথচ দৃঢ় মানুষটি 'মাস্টারমশাই' অভিধায় সমধিক পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পরিচয়—তিনি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিষ্প্রশ্ন, নিঃশর্ত, আজ্ঞাবাহী, নিরভিমান ইষ্টসর্বস্ব পরম ভক্ত, এবং এই পরিচয়ই কালের সীমানা অতিক্রম করে অক্ষয় হয়ে থাকবে, প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে শ্রীশ্রীঠাকুর-অনুগামী আগামী প্রজন্মকে।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

সুবোধচন্দ্র সেন

২৬শে জুন, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ — ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সুবোধচন্দ্র সেন

[শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের নবীন বয়সেই যাঁরা তাঁকে জীবনকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে নিজ জীবন আবর্তিত করেছেন এবং সারা জীবন ধ'রে নিজের প্রাপ্তি অন্য অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, ডাঃ সুবোধ সেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সৌভাগ্যবশত তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তের সৌজন্যে তাঁর রচিত পিতৃস্মৃতি-আলেখ্য পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে সুবোধ সেনের ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন এবং আদর্শের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণের ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে — তার সঙ্গে রয়েছে সেই সময়ের ইতিহাসের ঝলক। শ্রীমতী বন্দনার অনাড়ম্বর, নির্ভার অথচ গভীর মনস্বিতায় উজ্জ্বল মৃদু স্বগতোক্তি-প্রতিম স্মৃতিচারণাটি কিছু সংক্ষেপ ও সামান্য সম্পাদনা ক'রে এখানে যুক্ত হল।]

ইতিহাস দুরকমের হয়—এক, বহিরঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহাসিকরা যা লিপিবদ্ধ ক'রে বিতর্কের ঝড় তোলেন। আর এক হল অন্তরালের অন্তরঙ্গ ইতিহাস— প্রত্যক্ষদর্শীর ধমনীর মধ্য দিয়ে যে ইতিহাসের অণু-পরমাণু প্রবাহিত হয়। এই অন্তরঙ্গের ইতিহাস খুব ব্যক্তিগত মনে হলেও এটাই সত্য। রাজা-রাজড়ার যুদ্ধের বিবরণ, কার অশ্বপালে কত অশ্ব, হাতিশালে কত হাতি, কোন যুদ্ধে কার কত লাভ হয়েছিল, কার বা ক্ষতি—এই হিসাবে পণ্ডিত মহলের সংখ্যাতাত্ত্বিক আনন্দ হয়তো লাভ হতে পারে, কিন্তু অন্তরঙ্গের ইতিহাস, যা নিভৃত ঘরের কোণে তিল তিল ক'রে গড়ে ওঠে, তার কোন চমক থাকে না, থাকে সত্যের শক্তি।

আমার বাবা সুবোধ সেন সম্বন্ধে আমি তেমনই একটা কিছু লিখতে বসেছি। বাবার জীবনে কোন নাটকীয় চমক ছিল না—ছিল জিজ্ঞাসা আর নিষ্ঠা। এই শান্ত আড়ম্বরহীন জীবনধারার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণের যে স্বাদ আছে, তারই সামান্যাংশ আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই। যেসব ঘটনা বিবৃত করব, তার অনেকটাই আমার পঁচিশ / ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পথে না চলে আমি ঐ সময়ের ওঠানামার মধ্যে বাবাকে কেমনভাবে পেয়েছি আর বাবা আমাদের কী দিতে চেয়েছেন —তার খোঁজেই এই লেখা।

বাবা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৮ সালের ২৬শে জুন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে ।এই সময় দেশের রাজনৈতিক পটভূমি খুব অস্থির ছিল। ব্রিটিশ শাসনের দমননীতিতে ক্রুদ্ধ যুবসমাজের একাংশ সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করেছিল। কোন কোন রাজনৈতিক দল দেশোদ্ধারের উৎসাহে দূরদর্শিতার বিচার ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপকে স্বীকার না ক'রে তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধির কোন দ্রুত এবং চমকদপ্রদ পদ্ধতিতে বীর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে তুষ্টি আনতে পারে না। এক খণ্ডস্বার্থ থেকে আর এক খণ্ডস্বার্থে

ঘুরতে ঘুরতে যে পথভ্রান্তির সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়, সেকথা যাঁরা মননশীল তাঁদের বোধে ধরা পড়ে।

বাবা ম্যাট্রিক পাশ করার পরে ১৯১৪ সালে কলকাতায় এসে তখনকার রাজনৈতিক দলগুলো—বিপ্লবী ও অসহযোগী—সকলের সঙ্গেই মিশেছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু জানবার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল, আবার বাস্তব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সুন্দর হোক, এটা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯৫৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জীর একটি নোট নিয়েছিলাম—সেটাতে ধরা পড়েছে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের চঞ্চলতা। সেই নোটটি বর্ণনা করছি।

"বাবা ফার্স্ট ক্লাসে পড়বার সময় আগ্রা সৎসঙ্গে দীক্ষা নেন। ১৯২০-তে নাগপুর কনফারেন্সের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়ে ভলানটিয়ার হন। ১৯২১-এ প্রবর্ত্তক সংঘে যোগ দেন। ১৯২২-এর অক্টোবরে হিমাইতপুর সৎসঙ্গে দীক্ষা নেন। নরেন ব্যানার্জি নামে কোন বন্ধু তাঁকে এ পথে আসতে উৎসাহিত করেছিল। তখন বাবা মেডিক্যাল কলেজের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। ১৯২৩-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হননি (নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট?)। ১৯২৪-এ ডাক্তারি পাশ করেন। ১৯২৫-এ D.P.H. পাশ করেন। ১৯২৬-এ দশ মাস বহরমপুর থাকেন—তারপর পুরুলিয়া যান। এই সময় তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৩০ এ যশোর আসেন। যশোরে আসার পর প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন ছয়/সাত বছর পর্যন্ত। ১৯৩৭-এ ঋত্বিক সম্মেলনের প্রবর্তন হওয়াতে প্রচারকার্যে খুব সুবিধা হয়। ১৯৪১-এ যশোর উৎসব। ১৯৪২-এ মিলিটারি থেকে আমাদের বাড়ি নিয়ে নেওয়াতে আমরা পাবনায় চলে আসি। ১৯৪২—১৯৫৪ তো জানা ইতিহাস।"

১৯৫৪ সালে নেওয়া এই ছোট্ট নোটটুকুর মধ্যে কিন্তু বাবা যে নন-কোঅপা-রেটিভ মুভমেন্ট-এ যোগ দিয়েছিলেন, সেকথা কোথাও লেখা নেই। সে গল্প আমি কোন সময় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম। নোট নেওয়ার সময় যদি খেয়াল থাকত তাহলে হয়তো বাবার কাছে ঐ সময়ের কথা কিছু শুনে নিতাম। বাবা কোন উল্লেখ করেননি; হয়তো ঐ আন্দোলনের পুরো ব্যাপারটাই ওঁর কাছে জীবনবিরুদ্ধ মনে হয়েছিল, আত্মঘাতী মনে হয়েছিল। ঐ আন্দোলন সম্বন্ধে মনে কোন নরম জায়গা থাকলে আমাকে বলতেন বলে মনে হয়।

সৎসঙ্গে আসার পর থেকে, ঠাকুরের কাছে সর্বপরিপূরক আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে বাবা আর কোথাও ছোটাছুটি করেননি। তিনি নিজের স্বভাবকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর একান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী সাহায্যকারী নিরহঙ্কার মাধুর্যমণ্ডিত স্বভাবকে তিনি কোন বিরুদ্ধ ভাবধারায় পঙ্কিল হতে দেননি—এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

ডাক্তারি পড়া শেষ করে স্বাধীনভাবে ডাক্তরি করার ঝুঁকি না নিয়ে চাকুরিজীবনের

নিশ্চয়তা গ্রহণ করেছিলেন পারিবারিক কারণে। ডাক্তারি পড়ার তৃতীয় বর্ষে পিতৃবিয়োগের পরে তিন ভাই, তিন বোন এবং মা, সকলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ওঁকে মনে মনে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। আমার কাকা-পিসিমারা বরিশালে থেকেই পড়াশুনা করেছেন। ছুটির সময় আর পড়াশুনো শেষ হলে ওঁরা যশোরে আসতেন, কিম্বা যেখানেই মা বাবা থাকতেন, নির্দ্বিধায় সেখানেই কাকারাও থাকতেন। একথা উল্লেখ করলাম এজন্য যে যখন দেশভাগের পরে অনেক কষ্ট করে মামাবাড়ির দুখানা ঘরের মধ্যে থাকা হচ্ছিল তখনও কাকারা দাদার শ্বশুরবাড়িতে এসে ক'দিন থেকে যেতে অসুবিধা বোধ করেননি। আমার মায়ের সঙ্গে কাকাদের খুব ঘনিষ্ঠ মধুর সম্পর্ক ছিল— বাবার সঙ্গে ছিল সম্ভ্রমসূচক দূরত্বপূর্ণ অন্তরের সম্বন্ধ।

যদিও বাবা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তবুও সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের কাছে নিজেকে নিবেদন করার মত মানসিক গঠন আসতে আরও বছর সাতেক লেগেছিল। ১৯২৯-এ মায়ের কাছে লেখা এক চিঠি থেকে তাঁর তখনকার মনের অবস্থা জানতে পারি। একটু উদ্ধৃতি রাখছি—

"...কত কথাই তো এতদিন মাথায় গজ গজ করত—স্বরাজ দেশোদ্ধার কত কী! এবার পাবনা গিয়ে অনেক ভাল ফল হয়েছে। ওসবে যেন মন সাড়া দেয় না। ঠাকুর বলেছেন—স্বরাজ বললে স্বরাজ হয় না, স্বরাজ করলে স্বরাজ হয়।

...বাস্তবিক এখানে যে বিপুল কর্মপ্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দু-তিন শত লোক ... এখানেই দিনরাত খাটছে। খাওয়া একবেলা।... এতগুলি লোক যে একবেলা খেয়ে পরিশ্রম করছে, কীসের জোরে? মুখে হাসি লেগেই আছে। তাছাড়া কেউ যে কষ্টে আছে — একথা কেউ মনেই ভাবে না। অনুভব করা দূরের কথা। আমার মনে হয় এদের activity-র মূল হচ্ছে ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা। ভালবাসার লোকের জন্য যে পরিশ্রম—তাতে আনন্দ ছাড়া কিছু নেই। সকলেই কি পারে? না—তা পারে না—তাই যারা স্বার্থ খোঁজে—তারা কিছুদিন পরেই আশ্রম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এইসব লোকেরাই আশ্রমের কুৎসা প্রচার ক'রে তাকে মসীলিপ্ত করতে চাইছে। ... যাক্, ঠাকুর বলেছেন যে, যার life unit ঠিক হয়েছে—ও যার activity আছে — তার আর কোন ভয় নেই।... আশ্রমের কাজের জন্য worker আরও চাই ... আমাকে কিন্তু বললেন না আসতে। ... তাঁর কথায় মনে হল আমি যে কাজে আছি সেই কাজে থাকাই তাঁর অভিমত। ... ঠাকুর এককথায় বলে দিয়েছেন biology সম্বন্ধে research করতে হবে। ডাক্তারি শাস্ত্রটা তো প্রায় ভুলেই গেছি। আবার তা পড়তে হবে প্রথম থেকে— উপায় নাই ... কিন্তু কী করে কাজ আরম্ভ করি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।... এখানে (পুরুলিয়ায়) লোকের সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। কী করে মিশবো? একটা common basis থাকে তবে তো মেশা যায়? ... কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি যে এই

তো আমার স্থান। আমি যা বলি, যা ভাবি, যা চাই—এই তো এখানে ঠিক তাই আছে।”

এই সময় বাবার life unit ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এই সময় বাবা জীবনের কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ কোথায় আছে বুঝেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন,—এবং সেই কেন্দ্র পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই উদ্দেশ্যে সমস্ত দিক adjust ক'রে সমস্ত কর্মপ্রণালী পরিচালিত করেছিলেন। বাবার ভাললাগার যে অভিব্যক্তি এই লেখাতে ফুটে উঠেছে —তা তখনকার দিনের আশ্রমবাসীদের অনেকের কাছেই পরিস্ফুট ছিল। গোপাল জ্যাঠামশাই—অর্থাৎ সৎসঙ্গের প্রথম যুগের সম্পাদক এবং ঋত্বিগাচার্য-সচিব শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়-এর মাসতুত ভাই হরেরাম চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে গিয়েছিলাম আশ্রমের কথা, পুরোনো দিনের কথা শুনব বলে। প্রথম কিছুক্ষণ উনি শুধু বাবার কথাই বললেন। ওঁর ভাষায়, “ঠাকুরকে গ্রহণ করলে কীভাবে তাঁকে জীবনে বহন করতে হয়, সুবোধদাকে দেখে সেটা বোঝা যায়। . . . গোপালদা, তোমার বাবা,— ওঁরা ঠাকুরের বড় কাছের লোক ছিলেন। সুবোধদা যখন আসতেন আমরা ছুটে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বসতাম। কত গল্প হত। ঠাকুর ভীষণ উৎফুল্ল হতেন. আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম। ঠাকুর গ্রহণ করা যে কী জিনিষ সুবোধদাকে দেখলে বোঝা যেত। . . . ”

ঠাকুরের কাজ জীবনের অনেক বিভাগের মধ্যে একটু অংশ নয়, সবখানি জুড়েই তাঁর কাজ, বাবার অন্তরে এই বোধ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় লেগেছিল—এ কথা স্পষ্ট। এরপরে বাবা পুরুলিয়া থেকে যশোর চলে আসেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় থেকে তাঁর ইষ্টার্থপরতার সুবর্ণ যুগের শুরু বলা যায়। প্রায় সবসময়ই যজন ও যাজনকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন তিনি। বাবা ভীষণ দৃঢ় কিন্তু মিষ্টিভাষী ছিলেন—তাঁর কাছে এসে কেউ কখনও আহত হয়নি। এই সময় ঋত্বিক সংঘের সংগঠন হয়। যশোরে আমাদের চৌরাস্তার মোড়ের ভাড়াবাড়ির কাছে ঋত্বিক সংঘের লোকেদের রাত্রিবাসের জন্য একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া আমাদের বাড়িতেই হত। আমার মনে আছে, এঁদের সঙ্গে বাবার দীর্ঘ আলোচনা হত। প্রতিটি বিষয়ে নিজেদের ধারণা পরিষ্কার আছে কি না—এটা পরিস্ফুট করার জন্য দুটো দল ক'রে আলোচনাগুলো চলত। দু'পক্ষের ভাগেই কিছু কিছু জোরদার বক্তব্য রাখার মত লোক থাকত। এই দুটি পক্ষ নিজেদের মতামত স্থাপনা করার জন্য তীব্র এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগ করতেন। মা বলতেন, “এসব মতামত বিনিময়ের জন্য আমার টেবিলটা যে কত কিলঘুষি খেয়েছে। ওর যদি প্রাণ থাকত তবে ও নিশ্চয়ই আমার কাছে তার দুঃখ জানাত।” এই আলোচনাচক্র যেমন বুনিয়াদী ছিল, তেমনই মনোগ্রাহী। বৈঠকখানা ঘরে লোক ধরত না। সন্ধেবেলা এই ছিল নিত্যকার ব্যাপার। আর সকালে সবাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তেন। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগেই সমস্যাগুলোকে গুচ্ছ গুচ্ছ ক'রে নির্ধারিত করা যায়; এবং এই প্রত্যেক গুচ্ছের সমস্যার সমাধান ঠাকুরের কাছ থেকে আমরা কেমন ক'রে পাচ্ছি এবং চিরায়ত ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তা

কীভাবে অঙ্গীভূত—গীতার শ্লোকের মাধ্যমে সেগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে, বহির্মুখী এবং বিভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলার প্রয়াস এই আলোচনাচক্রের মাধ্যমে করা হত। কোন একজন মানুষকেও ঠাকুরের কথা বোঝাতে পারলে এঁরা সবাই মিলে দিগ্বিজয়ের আনন্দ অনুভব করতেন। সেই উচ্ছ্বাসভরা মুখগুলি মনে আছে।

বাবা মাকে নিজের ব্রতপালনের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। মা ব্রাহ্মঘেঁষা পরিবারের মেয়ে ছিলেন। নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেহধারী পুরুষোত্তম গুরুরূপে মানুষের সামনে সত্যিই থাকতে পারেন, একথা মানবার জন্য অনেক আলোচনা, বিচার-বিবেচনা, প্রত্যক্ষদর্শন এবং বাবার প্রতি একান্ত ভালবাসার ফলে মা বিয়ের দশ বছর পরে দীক্ষা নেন। আমার মা জ্যোতির্ময়ী দেবী—জুঁই-মা নামে যিনি অধিক পরিচিত—ছিলেন দার্জিলিং কনভেন্টে পড়া ব্যাক্তিত্বময়ী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, এবং সর্বার্থে সুদক্ষ; কিন্তু বাবার উগ্রতাবিহীন এবং আদর্শে-সমর্পিত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করেছিলেন।

যশোর জেলায় ঠাকুরের ভাবাদর্শের আন্দোলন-সংগঠনে বাবা ডিস্ট্রিক্ট-ইন-চার্জ হন। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার হিসাবে যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ট্যুর করতেন, তার সঙ্গে বাবা প্রচার-অভিযানের কাজ যোগ করে নিয়েছিলেন। যেখানে যেতেন সারাদিন অফিসের যা করণীয় করতেন; সন্ধেবেলায় যেসমস্ত লোকজন আসতেন, তাঁদের কাছে ঠাকুরের কথা বলতেন। কখনও কখনও অধিবেশন আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। আমাদের বাড়িতে যশোর জেলার একটা বড় ম্যাপ টাঙানো থাকত। সেই ম্যাপ ধ'রে পর পর গ্রাম কিংবা সাব-ডিভিশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হত। এভাবে যশোর জেলার প্রত্যেক সাবডিভিশনের সঙ্গে বাবার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামে যে দীক্ষাপত্র তৈরী হয়ে আসত, সেই দীক্ষাপত্রের অর্ধাংশ কেন্দ্রে, অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে জমা থাকত। একটা খাতা তৈরী করা হয়েছিল, যাতে গ্রাম হিসাবে নাম তালিকাভুক্ত করা হত। আমার তখন স্কুল ছিল না। রাসবিহারীদা নামে একজন একাজগুলো করতেন। তাঁর সঙ্গে বসে বসে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কাঁচা হাতে আমিও একাজ অনেক করেছি।

সৎসঙ্গের অধিবেশনগুলিতে প্রচুর লোকসমাগম হত। মাঝরাত্রেও একনৌকা মানুষ এসে উপস্থিত হতেন। তাঁদের আহার-শয়নের ব্যবস্থা করার দায়িত্বে ছিলেন মা। প্রফুল্লকুমার দাস সঙ্কলিত ঠাকুরের কথোপকথন-গ্রন্থ 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-তে এর একটু উল্লেখ আছে। ঠাকুর বাবাকে বলছেন, "শুনেছি তোমার বাড়িতে ছোটখাটো আনন্দবাজার লেগেই থাকে ... কিন্তু আরও দ্রুতগতিতে কাজ চাই।" যে দুর্দিনের আশংকায় ঠাকুর সবাইকে এত তাড়া দিতেন, তা যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা কেউ বুঝতে পারেনি তখন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের দূরত্ব থেকে সেই সময়কে যখন দেখতে পাই তখন কাজগুলির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

১৯৪১-এ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যশোর উৎসব পালিত হয় মূলত বাবার ঐকান্তিকতায়। ১৯৩০ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪১-এ উৎসব পর্যন্ত একভাবে কাজ ক'রে বাবা যশোর জেলায় কাজের একটা শক্ত জমি তৈরি করেছিলেন। যশোর-উৎসব সার্থক হয়েছিল গ্রাম বাংলার সমর্থনে। উৎসবে প্রতিদিন পাঁচ হাজার লোক আনন্দবাজারে (সাধারণ ভোজনালয়) প্রসাদ পেয়েছে। আমাদের বাড়ির পিছনে একবিঘা জমির উপর খাবার জায়গা করা হয়েছিল। যত চাল-ডাল-তরিতরকারি, সবই মানুষের দানের। গরুর গাড়ি বোঝাই খাদ্যশস্যের আমদানির যে-মিছিল দেখা যেত, তা দেখতে মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ত। প্রফুল্লদা (দাস)-র কাছে শুনেছি অখণ্ড বাংলার প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিতে আমন্ত্রণপত্র গিয়েছিল এবং প্রতিটি জেলার মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছিল। উৎসবের সময় যশোরে অনেক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বাড়িগুলি গ্রাম অথবা জেলা হিসাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল যাতে যাঁরা এসেছিলেন কেউ নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে না করেন। অতবড় উৎসবে গিয়ে কেউ ভীষণ কষ্ট পেয়ে এসেছিলেন, এখনও পর্যন্ত আমি এমন কথা কারও মুখে শুনিনি। পঞ্চানন বিশ্বাস বলে একজন ছিলেন, ছোট ছোট টিনের প্লেটে ঠাকুরের অনেক বাণী লিখতেন। সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে কাপড়ে মোড়া বাঁশের খুঁটিতে সেই বাণীগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উৎসবের আগের তিন মাস বাড়িতে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর জন পর্যন্ত সর্বক্ষণের কর্মী নিত্যই থাকতেন। কারণ যে অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করা হয়েছিল, যেসমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, প্যাণ্ডেল তৈরি করার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার জন্য কিছু লোককে অনবরত কলকাতা-যশোর ক'রে বেড়াতে হত। যশোরের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বাবা খুব সাহায্য পেয়েছিলেন। যে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল—তার জন্য জায়গায় জায়গায় লাইন দিয়ে খাটা পায়খানা ক'রে দেওয়া হয়েছিল, ঘন্টায় ঘন্টায় সেগুলি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল।

যশোর উৎসব সাত দিনের জন্য পরিকল্পিত ছিল—কিন্তু সম্ভবত এমন সুসংহত জনশক্তির অভ্যুদয়ে ঈর্ষাতুর কোন শক্তির প্ররোচনায় উৎসবের শেষদিনের অনুষ্ঠান চক্রান্ত ক'রে পণ্ড ক'রে দেওয়া হয়। ছ'দিন, ছ'রাত্রি বাবা প্যাণ্ডেল থেকে নড়েননি, ইতিমধ্যে গণ্ডগোল বাঁধতে উদ্যোগী যুবকদের ডেকে বাবা তাদের ক্ষোভ এবং জিজ্ঞাসার প্রশমন করেছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ দিনের রাত্রে কেউ বাবাকে জোর ক'রে একটু বিশ্রামের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং সেই অবসরে কিছু গোলমাল হয়। শেষের ঐ খুঁতটুকু সত্ত্বেও মনে হয়—যশোর উৎসব একটা সার্থক প্রচেষ্টা। একক প্রচেষ্টা তো নয়। উৎসব করার আগে উৎসবের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে একটি লেখা তৈরি ক'রে যশোরের যত বিদ্বজ্জন ছিলেন —ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, শিক্ষক কিংবা বনেদী বংশীয় অভিজাত ব্যক্তি, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা—সকলের কাছেই উপস্থিত হয়েছিলেন আমার বাবা। তাঁরা সানন্দে এই উৎসবের আহ্বায়ক হিসাবে নিজেদের নাম সই করেন। বাবা সবার কাছে গিয়েছিলেন; রাস্তার

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

ভিখারি এসে 'মহোৎসবে আমি কিছু দিতে চাই' বলে তার ভিক্ষার ঝুলি উজাড় করে দিয়েছিল — বাবা সাদরে প্রত্যেকের দান গ্রহণ করেছেন।

এই উৎসবের কথা বিশদভাবে বললাম এজন্য যে এর পরেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের বীভৎস ঘটনা ঘটে। দুর্ভিক্ষটা কৃত্রিম ছিল। প্রত্যেক গ্রাম থেকে অজস্র মূল্য দিয়ে চাল-ডাল-আলু নিঃশেষে কিনে নিয়ে নৌকা বোঝাই করে গ্রামবাসীদের চোখের সামনে সেসমস্ত খাদ্যশস্য জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিলিটারিদের জন্য বাজার থেকে দ্রুত খাদ্য সরিয়ে নিয়ে গুদামজাত করাও চলছিল অবাধে। যে সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধন,—এক আদর্শে চলার উন্মাদনা পরাধীন জাতিকে আবার স্বনির্ভর ক'রে, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতায় গ্রথিত ক'রে, এক ক'রে তুলতে চাইছিল, স্বভাবতই শাসক ইংরেজের তা ভাল লাগেনি। বিব্রত করার চেষ্টায় তাই ফাঁক ছিল না। তখন মহাযুদ্ধের তাড়নায় ইংরেজ হয়রান। সৎসঙ্গের এতবড় সংহতির পিছনে কোন বিপ্লবী শক্তি লুকিয়ে নেইতো? এই সন্ধান তারা ভালভাবেই করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন কুষ্টিয়ার বিশ্বগুরু উৎসব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যশোর উৎসব — দুটোর পরেই আশ্রমে গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল। যশোর উৎসবের পরে একটি ইংরেজ যুবক হঠাৎ ক'রেই আশ্রমে এসে থাকতে শুরু করে। আমার দুই মাস্টারমশাই ধূর্জটিকৃষ্ণ নিয়োগী এবং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তার খুব আলাপ হয় — নিরীহ জিজ্ঞাসু হিসাবে, যেন ঠাকুরের কথা জানতে আগ্রহী এক অনিসন্ধিৎসু সত্যসন্ধানী। মাস ছয়েক থেকে চলে যাওয়ার পরে জানা যায় সে ছিল গুপ্তচর। একথা জেনে আমার শিক্ষকদ্বয় খুবই আঘাত পেয়েছিলেন।

এই ঘটনা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরের। যখন মন্বন্তরের সময় এবং পরেও আশ্রমের এবং ঠাকুরের লোকেদের সেবাকর্মে কোন ব্যাঘাত ঘটল না, বরং আরও তীব্রভাবে চলতে লাগল, যখন গুপ্তচর এসেও কোন ছিদ্র বার করতে পারল না, কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের লেশমাত্র দেখতে পেল না, তারপরেই মুসলিম লীগের উস্কানি শুরু হল।

যশোর উৎসবের মাস ছয়েকের মধ্যেই যশোর মিলিটারি বেস হিসাবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকান সৈন্য শহর ভরিয়ে ফেলেছিল। তাদের থাকার জন্য শহরের লোকেদের বাড়ি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাবার অফিস— ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বিরাট বিল্ডিং, একই সঙ্গে আমাদের বাড়িও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পারিবারিক এবং আর্থিক দিক দিয়ে বাবাকে যাতে খুব বিব্রত থাকতে হয়, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। সরকারি কর্মে অবহেলার অজুহাতে বাবাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। আসলে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তখন বাবাকে তাদের প্রচারের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়েছিল। তখন যশোরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এম. এন. খান—তিনি ভয়ানক গোঁড়া ছিলেন। প্রফুল্লদা (দাস)-র মুখে শুনেছি,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

উনি সরকারকে নোট পাঠিয়ে ছিলেন যে সৎসঙ্গকে যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তবে লীগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এ কথা কীভাবে জানা গেল—আমার এ প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্লদা বলেন—'সব অফিসেই তো ঠাকুরের লোক ছিল, তাই জানতে পারা গিয়েছিল।' আসলে বাবা যখন সেখানে উৎসবের জন্য অথবা ঠাকুরের কথা বলার জন্য প্রচারে বেরোতেন—বিশেষ ক'রে উৎসবের আগে—তখন বাবার সঙ্গে একজন মৌলবী থাকতেন। যেহেতু যশোরের গ্রামগঞ্জ মুসলমানপ্রধান, ঠাকুরের সাম্প্রদায়িক বিভেদশূন্য জীবনধর্মী কথা যা পূর্ববর্ত্তী পুরুষোত্তমের বাণীর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, তা নির্দ্বিধায় সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বলার তখন সুযোগ হয়েছিল। লীগের পক্ষ থেকে যে বিদ্বেষের ফোয়ারা ছিটিয়ে বিভেদের বীজ রোপন করার কথা ভাবা হচ্ছিল, তার উত্তর দেওয়ার এবং প্রতিবিধান করার শক্তি সৎসঙ্গের এবং মুখপাত্র হিসাবে বাবার আছে, এ কথা তারা অনুমান করেছিল। অতএব বাবাকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরানো তাদের প্রধান করণীয় হয়ে উঠল। ইষ্টপ্রাণ ক্ষিতিনাথ জ্যাঠামশাই (ঘোষ) ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার। তিনি বোর্ডের বেশির ভাগ মেম্বারদের কাছ থেকে বাবার প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাবার সমর্থনে জনমত সংগ্রহ করেছিলেন। যে মিটিং-এ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা ছিল, সেই মিটিং-এর আগেই বাবা তাঁর প্রতি প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে এবং উত্তরগুলি গ্রহণীয় মনে করলে তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন, এই মর্মে একটি চিঠি কাউকে না জানিয়ে চীফ সেক্রেটারির কাছে দিয়ে আসেন। সেই চিঠি সানন্দে গৃহীত হয়েছিল। কারণ, বাবা তাঁর কর্মক্ষেত্রে না থাকুন, এভাবে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াতে না পারুন, এটাই কাম্য ছিল। আমরা তখন পাবনায় ছিলাম। মা যত চিঠি লিখতেন, যত উৎসাহ দিতেন, ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে যত কথা লিখতেন, অফিস থেকে সে চিঠিগুলি চেপে দেওয়া হত। সাত/আট মাস বাবা কোন চিঠি পাননি। ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরের সমর্থন ছিল না, তবু সেটা ঘটে গেল; ক্ষতিটা হল প্রচারকার্যের, অসৎনিরোধের। এভাবে পরিস্থিতির প্রভাবে বাবার জীবনের একটা পর্বান্তর ঘটে গেল।

১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে ঠাকুর দেওঘর চলে আসেন। আগের থেকে কেউ বুঝতে পারেনি। ঠাকুরের শরীর ভাল যাচ্ছিল না— ডাক্তার হাওয়া বদলের পরামর্শ দ্যান। সুশীল জ্যাঠামশাই, অর্থাৎ ঠাকুরের অন্যতম অগ্রগণ্য মনস্বী পার্ষদ সুশীলচন্দ্র বসুকে ঠাকুর দেওঘরে বাড়ি ঠিক করতে পাঠালেন। যে বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে গেছেন, সেই বাড়িটিই ঠিক করে সুশীল জ্যাঠামশাই হিমাইতপুরে খবর দিলেন। ঠাকুরের দেওঘরে আসা খুব আকস্মিক হয়েছিল; তিনি যে চিরদিনের মত হিমাইতপুর ছেড়ে যাচ্ছেন, একথা কেউ বোঝেনি। তার দু/তিন বছর আগে থেকেই মুসলিম লীগের কাজকর্ম প্রচণ্ড গতিতে চলছিল। লোভের প্ররোচনা, বিদ্বেষের ঘৃণার উস্কানি প্রাণভরা ভালবাসা আর সেবার ঊর্দ্ধে স্থান পেয়েছিল। সে সেবা কেমন ছিল? আশ্রমের দু/তিনটে গ্রাম এবং তারও আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে পঞ্চাশের

মন্বন্তরের ভয়ানক দিনগুলোতেও কেউ না খেয়ে মরেনি। ঠাকুরের নির্দেশমত ভোরবেলায় উঠে কিশোরী দাদু (ঠাকুরের প্রথম দুই ভক্তের অন্যতম কিশোরীমোহন দাস, অনন্য সেবাকর্মী) ধামা মাথায় নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে দরজায় দরজায় এসে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে যেতেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিক্ষা। সেই চাল এবং অন্যান্য জিনিস তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত যাদের নিজেদের আসার উপায় ছিল না। অন্যরা আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে কিশোরী দাদুর ডিসপেন্সারি থেকে খাবার, ওষুধ সব নিয়ে যেত। গ্রামেগঞ্জে কলকাতার রাস্তাঘাটে যখন শুধুই হাহাকার, আমরা তখন বসবাস করতাম পারস্পরিকতায়, আনন্দময় পরিশ্রমের জোয়ারে ভাসা, আনন্দময় পুরুষোত্তমের করুণায়। ঐ সময় আশ্রমের আশেপাশের একটি লোকও অনাহারে মরেনি। ডকুমেন্টেশনের প্রশ্ন উঠলে বলা যায় যে অন্ধকারের যে ছবি দেখানো হয়েছে, তা হয়তো সত্য; কিন্তু পাশাপাশি মানুষের লক্ষ, চিন্তা, চেষ্টা অন্যরকম হলে বিপর্যয়ের মুখেও জীবন যে অন্যরকম হয়, সে-সত্যও তো ছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিক খুব সামান্য রকমে হলেও মন্বন্তরের আগ্রাসন থেকে কিছু গ্রামের এই অসামান্য উত্তরণের উল্লেখ না ক'রে পারেননি, যদিও সে গ্রামগুলি যে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম-পরিমণ্ডলের, সে-কথা উল্লেখ করার বদান্যতা তাঁর ছিল না। সেসময় বাংলায় এমন একটা লোক ছিল না যার কোন না কোন আত্মীয়স্বজন ঠাকুরের কাছে পৌঁছয়নি। এত প্রাণচঞ্চল, কর্ম্মমুখর, ভালবাসাময় পরিবেশ ছিল যে সেসময় তীব্র রটনা ছিল—ঠাকুর সম্মোহনবিদ্যা জানেন। আশ্রমে এলেই তাঁর সম্মোহনী স্পর্শে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়।

নানারকম গুজবে যারা মত্ত হয়ে থাকত, সাক্ষাৎ তদন্ত করার মত মানসিক শক্তি তাদের ছিল না। কিশোরী-দাদুর এই যে সেবাকর্ম তার মূল গ্রহীতাই ছিল স্থানীয় মুসলমান সমাজ। বিভেদকামীর প্ররোচনায় তারা ভুলে গিয়েছিল যে ঠাকুর তাদের হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন, অসুখে ওষুধ দিয়েছেন, ঘর বাঁধার ছাউনি, পরনের কাপড় অকাতরে বিলিয়ে তাদের রক্ষা করেছেন। তারা প্রয়োজনের কথা এসে বললে ঠাকুর নিজে ভিক্ষে ক'রে তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঠিক আগেই যশোর উৎসবে সৎসঙ্গের সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে তার মূল্যবান ভূমিকা লীগ কর্মকর্তাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল; তাই ঠাকুরের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সেবার অবদান হীন স্বার্থপ্রণোদিত অভিযানের কাছে বহুলাংশে মূল্যহীন হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাবনার স্থানীয় মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ ঠাকুরের প্রতি অনুরাগে ও ভালবাসায় নিনড় ছিলেন—একথা উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

এই প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন কর্ম্মমুখর জীবনযাত্রা আকস্মিকভাবে চতুর্দিক থেকে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আঘাতটা বাবার শরীরের উপর পড়েছিল। বাবা সে অবস্থা অতিক্রম করে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যশোরের বাড়ি

ফিরে পেয়ে আমরা পাবনা থেকে ফিরে এলাম। বাবা নতুন করে প্র্যাকটিসে মন দিলেন; প্র্যাকটিস উপলক্ষ্যেই গ্রামেগঞ্জে যেতে হত—সেসময় ঠাকুরের কাজও করতেন। এই সময়কার বাবার একটি ঘটনা উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই রাতারাতি অনেকগুলো ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠেছিল, কারণ যুদ্ধের খাতিরে কিছু লোকের হাতে বেশ কাঁচা পয়সা এসেছিল। তাছাড়া বাড়িঘরের জন্যও ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এরকমই একটি ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল করল। সেই ব্যাঙ্কে অনেকের টাকা ছিল; বাবারও ছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে মারবে বলে শহরসুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠল। স্টেশনে, বাজারে, ডাকবাংলোয় সব জায়গায় তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল জিঘাংসায় উন্মাদ জনতা—বেচারির তখন প্রাণ বাঁচানোই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। ঘটনাক্রমে প্রবোধ-কাকাবাবু (প্রবোধচন্দ্র মিত্র, সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা'-র প্রথম সম্পাদক, দক্ষ ইষ্টকর্মী)-র সঙ্গে ভদ্রলোকের কোন সূত্রে পরিচয় হয়, কাকাবাবু তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাবা তাঁকে আশ্রয় দেন। রটে যায় যে ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আছেন। আমাদের বাড়ি ঘেরাও হয়ে যায়। কিন্তু সীমানার বাইরে থেকে। সীমানার বাইরের আমগাছগুলোতেও ছেলের দল চ'ড়ে বসেছিল। ভদ্রলোক বোধহয় বাবার কম্পাউন্ডারকে টাকা দিয়ে চুপি চুপি পাঠিয়েছিলেন টেলিগ্রাম করতে—কিন্তু লোকেরা ধরতে পেরে তাকে লাঞ্ছিত করে। সন্ধেবেলা ভদ্রলোক মুখ ঢেকে একবার পালানোর চেষ্টা করতে গেলে ধরা পড়ে যান। হঠাৎ চেঁচামেচি গোলমাল শুনে বাবা ছুটে গিয়ে দেখেন—রাস্তায় ভদ্রলোক আক্রান্ত। বাবা এগিয়ে এসে ওঁর কাঁধে হাত রেখে বলেন—ইনি আমার আশ্রিত। ছেলেরা বলে—আপনার আশ্রয়ে থাকুন, পালাবার চেষ্টা যেন না করেন। এই অবরোধ দু'দিন ছিল, কিন্তু আমাদের গেটের মধ্যে কেউ একটি পা-ও রাখেনি। মিটমাটের জন্য শহরের গণ্যমান্য লোকেরা যেদিন এসেছিলেন, সেদিন একটা জরুরি কলে বাবাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। বাবা বেরোনোর আগে কর্তাব্যক্তিদের বলেন—জরুরি কলে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে; ইনি আমার অতিথি, আমার আতিথ্যের ভার আপনাদের উপর দিয়ে গেলাম—ত্রুটি না হয়, দেখবেন। তাঁরা বাবাকে ভরসা দিয়েছিলেন এবং ভরসার মর্যাদা রেখেছিলেন। সেই ভদ্রলোককে তাঁরা চলে যেতে দিয়েছিলেন এ কথা ব'লে—একমাত্র ডাক্তারবাবুর অতিথি বলে আপনার প্রাণটা বাঁচল।

এই সময়ের আর একটা গল্প বলি। বাবার মাসতুত ভাই রবিকাকা ব্যবসা উপলক্ষে যশোরে এসে একটা হোটেলে উঠেছিলেন। সেখানে বাবার সম্বন্ধে খোঁজ করেছিলেন দেখা করতে আসবেন বলে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন—সে কী, আপনি তাঁর ভাই আর হোটেলে ভাত খাচ্ছেন? উনি তো অতিথি না খাইয়ে নিজে খান না, এমনই অতিথিবৎসল। স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে কেউ যদি কোন উপলক্ষে একটু থাকার জায়গা খুঁজত—সবাই বাবার নাম বলে দিত।

ঠাকুরের কাজ আবার শুরু করেছিলেন বাবা; বাড়িতে দু'একটা অধিবেশন হল। কিন্তু তারপরেই বাড়ি ছাড়তে হল। দেশভাগ। স্বাধীনতা ঘোষণার পরদিন অথবা চার/পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ এসেছিল—সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। প্রাথমিকভাবে বর্ডার পেরিয়ে একটি বাড়িতে ওঠা হল এবং পরে দেওঘরে গিয়ে বাবা-মা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করায় ঠাকুরের নির্দেশে কলকাতা চলে আসা হল। কলকাতায় এসে আমাদের মামাবাড়িতে দুখানা ঘরের মধ্যে থাকতে হয়েছে। ঠাকুমা, আমি, আমার বড় ভাই শঙ্কর এবং ওর বন্ধু পরমেশ—আমরা মজঃফরপুরে বাবার ছোটকাকার কাছে গেলাম।

এই দেশভাগের ধাক্কায় বহু বড় বড় বনেদি পরিবার ভেসে গেছে। কিন্তু বেঁচে গেছে সেসব পরিবার যাদের মধ্যে শ্রদ্ধার বীজ দৃঢ় ছিল। নিদেপক্ষে মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হয়, এটুকু শিক্ষা যেসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল, তারা হারিয়ে যায়নি। একদিন তখন আমি মজঃফরপুরে বি. এ. পড়ছি, কথায় কথায় সেজ-কাকাকে বলেছিলাম—সত্যি, কত লোকের কত বিপর্যয় হয়ে গেল এই পার্টিশন হয়ে, সে তুলনায় আমরা তো বেশ ভাগ্যবান! পার্টিশনের দুঃখ আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। একথা শুনে সেজকাকা আমাকে খুব জোরে বকেছিলেন—কিছু হয়নি মানেটা কী? সকলের যা হয়েছে—তোমাদের তার চেয়ে বেশি ছাড়া কমটা কী হল? তবে লোকেদের যা থাকে না, তোমাদের সেটা ছিল, ভরসা ছিল। তোমাদের সবসময় একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল—ঠাকুর আছেন, একটা কিছু ব্যবস্থা হবে যাতে অন্তত ধ্বংস হয়ে যেতে হবে না। এই বিশ্বাস আর নির্ভরতাই তোমাদের মুষড়ে পড়তে দেয়নি। আর মুষড়ে না পড়লে মানুষ কিছু একটা করে ফেলতে পারে।

বাবা অনেক ঘুরে, অনেক বিচার ক'রে, অনেক দেখে ঠাকুরকে পেয়েছিলেন—গ্রহণ করেছিলেন সবখানি দিয়ে। খানিকটা সংসারের জন্য, খানিকটা সন্তানের জন্য, খানিকটা অর্থের জন্য, প্রতিপত্তির জন্য রেখে ঝড়তি-পড়তি ঠাকুরের জন্য থাকুক—বিপদের সময় নাম ক'রে ডাকাডাকি করলে বিপদমুক্ত হওয়া যায়, তাই মাদুলি-কবচের মত ব্যবহার হোক, এজন্য তিনি ঠাকুরকে গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের প্রাণের টানে ঠাকুরকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বহন করেছিলেন—মনন করেছিলেন এবং ধ্যান করেছিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী প্রজন্মের কাছে যদি কিছু গিয়ে পৌঁছে থাকে তাহলে সেটা সেই নামীর স্পর্শ পাওয়া নামের বৈভব। ঠাকুরের একটা ছড়া আছে—

ভর দুনিয়ায় যেই যা করুক
ঠিক জানিস তুই থোক্
সব করারই পিছে আছে
প্রিয় উপভোগ।

বাবা ঠাকুরকে প্রিয় বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আনন্দকে লক্ষ ক'রে

নিজের সব কিছু নিয়োজিত করেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যদি কিছু গিয়ে পৌঁছে থাকে তা হল সেই নিবেদিত প্রাণের বৈভব!

কলকাতায় মামাবাড়ি থেকে পার্কসার্কাসে বাড়িভাড়া নিয়ে চলে এসেছিলেন বাবা। কলকাতায় এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন, পশারও জমে উঠেছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুণ বাবাকে মা আর প্র্যাকটিস করতে দেননি। এরপরে বাবা বাড়িতেই থাকতেন। খুব নাম করতেন। ঘরে বসে কিছু লাইফ ইনস্যুরেন্সের কাজ করতেন। আমার দিদি এবং আমি দুজনেই স্কুলে পড়ানোর কাজে যোগ দিই। সেটা ১৯৪৯। বছরের শেষ দিকে আমার বড় ভাই শঙ্করের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে সিলেকশন হল এবং পরের বছরের শুরুতেই দেরাদুন চলে গেল। আমাদের দুই বোনেরই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এবং একরাত্রে বিয়ে হয়ে গেল। ছোটভাই পুলককে নিয়ে মা-বাবা থাকলেন। ঐ বছর পুজো উৎসবে বাবা দেওঘর যাওয়ার পরে ঠাকুর দেওঘরেই গিয়ে থাকতে বললেন—বাবা ১৯৫১ সালে দেওঘরে চলে গেলেন। ছেলেদের লেখাপড়া, মেয়েদের বিয়ে নিয়ে গৃহস্থকে কত পরিকল্পনা কত হিসাব কত সঞ্চয়-জল্পনা-কল্পনা করতে হয়, ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলি এত সহজে সংঘটিত হয়েছে যে তাকে লৌকিক হয়েও অলৌকিক ঘটনা মনে হয়।

বাবা-মা পুলককে নিয়ে দেওঘর চলে আসার পরে ওখানকার পরিবেশে বাবা কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেসময় দেওঘরে বাবার সহকর্মী বন্ধু, চেনাজানা পরিবার সকলে বাড়িঘর রুজি-রোজগারের পন্থা সব কিছু ফেলে যে-যেখানে যেমনভাবে পারেন এসে আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনযাত্রা তখন কঠিন ছিল। সব পরিবারেই মা বাবাদের খাওয়াপড়ার যোগাড় করতে কায়িক অথবা মানসিকভাবে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত যে তাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো ইত্যাদির কথা চিন্তা করতে পারতেন না। বাবা পুরানদহের লক্ষ্মীকুটিরে ছিলেন। বাড়ির সামনে একটা বড় মাঠের মত ছিল। প্রাচীর ঘেরা বাড়িটায় অনেক ফলগাছ-ফুলগাছ ছিল—তার উপর স্বাভাবতই ছেলেদের আক্রমণ ছিল—মালীর তাড়নাও ছিল। বাবা ঘরের ইজিচেয়ারে বসে এসব দেখতেন। এসমস্ত ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর কী হবে, সেবিষয়ে বাবার চিন্তার অন্ত ছিল না। ওরা ঘুরে বেড়ায় কেন? আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—এরকম কয়েকজনকে বলতেই মস্ত বড় দল তৈরি হয়ে গেল। পুলক বছর দেড়েকের মধ্যে বেলুড়ে পড়তে চলে গেল। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা মা বাবার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াত। তাদের ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ছোটদের অক্ষর পরিচয়, যোগ-বিয়োগ—সবই ভাগে ভাগে চলতে থাকত। একটা ছোট্ট ছেলের কথা মনে আছে—একদম ভোরবেলায় স্লেট বুকে করে চলে আসত। মা সকালের নিত্যকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাকে মুখে মুখে পড়াতেন। বেশ মেধাবী ছিল ছেলেটি। পরপর ছ'সাতটা সংখ্যা বলে গেলেও তাঁর যোগফল বলতে পারত। অত শীতে হাত-পা ঢাকা জামা ছিল না

তার—মা খদ্দরের জামা আর পাজামা তৈরি করে দিয়েছিলেন নিজে, চটি কিনে দিয়েছিলেন। দু'তিনটি মেয়ে মা আর বাবার কাছে পড়ে স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল। আমরা যখন যেতাম তখন আমাদের ভাগেও ছাত্রছাত্রী থাকত। দিদির তো পড়ানোর অভ্যাস ছিলই, আমিও না-ভুলে-যাওয়া পাঠগুলো পরিবেশন করতে ভালই বাসতাম। বাবা বলতেন, তুমি যতক্ষণ সমাজের মধ্যে আছ, কী-কী ভাবে তুমি সমাজকে সাহায্য করতে পার, তা তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। তুমি যদি পরিবেশকে উন্নত করতে চেষ্টা না কর, সেই অবনত পরিবেশ তোমাকে নামাতে চাইবে। মনে রেখো, এটা প্রাণের দায়।

বাবা দেওঘরে ছিলেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। তারপর আমাদের ছেড়ে চলে যান। এই নয়/দশ বছর বাবার কাছে ছুটে ছুটে যাওয়ার আকর্ষণ আমাদের সবার কাছেই দুর্বার ছিল। তখনও তো ঠাকুরকে বুঝিনি—বাবাকেই জানতাম। আমার দীক্ষাদাতা ঋত্বিকও ছিলেন বাবা-ই। ১৯৫৪ সালে বাবার কাছে অনেক দিন ছিলাম। বিকেল বেলায় পাঁচিল ঘেরা লক্ষ্মীকুটিরের ভিতরের মাঠের পাশে বাঁধানো রাস্তার উপর বাবা চেয়ার নিয়ে বসতেন—আমি রাস্তায় ঘুরতাম। কোন কোনদিন অনেক কথা হত। ঐ বছরের ১লা এপ্রিলের ডায়েরি থেকে তুলে আলাপচারীর একটু নমুনা দিচ্ছি। কেমন করে বাইরের জগতে চলতে হয় সে-প্রসঙ্গে বলেছিলেন— "কথা বলবার সময়—বিশেষ করে কোন আলোচনার সময় বিশেষ নজর রাখতে হয় যাতে অবান্তর আর অপ্রয়োজনীয় কথা কিছু না আসে। সত্যি কথা হলেও তা বলতে নেই যদি মঙ্গলপ্রসূ না হয়। সত্যি কথা হলেও তা বিশেষ করে বলতে হয় না, যদি সে কথায় বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে। কারণ সত্য এককভাবে কখনও সত্য নয়—সত্য, শিব এবং সুন্দর, এই trio যেখানে একাঙ্গীভূত নয়, সেখানে সত্যকে শুধু দম্ভ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না। সত্যের পিছনে চাই মঙ্গলকে—শিবকে; আর শিবই সুন্দর। যদি শিবকে বাদ দাও তবে যতই শক্তির অর্চনা কর, দক্ষযজ্ঞের মতই পণ্ড হয়ে যাবে।

আসল কথা, আত্মরতি চাই—self-contentment বলে যাকে; শিব আত্মরতিতে বিভোর, তাই শিব ভোলানাথ সর্বংসহ নীলকণ্ঠ আশুতোষ।"

আমি বললাম—ভাবলে পরে জিনিষটা বেশ অনুভব করা যায়—কিন্তু self-contented থাকা কি সহজ? থাকতে দেবে না পারিপার্শ্বিক। সংঘাতে সমালোচনায় পাগল করে দেবে। Contentment কে মনে করে জড়ত্ব, অসাড়তা। মনে করে লোকটা inert, inactive, আরও কত কী! মনটা বিষিয়ে উঠতে চায়, তিক্ততায় ভরে ওঠে। বাবা বললেন—আঘাত তো আসবেই। বাইরের সকলে আঘাত হানতেই তো জানে, প্রেমিক তো নয় দুনিয়ার সবাই। ভোলা মহেশ সেই আঘাতেই নীলকণ্ঠ। Overcome করতে হবে সে অবস্থাকে শুধু সহ্য ক'রে। নইলে আত্মরতি থাকবে

না। স্বয়ং তৃপ্ত থাকার পথে ঐটুকু সাধনা। লোকে ভুল বোঝে বুঝুক—কী আসে যায় তাতে! নিজের মত করে ভেবে নাও সব কিছু। যারা নিন্দা করছে, তারাও তোমারই একটা ভাবের অভিব্যক্তি, যারা তোমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে—তারাও তোমারই বিকল্প। নিজের সত্তার সাথে মিলিয়ে নাও সব কিছুকে, তৃপ্তি তোমাকে ছাড়বে না।'...

দিনটা বিশেষভাবে আমার মনে আছে এজন্য যে বাবার সঙ্গে এরকম আলাপচারীর সুযোগ আর হয়নি। এই বছরই কালীপূজার পরের দিন বাবার প্রথম স্ট্রোক হয়; পক্ষাঘাত হলেও খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছিলেন। তারপরেও ছাত্রদের পড়াতেন। কিন্তু বছর তিনেকের মাথায় আবার যে স্ট্রোক হয়, সেই পক্ষাঘাত আর নিরাময় হয়নি, বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও শেষের দিকে মায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় কথা বলতে পারতেন একটু একটু। যাওয়ার কিছুদিন আগে মাকে বলেন—আমার খুব আনন্দ, আমার খুব আনন্দ। বেদনাক্লিষ্ট মুখে যে আনন্দের প্রকাশ, বাবার একটা ছবিতে তা পরিস্ফুট আছে। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর। ভয়ানক একলা বোধ করেছি। তারপর ভেবেছি—খুঁজে দেখব বাবা আমাদের কী সম্পদ দিয়ে গেছেন। সে এক অন্য গল্প। অন্য কালে অন্য সমাজচিন্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অন্য পরিবেশের ভিতর দিয়ে, নিজের অনুভূতি দিয়ে কেমন করে জেনেছিলাম—বাবা আমাদের জন্য যে পরমৈশ্বর্য রেখে গেছেন তা হল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রয়। এমন সম্পদ আর হয় না। কিন্তু এ যে সম্পদ, তা যদি নিজের অনুভূতির কাছে ধরা না পড়ে, তবে তা শুধু শেখানো বুলি। আবার নিজের অনুভবকে হস্তান্তরও করা যায় না। বাবার সারা জীবনের চেষ্টা আমার প্রচেষ্টাকে জাগ্রত করতে পারে, অভিমুখী ক'রে তুলতে পারে—কিন্তু করার ভাগ আমার আলাদাই থাকবে। ঠাকুর বলেছেন— ধর, কর, হও। অথবা—কর, হও, পাও। ধরার জায়গাটা বাবা ধরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমার স্থানকালপাত্র পৃথক বলে যদি ধরার জায়গায় সংশয়দীর্ণ মনোভাব পোষণ করি, তবে করা আসবে না, হওয়া হবে না। "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" শ্রুতির এই বাণী বাবা তাঁর জীবনচর্যার মাধ্যমে রেখে গেছেন আমাদের জন্য এবং সেটাই একমাত্র। বাবাকে প্রণাম। আমার ঋত্বিককে প্রণাম। আমার প্রাণপ্রিয় দয়াল ঠাকুরকে প্রণাম।

বন্দে পুরুষোত্তমম্।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

৫ই নভেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ — ১৬ই জুন, ১৯২৫

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

উনবিংশ শতকের বাংলার আকাশ যাঁদের দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে ছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যদের একজন। তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপট, সুবৃহৎ কর্মজীবন, রাজনৈতিক মতবাদের স্বাতন্ত্র্য ও দার্ঢ্য, অনবধি দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি তাঁর অস্তিত্বের সর্বব্যাপী মহাপ্রাণতা—এ সবই তাঁকে এক অনন্য বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।

ঢাকা জেলার তেলিরবাগের আদি নিবাসী, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাশ ও নিস্তারিণী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয় কলকাতায়, ৫ই নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি স্কুলে শিক্ষাজীবনের শুরু। ১৮৯০-এ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড যান এবং ১৮৯৩-এ মাত্র তেইশ বছরে ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতা ভুবনমোহন বন্ধুর জামিন হতে গিয়ে দেউলিয়া হন। কিন্তু আর্থিক দৈন্য ও দুরবস্থায় অবদমিত হওয়ার মানুষ চিত্তরঞ্জন ছিলেন না। সাত বছরের মধ্যে ১৯১৩-তে পিতৃঋণ পরিশোধ করে তিনি দেউলিয়া নাম খণ্ডন করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রভূত উপার্জন, বৈভব, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, প্রতিপত্তি এবং দানশীলতা তাঁর সমসময়েই নানা কিংবদন্তীর জন্ম দেয়। এর পাশাপাশিই সমান্তরালভাবে ছিল তাঁর স্বদেশচেতনা ও রাজনীতিভাবনা। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত সুডেন্টস্ ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর চমকপ্রদ আইন ব্যবসার সাফল্যের মধ্যে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে নানা রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ, যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯০৮) আসামী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখের পক্ষ সমর্থন ও গরিমাময় সাফল্য। জাতীয় কংগ্রেসে সক্রিয় যোগদান করে অল্পকালের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন প্রথম সারির নেতারূপে গণ্য হন এবং গাঁধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে বিপুল আয়ের ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার-রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস্ বোর্ড-ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে ব্রিটিশ অ্যাডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলি নিযুক্ত করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করায় তিনি এ কাজও পরিত্যাগ করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগের ফলে সারা দেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ও তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। নিজের ও পরিবারবর্গের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ত্যাগ করে সন্ন্যাসীসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা বেছে নেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এই অসাধারণ সাফল্য ও কর্মময় মহাপ্রাণ মানুষটির অন্তরের অন্তস্থলে ছিল আর এক গূঢ় বুভুক্ষা, তৃষ্ণা, যার পরিচয় সাধারণ্যে সর্বদা উন্মোচিত হয়নি। এক

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধান তাঁর মধ্যে ছিল সহজাত। তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁকেও ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলীর মধ্যে বড় হতে হয়েছিল—কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিই ছিল চিত্তরঞ্জনের সুগভীর প্রত্যয়। তাঁর ভাগিনেয়ী সুগায়িকা সুলেখিকা সাধিকা সাহানা দেবীর ভাষায় "... মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একটি সত্যকারের হিন্দু। হিন্দুধর্মের যেটি প্রাণ সেইটি তিনি বুঝেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তার ডালপালাকে আশ্রয় না করে একেবারে মূলকেই আশ্রয় করেছিলেন। প্রকাশ্যে যখন নিজেকে হিন্দু বলতে আরম্ভ করেন তখন ব্রাহ্মসমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ একজন তাঁকে এসে বলেন —'তুমি তাহলে তোমার পিতার ধর্ম রাখলে না!' উত্তরে মামাবাবু তাঁকে বলেন, 'পিতার ধর্ম রাখাই যদি পুত্রের ধর্ম হয় তবে আমার পিতা কখনও তাঁর পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করতেন না।. . .'

অবসরবিহীন সদা ব্যস্ত জীবনধারার মধ্যেও তাঁর অন্তরের কী এক আকুলতা তাঁকে বারেবারে উদ্বেল করে তুলেছে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগসাধনার অভিপ্রায় ছিল তাঁর, কিন্তু 'রাজনীতি ও যোগসাধনা দুটো একসঙ্গে করা সম্ভব নয়'—বলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নিরস্ত করেন।

অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, ৫৪ বছর বয়সে চিত্তরঞ্জনের জীবনে এক লগ্ন আসে, যা হয়তো পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ছত্রিশ বছরের যুবা, কলকাতায় মানিকতলা স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে পাবনা সৎসঙ্গে বায়ুচালিত তড়িৎযন্ত্র উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। সেই সূত্রে ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, যতীন রায় এবং সুশীলচন্দ্র বসু দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। দেশবন্ধুর জীবনীকার হেমেন দাশগুপ্ত তাঁদের দেশবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পাবনা সংসঙ্গ থেকে আগত শুনে তিনি সাগ্রহে জানান যে ঠাকুরের কথা তিনি বিপ্লবী বারীন ঘোষের কাছে শুনেছেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বিশেষ আগ্রহী। বারীন ঘোষ দ্বীপান্তর থেকে ফিরে পাবনা আশ্রমে ঠাকুরের সাহচর্যে কিছুদিন কাটিয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'পাবনা সৎসঙ্গীর মধুচক্র' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

সিরাজগঞ্জে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতে যান চিত্তরঞ্জন; ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে সুশীলচন্দ্র বসুও সিরাজগঞ্জ যান এবং অবকাশমত ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা আলাপ আলোচনা করেন। সিরাজগঞ্জ অধিবেশন থেকে ফেরার দিন দশেক পরে একদিন সন্ধ্যায় দেশবন্ধু মানিকতলার বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন। তখন সেখানে চলছিল তুমুল কীর্তন। গাড়িবারান্দার ছাদে মাদুরে বসেছিলেন ঠাকুর—দেশবন্ধুকে দেখেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সৌহার্দ্যের সঙ্গে "আসেন দাদা, বসেন" —বলে মাদুরে বসালেন। বহু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হতে থাকে—অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ, চরকা, খদ্দর ইত্যাদি। মহাত্মা গাঁধী সম্বন্ধেও কথা উঠল। দেশবন্ধু বললেন—চরকা ও খদ্দরে দেশের খানিকটা উপকার হলেও তাতেই যে দেশোদ্ধার হবে তা তাঁর বিশ্বাস হয় না। প্রসঙ্গত বলা যায়, গাঁধীজির সঙ্গে মতান্তরের দরুন তিনি ১৯২২-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন, যা

তাঁর এবং মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অত্যল্প সময়ের মধ্যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলরূপে পরিগণিত হয়।

ঠাকুরের সঙ্গ পেয়ে চিত্তরঞ্জনের যেন মনের অর্গল খুলে গেল। প্রথম দিনেই তিনি তাঁর জন্মজন্মান্তরের পরম আশ্রয়কে চিনে নিয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। দেশবন্ধুর দীক্ষাগ্রহণ পর্ব বিষয়ে সুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত 'মানসতীর্থ পরিক্রমা' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক :

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন,—দাশদা, শুধু খদ্দরে কী হবে বলুন দেখি? আর জেলে গেলেই বা কী হবে? ইংরাজকে কি এমনই শক্তিহীন মনে করেন যে, এতেই তারা ভয় পেয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাবে? আর যা করলে (মানুষ) জেলে যায়, তা করলে জেলেই যায়; আর জেলে গেলে যা হয়, তাই-ই হয়,—স্বাস্থ্য যায়, শক্তিক্ষয় হয়, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়।

দেশবন্ধু প্রশ্ন করলেন—তবে কী করব?

—দেশটাকে যদি স্বাধীনই করতে চান, তবে...কোথায় দেশবাসীর দুঃখ, জনসাধারণের কোথায় অভাব, অন্তরের দরদ দিয়ে বুঝে, তা দূর করবার জন্য তীব্রভাবে কাজে লাগেন; আর এর ফলে যখন দেশবাসীরা আপনাদের সেবাকে ইংরেজের সেবার চাইতে বেশী বলে প্রাণে-প্রাণে বুঝবে, তখন 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলে চীৎকার না করলেও স্বরাজ আপনিই এসে যাবে।

—কিন্তু যা-ই করতে যাই, তাতেই তো ইংরেজরা বাধা দেয়।

—এমন জায়গায়, এমন platform-এ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, যাতে কারো সঙ্গে কোনও বিরোধ না বাধে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে আসে, তখন ইংরেজরা এল ব্যবসার সাথে তাদের কৃষ্টি নিয়ে। ব্যবসা দিয়ে যেমন তারা দেশবাসীর চাহিদা মেটাতে লাগল, সেই সঙ্গে নানাভাবে তাদের culture-কেও establish করতে লাগল। পাদ্রীরা বসিয়ে দিল স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি। সে-সব দিয়ে ক্রমশ তারা দেশবাসীর মন জয় করে নিল।

আপনারাও যদি শুধু বক্তৃতা না দিয়ে, ইংরেজকে গালি না দিয়ে, দেশের কোথায় ব্যথা তা অনুভব করেন, দেশের সেবায় লেগে যান, তবেই না আপনারা দেশটাকে জয় করতে পারবেন। . . . আমি বুঝি সেবা,—মানুষের সবরকম অভাব দূর করা। একে যদি politics বলেন, তবে এই-ই আমার politics।

একথায় উদ্দীপ্ত হয়ে দেশবন্ধু বলে উঠলেন—কী করব তাহলে বলে দিন। আমারও আর এ রাজনীতি ভাল লাগে না, কিন্তু এমন জড়িয়ে গেছি যে কিছুতেই যেন আর বেরুতে পারছি না। এমন একজন উপযুক্ত লোকও খুঁজে পাই না, যার হাতে সব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—সে কি? এত বড় দেশটায় আপনার সাহায্যকারী একটা লোকও খুঁজে পাচ্ছেন না;এও কি একটা কথা?

—তাই তো দেখছি। কাজের ভার দিলে কেউই ঠিকমত পারে না। আবার যার ভাল করি, সে-ই হয়ে ওঠে নিন্দুক, বিশ্বাসঘাতক।

—দেখুন তবে; আপনিই বলছেন, সারা দেশে মানুষের মত মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ একা আপনি তো আর স্বরাজ আনতে পারবেন না; সাহায্যকারী না পেলে, কাজ করবেনই বা কাদের নিয়ে?

আরো দেখুন, দেশের এতবড় একটা অভাব আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন, অথচ সেদিকে না তাকিয়ে, তাড়াহুড়ো করে আপনারা স্বরাজও আনতে চাইছেন। তাতেই তো বোঝা যাচ্ছে যে স্বরাজ আপনারা চান না। তা যদি চাইতেন, তবে আমার মনে হয়—আগে মানুষ তৈরী করতেন। তা না করে আপনারা শুধু ইংরেজের দোষই দেখছেন। ওদের দোষ দেখতে দেখতে, ওদের কী গুণে যে আমরা ওদের অধীন হয়ে আছি, তা আর নজরেই পড়ছে না!

দেশে মানুষ পাবেন কী করে দাশদা, দেশের সমাজটা যে একদম পচে গেছে। ঘরে-ঘরে অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ আর শিশু মৃত্যু। আজকাল বিবাহ ঠিকমত হচ্ছে না, তাই ভাল ছেলে জন্মাবে কী করে? সমাজটাকে যদি এখনও সংস্কার করতে পারেন তবে অসম্ভব নয় যে কুড়ি-পচিঁশ বৎসরের মধ্যে এমন সব যুবক পাবেন যারা দেশের সত্যকার কর্মীর অভাব দূর করতে পারবে।

দেশবন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে লাগলেন। দেশের সমাজ ও অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে এমন সব কথা হতে লাগল, যা দেশবন্ধুর মত আমাদেরও অন্তরকে স্পর্শ করল। দেশবন্ধু শেষে বললেন—রাজনীতির কাজে আমি আর মন-প্রাণ দিয়ে লাগতে পারছি না। সমাজ-সেবাই যেন আমার মন চায়। আর এমন করে গোলমাল বাড়িয়ে স্বরাজ পাওয়া যাবে না, তাও বুঝি। তবু এই মরা দেশটাকে একটা হুজুগে মাতিয়ে রাখতে চাইছি, আর কেমন করে নিজেই যেন সেই হুজুগের ঘূর্ণিপাকটাতে পড়ে গেছি।

শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখুন দাশদা, যিনি সবটা দেখতে পান, এমন একজন ঋষি বা Seer পিছনে না থাকলে কোন কাজ হয় না। অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, রামদাস ছিলেন বলে শিবাজী মহারাষ্ট্র জাতি গড়ে তুলেছিলেন, আর চাণক্য ছিলেন বলেই চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত হতে পেরেছিল। আবার রাণা প্রতাপ অত শক্তিশালী হয়েও তেমন কিছুই গড়ে তুলতে পারল না, শুধু তার পিছনে অমন কেউ ছিল না বলেই।

দেশবন্ধু তখন বালকের মত বললেন—তবে কী করতে হবে আমায় বলে দিন।

—'নাম', খুব 'নাম' করতে হয় দাদা!

—'নাম' তো কত করেছি; কই কিছুই তো হল না।

—শুনে নিতে হয়,—কী করে করতে হয়; আর তাই অনবরত করতে হয়।

—কেমন করে করব, বলে দিন।

—মা'র কাছে শুনে নিন, মা জানেন।

জননী মনমোহিনী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসতেই দেশবন্ধু উঠে গিয়ে তাঁর কাছে বসলেন। দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেই, একটু ভেবে মা বললেন—দেখ তোমরা বড়লোক; বড়লোকদের আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না, তারা ভগবানকে অনুগ্রহ করে। অদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন—ও বালক, ওর কি বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে? ওর কথায় অনেকে লাফিয়ে ওঠে, শেষে থাকতে পারে না। দীক্ষা এখন থাক, আগে মন ঠিক কর গিয়ে।

মা'র কথা শুনে দেশবন্ধু আবেগভরে বললেন—মা! আপনার দয়া যে পাব না, তা আমি জানি! আমার মত পাপীর উপর দয়া কেমন করে হবে? ঁজগন্নাথের মন্দিরে কত লোক যায়, আমি অভিমানে সে মন্দিরে কখনো ঢুকিনি। ঁজগন্নাথ সবাইকে দয়া করেন দেখতে পাই, শুধু আমাকেই করেন না।

দেশবন্ধুর কাতরতায় মায়ের মন ভিজে গেল। মা বললেন—দেখ, কতলোককেই তো দেখলাম; তারা ধরে থাকতে পারে না, কিছুদিন বাদেই ছেড়ে দেয়, আর শেষে বলে—ওতে কিছু হয় না। তারপর কত কী নিন্দা করে বেড়ায়! ... তুমি চিত্তরঞ্জন! দেশজোড়া তোমার নাম, কত লোক তোমায় মানে, কত বড়লোক তুমি! আর বড়লোক যখন আমাদের মত লোকের কাছে আসে, তখন কৃতার্থ করতেই আসে। তাই বলি, কৃতার্থ করতে যদি এসে থাক, তবে 'নাম' নিয়ে আর কাজ নেই। অন্যান্য বড়লোকদের মত তুমিও কিছুদিন বাদে সব ছেড়ে দেবে।

দেশবন্ধু মায়ের কথা শুনে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—মা, চিত্তর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার পরম শত্রুও কখনো একথা বলবে না যে, সে যেখানে-সেখানে গিয়ে মাথা নত করে। আর এটাও সকলে জানে, চিত্ত একবার যেখানে মাথা নত করে, সেখান থেকে আর সে মাথা কখনও ওঠায় না। আমি মা কৃতার্থ করতে আসিনি, কৃতার্থ হতেই এসেছি। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

দেশবন্ধুর কথায় মায়ের হৃদয় গলে গেল। ছাদের উপর, উন্মুক্ত আকাশের তলে মা দেশবন্ধুকে দীক্ষা দিলেন ও কত কথা বললেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি মা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি নিয়ে নেমে গিয়ে মোটরে উঠলেন। ১৯২৪ সালের ১৪ই জুন শনিবার সন্ধ্যায় দেশবন্ধু দীক্ষা গ্রহণ করেন।"

দেশবন্ধুর এই দীক্ষাগ্রহণ রাজনৈতিক মহলে, বিশেষত তাঁর নিজের স্বরাজ দলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তা তাঁকে কোনভাবে বিচলিত করতে পারেনি। অনেকেরই অভিমত ছিল যে যে-কোন ভাবেই হোক দেশবন্ধুকে ঠাকুরের সংস্পর্শে আর যেতে দেওয়া হবে না। এরকম কয়েকজন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বলেন—তোমরা এরূপ চেষ্টা থেকে বিরত হও। আমি জানি, শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে, he has got a very strong sentiment। তোমরা কর্তার কাছে (দেশবন্ধুকে তাঁরা 'কর্তা' বলতেন) শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন।

অনেকের ধারণা—দেশবন্ধুর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণের ঘটনাটি কল্পিত।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর 'দেশবন্ধু স্মৃতি' (১ম সংস্করণ) এবং সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া' গ্রন্থ পাঠ করলে এই ভ্রান্তির নিরসন সম্ভব। দীক্ষা গ্রহণের তিনদিন পরে তিনি আবার মানিকতলায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন—ঐ সময় পল্লী সংস্কার নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবিত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প ও ছোট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন করে গ্রামজীবনে কীভাবে সমৃদ্ধি ও নবজীবন আনয়ন করা সম্ভব—এ সমস্ত গ্রাম-সংগঠনের বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত আলাপ আলোচনা হল। যাওয়ার সময় দেশবন্ধু জানালেন যে স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর FORWARD পত্রিকায় গ্রামসংগঠন সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করবেন। কয়েকদিন পরেই ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

সেবার ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় দেশবন্ধু ঠাকুরকে বলেন—দেশের কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে যখন খুশি আশ্রমে গিয়ে আপনার সঙ্গ-সুখ লাভ করব, তারও উপায় নেই। আপনার কর্মীদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকেন যিনি আমার বাড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে থাকতে পারেন, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপাদি করে আপনার বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদগুলি সব জানতে পারি। ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন, আচ্ছা, চিন্তা করে দেখব আপনার বাড়িতে কাউকে পাঠাতে পারি কি না। পরবর্তীকালে ঠাকুর সুশীলচন্দ্র বসুকে দেশবন্ধুর বাড়িতে পাঠান। তাঁকে পেয়ে দেশবন্ধু মহাখুশি। দোতলার যে ঘরে তিনি থাকতেন, তারই পাশের ঘরে সুশীলচন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা করেন।

আশ্রম বিষয়ক নানা আলাপ আলোচনায় একবার সুশীলচন্দ্র দেশবন্ধুকে বায়ুচালিত তড়িৎযন্ত্রের সম্বন্ধে বলেন। দেশবন্ধু হেসে বলেন—আমিও ফকির হলাম, আর আপনারাও আমার কাছে এলেন। আগেকার সময় হলে আমি একাই এটার ভার নিতে পারতাম। নিঃস্ব হয়েও তিনি এই কাজে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন। একটি অংশীদারি কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ছিল দেশবন্ধুর যেটি পরে উঠে যায়। তার কতগুলি আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং একটি সূক্ষ্ম কেমিক্যাল ব্যালেন্স তিনি বিশ্ববিজ্ঞানাগারের জন্য দেন। এমন কী তাঁর নিজের ব্যবহারের রেমিংটন টাইপ মেশিনও আশ্রমের কাজের জন্য দান করেন।

কলকাতা করপোরেশনের মেয়র থাকাকালীন একবার দেশবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে বলেন—দেখুন, বালিগঞ্জ লেকের ধারে পঞ্চাশ বিঘা জমি আমার Control-এ আছে, সেটা আমি আপনাদের আশ্রমের জন্য দিতে পারি। ঠাকুরকে বলে আপনারা যদি এখানে আশ্রম স্থাপন করেন, তাহলে দেশের জনসাধারণ ও বড় বড় লোক আপনাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবেন। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে আশ্রম সহজে সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে আর আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যও সফল হবে শীঘ্রই।

সুশীলচন্দ্র কলকাতা থেকে আশ্রমে ফিরে দেশবন্ধুর প্রস্তাব ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন । সব শুনে ঠাকুর বলেন—দাশদা ও আপনার অনুমান ঠিকই, আশ্রম

ওখানে হলে তা শীঘ্রই বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি কী ভাবছি জানেন? একটা অজ পাড়াগাঁ, যেখানে কোন কিছুরই সুবিধা নেই, বরং পদে পদে বাধাবিঘ্ন অনেক, এরকম একটা জায়গায় থেকে, আপনারা যদি নিজেদের আশ্রম গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে কোন কিছুই আপনাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই কলকাতার সুবিধার চাইতে এখানে হিমাইতপুরে থেকেই আশ্রমের কাজ চালিয়ে যাওয়া আমি পছন্দ করি।

সুশীলচন্দ্র বলেন যে আশ্রম স্থাপন না করলেও, দেশবন্ধুর ইচ্ছানুযায়ী জমিটা নিয়ে রেখে দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে বিক্রয় করলে বেশ কিছু অর্থাগম হতে পারে তাতে। ঠাকুর দৃঢ়ভাবে জানান—সেখানে আশ্রম স্থাপনের যখন কোন সংকল্পই আপাতত নেই, তখন জমি নেব কেন?

সকল আসক্তির অতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিস্পৃহতায় এভাবেই দেশবন্ধু-প্রস্তাবিত জমি গ্রহণ পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

দেশবন্ধুর বাড়িতে থাকাকালীন সুশীলচন্দ্রের বহু দেশবরেণ্য নেতাকে সামনে থেকে দেখার ও তাঁদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়। এঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসু ও মাতা প্রভাবতী দেবী সৎনামে দীক্ষিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রও ছিলেন ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। একাধিকবার তিনি আশ্রমে যান এবং ঠাকুরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। শেষবারের মতন যখন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তারপর ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও সুশীলচন্দ্রকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের যে-পথে পরিচালিত করছেন, সেটাই সর্বকালের সর্বমানবের পথ, এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক শাসন থেকে ভারত যখন মুক্তি লাভ করবে, তখন তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে।" সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের পূর্বে এলগিন রোডের যে বাড়িতে তিনি অন্তরীণ ছিলেন, সেই বাড়িতে তাঁর শয়নকক্ষের দেওয়ালে ঠাকুরের একখানি বৃহৎ আলোকচিত্র বহুদিন পর্যন্ত টাঙানো ছিল, পরে কোন অজ্ঞাত কারণে সেটি সরিয়ে দেওয়া হয়।

একবার সুশীলচন্দ্র দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রথম দর্শনেই তিনি ঠাকুরকে কীভাবে গুরুরূপে বরণ করেন? তা কি নেহাৎ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে? দেশবন্ধু প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—না, তা নয়; আমি ভাবের ঘোরে তাঁকে গ্রহণ করি নি। ... প্রথম দর্শনেই যা আমাকে মুগ্ধ করল তা হচ্ছে তাঁর wonderful child-like simplicity (আশ্চর্য বালকসুলভ সরলতা)। . . . পূর্ণজ্ঞান না হলে এরূপ সারল্য সম্ভব নয়। তারপর আমি যে সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন I was beset with innumerable difficulties, which, inspite of the knowledge and experience I had, I could not solve (আমি এত অসংখ্য বাধাবিঘ্নতে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়েও তার কোন সমাধান পাইনি)। আমার জীবনের সেই সব অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্নের কথা যখন তাঁর

কাছে বললাম তখন তিনি মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে, সামান্য কটা কথায় আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তখনই আমি বুঝলাম—ইনি কেবল শিশুর মত সরলই নন, অসাধারণ জ্ঞানীও বটেন। তাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করে আর কোন উপায়ই রইল না।

দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরে চিত্তরঞ্জন পুত্র চিররঞ্জন ও পুত্রবধূ সুজাতা দেবীকে সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রমে পাঠিয়ে দেন—তাঁরা সুদীর্ঘ দিন সেখানে ছিলেন। দেশবন্ধু দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই নিয়মিত নামধ্যান করতেন এবং যেখানেই যেতেন সবার কাছে ঠাকুরের কথা বলতেন। পরবর্তীকালে সুশীলচন্দ্র বম্বে বিধানসভার স্বরাজ দলের সদস্য ডঃ জয়াকর এবং মথুরায় এ. আই. সি. সি. সদস্য হাকিম ব্রজলাল বর্মন-এর কাছে দেশবন্ধুর দীক্ষাগুরুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার কথা শুনেছেন। দেশবন্ধুর অনুরোধেই গাঁধীজি পাবনা সৎসঙ্গ পরিদর্শনে আসেন।

১৯২৪-এর ডিসেম্বরে নিজের বাড়িটি পর্যন্ত দেশের সেবায় দান করে চিত্তরঞ্জন বন্ধু পল্টু করের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে সপরিবারে উঠে যান। ইতিমধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও কর্মধারার কোন বিরতি ছিল না। ১৯২৫-এর ২রা মে ফরিদপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ফরিদপুর থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং যাওয়া ঠিক হয়। দেশবন্ধু ফরিদপুর আসছেন শুনে ঠাকুর ফরিদপুর থেকে পাবনা আসার জন্য অনুরোধ করে তাঁকে একটি মধুর, আন্তরিক চিঠি পাঠান। ১১ই মে স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চিত্তরঞ্জন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পাবনা আশ্রমে আসেন। তার আগে থেকেই চিররঞ্জন সেখানে সপরিবারে বাস করছিলেন।

পদ্মাতীরে একটি ছোট বাংলোতে দেশবন্ধুর থাকবার ব্যবস্থা হয়। বাংলোর সামনে বাঁধানো বেদীতে বসে গভীর রাত পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষা, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা চলত। দার্জিলিং থেকে ফিরে কী কী কাজে হাত দেবেন, ঠাকুরের সঙ্গে সেসবও পরামর্শ করলেন।

আশ্রমে দিন দুই থাকার পরেই দেশবন্ধু অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধেই তিনি আরও কিছুদিন থেকেও যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিবার-পরিজনের আগ্রহাতিশয্যে দার্জিলিং চলে যেতে বাধ্য হন। বিদায়কালে ব্যথাতুর কণ্ঠে ঠাকুর বললেন—যেতে দেওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু কী করব, উপায় নেই। দেশবন্ধুর অনুরোধে তাঁর পি. এ. হিসেবে সবসময় কাছে থাকার জন্য আশ্রমকর্মী মনোহরচন্দ্র বসুকে ঠাকুর সঙ্গে দিলেন;ইনি মহাপ্রয়াণের সময় পর্যন্ত দেশবন্ধুর পাশে ছিলেন। আশ্রম থেকে যাওয়ার সময় মোটরে ঈশ্বরদি যাওয়ার পথে দেশবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে বলেন—আমার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য, যা এতদিন আবছার মত ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পেয়ে তা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, কী করে একজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা, এরকম আর একজনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে পারে। দুটো শরীর আলাদা,

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

কিন্তু মনের এ রকম অপূর্ব মিল কী করে সম্ভব হয়—তা বুঝি না।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে দার্জিলিং-এ মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ঘটে। সমগ্র দেশ শোকে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর অকাল প্রয়াণে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায় তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বের ইষ্ট-আকূতি। মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট মনোহরচন্দ্র বসু জানিয়েছেন, 'ভোম্বল (চিররঞ্জনের ডাকনাম)! আমি পাবনা যাব'—এই কথা কটি বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রোগশয্যায় দেশবন্ধুর ইষ্ট চিন্তা ও ধ্যানই মুখ্য ছিল। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন 'FORWARD' পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলে দেশবন্ধু বললেন— এখন এসো প্রফুল্ল, আমি একটু 'নাম' করব। ঐদিন হেমেন দাশগুপ্ত দার্জিলিং থেকে কলকাতা ফেরার সময় তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি বলেন—তুমি পাবনা হয়ে যেতে পারবে?

কলকাতায় দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। জননী মনমোহিনী তাঁর শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণের বেশ কিছুদিন পরে একবার কলকাতায় তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সুশীলচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ হয়। সেসময় বাসন্তী দেবী সুশীলচন্দ্রকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জানান যে, তাঁর স্বামী মৃত্যুশয্যায় তাঁকে বলে যান শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে—কিন্তু নানা কারণে স্বামীর মৃত্যুশয্যার সে অনুরোধ তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব হয়নি। বাসন্তী দেবীর এই উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায়, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের অন্তরে ঠাকুরের জন্য কী তীব্র আকুলতা ব্যাপ্ত হয়ে ছিল।

দেশবন্ধু পাবনা থেকে দার্জিলিং-এ যাওয়ার পরে ঐ সময়ে দার্জিলিং-এ যাঁরা দেশবন্ধুকে দেখেছেন, তাঁরাই তাঁর চরিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুগভীর প্রভাব অনুভব করে অভিভূত হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুরই অনুরোধে পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শনে যান দেশবন্ধু আশ্রম থেকে দার্জিলিং চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে। আশ্রম পরিদর্শনের কিছুদিন পরে মহাত্মাজি দাজিলিং গিয়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটান। তাঁদের মধ্যে এই সময়কার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় ঠাকুরের সাহচর্যে দেশবন্ধুর স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ফুটে ওঠে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকায় মহাত্মা গাঁধীর লেখায় বিষয়টি পরিস্ফু ট হয়। গুজরাটি সাপ্তাহিক 'নবজীবন'-এ গাঁধীজি লেখেন—'শেষ চার মাসে দেশবন্ধুর চরিত্রে অতি অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাঁর বদ-মেজাজের পরিচয় আগে অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু ফরিদপুরে তাঁর নম্রতার যে পরিচয় পেলাম, তা যেন তার পর থেকে বেড়েই চলল। . . . দার্জিলিং এসে দেখলাম তার পূর্ণ পরিণতি। এই পাঁচ দিনের স্মৃতিচারণে আমার কোন ক্লান্তি নেই। সেসময়ে তাঁর প্রতি কথায় ও কাজে যেন ভালবাসা উপ্‌ছে পড়ত। তাঁর আশাবাদও এসময়ে অতিশয় তীব্র ছিল। . . . বলেছিলেন—যতদূর সম্ভব, মানুষের হৃদয় জয় করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ঐ একই পত্রিকায় গাঁধীজি আরও লিখেছেন—'দার্জিলিং-এ তাঁর কাছে যখন যাই তখন তিনি বাড়িতে মাছ মাংস ঢুকতে দিতেন না। তিনি আমাকে বার কয়েকই বলেছিলেন, "পারলে আর কখনও মাছ মাংস খাব না। আমার খেতে ভাল লাগে না আর তাতে আধ্যাত্মিক বিকাশের বাধাও ঘটে। আমার গুরুদেব বিশেষভাবে বলেছেন —আমি এখন যে সাধনার পথ ধরেছি তাতে আমার পক্ষে আমিষ বর্জন করাই বিধেয়।"

দেশবন্ধুর জীবনের শেষ পর্বের এই অভূতপূর্ব অধ্যাত্ম চেতনার দিকটা তাঁর অন্যতম জীবনীকার মণি বাগচি অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন, "স্টেপ এসাইড্- এর ঘরটিতে রোগ শয্যায়শায়িত দেশবন্ধুর শেষের দিনগুলি যখন এক নিবিড় নীরবতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল, তখন আমরা অনুমান করতে পারি তাঁর আরাধ্য দেবতা বরাভয় নিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের এই ত্যাগ দ্বারা দেশবন্ধু তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে রূপান্তরিত করেছিলেন একটি আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আর রাজনীতির সঙ্কীর্ণ ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করে তিনি স্পর্শ করেছিলেন ভারত আত্মার যথার্থ তন্ত্রীটিকে . . . এখানেই তাঁর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।"

পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর দেশবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, "দাশদাকে ছেড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। দাশদা যখন গাড়িতে উঠলেন , তখন মনে হচ্ছিল তাঁকে হাত ধরে টেনে নামাই। এমন sincerity ও সত্যের প্রতি টান আর কোথাও দেখিনি। একদিন গভীর রাত্রে দাশদা এই বাঁধের উপর একা দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'মা, তোকে স্বাধীন দেখতে পাব না?' আমি পিছনে ছিলাম, দাশদা তা জানতে পারেননি। আমি তাঁর কথার উপর চেঁচিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পাব, তবে কাজ অনেক বাকি।'

আমার এই মেঠো পাড়াগেঁয়ে কথা সবাই বোঝে না। আমি অশিক্ষিত লোক, ঠিক ঠিক সবটা বুঝিয়ে বলতে পারি কি না জানি না। কিন্তু দাশদাকে যা বলতাম, আকার ইঙ্গিতেই তিনি সব বুঝে নিতেন ও তেমনভাবে চলার চেষ্টা করতেন। বলতে কি, দাশদা কয়েকদিনের মধ্যে আমার ভাষার a, b, c, d, যেন মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। আমি যা বলতে যা বুঝি, তিনি তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি যেন শিশুর মত আমার কথাগুলি গিলতেন।"

সবদিক থেকেই সবার চেয়ে অনেক বড় মাপের এই মানুষটির ইষ্টনিষ্ঠার গভীরতাও ছিল তাঁরই পক্ষে মানানসই। তাই বাহ্যত অল্প কালের পরিসরের মধ্যেই তাঁর ইষ্টের সঙ্গে একাত্মতার অভীপ্সা এমন তীব্রতা লাভ করেছিল যে দেহাতীত হয়ে তিনি চিরলগ্ন হয়েছেন তাঁর পরম ঈপ্সিতে, সকল বিচ্ছেদের শেষে হয়েছে চিরমিলন।
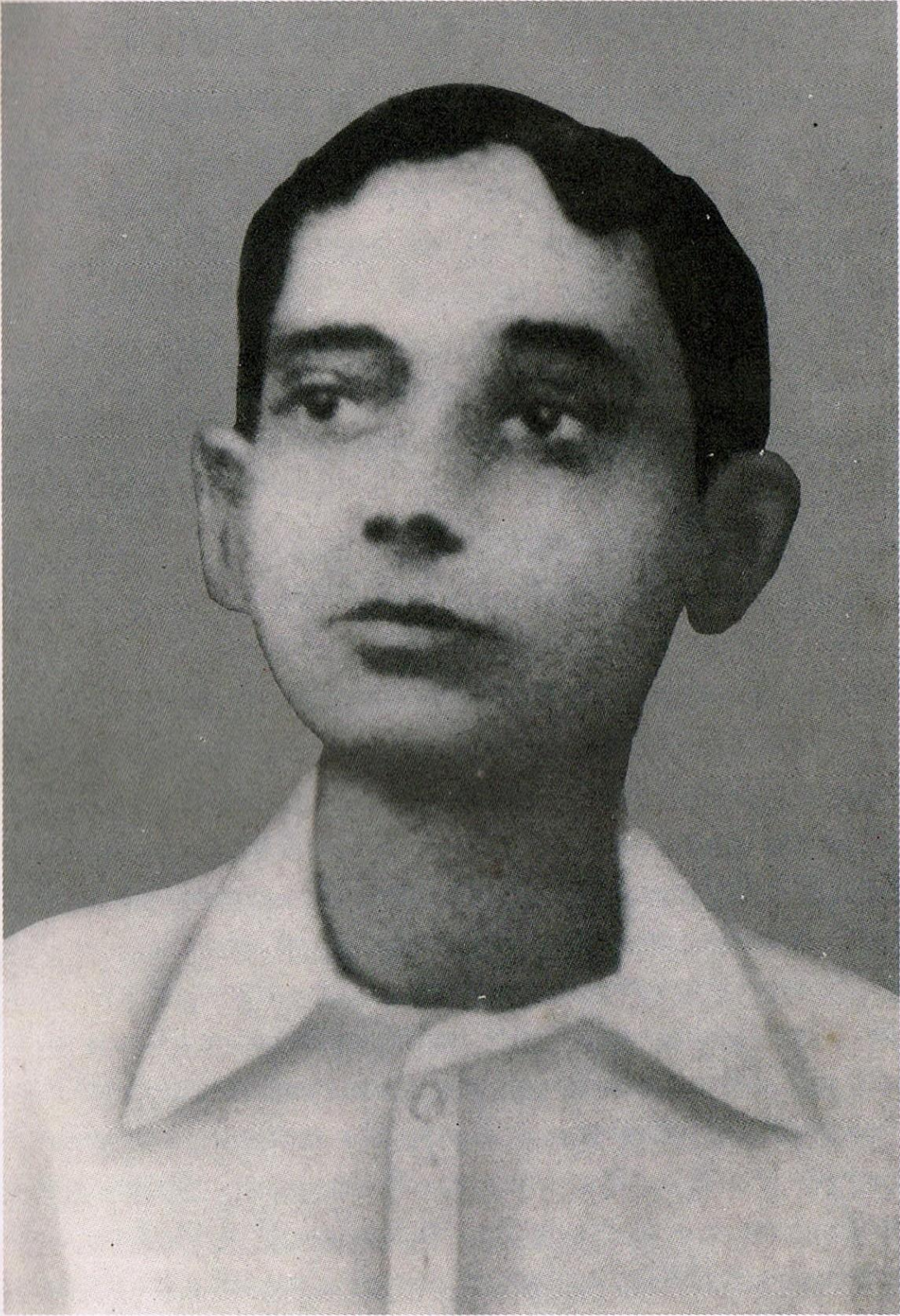
কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

? — ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রেমের অমৃত ছোঁয়ায় সুরাপাত্র কখনও কখনও সুধাপাত্রে পরিবর্তিত হয়—সুরামাতাল হয়ে ওঠে সুরের মাতাল, ভালবাসার নেশায় টলোমলো, মদিরার তীব্র আকর্ষণ তুচ্ছ করে গীতি-কুসুমে পূজার নৈবেদ্য সাজাতে শুরু করে তার প্রিয়পরম প্রেমের দেবতার উদ্দেশ্যে। হয়তো এর প্রস্তুতি জন্ম-জন্মান্তরের—চিরবন্ধনে আবদ্ধ ভক্ত ও ভগবান; তাই বাহ্যত বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেও তাঁর অমোঘ টানে কাছে আসতে বাধ্য হয় অভিমানী ভক্ত। মানুষটি চেয়েছিলেন আশ্রয়, পেলেন সব পাওয়ার সেরা পাওয়া—এক অবাধ প্রশ্রয়। সমস্ত দোষগুণ নিয়ে, এমনকি মদ্যপানের সংসারনিন্দিত নেশাসুদ্ধ, পরম প্রশ্রয়ে সঁপে দিলেন নিজেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর ধ্বনিত হল :

হে মোর জীবনসাথি, চির প্রেমময়,
বিশ্বে শুধু তুমি মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়
তাই তুমি সকলের বড়;...

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনিঃশেষ প্রেমের প্রশ্রয়ে সুরার অন্ধকার থেকে সুরের আলোকে উত্তীর্ণ কথক কবি ভক্ত মানুষটি হলেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বরিশালের বিপ্রসন্তান হেমচন্দ্রের প্রথাগত শিক্ষালাভের তেমন সুযোগ হয়নি, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ও সহজাত কাব্য ও কথকতার ক্ষমতার অধিকারী হেমচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রভূত প্রতিভা-সম্পদ সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলতার অভাবে এবং স্বভাবগত ঔদাসীন্যের কারণে তাঁর বিপুল সৃষ্টির অধিকাংশই বিলুপ্ত এবং সাধারণ্যে আজ কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক সম্পূর্ণ বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ইতিহাসের ধূসর পাতা উলটিয়ে সে সময়ে ফিরে গেলে অনুভব করা যায় যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ছিল তাঁর মধ্যে। বরিশালের অপর খ্যাতনামা কবি মুকুন্দ দাস—চারণকবি রূপে যিনি পরবর্তীকালে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন—ছিলেন হেমকবির নিত্যসঙ্গী। মুকুন্দদাসের গাওয়া বহু গানের রচয়িতা ছিলেন হেমকবি, যদিও এ তথ্য প্রায় সকলেরই অজানা। মুকুন্দদাসের জীবনী-গবেষক অধ্যাপক ডঃ জয়গুরু গোস্বামী 'চারণকবি মুকুন্দদাস' গ্রন্থে চারণকবির জীবনে কবি হেমচন্দ্রের প্রভাব সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে হেমকবির প্রতিভার বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

"... মুকুন্দদাসকে যিনি গান সরবরাহ করিয়াছিলেন, যিনি যাত্রার পালা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে। বুঝি বা গোবিন্দদাস অপেক্ষাও বিয়োগান্ত মহিমায় ভাস্বর তিনি। এমন নেশা ছিল না, যাহাতে তিনি আসক্ত না ছিলেন। এমন

রাগ-রাগিনী ছিল না, যাহাকে তিনি তাঁহার কণ্ঠের শাসনে না রাখিয়াছিলেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ ছিল তাঁহার গান রচনা এবং কথকতা।. . . অদ্যপিও বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মানুষের কানে বাজে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ীতে ও জগদীশবাবুর আশ্রমে হেমকবির কথকতা।

প্রাচীন চারণগণ নিজেরাই ছিলেন রচয়িতা, উহা সামন্তযুগের কাহিনী। ইংরাজ আমলের চারণ মুকুন্দদাস তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন হেমকবির নিঃস্বার্থ সাহচর্যের নিকটে। দুই শক্তি একই হইয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হেমকবি না থাকিলে মুকুন্দদাস হইত না; আবার কেহ কেহ বলেন, মুকুন্দদাস না থাকিলে হেমকবিকে কেহই চিনিত না,—পূর্ণতা এই দুইটিকে লইয়াই। তুলসী পাতা ছোট হইলেও যেমন মহাত্ম্যে ছোটবড় হয় না, তেমনি ছিলেন—হেমকবি আর মুকুন্দদাস।. . .

হেমকবির প্রতিভা ধনী ছিল, কিন্তু তাহাতে "সুগৃহিণী" ভাব ছিল না। মুকুন্দদাস এই "সুগৃহিণী"র কার্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরশমণির স্পর্শে হেমকবি সঞ্জীবিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীতে কিছুদিনের জন্য তাঁহার অধিষ্ঠানও হইয়াছিল। তাহার পর "আতিথ্যের উপহার" লাভ করিয়াছিলেন "বীরবল" ছদ্মনামধারী প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে।. . . মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত নৈষ্ঠিক নীতিবাদী হইলেও হেমকবির কবিত্বকে তিনি বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেমকবির কবিতা ও গীতরচনার ধারাল ইস্পাত খণ্ডকে তিনি মুকুন্দদাসের গান গাহিয়া অভিনয় করা ও আসর মাতাইবার ক্ষমতার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা যেন কুঠারের ফলার সঙ্গে "আছাড়ি" লাগাইয়া দেওয়া।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত নিজে লেখনীচর্চা করিতেন।. . . বরিশালের বি. এম. কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন—"প্রতিযোগিতার কথা শুনিয়াছি, অশ্বিনীকুমার দত্তের এবং হেমকবির মধ্যে—কে কত অল্প সময়ে কবিতা লিখিতে বা গান বাঁধিতে পারেন। ফলাফলে দেখা যাইত — হেমকবির নিকটে অশ্বিনী দত্তের মহানুভব পরাজয়।" এই প্রসঙ্গে সুধাংশুবাবু একটি দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন—"সেদিন হেমকবির লেখনীতে বেদান্ত আসিয়া ভর করিয়াছিল। ফলে তখন একটি আধ্যাত্মিকতত্ত্বপূর্ণ গানের সৃষ্টি হইল, যাহা আজও হেমকবিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।" গানটি নিম্নরূপ:-

"কেবা কার করে আরাধন
যেন, আপনি পাতিয়া কান
শোনো আপনার গান
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাকো বারে বারে, কে দিবে সাড়া
আপনারে নাহি চেনো, আপনি-হারা
মুঠোর ভিতরে রাখি

মোহপাশে মুদি আঁখি
আঁধারে নিভায়ে বাতি, খোঁজা হারাধন।
কেবা তুমি, কেবা আঁখি
সব আমি হই,
আমাতেই আমি তুমি, ভিন্ কেহ নই
হয় শুধু তুমি থাকো
নয় শুধু আমায় রাখো
উভয়ের হ'তে নাহি পারে একাসন।"

এই রচনার নিকটে অশ্বিনীকুমারের রচনাকে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। "দত্ত কারো ভৃত্য নহে", কিন্তু, হেমকবির নিকটে অশ্বিনীকুমার যেন বলিতে চাহেন, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" উভয়ের সম্পর্কটা দৃষ্টি-উন্মোচক। লোকনেতা, সারা বাঙ্‌লা দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম বনাম অখ্যাত অজ্ঞাত মদ্যপ এক স্বভাবকবি। জয় হইতেছে শেষোক্তের।....

Emerson বলিয়াছেন, "Man is only half himself; the other half is his expression" হেমকবি সেই 'other half' কে উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ জানিয়া 'the man that is half himself' তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। মুকুন্দদাসের 'other half' এই হেমকবি। হেমকবিকে বাদ দিলে মুকুন্দ দাস অর্ধেক হইয়া থাকিতে পারেন না — 'a man taken by half is never taken right '....

হেমকবি ও মুকুন্দদাস কেহই উচ্চ সংস্কৃতিবান্ নহেন; শিক্ষিতও নহেন। স্কুল-কলেজের বিদ্যায় উভয়েই বঞ্চিত। মুকুন্দদাসের উদ্ভব নিম্নকূলে; হেমকবির ব্রাহ্মণকূলে হইলেও কর্ম ছিল নিম্মকূলে। তদানীন্তন নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়া মাপিলে উভয়েরই লজ্জা নিবারণ কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি উভয়ে মিলিয়া বাঙালীকে মাতাইয়া রাখিয়া ছিলেন—দেবদেবীর ভক্তিতে নহে, এক নূতনতর কর্মবোধে নহে,—দেশাত্মবোধে সন্মানবোধে ইংরাজ বিরোধিতায়।"

ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র ডঃ গোস্বামী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হেমকবিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তদানীন্তন বঙ্গাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী—এমনকী সূর্যস্বরূপ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে " . . . আর এই গণজাগরণের গান গাহিবার জন্য এই দেশের মাটিতে আবির্ভূত হইলেন — ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বাধীনতার অগ্রদূত গোবিন্দ দাস, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, সত্য-শিব সুন্দরের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ, ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বরিশালের জন্মদাতা অশ্বিনীকুমার, কবি ও কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চারণকবি মুকুন্দ দাস"।

এ হেন প্রতিভাধর হেমচন্দ্রের গুণমুগ্ধের তালিকায় ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরীর মত মানুষও। অর্থোপার্জনও ছিল রীতিমত

উল্লেখযোগ্য, ঘন্টায় ত্রিশ টাকা নিতেন কথকতায়। কিন্তু সবই নিঃশেষ হয়ে যেতে মদ ও আনুষঙ্গিক কুসংসর্গে। তাঁকে সমূহ বিনাশের হাত থেকে উদ্ধার করার আশায় মুকুন্দদাসই তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেন।

ঠাকুর সেসময় কলকাতার হরিতকী বাগান লেনের একটি বাড়িতে এসে ছিলেন। সারাদিন আলাপ-আলোচনা, নামকীর্তনে বাড়িটি ভরপুর হয়ে থাকতো। কলকাতার ভক্তমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন বিভিন্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে, ঠাকুর নিরন্তর দিয়ে যেতেন সকলের সব প্রশ্নের সমাধানী উত্তর। সে-সব উত্তর ছিল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, মানুষ তৃপ্ত হয়ে ফিরে যেত উত্তর পেয়ে, কিন্তু পরদিনই এসে উপস্থিত হত কী এক অদ্ভুত আকর্ষণে। ঠাকুর যখন কথা বলতেন, তাঁর সমস্ত দেহে যেন তার অভিব্যক্তি ফুটে উঠত, ভাবের এক সাবলীল অপরূপ প্রকাশ ঘটতো, ভাষায় যা অবর্ণনীয়।

একদিন বিকেলে এমনই এক আসরে এলেন কবি হেমচন্দ্র মদ্যপ অবস্থায়। ঠাকুরের কাছে আসবেন বলে সেদিন আরও বেশি করে নেশা করে এসেছেন, ঠাকুর তাকে ঘৃণা করেন কিনা, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কবি ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর তাঁর সুপরিচিত মধুর ভঙ্গিতে 'আসুন দাদা' সম্বোধনে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন। বেসামাল কবির ভারে ঠাকুর বসে পড়েন এবং হেমচন্দ্রের মাথাটি নিজের উরুতে রাখেন। এই অবস্থায় কবি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন আর ঠাকুর মৃদু হাসি ভরা মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর হেম কবি ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেন, ঠাকুর, এইমাত্র আমি মদ খেয়ে এলাম।

—সে তো মুখের গন্ধেই টের পাচ্ছি।

—কই, মদ খেয়েছি বলে তো আপনি আমায় ঘৃণা করছেন না!

—আমার বাঁ হাতে যদি ঘা হয়, তবে আমার ডান হাত তাকে কেটে ফেলে দেবে, না সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলবে?

—ঠাকুর, এমন কথা তো কারো কাছে আগে শুনিনি। সেদিন আরও নানা কথা হল কবির ঠাকুরের সঙ্গে;সস্নেহে ঠাকুর বলে গেলেন নানা কথা। লক্ষ্য যাঁর সমাধান, সমস্যা তাঁর কাছে দুর্লঙ্ঘ্য নয় কখনও;সাধারণ দৃষ্টিতে যা অন্যায়, গর্হিত অপরাধ, তাঁর চোখে তা সংশোধনীয় সাময়িক বিচ্যুতি। মাতৃস্নেহে সহ্য করেছেন তিনি অবাধ্য সন্তানের উপদ্রব, যাতে তার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পর ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে হেমকবি পাবনা আশ্রমে এলেন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলেন,—আপনার কাছে কিছুদিন থাকব বলে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলেন—ভালই হল, এই ক'টা দিন তাহলে বেশ স্ফূর্তিতে কাটানো যাবে।

তেরো বছর বয়স থেকে কবির মদের নেশা। বিকেল হলেই নেশা চেপে বসে।

কিন্তু আশ্রমে মদ পাওয়ার উপায় নেই। তাই প্রত্যহ পাবনা শহরে গিয়ে নেশা করতে হয়। শহরের অনেকেই আশ্রমকে ভাল চোখে দেখত না, তার উপর আশ্রমেরই একজনকে প্রকাশ্যে রোজ মদ খেতে দেখে বিরূপ সমালোচনা বৃদ্ধি পায়। আশ্রমকর্মী সুশীলচন্দ্র বসু ঠাকুরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। ঠাকুর হেম কবিকে ডেকে বলেন—আপনি তো আমার কাছেই এসেছেন, আমারই তো অতিথি আপনি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—তাহলে আপনার যা কিছু দরকার আমার কাছেই বলবেন, আমিই সব কিছু আপনাকে দেব।

—সবই আপনি দেবেন? ধরুন, আমার যদি মদ দরকার হয়?

—হ্যাঁ, তাও দেব।

—তাহলে তো খুব সুবিধাই হয়, আমার আর কষ্ট করে তিন মাইল হেঁটে পাবনা যেতে হয় না।

পরদিন বিকেলে হেমচন্দ্র ঠাকুরের কাছে এসে বলেন, ঠাকুর আমার নেশার সময় হয়েছে, এক্ষুনি মদ চাই।

ঠাকুর সেকথা শুনে হেমচন্দ্রের মদ্যপানের ব্যবস্থা করে দিলেন, কবি স্বচ্ছন্দে তা পান করলেন। এভাবে পরপর কয়েকদিন ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় মদ নিয়ে পান করার পর একদিন বিকেলে ঠাকুরের কাছে এসে বলেন—ঠাকুর, মনে করেছিলাম আপনি অত্যন্ত সহজ সরল লোক, এখন দেখছি আপনি অতি বড় খল, অতি বড় কুটিল।

ঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন কী হল?

—আপনার কাছ থেকে মদ নিয়ে খেতে হবে, এমন বন্ধনে আমায় ফেললেন কেন?

—দেখুন, আপনিও বিপ্রসন্তান, আমিও তাই। আমি কথা দিয়েছি, আপনিও কথা দিয়েছেন; আমি আমার কথা রক্ষা করে চলেছি আর আপনিই বা তা করবেন না কেন?

—ঐটাই তো মুস্কিলের কথা, আপনিই চালাকি করে আমাকে এই ফাঁদে ফেলেছেন। সকলে আপনার কাছে এসে আপনার মধুর সঙ্গ পেয়ে ও অমৃতোপম উপদেশ শুনে তাদের জীবন চলনা শুধরে নেয়, আর আমি কিনা আপনারই কাছ থেকে মদ নিয়ে খাচ্ছি! কাল থেকে আমার মনে ভয়ানক দ্বন্দ্ব হচ্ছে —আপনার কাছ থেকে মদ নিয়ে খাওয়া আর কিছুতেই চলবে না। এর থেকে যদি আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাও ভাল।

বললেন বটে, কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যাওয়া তাঁর আর হল না, ঐ 'অতি বড় কুটিল' মানুষটির ভালবাসার ফাঁদে পড়ে তীব্র অনুতাপের দহনে আবাল্য সঙ্গী বদ নেশাকেই ছাড়তে বাধ্য হলেন কবি। সকল নেশার সেরা নেশার সন্ধান পেয়ে গাইলেন :

"....বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা,
কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা,
তোমারই মাঝারে ফুটেছে আহারে!
তোমারেই বারে-বারে চেয়েছিনু আমি।..."

ঠাকুরের সরল চাতুর্যের পূর্ণ পরিচয় পেতে তখনও কবির বাকি ছিল আরও। একদিন বিকেলে ঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন, অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত আছেন। নানা কথাবার্তা আলাপ আলোচনা চলছে। হঠাৎ ঠাকুর হেমচন্দ্রের কাঁধে হাত দিয়ে বলেন—চলুন, একটু ঘুরে আসি। দুজনে হাঁটিতে হাঁটিতে কথা বলতে বলতে এগোতে লাগলেন; ঠাকুর মাতৃমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—এবারে একটু ভেতরে গিয়ে বসলে হয়। একতলার একটি ঘরে প্রবেশ করে বসলেন উভয়েই। একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হেমচন্দ্রের জীবনের একটি গভীর গোপন ঘটনা হঠাৎ উল্লেখ করেন। কবি তো অবাক! এ কথা ঠাকুর জানলেন কীভাবে! তিনি নিজে ছাড়া একথা আর কারও জানা নেই। কিন্তু ঐ একটিতেই শেষ নয়—পরপর এ ধরনের সকলের অজ্ঞাত কবির জীবনের গুপ্ত ব্যাপার ঠাকুর বলে চলেন—যেন ছবির মত দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। হেমচন্দ্র নতজানু হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন—সমস্ত দেহখানি কাঁপছে থরথর করে। একসময় ঠাকুর নীরব হলেন; কান্নায় ভেঙে পড়ে চরণে লুটিয়ে পড়লেন কবি, ঠাকুর তুলে নিলেন বুকে, ঘুচে গেল সমস্ত অন্তরাল, নিঃসীম শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল অশান্ত কবির অন্তস্থল। তাঁর এই আত্মসমর্পণের নন্দিত প্রাপ্তি ফুটে উঠেছে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে —

"....হে নব পরিচিত, হে চিরপুরাতন,
দরশনে আজি তব সার্থক এ নয়ন।
এ জীবন ফুটি উঠি, স্তুতি হয়ে পড়ে লুটি
শুধু তব শ্রীচরণ-পরশনকামী।..."

দীক্ষা নিলেন কবি হেমচন্দ্র এবং সপরিবারে আশ্রমে এসে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। ছিপছিপে গড়ন, ফরসা রঙ, ছোটখাটো চেহারা কবির। একবার উৎসবের সময় ঠাকুর বসে আছেন মাতৃমন্দিরে, ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে। কবি এসেছেন ঠাকুরের কাছে।

কিন্তু ভিড় ঠেলে এগোতে পারছেন না। বিফল মনোরথ হয়ে মনোবেদনা নিয়ে ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। ঠিক তখনই ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন কবির দরজায়, বললেন,—আসুন হেমদা, বেড়িয়ে আসি। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন হেমচন্দ্র,গাইতে আরম্ভ করলেন তাৎক্ষণিক রচিত গান :

এই তো এই তো তব দরশন মানস-নয়ন রঞ্জন
এই তো করিনু চরণে প্রণতি জয় জগজন-বন্দন!

এই তো করিছ নয়নপাত
এই তো আমার হৃদয়নাথ
সার্থক আজি জীবন মম সফল সকল ভুবন। . . .

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক চিরন্তন, যখনই তিনি আসেন, তখনই আসতে হয় তাঁর ভক্তকেও—একই আবর্তে নিত্য আবর্তিত। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, একবার ছাপ মারা হয়ে গেলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এ সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের।

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার আগে একবার কুমিল্লার এক সাধুর কাছে গিয়েছেন কবি। তখন তিনি বাংলার সুপরিচিত কথক। সাহিত্যিক মহলেও যথেষ্ট খ্যাতি তাঁর। সাধুজির সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর তিনি কবির কাছে কথকতা শুনতে চান। কবি বলেন, ভগবানের নামগান করতে আমার ভালই লাগে, কিন্তু আমি যে মদ খাই। কথকতার আসরে বসার আগে আমার মদ চাই, নইলে ভাব আসবে না। এসব জেনেও আমার কথকতা যদি শুনতে চান, তবে শোনাব। এই অকপটতা ও সরলতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত, যা পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে। তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন ঠাকুরের ভালবাসার কাছে — চেতনসত্তা জাগ্রত হয়েছিল তাঁর ঠাকুরের অমিয় স্পর্শে।

কবি ঠাকুরের মধ্যে দেখেছিলেন অনন্ত রসের উৎস এক আশ্চর্য মজার মানুষকে — যিনি সীমার মাঝেও অসীম, রূপের মাঝেও অপরূপ। তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে লেখনীর মাধ্যমে:

এসেছে মজার মানুষ
মানুষের সাথে তাঁহার মেলে না,
(তাঁর) চলা-বলা-হাসি-খেলা
যে দেখে আর ভোলে না। . . .

কখনও বা কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

“. . . . সবাই মিলে করব পূজা আয় রে তোরা আয়!
নামগুলি সব কুসুম হয়ে পড়বে তাঁহার পায়।
ধোওয়াব চরণ তাঁহার নয়নের জলে
সুরের মালা গেঁথে তাঁহার পরাব গলে . . . ”

হেমচন্দ্র রচিত তাৎক্ষণিক গানের সংখ্যা প্রচুর, তার অধিকাংশই আজ বিলুপ্তির পথে। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ‘মুরলী’ পুস্তিকাতে ৮৩টি গীতি সংরক্ষিত হয়েছে। উচ্চ ভাব ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় রচিত এই গানগুলি একসময় সৎসঙ্গীদের ঘরে ঘরে বহুল প্রচারিত ছিল। সমবেত কীর্তনে এসমস্ত গানের প্রচলন এখনও অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের উক্তিতে হেম কবি ও তাঁর গানের কিছুটা পরিচয়

পাওয়া যায়। মহারাজের ভাষায়—"শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত হেম কবির সেই গান এখন আমার তন্ত্রীতে বেজে ওঠে। তাকে লক্ষ্য করেই যেন গাইতে ইচ্ছা হয়—কোথায় পাব এমন মানুষ, কোথায় পাব এমন প্রাণ। তার প্রাণভরা প্রত্যেকটি গানই এমনতরই—এমনি করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বিধ্বস্ত বিব্রত ব্যাকুল হৃদয়তন্ত্রীতে,—অন্তত আমার তো এমনই মনে হয়। যে প্রাণ যাতে বিসর্জন পেয়ে তৃপ্ত, আমার মনে হয়, সেই ভাবমাখা উদাত্ত ও স্বরিত সুর সবার প্রাণের তুষ্টি ও শান্তির একটা আবহাওয়া অন্তত ক্ষণিকের তরেও—সৃষ্টি করে সার্থকতা ও তৃপ্তি এনে দেবে।"

একবার অধ্যাপক পঞ্চানন সরকার কবিকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ঠাকুরের আশ্রয়ে কেমন আছেন?

—আশ্রয় আবার কী? প্রশ্রয় বলুন।

—সে কী, প্রশ্রয় কী বলছেন! সে তো একটা নোংরা জিনিস; তাই কি পেলেন আপনি এই বিশ্ববিশ্রুত আশ্রমে?

—বলি ঠিকই। হেম কবি ভুল কমই কয়—সে কি আপনার অজানা, পঞ্চাননবাবু? মানুষ আশ্রয় চায় না। চারযুগে কস্মিনকালেও মানুষ চায়নি তা। মানুষ চায় প্রশ্রয় যা পেলে তার অন্তরাত্মা বর্তে যায়। অথচ এই দুনিয়ায় কেউ সে বস্তুটি দিতে চায় না— দিতে জানে না—দিতে পারে না। যদিও নিজে নিজে প্রত্যেকেই ঐ কোন্ আকাশের চাঁদটাকেই ঐ পরশমণিটাকেই খুঁজে মরছে—নিশিদিন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার পঞ্চাননবাবু। মানুষ বড় হতে চায়, বড় বলে গণ্য হতে চায়, অথচ আশেপাশে কারও দুর্বলতার গন্ধ পেলে তার টুঁটি টিপে ধরে। সহ্য করবে না, নিজে বুক পেতে দুর্বলের অত্যাচার সইবে না। . . .

—কথা তো মন্দ বলছেন না মনে হচ্ছে। তবে কি আশ্রয় কেউ চায় না বলতে চান হেমদা?

—না, চায় না। কেউ না জানলেও কবি হেমচন্দ্র জানে। আশ্রয়ের কাঙালপনা জীবের নেই। থাকবে কী করে? আশ্রয়ের আকালই বা কবে হল জীবের? যেমনই হোক, যাই হোক,—সে কোন না কোন আশ্রয় নিয়েই চলে। পারে তো কোন বড় লোকের গোলাম হয়—যদি ঐ গোলামিটা নেহাৎ গায়ে না বেঁধে। নতুবা, নিদেন বৃত্তির আশ্রয় তো তার রয়েছে অঢেল—অপর্যাপ্ত।

. . . সেদিন রাতে—কী কারণে—হয়তো কারণ নেই। মনের তলে যে ব্যথাটা চাপা আছে বাইরের অভিজ্ঞানে তা জেগে উঠল। ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। চাই সান্ত্বনা, চাই প্রবোধ। কত জন এমন করে বসে আছে তাঁর কাছে আমারই মত। দূরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কথা বলতে বলতে এক ঝলকে এক পলকে আমার দিকে চাইলেন, ঘরে ফিরে এলাম।

সে চাউনি বলে দিল, যা ভেবেছ এ কিন্তু তা নয়। আগে দেখেছ একরকম, সে

দেখা নিয়ে দেখেছ—তাই দেখা হয়নি।

আমার চোখের দেখা কি তাঁর চক্ষুভাণ্ডারে জমা আছে নাকি? চোখ দিয়েই তা কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু চোখ তো পারে না। চোখ অনেক দেখে তাই তাঁকে দেখে না।

তাই তো, চোখে এখনও দেখা ফোটেনি। এত বড় জগৎটা, কত কিছু নিয়ে কাজ-কারবার করছি, কিন্তু কিছুই তো দেখা হল না।"

উপরে উল্লিখিত পঞ্চানন সরকার ও হেমচন্দ্রের এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ব্যথাহারী দরদী দয়ালের প্রতি মরমী কবির তীব্র আকর্ষণ ও গভীর অনুরাগ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত কথা, অপূর্ব অনুভূতি "চোখ অনেক দেখে, তাই তাঁকে দেখে না"! চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশ হতে উৎসারিত যে ব্যথা, দেখেও যে না দেখার বেদনা—তারই শাব্দিক প্রকাশ যেন। দেখা শুধু চোখে নয়, সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করা, তাঁতেই ভরপুর হয়ে থাকা। বেদান্তের সার বাক্য 'জগৎ ব্রহ্ম' এই উপলব্ধিরই স্থায়িত্ব লাভ।

ছোটখাটো চেহারা আর বৃহৎ অন্তঃকরণের অধিকারী এই মানুষটিকে নিয়ে ঠাকুরের কত আশা ভরসা। প্রেরণা দিয়ে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছেন 'কর্মদেবী', 'সঙ্ঘমিত্রা' প্রভৃতি নাটক। পুরুষ চরিত্র বর্জিত নাটক 'কর্মদেবী' মাতা মনোমোহিনী দেবীর পরিকল্পনায় উৎসবের সময় মঞ্চস্থ হয়। আশ্রমের মেয়েদের প্রথম প্রয়াস এটি, তাই তাদের উৎসাহ দেওয়া, কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে নৃত্যগীতাদি সব কিছুর শিক্ষা ও পরিচালনার ষোল আনা দায়িত্বই বহন করেন হেমচন্দ্র।

পরের বছর মঞ্চস্থ হল 'সঙ্ঘমিত্রা'। অনভ্যস্ত, একান্ত ঘরোয়া মেয়েদের দিয়ে অত্যন্ত মঞ্চসফল এই নাট্যপরিবেশনার পিছনেও রয়েছে হেমচন্দ্রের সুদক্ষ নৈপুণ্য ও নিরলস পরিশ্রম। এমনি করে বছরের পর বছর চলল নিত্য নতুন পালা।

নাটক রচনার পর হেমচন্দ্র নিজে অভিনয় করে প্রথমে দেখাতেন ঠাকুরকে সেখানে উপস্থিত থাকতেন পুরুষোত্তমজননী মাতা মনোমোহিনী দেবী, সুশীলচন্দ্র বসু, ব্রজগোপাল দত্তরায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, রত্নেশ্বর দাশশর্মা, পঞ্চানন সরকার প্রমুখ। রচনার মধ্যে কোথাও মনস্তাত্ত্বিক অসৌকর্য বা ভ্রান্তি থাকলে ঠাকুর স্বয়ং তা নিয়ে আলোচনা করতেন, আর হেমচন্দ্র মহানন্দে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পুনরায় ঠাকুরের সামনে তুলে ধরতেন। একাধারে মানুষটি ছিলেন কবি, নাট্যকার, শিক্ষক, গায়ক, বাদক, নর্তক, অভিনেতা, পরিচালক, সর্বোপরি এক গভীর মনোযোগী ছাত্র।

কবি নিত্য সঙ্গ করেন ঠাকুরের, তাঁর কবিমনের সরস ভাবভূমিতে লীলাময়ের লীলা ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন রঙে আভাসিত হয়, আর নিত্যনতুন অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করে রাখেন বিভিন্ন ভাবে, কখনও কবিতায়, গীতিতে, কখনও বা নাটকে অথবা প্রবন্ধের মাধ্যমে।

অধ্যাপক পঞ্চানন সরকার একবার জিজ্ঞাসা করেন, — এতসব লিখে যে মজুত

করে চলেছেন, এসব ছাপা হয়ে বেরুবে কবে?

—ছাপা হয় হবে, না হবে, নেই। কী তোয়াক্কা রাখি আমি তার? ও ভাবনা আমার নয়। আমি লিখছি রাত্তির জেগে, খেয়ে না খেয়ে, ভিক্ষে করে টেমির কেরোসিন যোগাড় করে, কিন্তু কেন জানেন?

—কেন বলুন তো?

—না করে উপায় নেই বলে। এটাই এ রাজ্যের সব সত্যের উপরের সত্য, সব রসের সেরা রস। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বিরাট সৃষ্টি রচনা করে কী আনন্দ পেয়েছিলেন জানি না; কিন্তু আমার এ অফুরন্ত সৃষ্টির রসও যে অফুরন্ত, এটা জোর করেই বলতে পারি—সেখানে ব্রহ্মা ও বুঝি বা হার মেনে যান!

আক্ষেপের বিষয় এই বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির অধিকাংশই কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে।

হেমচন্দ্র নিজের গোত্র বলতেন না, কেউ তাঁর গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে শ্রীশ্রীঠাকুরের গোত্রের উল্লেখ করতেন। কারণ হিসাবে বলতেন, যে-গোত্রের বড়াই আমাকে উর্দ্ধ-সম্বেগী করে উন্নতির পথে অবাধ করে তোলে নি, বরং উৎসন্নের পথেই বেপরোয়া চলিত করেছে, জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে এ অবধি, এ হেন গোত্রের নাম আর এ মুখে না-ই বা নিলাম। তাছাড়া, দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ তো এক নব জন্ম আমার। সেই মহা ভয়ঙ্কর অতীতটা থাকে থাক মাথা গুঁজে, আমার এই বর্তমান সব কিছুর পিছনে, কিন্তু তার জেরটা আজ আর টানতে যাব কোন্ দুঃখে!

একবার ভরদুপুরে একদল দর্শনার্থী আসেন হিমাইতপুর আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে। দর্শনার্থীর দল হেমকবিকে দেখতে পেয়ে বলেন—দাদা, আপনাদের ঠাকুর দেখতে এলাম। হেমকবি বলেন—আমরা না হয় তাঁকে ঠাকুর বলি, ভগবান, মহাপুরুষ বলি, আপনারা সেসব না বলুন, অন্তপক্ষে একজন ভদ্রলোক বলে তো মানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—তাহলে বলুন তো, এমন ভরদুপুরে বিশ্রামের সময় কি কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা যায়? তিনি বিশ্রামের পর উঠুন, তখন দেখা হবে।

এরপর তাঁর অসাধারণ কথার যাদুজালে মুগ্ধ করে তাঁদের আটকে রাখেন তিনি বেশ কয়েক ঘন্টা। যখন বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে, তখন তাঁদের মধ্যে একজন বলেন—ঠাকুর কী এখনও ঘুমোচ্ছেন?

—আগে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিন আমায়, তারপর বলছি।

সিগারেটের প্যাকেট আসার পর মৌজ করে একটি সিগারেট ধরিয়ে হেমচন্দ্র বলেন—কী জানেন দাদা, ঠাকুর উঠেছেন অনেক্ষণ আগেই। তা এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, আপনাদের পক্ষে (নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে) এই

ঠাকুরই যথেষ্ট।

এরপর অবশ্য হাসতে হাসতে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করান।

রসরাজ হেমচন্দ্রের দৈহিক অসুস্থতাতেও অন্তরের সরসতার ঘাটতি হয়নি। ওষুধ খেতে চাইতেন না মোটেই; ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অসুস্থ কবিকে জিজ্ঞাসা করেন—ওষুধ খাচ্ছেন তো ঠিকমত? তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্যান কবি—ভেবে দেখলাম, ওষুধ খাওয়ায় যত কষ্ট, বেঁচে থাকায় তত সুখ নেই । ওষুধ আর খাই না তাই।

তাঁর শরীর তখন অত্যন্ত অসুস্থ, অপটু। সুধা-মা (পরবর্তীকালে কৃষ্ণপ্রসন্ন-জায়া) পড়তে যেতেন কবির কাছে। পড়া শেষ হলে হেমকবি অসুস্থ শরীরে লণ্ঠন হাতে এগোতে আসতেন সুধা-মাকে, আপত্তি করলেও শুনতেন না। শারীরিক অসুস্থতার জন্য যখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে স্বরচিত গান শোনাতে পারতেন না, তখন সুকণ্ঠী সুধা-মাকে সদ্য রচিত গান শিখিয়ে পাঠাতেন ঠাকুরকে শুনিয়ে আসতে। এমনি করেই অব্যাহত ছিল তাঁর নিত্য নিবেদন।

কবি বলতেন, জন্মজন্মান্তরের মহাপুণ্য, তাই সব কিছু নিয়ে চলতে চলতে শেষে তাঁরই পদপ্রান্তে এসে পড়েছি আমরা। লোকে তাই তো বলে, কোন কিছুর শেষ না দেখে সব ধারণাই আহাম্মকি। যেমন করে যা হোক করে আসি না কেন, শেষ পর্যন্ত অমৃতভাণ্ডে চুমুক দিয়ে ফেলতে পারলে আর কথা কী!

অমৃতভাণ্ড পান করে কবি যে অমৃতলোকে বিচরণ করতেন, তার সন্ধান মেলে তাঁর গানের মধ্যে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে তাঁর রচনার প্রায় সবই আজ হারিয়ে গেছে, তবু যা আছে, তা আজও মানুষের মধ্যে ভক্তিভাবের সঞ্চার করে, উদ্দীপ্ত করে মনকে। বিশিষ্ট আশ্রমিক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কবির একান্ত সুহৃদ। হেমচন্দ্রের সংগীতের প্রেরণার উৎস চিত্রণে তাঁর জবানীতে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত হল:

"একদিন গভীর রাতে হেমকবি এসে হাজির আমার কাছে। . . . হেমকবির কণ্ঠস্বর —ব্রজেনদা, ও ব্রজেনদা! একটা গীত রচনা করেছি। সুরও দিয়েছি। চলুন না, বাঁধের ধারে বসে গানটা গাওয়া যাক।

. . . আমরা দুই বন্ধু চললাম বাঁধের ধারে। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তরণ—আধখানা ভাঙা চাঁদ অতি কষ্টে কিছু আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাঁধের উপর বসলাম। পিছনে নিস্তব্ধ আশ্রম। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পদ্মার জলরাশি। দূরে দূরে "গহনার নৌকো" থেকে নক্ষত্রের মত ক্ষীণ আলোর দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। গৈরিক জলধারা ঢেউ তুলে বাঁধের গায়ে কলতান সৃষ্টি করে পশ্চিমের দিকে বয়ে চলেছে। দুই বন্ধু পা-দুটো নামিয়ে দিতেই শীতল জলস্রোত আমাদের পা ধুইয়ে বয়ে চলল। কবি গান ধরলেন —একটি কলি গাইতেই আমি গানটি গলায় তুলে নিলাম। আমাদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর

পদ্মার ঢেউয়ের উপর ভেঙে পড়ল। দ্বৈত কণ্ঠের মূর্চ্ছনা পদ্মার বাতাস বয়ে নিয়ে চলল অসীমের পথে—

তুমি কি রহিবে সাথে?
যবে, এ আবাস ছাড়ি বাহিরিব আমি
মরণ-আঁধার রাতে।
যবে, ব্যর্থ-বাসনা-প্রহত-চিত্ত দারুণ আর্তনাদে
নিরাধার মহা ভয়াল শূন্যে লুটাইবে অবসাদে;
তুমি কি তখন বাহু পসারিয়া
লইবে আমারে বক্ষে তুলিয়া
ফুটাইবে আলো হাসির কিরণে
উজ্জ্বল আঁখিপাতে . . .

... বেশ কিছুক্ষণ আপন ভোলা কণ্ঠে গান চলার পর আমাদের খেয়াল হল ঠাকুর কাঁধ দুটি স্পর্শ করে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা চমকে পিছনে ফিরলাম—গান থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর হেসে ফেললেন, বললেন—'একটা correction করবের হবিনি (একটা জায়গা শুধরে নিতে হবে)। "তুমি কি" হবে না, " তুমি যে" হবে। "তুমি যে রহিবে সাথে ", " তুমি যে তখন বাহু পসারিয়া"। আমি তো বারবার বলেছি—আমি থাকবো, থাকবো, থাকবো।"

১৩৪০ সালে স্বল্পায়ু কবির প্রতিভাদীপ্ত জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু পার্থিব জীবনাবসানে সত্তার নাশ হয় না, শাশ্বত এই সত্য কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর 'ব্যর্থ-বাসনা-প্রহত চিত্ত' 'মরণ আঁধার রাতে বাহির' হওয়ার বহু পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় সঙ্গের প্রসাদে সংহত, একাগ্র ও স্থির হয়ে গিয়েছিল। অতএব কবি বর্ণিত নিরাধার মহা ভয়াল শূন্যে একাকী অবসাদে তাঁকে থাকতে হয়নি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—মৃত্যুর সময় মানুষ যে চিন্তা নিয়ে চলে যায়, সেই চিন্তা ও চিৎকণায় আত্মা আবদ্ধ হয়ে থাকে। যার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত থাকা যায়, সেই অনুরাগ আর সব ভাবকে control করে, সেই অনুরাগের সঙ্গে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জড়িত ভাব নিয়েই মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি সুগভীর অনুরাগে পূর্ণ চিত্ত কবি হেমচন্দ্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে আনন্দের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্যারীমোহন নন্দী

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ — ২৯শে চৈত্র, ১৩৮৪

প্যারীমোহন নন্দী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অলোকসম্ভব ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু প্রতিভাবান সামাজিক সাফল্যে উজ্জ্বল মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর কাছে এবং তাঁর চরণাশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছেন। অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ সেসব মানুষ নিজেদের পরমপ্রাপ্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন জনে জনান্তরে স্বতঃ প্রণোদনায়; তাঁদের নানা বর্ণোজ্জ্বল কীর্তিকিলাপ রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। তাঁদের অসাধারণ বিশ্বাসদীপ্ত চলনের দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অগণিত প্রাণ। এঁদের কীর্তিকাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হয়ে অনেক জায়গায় প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু যেসব সর্বত্যাগী মানুষ অহোরাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে থেকে তাঁর যাবতীয় স্বস্তিবিধানের জন্য তৎপর থেকেছেন, প্রতিনিয়ত তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর একান্ত নিকটস্থ পরিপার্শ্বের সেবায় নিযুক্ত থেকেছেন, তাঁদের অনাড়ম্বর দৈনন্দিন চমকবিহীন জীবনযাত্রায় তেমন কোন নাটকীয় উপাদান নেই, যা সাধারণ্যে প্রচার লাভ করতে পারে। অথচ এঁদের নিরন্তর সতর্ক দৃষ্টি এবং সেবা-ই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যদিনের জীবনচলনাকে স্বস্তিদান করেছে। ডাক্তার প্যারীমোহন নন্দী এমনই একজন অপরিহার্য নিত্যসেবক।

অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত বারুজীবী পরিবারে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) প্যারীমোহনের জন্ম। পিতা প্রসন্নকুমার নন্দী ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। প্রসন্নকুমার ও স্বর্ণময়ীর তিন পুত্রের মধ্যে প্যারীমোহন কনিষ্ঠ, কিশোরীমোহন এবং কৃষ্ণমোহন যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম।

প্রসন্নকুমারের ব্যবসা কলকাতাতেও বিস্তৃত ছিল। কলকাতায় তাঁদের যে ব্যবসাস্থল ছিল, সেখানে থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোরীমোহন পড়াশুনো করতেন। তাঁদের পরিবারের মধ্যে একটি সুতীব্র ধর্মপিপাসার বাতাবরণ ছিল। কিশোরীমোহন বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মিশনের সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অনেকের সঙ্গেই তাঁদের পরিবারের বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, এবং অনেকেই তাঁদের বাড়ি যাওয়া আসা করতেন। সমগ্র পরিবারটিই ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। হয়তো মিশন থেকে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছাও ছিল তাঁদের, তবে ঘটনাচক্রে তখনও পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে ওঠেনি।

প্যারীমোহন কৃতিত্বের সঙ্গে বিদ্যালয় জীবনে সমাপ্ত করার পর ঢাকার সুবিখ্যাত মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান। সেখানে তাঁর

পরিচয় হয় সুবোধ দাস নামে এক সহপাঠীর সঙ্গে। নানা বিষয়ে দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা হত। প্যারীমোহনের অন্তরেও ছিল প্রবল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সদৃশ কোন আধ্যাত্মিক পরমপুরুষের সন্ধানে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হত। সুবোধ তাঁর আকুলতা লক্ষ করে তাঁকে জানান এক মহামানবের কথা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে তাঁর কাছে গেলে প্যারীমোহনের সমস্ত জিজ্ঞাসার অবসান ঘটবে। প্যারীমোহন একথা শুনে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাঁর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায়। মেডিক্যাল ফাইনাল পরীক্ষা তখন আগতপ্রায়। স্থির হলো, পরীক্ষা দিয়েই চলে যাবেন পাবনার হিমাইতপুরে, সুবোধের 'ঠাকুর'-দর্শনে। বাড়িতে চিঠি দিয়ে প্যারীমোহন জানালেন যে পরীক্ষা শেষ হলে হিমাইতপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-দর্শনে যাবেন, সেহেতু বাড়ি যেতে কয়েকদিন দেরি হবে।

উনিশশো বিশের দশকের মধ্যভাগ—আনুমানিক ১৯২৪ কিংবা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ। তরুণ প্যারীমোহন পৌঁছলেন হিমাইতপুরে। সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁর অনুভূতিটি হল—যেন কত যুগের পর নিজের জায়গায় এসে পৌঁছলেন। আশ্রমে তখন অবিশ্বাস্য বিপুল কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠার যুগ; অর্থ এবং পরিকাঠামোর সর্ববিধ অভাব সত্ত্বেও নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং উদ্দীপনার শক্তিতে আশ্রমে তখন বহু অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে রীতিমত কায়ক্লেশে দিন চলে আশ্রমিকবৃন্দের —কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে সে ক্লেশও আনন্দময় সকলের কাছে। প্যারীমোহনের নবীন প্রাণ সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। আশ্রমের অধিবাসী সকলের অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন, ঠাকুর-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ কোমল স্নেহ, আশ্রমের আশ্চর্য কর্মোদ্দীপনা, সবকিছুই তাঁকে মুগ্ধ, অভিভূত করে তুলল। সর্বোপরি আশ্রমের প্রাণ-কেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার অমৃত-স্পর্শে ঘটে গেল যেন জন্মান্তর! আশ্রম ছেড়ে, ঠাকুরকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার কথা তাঁর আর মনেই এল না। ওদিকে পিতা প্রসন্নকুমার তাঁর মেধাবী কনিষ্ঠ পুত্রের বিলেতযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছেন, সেখান থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ সমাপ্ত করে পুত্র প্রথিতযশা চিকিৎসকরূপে দেশবাসীর সেবা করবে—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। হিমাইতপুর আশ্রম এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্বন্ধে তখন নানাবিধ জনশ্রুতি ছিল—তাতে খ্যাতির চেয়ে অপবাদই ছিল বেশি। একটি বিশেষ প্রচলিত জনরব ছিল—অনুকূলচন্দ্র এবং তাঁর জননী সম্মোহনবিদ্যায় পারদর্শী, আশ্রমে কেউ গিয়ে পড়লেই তাকে সম্মোহিত করে স্থায়িভাবে বেঁধে ফেলেন আশ্রমের সঙ্গে। প্যারীমোহনের হিমাইতপুরে দীর্ঘদিন অবস্থিতি তাঁর পরিজনদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। অবশেষে পিতা প্রসন্নকুমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোরীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আশ্রমে যাওয়ার পরে সেখানকার সবকিছু সাক্ষাৎভাবে দেখে-শুনে-বুঝে,

ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা বহুশ্রুত সম্মোহন-বিদ্যার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলেন। বুঝলেন, সম্মোহনী শক্তির মূল স্বরূপ হল সীমাহীন ভালবাসা। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর সান্নিধ্যে আগত যে-কোন মানুষকে এমন ভালবাসতে পারেন, তেমন বুঝি মানুষ নিজেকেও ভালবাসতে পারে না। সুতরাং যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তার পক্ষে ঐ আশ্চর্য ভালবাসার অমৃত আস্বাদন একবার লাভ করার পরে আর তা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। অতঃপর প্যারীমোহন তো বটেই, তাঁর পিতা প্রসন্নকুমার এবং অগ্রজ কিশোরীমোহনও মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের মাধ্যমে সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন।

প্রসন্নকুমারের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীমোহনকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর অভিপ্রায়ের কথা জেনে বলেন—ওকে বিলেত পাঠানোর আপনার যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক মানুষের স্বস্তিবিধান, সে উদ্দেশ্য যদি এখানে এই আশ্রমেই সিদ্ধ হয়, তাহলে আপনার ওকে এখানে রাখতে আপত্তি নেই তো? প্রসন্নকুমার জানান যে সেরকম হলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। ঠাকুর তখন ভারী মধুর কোমল ভঙ্গিমায় আবদার করে তাঁর কাছে প্যারীমোহনকে চেয়ে নেন। প্রসন্নকুমার কনিষ্ঠ পুত্রকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে সমর্পণ করে ফিরে যান।

প্যারীমোহনের শুরু হল অন্য জীবন—এক অনন্য জীবন। নামধ্যান-সাধনভজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনই অধীত চিকিৎসাবিদ্যার বাস্তব প্রয়োগ হতে থাকে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ঠাকুর-পরিবারের এবং আশ্রমিকবৃন্দের চিকিৎসা তো করতেনই, আশেপাশের গ্রামেগঞ্জেও অসুস্থ আতুর মানুষের বলভরসা হয়ে ওঠেন ডাক্তার প্যারীমোহন। ঠাকুরের সাহচর্যে ও সদাসতর্ক নির্দেশনায় তাঁর মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হতে থাকে। চিকিৎসা পদ্ধতির বৈচিত্র্য, বিস্তার এবং গভীরতা—সবদিকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বোধিসম্পন্ন নির্দেশনায় ও পরামর্শে তাঁর দক্ষতা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে।

দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ প্যারীমোহন বিশেষ যে বাকপটু ছিলেন, তা নয়। খুব সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন সেবা ও কর্মের মূর্ত প্রতীক। প্রতি মুহূর্তে ঠাকুরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা এবং অন্যান্য নানাবিধ কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁর ইষ্টায়িত চরিত্র ফুটে বেরোত। ঠাকুরও কখনও শাসনে কখনও আদরে তাঁর এই নিত্য সহচরটিকে বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করতেন।

১৯৪১-এর এক শীতের সকাল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-বেষ্টিত হয়ে বসে ছিলেন। সে সময় প্যারীমোহন উপস্থিত হয়ে কথায় কথায় বলেন যে এক টাইফয়েড রোগীকে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে ঠাকুর-প্রদত্ত ফর্মুলায় প্রস্তুত 'এ্যাজামঞ্জিট' দিয়ে খুব উপকার

পাওয়া গেছে। শুনে ঠাকুর সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এ প্রসঙ্গে সুচিকিৎসা বিষয়ে প্যারীমোহনকে ঠাকুর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বলেন যে ভাল চিকিৎসক হতে গেলে রোগ এবং রোগীর বিষয়ে সম্যক বিশ্লেষণ প্রয়োজন; case-note বা চিকিৎসার বিবরণ নিজের মত করে লিখে রেখে মাঝে মাঝে সেগুলি পড়া, তা নিয়ে ভাবা এবং আরও ভাল ফল কীভাবে পাওয়া যেতে পারে তার উপায় চিন্তা করা দরকার। ঠাকুর আরও বলেন—বিভিন্ন শ্রেণীর অসুখের বিবরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে লিখে রাখলে দরকারমত খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। লিখে না রাখলে সব কথা মনে থাকে না। নতুন কিছু পড়লে তার মধ্যকার প্রয়োজনীয় অংশও লিখে রাখতে হয়। এছাড়া সহকর্মীদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একজন অপরজনের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারে।

প্যারীমোহন বলেন—শেখবার বুদ্ধি তো বড় কারও দেখি না, প্রত্যেকেই এক এক জন মাতব্বর। বললেও শুনতে চায় না, হীনম্মন্যতায় ভরা।

ঠাকুর কিন্তু এ কথার উত্তরে প্যারীমোহনের নিজের দায়িত্বই স্মরণ করিয়ে বলেন যে প্যারীমোহনের ভিতরে ছাত্রত্বের বোধ জাগরূক থাকা প্রয়োজন। তাহলে শ্রদ্ধা ও আগ্রহভরে অপরের কথা শুনে তার মধ্য থেকে গ্রহণীয় যা তা গ্রহণ করে তার বিহিত প্রয়োগে সুফল পাওয়া সম্ভব। এবং এভাবে কোন সুফল পেলে যে-ব্যক্তির কথা শুনে উপকার হয়েছে, সকলের কাছে তার উন্মুক্ত ভাবে প্রশংসা করলে তার মধ্যে কোন হীনম্মন্যতা যদি থেকেও থাকে, তা দূর হয়, এবং সে-ও তখন ছাত্রভাবে প্যারীমোহনের কাছ থেকে শুনতে বা শিখতে পারে। কিন্তু আগে নিজেকে নমনীয় করতে হয়, নিজে অনমনীয় হলে অপরকে নমনীয় করা যায় না।

প্যারীমোহন বলেন যে অনেকে ভুল পরামর্শ দিয়েও তাদের পরামর্শ গ্রহণ না করলে অহংবশত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ঠাকুর মাধুর্য-মণ্ডিত ধীর গম্ভীর ভঙ্গীতে বলেন—ভুল বলে যেটা বোঝ, সেটা গ্রহণ করতে যাবে কেন? কিন্তু সেখানে সরাসরি বিরোধিতা না করে, তোমার positive experience যেটা কারণসহ সেইটে মিষ্টি করে বলবে, with all respect to the person। ন্যায়সঙ্গত কথাও যদি তুমি অকারণ রূঢ় ও রাগতভাবে বল, তা মানুষ শুনতে চাইবে না। আবার নিজের মেজাজ ঠিক রেখে, অন্যের মেজাজের প্রতি লক্ষ রেখে খেলিয়ে-খেলিয়ে, রসিয়ে-রসিয়ে তুমি কিন্তু অনেক কথা বসিয়ে দিতে পার তার মাথায়। নিজের উপর নিজের লাগাম যদি ঠিক না থাকে, তাহলে আর কাউকে কিন্তু তোমার পথে আনতে পারবে না। তোমার পথে মানে কল্যাণের পথে, সত্যের পথে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথে, অভ্রান্তির পথে, বিজ্ঞানের পথে; আর, সে-পথ সবারই পথ। আমাদের অহং-এর খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ যেন আমাদের অনুসৃত সত্যপথ হতে বঞ্চিত না হয়। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'। মানুষের জানা যদি বিহিত বিনয়-সমন্বিত না হয়, তবে সে-জানা

দিয়ে সে অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও উচ্চেতিত করে তুলতে পারে না। বিনয় মানে বিশেষভাবে নিয়ে যাওয়া। তুমি তোমার পরিবেশকে তোমার জানার রাজ্যে যদি নিয়ে যেতে চাও, তবে প্রতিটি বিশেষকে বিশেষভাবে অনুধাবন করে বিশিষ্ট পথে ঘটিয়ে তুলতে হবে তা। বিদ্যা আছে, অথচ বিনয় অর্থাৎ বিনয়ন কৌশল নেই, তার মানে সে-বিদ্যা আয়ত্ত হয়নি তোমার। এই বিনয় মানে কিন্তু একটা নির্জীব নরম ভাব নয়। যেখানে, যখন, যে-ক্ষেত্রে, যার সঙ্গে যেমনতর ব্যবহার করলে তুমি তাকে তোমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যানুগ পন্থায় আনতে পারবে, তেমনতর আচরণটাই বিনয়। তাই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ নানাক্ষেত্রে নানারকম হতে পারে। তবে তার সঙ্গে থাকা চাই দরদ ও শ্রদ্ধা। তা কিন্তু সাধারণত মানুষের মনকে স্পর্শ করেই।

প্যারীমোহন জানতে চান—বিনয়ের expression নানারকম হতে পারে, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলেন—আমার নিজের কথাই বলি। সে ভারি মজার কাণ্ড হয়েছিল। তখন আমি ডাক্তারি করি। একবার এক রোগীর বাড়ি থেকে ক'দিন খবরও দেয় না, ওষুধও নিয়ে যায় না। অথচ বলবৎ রোগী। আমি ভেবে-ভেবে সারা। নিজে যে যাব, সে ফুরসতও নেই। ওরাও আসে না। উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। শেষটা তিন দিন পরে রোগীর বাড়ি থেকে ওষুধ নিতে এলো। লোকটাকে দেখে প্রথমে রোগীর খবর নিলাম, তারপর রেগে আমি এইসান গালাগালি শুরু করে দিলাম, সে আর কথা কবে কী? আমাকে তিনদিন ধরে এতখানি দুশ্চিন্তায় ভুগিয়েছে, আমিও মনের ঝাল মিটিয়ে বকলাম। যা মনে এলো, বললাম। সে-বলার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল তাদেরই মঙ্গল। আমার বকা খেয়ে সে বলে, 'বাবু ! আপনি আর একটু গালান। আমার ঘাট হইছে বাবু, আর এমন করব না। তবে গালমন্দ যে এত মিঠে লাগে আমার জানা ছিল না, আপনি আর একটু গালান। আপনার মুখে কথাগুলি কত ভাল শোনালো, আর কেউ আমাকে এমন কথা ক'লি তার ঘাড়ডা আমি ছিঁড়ে ফেলতাম না এতক্ষণ! কিন্তু আপনি কেমন সুন্দর করে কলেন।' তখন আমার মনে হলো পরমপিতা তাহলে আমাকে গালাগালি দিতে শিখিয়েছেন বটে। এখানে গালাগালিই কিন্তু তাকে ঈপ্সিত বোধে উপনীত করে দিয়েছে। তাই এটা বিনয়বহির্ভূত নয়। তবে এ বড় কঠিন ব্যাপার। পট করে যদি নকল করতে যাও, কেউ ঘাড়টাই ছিঁড়ে ফেলতে পারে। তবে এইটুকু লক্ষ রাখবে, যদি কোথাও তিক্ত কথাও বলা প্রয়োজন হয়, তা বলবে যথাসম্ভব হৃদ্য করে। চটে আত্মহারা হয়েছ কি আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারবে না, তখন আর মানুষকে পথে আনতে পারবে না। তোমার ক্রোধের সংস্পর্শে তারও ক্রোধের উদ্দীপন হবে। মনের যে-দরজা খোলা থাকলে মানুষ ভাল কথা মাথায় নিতে পারে, সে-দরজায় তখন কপাট পড়ে যাবে। তখন তুমি লাখ ভাল কথা কও, তা তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সে ভাববে, তুমি তাকে খাটো করবার জন্য

সব কথা বলছ। তাই, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে খুব হুঁশিয়ার।

প্যারীমোহন ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলেন—অতো হিসাব করতে গেলে তো কাজ করাই মুশকিল।

ঠাকুর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে বলেন—ঐখানেই তো বাহাদুরি প্যারীচরণ! ঐখানেই তো বাহাদুরি! 'প্যারীমোহন' নামটি আদর করে ঠাকুর 'প্যারীচরণ' করে নিলেন। এরপরে গুরুত্ব সহকারে একটু গম্ভীর স্বরে বললেন—কার্যক্ষেত্রে সংঘাতের মধ্যে পড়ে কার কতখানি মাথা ঠিক থাকে, সেইটেই তো চরিত্রের পরখ। আর, কাজের কোন মানে হয় না, সে-কাজের সঙ্গে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণবুদ্ধি না থাকে। সে কাজ তখন ভিতরে-বাইরে জঞ্জাল সৃষ্টি করে। নিরখ-পরখ ঠিক রেখে কাজ কোরো, দেখবে, সে-কাজে নিজেও শান্তি পাবে, অন্যকেও শান্তি দিতে পারবে। একদিনেই মানুষ নির্ভুল হয়ে যায় না, তবে ভুল সংশোধনের দিকে লক্ষ থাকলে আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে আসে। ইষ্টপ্রীতিকে লক্ষ করে কাজ করলে প্রত্যেকটা কাজ হয় তাঁর আরতি-বিশেষ। সেখানে অহমিকা বা প্রবৃত্তি বেশি মাথাতোলা দিতে পারে না। তাই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিরক্তি, দম্ভ, বিদ্বেষ স্বতঃই প্রশমিত হয়। মানুষ কঠোর, ক্ষিপ্র, অনন্তকর্মা হয়েও হয় নিরভিমান ও নির্বিরোধ। তাই বলে সে অন্যায়ের সঙ্গে কিন্তু আপোষ করে না, দৃপ্ত বিনয়ে প্রতিরোধ করে সেখানে। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য যা মানুষের অন্তরের জটিল অন্ধকারকে আলোকিত করে তোলে। তেমনি হলে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। তখন তোমাকে দেখে লোকে বলবে—যাদুকরের ছেলের মত প্যারী কত রঙ্গ জানে!

শেষ পংক্তিটি মাথা দুলিয়ে গানের মত সুর করে গাইলেন ঠাকুর। তারপর হেসে লঘু স্বরে বললেন—অনেক বকাইছ, এইবার ভাল করে এক কলকে তামাক খাওয়াও।

প্যারীমোহন দ্রুত তামাক সেজে দিলেন। অন্তর তাঁর ভরে গেল ঠাকুরের প্রীতিপ্রসন্ন সংশোধনী কথায়, মনে এল অনন্য আত্মবিশ্বাস।

আর এক বার একজন রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীমোহনকে বলেন—যে-সব complication আসেনি, অথচ আসতে পারে, সেগুলির পথ আগে থাকতে বন্ধ করে দিতে হয়। তাছাড়া রোগীর system টাও মোটামুটি বোঝা দরকার, যাতে একটা কষ্ট কমাতে গিয়ে আর একটা কষ্ট না বাড়ে। চারিদিকে নজর রেখে এমনভাবে treatment করতে হয়, যাতে সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। একদিক সামাল দিতে আর একদিক বেসামাল হয়ে গেল, সেটা সামলানো হল তো অন্যদিকে বেতাল হল, এভাবে একটার পর একটা ওষুধ চলতে লাগল, এ কিন্তু ভাল চিকিৎসকের লক্ষণ নয়। তাছাড়া অস্বাভাবিক জলদিবাজি বা ঢিলেমি, কোনটাই ভাল নয়। রোগকে কাবু করা ও ভিতরের শক্তি উজ্জীবিত করে

প্রকাশক: শান্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

তোলা—দু'দিকেই নজর দিতে হবে। চিকিৎসকের ব্যবহার এমন দরদী ও উদ্দীপনী হওয়া চাই যাতে রোগীর অন্তর্নিহিত curative urge flare up করে ওঠে।

এভাবে ঠাকুর প্যারীমোহনকে সবদিকে দক্ষ আদর্শ চিকিৎসকরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

দেওঘরে আসার কিছুকাল পরে ১৯৪৮-এর প্রথমদিকে প্যারীমোহন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর কোনমতে উত্থানশক্তি লাভ করামাত্র গাড়ি করে ঠাকুর-দর্শনে আসেন। অসুস্থ থাকার জন্য ঠাকুরের কাছে আসতে পারেননি এতদিন, অসুস্থতার যন্ত্রণার চেয়েও সে-যন্ত্রণাই যেন তাঁর বেশি। কোনক্রমে গাড়ি থেকে নেমে ঠাকুরের সামনে পৌঁছতেই ঠাকুর সোল্লাসে বলে উঠলেন—তুই আলি?

প্যারীমোহন অতি কষ্টে প্রণাম করলেন। স্নেহে ও মমতায় ঠাকুরের মুখখানি আর্দ্র হয়ে উঠল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা সবিস্তারে খোঁজ নিতে লাগলেন। কথায় কথায় প্যারীমোহন জানালেন যে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছেন না, শ্রবণশক্তি নষ্ট না হয়ে যায়!

ঠাকুর উদ্দীপ্তভাবে বলেন—তোর অতখানি vital urge and energy, তাই ঠিক আছিস। তোর মত অমন strong brain কজনের আছে? সোজা কথা? তোর কান যাবে কী করে? ঐ অবস্থায় তুই নাম করেছিস! . . . তোর মত কজন পারে? পরমপিতার দয়ায় তুই সেরে উঠলি বলে। আর তোর কত কাজ, তোর কি পড়ে থাকলে চলে? তাড়াতাড়ি ঠেলে ওঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বচন-শক্তিতে প্যারীমোহন তৎক্ষণাৎ যেন অনেকখানি উজ্জীবিত ও সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর চেহারা বদলে গেল। ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে প্যারীমোহন বললেন—আমার খুব অবনতি হয়েছে, নইলে ঠাকুরের কথা কখনও বিস্মরণ হবার মত হয়? মাঝে কিছুই যেন আমার মাথায় ছিল না। সবই যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

তা শুনে ঠাকুর সবিস্ময়ে বলেন—বলিস কী? শুনিস পরে—কী অসম্ভব কাণ্ড তুই করেছিস।...

ঠাকুরের মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল কিছুদিন ধরে; প্যারীমোহন জানতে চাইলেন, ঠাকুরের মাথাধরা কেমন আছে। ঠাকুর জানালেন—আছে, তুই ভাল হ।প্যারীমোহন বলেন—আমি ভাল হলে তো আপনার মাথাধরা কমবে না। ঠাকুর জবাব দেন—তুই ভাল হলে আমাকে ভাল করে দেখতে পারবি। ঠাকুরের অমন অন্তরঙ্গ আকুলতা এবং উদ্দীপনায় প্যারীমোহনের প্রাণশক্তি বহুলাংশে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

১৯৫০-এর এক গ্রীষ্মের সকালে ঠাকুর দেওঘরে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কয়েকটি বাণী প্রদান করছিলেন। সম্মুখে বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্যারীমোহন সেখানে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। ঠাকুর তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। প্যারীমোহন জানান যে কলকাতায় তিনি কতগুলি ওষুধের কথা লিখেছিলেন—সেগুলি ঠিক লেখা সত্ত্বেও তারা জানিয়েছে যে ভুল লেখার জন্য তারা ওষুধ পাঠাতে পারেনি। এভাবে তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঠাকুর মিষ্টি করে বলেন—মানুষ না পেরে দোষ দেয় ভগবানকে। তুই চটিস কেন? তোর ওপর দোষ দিয়ে ওরা বাঁচতে চায়।

এ কথা শুনে প্যারীমোহনের ক্ষোভ অনেকখানি প্রশমিত হয়। প্রসন্নভাবে বলেন — আমিও তো দোষ থেকে বাঁচতে চাই, কিন্তু যেখানে দোষ দেখি না, সেখানে দোষ শোধরাব কী ভাবে? তা সত্ত্বে অন্যে দোষ দিলে তাকেই বা বোঝাব কী ভাবে?

ঠাকুর আরও মধুর স্বরে বলেন,—তোর তা দিয়ে কাজ কী? তুই ভগবানের কোলে থাক।

এমন আদর-মাখানো কথায় প্যারীমোহনের সব বিরক্তি, ক্ষোভ দূর হয়, হাসিভরা মুখে সেখান থেকে বিদায় নেন।

ঠাকুরের পরিপার্শ্বস্থ অনেকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেদের বুঝটা পাকা করে নিতেন। ১৯৪৯-এর এক হেমন্তের বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তাপোষে বসে ছিলেন—সামনে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শরৎচন্দ্র হালদার, সুরেন বিশ্বাস, প্রফুল্লকুমার দাস প্রমুখ আরও কয়েক জনসহ প্যারীমোহনও। কোন্ কাজ মানুষ বাহবার প্রলোভনে করে এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। শরৎচন্দ্র হালদার কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে বাহবার প্রলোভন তাঁদেরও আছে। ঠাকুর তখন বলেন যে যতজনে বাহবা দিক, তাঁর অর্থাৎ ইষ্টের তৃপ্তিজনিত বাহবা পেতে ভাল লাগা ভাল।

শরৎচন্দ্র বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জানতে চান যে এমনিতে হয়তো কারও জন্য কিছু তিনি করেন না, কিন্তু ঠাকুরের কাছে বাহবা পাওয়ার লোভে তাঁকে দেখিয়ে লোকের জন্য যদি করেন, সেটা কেমন হয়?

ঐরকম চলনের মধ্যে ইষ্টকেন্দ্রিকতার অভাব এবং প্রবৃত্তির তাড়না থাকে বলে শ্রীশ্রীঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেন। এর পরে প্যারীমোহন বলেন—সুরেনদা (বিশ্বাস) আমার কাছে পাঁচটা টাকা চাইলেন, তাঁকে দিলাম না। আপনি তাঁর জন্য যখন চাইলেন, তখন দিলাম, এতে দোষ কী?

ঠাকুর নিষ্ঠাবান শিক্ষকের মত আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে বলেন—তার মানে আমি তোমার মধ্যে জীবন্ত নই। আমি তোমার প্রবৃত্তি-পূরণের ইন্ধন। আমি কষ্ট করে

তোমাকে বলব, তবে তুমি দেবে। আমার উপর টান থাকলে, তুমি সুরেন যখন প্রয়োজনপীড়িত হয়ে চাইল, সামর্থ্য থাকলে তখন তাকে না দিয়ে পারতে না। এই বোধের থেকেই সুরেনকে দিতে যে তার সত্তারূপে পরমসত্তাও বিদ্যমান। ঠাকুরকে ভালবাসা মানেই নিজের ও সবার সত্তাকে ভালবাসা ও পুষ্ট করা। যা-কিছু করবে, করবে আমার প্রীত্যর্থে। আমাকে বা লোককে দেখিয়ে করবার বুদ্ধি যদি হয়, তবে বুঝতে হবে আমাকে তুমি ভালবাসনি। আমার সম্বন্ধে কোন বোধ বা দরদ তোমার গজায়নি। তাই, আমার চলনও তোমার চরিত্রে ফুটে উঠছে কম। যে পরমপিতাকে ভালবাসে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসও অজ্ঞাতসারে সবার কল্যাণ করে। কারণ, পরমপিতা চান প্রত্যেকের সাত্বত কল্যাণ। . . . যখন মানুষের জন্য এইরকম বোধ ও সেবা জাগে, তখন সত্যিকার আত্মপ্রসাদ জিনিসটা আসে ; আমার ঠাকুর যেন তখন আমার ভিতরে জেগে থাকেন—আমার বিকশিত হৃৎপদ্মে—শান্তিতে, সুখে, হর্ষে। আমার স্বতোৎসারিত ইষ্টপ্রাণ সেবা নন্দিত করে তাঁকে নিত্যনিয়ত। তৃপ্তি পাই আমরা, তৃপ্তি পায় পরিবেশ। তখন জীবনটা যেন আনন্দে ফুটে ওঠে। এতে আত্মপ্রসাদ হয়, কিন্তু সেবার অহং আসে না। শক্তি আসে, সংহতি আসে, আসে সম্বর্ধনা। ছোট স্বার্থ ছুটে গেলে পরে দেখবে, এক ঝাঁকিতে কত যোজন পেরিয়ে যাবে।

এরপর আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পরে প্যারীমোহন পরিষ্কারভাবে জানতে চান—প্রত্যেক আমার ঠাকুরের প্রতিমূর্তি ভেবেই তো সেবা করা উচিত।

স্নিগ্ধ স্বরে ঠাকুর উত্তর দেন—গোড়ায় ঐ কথা ভাবা সবার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত নাও হতে পারে। ওটা পরে স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে ইষ্টানুরাগের সার্থক পরিণতি হিসাবে। ভাবতে হয় আমার ভিতরে ঠাকুর আছেন, তাঁর traits আছে, তিনি জীবন্ত আছেন। এই মানুষটি প্রয়োজনপীড়িত, এর জন্যে না করলে অন্তরের ঠাকুর আমার উপোসী থাকবেন। আবার, এভাবেও হয়—আমার ঠাকুর প্রত্যেকের কষ্টে ব্যথিত হন, প্রত্যেকের সেবা করেন, আমি যদি এর জন্য না করি, ঠাকুরের কষ্ট বাড়বে। তাই এর জন্য করাই আমার একান্ত কর্তব্য। তার ভিতর দিয়ে শিবজ্ঞানে জীব সেবা সত্যিকার হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সম্বোধি নিয়ে জেগে উঠবে।

এভাবে নানাদিক থেকে প্রশ্ন করে প্যারীমোহন পরম দ্রষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে জীবন-চলনার দিক্ নির্দেশ লাভ করেতেন।

আর একবার ঠাকুর-সন্নিধানে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে প্যারীমোহন উপস্থিত ছিলেন। ভক্তবর প্রফুল্লকুমার দাসের সদ্‌গুরুর লক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেন যে সদ্‌গুরুর প্রধান লক্ষণ—তিনি তাঁর গুরুতে সর্বতোভাবে সংন্যস্ত হবেনই। তাঁর করা, বলা এবং ভাবার মধ্যে ফারাক থাকে না। তিনি পূর্বতনদের প্রতি নিত্যপ্রণত এবং প্রতি-প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যশালী। অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করে তিনি মানুষকে সহজ পথে এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে তাদের চারিত্রিক বিকাশ

ঘটে। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করে তোলার দিকেই থাকে তাঁর সবচেয়ে বেশি ঝোঁক।

প্যারীমোহন জানতে চান যে কারও ভিতরে ঐসব লক্ষণ আছে কি না, তা বাইরে থেকে কীভাবে বোঝা সম্ভব।

ঠাকুর সহাস্য মুখে বলেন—নজর করলেই বোঝা যায়। সদ্‌গুরুর অহংটা হয় অত্যন্ত পাতলা। অপরকে সওয়া-বওয়ার শক্তি তাঁর থাকে অসীম। নিজের গুণগান করার অভ্যাস তাঁর খুবই কম থাকে। অপরকে বড় করাই তাঁর সুখ। আত্ম-প্রতিষ্ঠার বালাই তাঁর থাকে না। আদর্শ প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র ধান্দা।

এরপরে ললিত ভঙ্গিমায় গানের সুরে বলেন—তাঁর আছে অনেক নিশানা—নয়নে তাঁর যায় যে চেনা। তাঁর character হয় abnormally normal। তাঁরা যেন প্রকৃতির শিশু। তাঁদের মধুর ব্যক্তিত্ব মানুষকে স্বতঃই মোহিত করে।

ঠাকুরের ভাবে, ভঙ্গিতে, কথায় এমন প্রীতি, লালিত্য এবং গভীরতা ঝংকৃত হয়ে উঠল যে সমগ্র পরিবেশে তা সঞ্চারিত হয়ে গেল। উপস্থিত অন্যান্য সকলের সঙ্গে প্যারীমোহনের সত্তাও আবিষ্ট হয়ে উঠল অপরূপ ভাবতরঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় ছিল প্যারীমোহনের তত্ত্বাবধানে। তাঁর তামাক সেজে দেওয়া, সুপুরি এগিয়ে দেওয়া, জামাকাপড় গোছ করে রাখা, নখ কাটা, বিহিত সেবার মাধ্যমে তাঁর ঘুম আসতে সাহায্য করা—সব কিছুই ছিল প্যারীমোহনের নিত্য কর্ম। সম্ভবত অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং সূক্ষ্ম চেতনার দরুন ঠাকুরের ঘুম খুব সহজে আসত না। প্যারীমোহন কখনও পায়ে হাত বুলিয়ে, কখনও খুব মৃদুভাবে শরীরটি ঝাঁকিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াতেন। এক রাতে এভাবে অনেক চেষ্টাতেও ঘুম আসছে না। প্যারীমোহন ঘুম না আসার কারণ জানতে চাইলে ঠাকুর বলেন—পাঁচশ বছর পরে কাকে কোথায় রাখব তাই ভাবছি। সচরাচর অন্য কারও সামনে তিনি এরকম কথা বলতেন না—প্যারীমোহনকে যোগ্য আধার অনুধাবন করেই এমন অন্তরঙ্গ গূঢ় উক্তি তাঁর কাছে করেন।

সদ্‌দীক্ষা ও ইষ্টে যথাযথ অনুরাগের মাধ্যমে কীভাবে মানুষকে উজ্জীবিত করে উপযুক্ত করে তোলা যায়, সে-বিষয়ে ঠাকুর সমস্ত জীবন ধরে বহুবার বহুভাবে বলেছেন। একদিন এরকম আলোচনা চলাকালীন প্যারীমোহন বলেন যে পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। ঠাকুর প্রত্যুত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন—পরিস্থিতি তোমাকে তার মত করতে চেষ্টা করবে। তোমার বৈশিষ্ট্য হল তাকে তোমার সহায়ক করে নেওয়া। দম্ভ, ঘৃণা, অহমিকা, দ্বেষ, লজ্জা, ক্রোধ এসে চেষ্টা করবে তোমাকে আত্মসাৎ করতে। তোমার কাজ হল তাদের ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন করে তোলা। আর সেই হল তোমার পুরুষকার। প্রতি মুহূর্তে সজাগ হয়ে এইভাবে চলাকেই বলে ধর্মাচরণ। তাই ধর্মাচরণের মূল হল ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর চাইতেন, তাঁর মানুষ যারা তাদের কর্মপটুতা এবং তৎপরতা হয়ে উঠুক সমীহীন। তাদের অসীম ক্ষমতাধর দেখতে পেতে চাইতেন তিনি। ঠাকুরের নিয়ত সেবা এবং পরিপার্শ্বস্থ সকলের চিকিৎসা নিয়ে প্যারীমোহন সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকতেন। তা সত্ত্বেও ঠাকুর যখনই যে কাজের কথা বলতেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু একবার ঠাকুর-প্রদত্ত একটি কাজ সম্পন্ন করে উঠতে পারেননি। ঠাকুর তাঁকে দেখে আগ্রহের সঙ্গে উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করেন—কী রে! কাম হাসিল করেছিস তো? প্যারীমোহন বিব্রত হয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালেন—এখনও সময় পেয়ে উঠিনি।

ঠাকুরের মুখখানি একথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে উঠল, বললেন—আমার মনটা খারাপ করে দিলি। আমি তো জানি তোর সময়ের অভাব। তৎসত্ত্বেও যে আর একটা responsibility দিয়েছি, তার উদ্দেশ্য তোর efficiency ও power of quick execution যাতে বেড়ে যায়। তোরা ক্রমাগত বেড়ে চলেছিস, এইটে দেখতে পেলেই আমার খুব satisfaction হয়। সুবিধা-সুযোগের মধ্যে অনেকে অনেক কাজ করতে পারে। আমার দেখতে ইচ্ছে করে অসুবধিা সত্ত্বেও কে কত স্থিরমস্তিষ্কে তৎপরতার সঙ্গে কাজ উদ্ধার করতে পারে। আমার নিজের চরিত্রটাও ঐ রকম। বাধাবিঘ্ন বা অসুবিধাকে আমি কোনদিন ডরাইনি। তাছাড়া, পাঁচ মিনিটে যা পারি, তা আড়াই মিনিটে করা যায় কিনা দেখতাম। নিজেকে চাপের মধ্যে ফেলতে ভাল লাগত। সেইটেই যেন আমার আরাম। এখন শরীরটা অপটু হওয়ায় আগের মত পারি না।

ঠাকুরের বেদনা-বিমর্ষ মুখ দেখে এবং তাঁর কথাগুলি শুনে প্যারীমোহন মনে মনে নিজেকে আরও ক্ষিপ্রতর করে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

কেউ অসুস্থ হলে ঠাকুর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বারবার লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন রোগী কেমন আছে। প্যারীমোহন চিকিৎসা করতেন, তাই তাঁকে ডেকে বলতেন —তাড়াতাড়ি সারাতে পারছিস না কেন? প্যারীমোহন জবাব দিতেন—আমি তো সাধ্যমত চেষ্টা করছি, প্রত্যেকের কর্মফলও তো আছে। আমি কী করব?

ঠাকুর জোরের সঙ্গে বলতেন—মানুষের কর্মফল যদি কাটাতে না পারিস তাহলে কী হল? ঠাকুরের উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা দেখে সে-উদ্বেগের নিরসনের জন্য প্যারীমোহন আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে সুস্থ করে তুলতে। এর ফলে তাঁর মনঃসংযোগ আরও বেশি হত এবং সাফল্যও লাভ হত অধিকতর।

স্বল্পভাষী সেবক-প্রবর প্যারীমোহন ঠাকুরের নির্দেশ ছাড়া নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কাজে হাত দিতেন না; এমন কী, নিজের বা পরিবারের কোন প্রয়োজন হলেও ঠাকুর নিজে থেকে না বললে অন্যত্র কোথাও যেতেন না। ১৯৬৯-এর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঠাকুর প্যারীমোহনকে একদিন সকালে ডেকে পাঠালেন।

প্যারীমোহনের স্ত্রী সেসময় অসুস্থ ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন—বৌমার শরীর ভাল না, তুই বৌমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখা। ঠাকুরের শরীরও বেশ কিছুদিন যাবতই অসুস্থ ছিল, যদিও সেসময়ে শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল। তাই ঠাকুর বলা সত্ত্বেও প্যারীমোহনের ঠাকুরকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। তবু তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা গেলেন। অকস্মাৎ ২৭শে জানুয়ারির ভোরে পেলেন মহাপ্রলয়ংকর সেই ভীষণ সংবাদ—শ্রীশ্রীঠাকুর ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। দ্রুত ছুটে এলেন দেওঘরে, তবে তার আগেই সে ঐশী তনু মহাগ্নিতে বিলীন হয়ে গেছে। সমগ্র সৎসঙ্গ জগতের সঙ্গে প্যারীমোহনও মূহ্যমান হয়ে বিপুল শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন। কিন্তু তার মধ্যেও অনুভব করলেন—পরম দয়াল অশেষ করুণায়ই তাঁকে শেষ মুহূর্তে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাহলে যেভাবে বিশেষ কোন উপসর্গ ছাড়াই ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ ঘটে, চিকিৎসক প্যারীমোহনের উপস্থিতিতে সেরকম ঘটলে চিকিৎসার ত্রুটির দায়ে হয়তো সকলের চোখে তিনি চির-অপরাধী হয়ে থাকতেন। এমন কী, তিনি নিজেও হয়তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেন না।

এর পরে আরও নয় বছর ছিলেন প্যারীমোহন। পরম প্রেমময়ের স্মৃতিবিজড়িত পরিমণ্ডলে দেওঘরেই তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত হয় ঠাকুর-পরিবারের এবং আশ্রমিক ও অনাশ্রমিক বহু মানুষের চিকিৎসাকর্মের মধ্য দিয়ে। ঠাকুর তাঁকে তাঁর পিতার কাছ থেকে যে-প্রতিশ্রুতি দান করে চেয়ে নিয়েছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে তা-ই রূপায়িত করে গেছেন প্যারীমোহন। ১৯৭৮-এর ১২ই এপ্রিল অল্প রোগভোগের পরে দেওঘরে তাঁর ঐহিক জীবনের অবসান হয়—প্রিয়পরমের চরণে চির-আশ্রয় লাভ করেন তাঁর নিত্য সেবক।

পঞ্চানন সরকার

৩রা অগাষ্ট, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ — ২৩শে মে, ১৯৭৫

পঞ্চানন সরকার

মানুষের সপরিবেশ বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার পক্ষে যা কিছু সহায়ক, তা-ই ধর্ম, আর তার বিরোধী যা, তা অধর্ম—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রদত্ত ধর্মের এই অভিনব ব্যাখ্যা 'ধর্ম' শব্দটিকে প্রচলিত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করেছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের সমগ্র জীবনই ধর্মের অধিকারভুক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর জীবনধর্মের প্রধান তিনটি ভিত্তিস্তম্ভকেও চিহ্নিত করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে; মানব-সৃজন ও মানব-গঠনের এই তিনটি স্তম্ভ হল বিবাহ, দীক্ষা ও শিক্ষা। ঠাকুরের সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিতে ও চিন্তায় শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষাদর্শের ব্যাপারে তাঁর বিশদ চিন্তা তৎরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে, কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তরে, বিশেষত 'শিক্ষা-বিধায়না' গ্রন্থে বিধৃত আছে।পাবনার হিমাইতপুর আশ্রমে ঠাকুরের শিক্ষা- সংক্রান্ত ভাবনা বহুলাংশে রূপায়িত হয়েছিল মূলত অধ্যাপক পঞ্চানন সরকারের মাধ্যমে, বাস্তব প্রয়োগে। সেই সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে অধ্যাপক নিজেকে তৈরি করেছিলেন শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ক'রে;তাঁর জীবনালেখ্য ছাত্র তৈরির ইতিহাস নয়, এক শিক্ষকের আত্মগঠনের অভিনব বিবরণ। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে সে-কাহিনী চিরন্তন হয়ে থাকবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অধীন বরিশাল জেলার হবিবপুর গ্রামে কাশীনাথ সরকারের পুত্র পঞ্চাননের জন্ম ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট। বরিশালেই শিক্ষাজীবনের শুরু তাঁর। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পড়াকালীন পঞ্চানন মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত ও অন্যান্য খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। অসাধারণ মেধাবী এই ছাত্রটি তাঁদের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। বরিশাল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম. এ. হন তিনি। একান্ত অল্প বয়স থেকেই পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত নানা বিষয়ে বহু বই ও পত্রপত্রিকা তাঁর নিত্যপাঠ্য ছিল। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পরে খুলনা জেলার বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্যগুণে পিতা পঞ্চাননের জীবনে ছিলেন আদর্শস্বরূপ, এক অনন্য আশ্রয়স্থল। তাই তাঁর প্রয়াণে পঞ্চানন মানসিক ভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, শূন্যতা ও অস্থিরতায় হৃদয় জর্জরিত হয়ে ওঠে।

তাঁর অগ্রজ অমৃতলাল আশৈশব সাধুসন্ন্যাসীসঙ্গ-পিয়াসী ছিলেন, গৈরিক বসনধারী যে-কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেই তাঁকে সমাদরে নিজ গৃহে নিয়ে আসতেন। অমৃতলাল এবং পঞ্চানন, উভয়েরই অধ্যাত্ম সন্ধান ছিল প্রবল। বিশেষত পিতৃ-বিয়োগের শূন্যতায় উভয়েই সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একদিন

এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে দেখে বিশেষ সম্ভ্রমের উদ্রেক হওয়ায় উভয়ে সস্ত্রীক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই সে দীক্ষা অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতীয়মান হয়। এরপরে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ফকিরকে দেখে ও তাঁর সুন্দর তত্ত্বপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে দু'ভাই তাঁর কাছে পঞ্চরসিক মতে দীক্ষা নেন। কিন্তু অল্পদিন পরে ঐ সম্প্রদায়ের এক উৎসবে উপস্থিত হয়ে সেখানকার অন্যান্যদের কুরুচিকর আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে পথও পরিত্যাগ করেন তাঁরা। অমৃতলালের অবশ্য এতেও অনুসন্ধিৎসায় ছেদ পড়ে না, তিনি সদ্‌গুরুর আশায় বেশধারী সাধুসন্ন্যাসীসঙ্গ করেই চলেন। কিন্তু পরপর দু'বার এভাবে প্রতারিত হওয়ায় পঞ্চাননের অন্তরে তীব্র নঞর্থক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—যে-কোন ধর্মগুরু সম্বন্ধেই বিদ্রূপাত্মক অনীহা দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। ফলতঃ তিনি সাধারণ সনাতন মূল্যবোধের দ্বারা লালিত ও স্থিরীকৃত যে-সব সংযত আচরণবিধি, স্বেচ্ছায় তা লঙ্ঘন করে বিপরীত পথে যেতে শুরু করেন। বস্তুত প্রকৃত বস্তু লাভের অপ্রাপ্তি জনিত হতাশাই তাঁকে এমন অস্থির করে তুলেছিল। সহজাত মেধাবলে যে-কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-লাভ ছিল তাঁর পক্ষে অনায়াসসাধ্য। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে তাতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে কুষ্টিয়ায় এসে চিকিৎসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই যশ ও প্রতিষ্ঠা, দুই-ই প্রাপ্তি হয় তাঁর। কিন্তু প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে, ফলে কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতায় আসেন জীবিকার সন্ধানে। নতুন জায়গায়, বিশেষত কলকাতার মত বড় শহরে চিকিৎসকরূপে পশার জমাতে কিছু সময় লাগতে পারে মনে করে তিনি ছাত্র-অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁর মত বহু শাস্ত্র-পারঙ্গম পণ্ডিত ব্যক্তির অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না; অচিরেই সারাদিন কেটে যেতে লাগল পড়ানোর কাজে। কিন্তু অন্তরের শূন্যতা ও অস্থিরতা দূর হল না। সন্ধ্যার পর থেকে অখণ্ড অবসর এবং সে অবসর তাঁর কাছে হয়ে উঠল অভিশাপ। একদিকে শূন্যতা, হতাশা এবং তজ্জনিত 'যা-খুশি-তাই' করার বেপরোয়া ঝোঁক, অপরদিকে পিতার অলক্ষ্য আদর্শবাদের অনুশাসন ও শিক্ষকতার সুনাম, উভয়ের দ্বন্দ্বে যন্ত্রণায় পীড়িত, দগ্ধ হতে লাগলেন পঞ্চানন অবসরের প্রতিটি মুহূর্তে; সারারাত্রি ঘুমোতে পারতেন না, ছুটে বেরিয়ে পড়তেন পথে, অস্থির পদচারণায় কাটত বিনিদ্র রজনী। এ সময়ে দৈনিক বসুমতীতে রাত্রিকালীন সম্পাদকের কাজ পেয়ে গিয়ে কর্মব্যস্ততায় অবসর-যন্ত্রণার কিছু সমাধান হলেও মানসিক যন্ত্রণার নিরসন হয় না; কাজের মধ্যে প্রবলভাবে ডুবে থেকেও একরকমের হাল ছেড়ে দেওয়া হতাশা অন্তরে পোষণ করতে করতে বয়ে চলে পঞ্চাননের জীবনতরী।

ইতিপূর্বে কুষ্টিয়া থাকাকালীন সেখানকার হোমিও চিকিৎসক জ্ঞানচন্দ্র প্রামাণিকের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একখানি প্রতিকৃতি দেখে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি পঞ্চাননকে আকৃষ্ট করে। জ্ঞানচন্দ্র তখন অনতিদূরেই হিমাইতপুরে অবস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার দর্শন করে আসার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালে তিনি

তৎকালীন মানসিকতা অনুযায়ী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতেই ঠাকুর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। পরে বাড়ি গিয়ে দাদা অমৃতলালের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই তিনিও বিরূপ-ভাবে বলেন যে ঠাকুর সম্বন্ধে অনেকের কাছেই তিনি নানা বিরুদ্ধ কথা শুনেছেন; ঠাকুর এবং তৎজননী মনোমোহিনী দেবী নাকি যাদু শক্তির অধিকারী, যে-কেউ এঁদের আওতায় গিয়ে পড়লে এঁরা তাকে বশীভূত করে ফেলেন। প্রতিভাধর বিজ্ঞানী কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাঁদের কাছে গিয়ে একেবারে বশীভূত হয়ে গেছেন, অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্পন্ন জীবন ত্যাগ করে গ্রাম্য আশ্রমে মেষতুল্য জীবনযাপন করছেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন পঞ্চাননেরই সমসাময়িক এবং পরিচিত ছিলেন। দাদা আরও বলেন, সদ্‌গুরুর সন্ধানে আর নিজেদের ছোটাছুটি করে লাভ নেই, অদৃষ্টে থাকলে তিনি স্বয়ং এসে ধরা দেবেন। এর ফলে সে-যাত্রায় পঞ্চানন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন প্রয়াসে নিরস্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর জীবনে পরমপ্রাপ্তির লগ্নটি তখনও আসেনি।

কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর বন্ধু ঈষদানন্দ বিশ্বাস একদিন এসে বলেন যে তিনি একবার পাবনা সৎসঙ্গে যাবেন বলে স্থির করেছেন। তা শুনে পঞ্চানন তাঁকে ভাল করে না জেনেবুঝে ঝোঁকের মাথায় দীক্ষা না নিতে পরামর্শ দেন। এও বলেন যে সব দেখেশুনে যদি ভাল মনে হয়, তবে বরং দু'বন্ধু একসঙ্গে দীক্ষা নেওয়া যাবে। ঈষদানন্দ বিশেষভাবে কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করে জানান যে অমন বেহিসাবী মদ্যপ কবি নিজেকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করে এখন সপরিবারে আশ্রম-নিবাসী, এ ঘটনা তাঁকে বিশেষ আলোড়িত করেছে। এ ঘটনা পঞ্চাননেরও জানা ছিল।

ঈষদানন্দ চলে যাওয়ার পরে এক রবিবার পঞ্চানন ছুটির দিনের বিড়ম্বনা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে আপার সার্কুলার রোডের এক মেসে বন্ধুবান্ধবদের তাসের আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ঘটনাচক্রে কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অমনি পঞ্চাননের তার্কিক বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—অধ্যাত্ম অনুভূতি প্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রসন্নের সঙ্গে জুড়ে দেন তীব্র বিতণ্ডা। সবিস্ময়ে এও লক্ষ করেন যে কৃষ্ণপ্রসন্নকে আদৌ বশীকৃত মেষ বলে বোধ হচ্ছে না, বিপরীতে তাঁর উজ্জ্বলতা এবং প্রখরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা-হোক, তর্কাতর্কি হতে হতে বেলা সাড়ে দশটা বেজে যাওয়ায় কৃষ্ণপ্রসন্ন অন্যত্র কাজ আছে বলে চলে গেলেন। কিন্তু তর্কপ্রিয় পঞ্চানন তখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কার ওপরে বাকি ঝালটুকু ঝাড়া যায়। ঠিক তখনই ঐ মেসে কানাই নামে একটি তরুণ জানায় যে মহারাজ নামে ঠাকুরের এক বিশিষ্ট ভক্ত এসেছেন কলকাতায়, অখিল মিস্ত্রী লেন-এ উঠেছেন, যে-কোন মানুষকে অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের মতে এনে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখেন ভদ্রলোক। পঞ্চানন তা শুনে লাফিয়ে উঠলেন একজন উপযুক্ত তর্কসঙ্গীর আশায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই গিয়ে হাজির হলেন অখিল মিস্ত্রী লেন-এর সেই বাড়িতে। ঘরে প্রবেশ করে কম্বলের আসনে উপবিষ্ট এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোককে দেখতে পান। আশেপাশে উপবিষ্ট ছিলেন আরও কয়েকজন। তিনি ঘরে ঢোকামাত্র ঐ দীর্ঘদেহী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁকে

অ্যাপায়ন জানান; তিনি রূঢ় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন—'মহারাজ' বলে এখানে কে আছেন, আগে তাই বলুন তো! এই রূঢ়তার প্রত্যুত্তরে স্মিত কোমলতায় ভদ্রলোক বলেন—দাদারা আমাকেই 'মহারাজ' বলে থাকেন; তবে মহারাজ বলতে যা বোঝায়, আমি তার কোন্‌টাই কিন্তু নই দাদা! এবারে আসল পরিচয় দিই,—আমার নাম শ্রীঅনন্তনাথ রায়, সাকিন হিমাইতপুরের পাশের গ্রাম কাশীপুর। আমার সাজা তামাক ঠাকুর ভালবাসতেন, তাই থেকে আমার ইয়ার বন্ধুরা আমাকে আদর করে বলতেন, "তামাক সাজার মহারাজ।" তারপর ব্যাঙাচির যেমন ল্যাজ খসে যায় বড় হলে, সেরকম আমার বেলাতেও 'তামাক সাজার' কথাটি খসে গিয়ে শুধু মহারাজটুকুতে এসে ঠেকেছে—এই আর কী! (মহারাজ কৌতুকচ্ছলে নিজের সম্বন্ধে এভাবে বললেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই তাঁকে 'মহারাজ' অভিধা দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—সন্তমতের পূর্ব পূর্ব গুরুদের নামের সঙ্গে 'মহারাজ' শব্দ যুক্ত দেখা যায়, যেমন, স্বামীজি মহারাজ, হুজুর মহারাজ প্রভৃতি; অনন্তনাথও ঐ জাতীয় একজন সাধক, সুতরাং তাকেও মহারাজ বলে ডাকা উচিত।)

তাঁর কথার ভঙ্গীতে উপস্থিত সকলে—পঞ্চাননও—হেসে ওঠেন। এঁর কথা বলার ধরনটি মনে ধরে পঞ্চাননের, ভাবেন এঁর সঙ্গে বোধহয় মন খুলে কথা বলা যায়। সে-কথা প্রকাশ করতেই অনন্ত মহারাজ তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পঞ্চাননও শুরু করেন তাঁর কূটতর্ক বাধাহীন, দ্বিধাহীনভাবে। অনন্ত মহারাজের অসীম ধৈর্য এবং উৎসুক আগ্রহ, কখনও মধ্যপথে হস্তক্ষেপ না করার সংযম, তাঁর প্রসন্ন সহৃদয় পোষকতায় পঞ্চানন মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারেন না; আরও বিস্মিত হন তাঁর আশ্চর্য সমাধানী শক্তিতে। তাঁর স্থৈর্য, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর জ্ঞান, অনন্য বাচনভঙ্গী সবই পঞ্চাননের তৃষিত সত্তার উপরে যেন এক মোহন প্রলেপের কাজ করে। কিন্তু সহজে কিছু মেনে নেওয়ার মানুষ তিনি নন। একদিন নয়, দু'দিন নয়, পরপর দশ দিন একাদিক্রমে এই তর্কযুদ্ধ চালান তিনি অদ্ভুত এক অহং-প্রদর্শন অভিলাষে—কিন্তু অবশেষে শান্ত, স্থিতধী, অসাধারণ সেই মহারাজের কাছে পরাভব স্বীকার করেন তিনি। তবে এ পরাজয়ে কোন গ্লানি নেই, আছে পরম গৌরব। এই তর্কযুদ্ধ চলাকালীনই ঈষদানন্দ হিমাইতপুর থেকে ফিরে পঞ্চাননের কাছে এসে ঠাকুর এবং তৎজননী সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগে ভালবাসায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। পঞ্চাননের বক্র দৃষ্টিতে অবশ্য মনে হল—শৈশবে মাতৃহীন ঈষদা একটু আদরযত্ন পেয়েই অতিরিক্ত বিগলিত হয়ে পড়েছে।

যাহোক, অনন্ত মহারাজের কাছে অবশেষে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা হয় পঞ্চাননের — যদিও অহংয়ের তাড়না তখনও যথেষ্ট প্রবল। কানাইয়ের মাধ্যমে মহারাজের কাছে দীক্ষার অভিলাষ ব্যক্ত করেন তিনি এক শর্তে—তিনি দীক্ষা নেবেন গোপনে এবং তিনি যে দীক্ষা নিলেন, একথা এখনই কারও কাছে প্রকাশ করা চলবে না। সেসময় তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী কলকাতায় তাঁর কাছে এসে ছিলেন, বাড়ি ফিরে তাঁকে জানালেন

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

যে তিনি দীক্ষা নিচ্ছেন এক জায়গায়, তবে আগে তিনি দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন দেখে বুঝে তারপর ভবতারিণীর দীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

দীক্ষার পরে যথাবিধি নামজপ ও ধ্যান শুরু করেন মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী। এক্ষেত্রেও ঠাকুরের ছবি সম্মুখে রেখে তাঁরই ধ্যান করতে হবে শুনে একজন মানুষের ধ্যান করার কথায় পঞ্চানন কিছুটা বিরূপ ভাব প্রকাশ করেন। মহারাজ তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের ধ্যেয়, কিন্তু তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিলেন, একইভাবে ঠাকুরও তৎপর্যায়ভুক্ত মানুষ এবং বর্তমান পুরুষোত্তমরূপে তিনিই ধ্যেয়। দীক্ষা গ্রহণের পরে পঞ্চাননের শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত, রিক্ত প্রাণে নবীন আশা, নব চেতনার উন্মেষ হতে লাগল, চতুষ্পার্শ্বস্থ অপ্রীতিকর হতাশাদ্যোতক সবকিছুই কী এক অজানা প্রীতির মুকুলে ভরে উঠতে লাগল।

কিন্তু ঠাকুরকে তখনও প্রত্যক্ষ করা হয়নি, ধ্যান যেন ক্রমে কিছুটা নিষ্প্রাণ হয়ে আসতে থাকে। অনন্ত মহারাজ কিছুদিন পর হিমাইতপুর ফিরে গেলেন—যাওয়ার সময় একবার ঠাকুর-দর্শনে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে গেলেন তাঁকে। ইতিমধ্যে হেমকবি (মুখোপাধ্যায়) একবার কলকতায় আসেন। কবিকে পঞ্চানন আগে থেকে চিনতেন —তাঁর উচ্ছৃঙ্খল, বেহিসাবী জীবন, মদ্যপ চরিত্র আবার অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য, সবকিছুই জানা ছিল। কিন্তু এবারে কলকাতায় যাঁকে দেখলেন তিনি যেন এক অন্য মানুষ। বর্তমানের হেমকবির এই আমূল পরিবর্তিত সত্তা পঞ্চাননকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেসময় কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে আমন্ত্রিত হয়ে হেমকবি 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূলসূত্র'—এই বিষয়ের উপর সপ্তাহব্যাপী অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার পঞ্চানন বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশ করায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন—পঞ্চাননও এককথায় বসুমতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

মহারাজ কলকাতা থেকে চলে যাওয়াতে পঞ্চাননের সব কিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল, কলকাতা যেন আকর্ষণহীন হয়ে পড়ল তাঁর কাছে। অবেশেষে ১৯২৬ এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হিমাইতপুর রওয়ানা হন। কুষ্টিয়া থেকে নৌকায় বাজিতপুর হয়ে সেখান থেকে হিমাইতপুর যেতে হত। পথে কুষ্টিয়াতেই আলাপ হল অবিনাশচন্দ্র পাল নামক শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভক্তের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে উঠে বসলেন বাজিতপুরের নৌকায়। খানিকক্ষণ পরে অকস্মাৎ পদ্মাবক্ষে ঝড় উঠল; পদ্মার বুকে ঝড়ের ভয়াবহতা অচিন্তনীয়—ঝড়ের বেগে নৌকা একদিকে কাত হয়ে গেল, চরম সর্বনাশের আশঙ্কায় যাত্রীরা চিৎকার করে উঠল, মাঝিদের মুখও গেল পাংশু হয়ে। শুধু ঠাকুরের দুই ভক্ত শান্তভাবে নাম করে চললেন; পঞ্চাননের মনে এক গভীর প্রত্যয় জন্মালো—ঠাকুর আছেন, তিনি রক্ষা করবেন। অকস্মাৎ পদ্মার বুকে এক অদৃশ্য চরে ঠেকে গেল নৌকা, রেহাই পাওয়া গেল অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

হাত থেকে। ঝড় থামলে নৌকা বাজিতপুর পৌঁছল।

হিমাইতপুর পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় সেদিন আর ঠাকুর দর্শনে গেলেন না পঞ্চানন। বিশেষত শুনলেন, ঠাকুরের শরীর অসুস্থ, ঘুসঘুসে জ্বরে ভুগছেন বেশ কিছুদিন। পরদিন সকালে সৎসঙ্গের তদানীন্তন সেক্রেটারি সুশীলচন্দ্র বসু তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর সেসময় ভক্তপ্রবর বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে ছিলেন। বারান্দায় চৌকিতে অর্ধশায়িত শ্রীশ্রীঠাকুর, হাতে একখানি ছোট পুঁথি। পঞ্চাননের মনে হয়, জ্ঞানচন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুরের যে ছবি দেখেছিলেন, তাতে কেমন সুন্দর চেহারা দেখেছিলেন, এখন তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না তো! চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত উজ্জ্বল হলেও চোখের কোল ঘিরে কেমন কালো কালো রেখা। হঠাৎই তখন ঠাকুর হাতের বইটির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন— বাঃ, এটাও তো বেশ সুন্দর কবিতা!

'দূরে থেকে দেখা যায় ভালো,
কাছে গেলে রেখা কালো কালো!'

একথা শুনে তাঁর তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে ঠাকুরের পঠিত ছড়ার হুবহু মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান পঞ্চানন;ভাবেন, এই কি তবে অর্ন্তযামিত্ব?

ইতিমধ্যে সুশীলচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বসে পড়েছেন সামনে। পঞ্চানন বিস্ময়ের ঘোরে প্রণাম করতেও ভুলে যান; পরমুহূর্তে ভাবেন, তাঁকে তো এখানকার কেউ চেনে না, এখন বরং চুপি চুপি চলে গিয়ে পরে এসে ঠাকুর-প্রণাম করলেই হবে। ভাবমাত্রই ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে বলেন,—আপনি তো প্রফেসারি করেন, তাই না দাদা! ঠাকুরের কথায় স্বস্তি পেলেন তিনি, উত্তর দিলেন—করতাম, ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে সম্মুখে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটিও কথা না বলে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পঞ্চাননের কী যে হল তিনি নিজেও জানেন না—অনর্গল বলে যেতে লাগলেন নিজের এতদিনকার সঞ্চিত যত বেদনা-অবসাদ-হতাশা-অভিমানের কথা—যেন হঠাৎ মুক্তি পাওয়া ঝর্ণার মত ঠাকুরের পায়ের কাছে ঝরে পড়ল তাঁর অবরুদ্ধ যন্ত্রণার স্রোতস্বিনী। ঠাকুর নীরবে আশ্চর্য গভীর চোখ দুটি মেলে শুনে যেতে লাগলেন তাঁর সব কথা। কথা শেষ হয়ে এলে পঞ্চানন আত্মগত আফশোষের সুরে বলে ওঠেন—এখন আর আমায় দিয়ে কী হবে!

একথা শোনামাত্র ঠাকুর শায়িত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে বসে ধমকের সুরে বলেন,—নিজের ভাবনা যদি নিজেই এত ভাববেন, তবে আমি আছি কী করতে? আমি যদি কিছু হই-ই আপনার, তবে নিজেকে এতটা নিঃসহায় ভাবা কি চলে নাকি আর? তাছাড়া এখানে যে এসে পড়েছেন, তাও কি আপনার নিজের ইচ্ছায়? কেউ যদি টেনেই এনে থাকেন আপনাকে, তাহলে সবকিছুর চাবি-কাঠি তো

তাঁরই হাতে—আর তাঁর ইচ্ছায় অঘটনও তো ঘটতে পারে চোখের পলকে। আমার কথায় এতটুকু আস্থা রাখাও কি শক্ত মনে করেন আপনি?

সেই গভীর সুপ্রত্যয়ী তিরস্কারে পঞ্চাননের অন্তরের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ-গ্লানি ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত কোথায় উড়ে গেল, পলকে উধাও হল মনের গ্লানিমা—এক অপরূপ নিশ্চিন্ততায় মন ভরে উঠল কানায় কানায়। তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট ফুটে উঠল তাঁর অন্তরের অবস্থা। তখন ঠাকুর সুশীলদাকে লক্ষ্য করে বলেন—উদ্ধার-উদ্ধার করে এতটা ব্যস্ত না হয়ে মানুষ যদি একটু বিশ্বাস করত সুশীলদা, তাহলে উদ্ধার কিন্তু আপনি এসে হাজির হত, না চাইতে। সহজ অবস্থায় মানুষ কিন্তু এ সহজ পথে পা বাড়াতে চায় না, অথচ নদীর মাঝে ভীষণ ঝড়ে যখন নৌকা ডুবু-ডুবু, তখন মানুষ কেমন অক্লেশে বিশ্বাস করে ফেলে, আর প্রাণপণে চালিয়ে যেতে থাকে নাম। এদিকে নামের অন্তরে তো রয়েছেন নামী স্বয়ং—সুপ্ত হয়ে। বিশ্বাসের আকুল আহ্বানে তিনি জেগে ওঠেন আর দেখতে দেখতে মাঝ-দরিয়ায় কোথা থেকে ঠেলে ওঠে এক চর, আর তুলে নেয় নাওটাকে তারই বুকের ওপর। এমন তো কত দেখেছেন আপনারা, তাই না সুশীলদা?

একথা বলেই ঠাকুর রহস্যভরা ইঙ্গিতে তাকান পঞ্চাননের দিকে। মহা বিস্ময়ে ভাবেন পঞ্চানন, পথের ঘটনা তো এখনও কাউকে বলা হয়নি! শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্যামিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস এ ঘটনায় তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হল।

প্রথমবার আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন এবং তাঁর কাছে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া তো হলই, হল ঠাকুর-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবীর বিশ্বজননীত্বের আস্বাদন লাভ, হল আশ্রমস্থ অন্যান্য অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও প্রীতি। পঞ্চাননের নিজেকে ঢেলে দিয়ে কথা বলার রকমটি লক্ষ ক'রে সোহাগভরে ঠাকুর বলতেন, ওটা একটা রাজলক্ষণ। আর একটি ব্যাপার লক্ষ করে যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ করেন তিনি—ঠাকুরের প্রতি প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা, কথা, তাকানো, হাসি সবই অনেকদিনের চেনা বলে মনে হয়, যেন কতবার কতদিন দেখেছেন তাঁকে! কিন্তু এই তো প্রথম এলেন তিনি আশ্রমে। ঠাকুরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হয়, জিজ্ঞাসা করেন সুশীলচন্দ্রকে। তিনি হেসে উত্তর দেন যে ঠাকুরের অমোঘ আকর্ষণে যাঁরা এখানে না এসেই পারেননি, তাঁদের প্রত্যেকেরই এই একই অবাক-করা অভিজ্ঞতা হয়েছে, আশ্রমে এ কাহিনী নিত্যদিনের।

দিন তিনেক পরে কলকাতা ফিরে এলেন। কিন্তু আর তো মন লাগে না কোন কিছুতে, ভেতরটা কেবলই ছটফট করে সেখানে আবার যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত আর নিজের সঙ্গে নিজেই পেরে উঠলেন না—১৯২৭-এর এপ্রিলে আবার পৌঁছলেন হিমাইতপুরে। মানুষ-পাগল শ্রীশ্রীঠাকুর তো আহ্লাদে আটখানা আর একটি মানুষ পেয়ে। পঞ্চাননেরও মনে হয়, যেন নিজের জায়গায় ফেরা হল।

তখন জননীদেবী মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ দানে অথবা তেমন না পাওয়া গেলে নিজে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে আনন্দবাজার (আশ্রমের যৌথ ভোজনালয়) চালাতেন। কোন কোনদিন ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করে আনন্দবাজারের ব্যবস্থা হতে হতে সারাদিন পার হয়ে রাত্রি হয়ে যেত। দিনান্তে একবার মোটা আউস চালের ভাত আর জলের মত পাতলা ডাল জুটত—মহানন্দে সকলের সঙ্গে পঞ্চাননও তাই খেতেন। মা খোঁজ নিতেন প্রত্যেকের আহার সম্পন্ন হয়েছে কি না। শেষ ব্যক্তিটিরও আহার শেষ হলে তারপর তিনি নিজে অন্ন গ্রহণ করতেন। গরমের দিন, পদ্মার ঘাটে এক সিমেন্টের বেদিতে রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা করে নেন পঞ্চানন—কোনদিন বৃষ্টি এসে গেলে এক ছুটে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়! বিছানা বলতে শুধু একখানি মাথার বালিশ, তাও আবার বৃষ্টি এলে ভিজে যায়। ঠাকুরকে সে-কথা জানাতে তিনি বলেন—ইটের বালিশ মাথায় দিলে কিন্তু আর বালিশ ভিজে যাওয়ার সমস্যা হয় না। এ সমাধান খুবই মনঃপূত হয় পঞ্চাননের, এরপর থেকে একখানি ইট-ই হ'ল তাঁর বিছানার একমাত্র উপাদান।

নাম করেন, ধ্যান করেন, অতীতের অসহ তিক্ত জীবন যেন বিস্মৃত দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়—নতুন আনন্দে, নবীন উৎসাহে দিনগুলি যেন হাওয়ায় ভর করে ভেসে যায়। ঠিকমত নামধ্যান হচ্ছে কিনা, মা নিত্য প্রত্যেকের কাছে সে-বিষয়ে খোঁজ নিতেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। মনে করিয়ে দিয়ে বলতেন—বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসেছিস, এটাই তো প্রধান করণীয়। নিয়মিতভাবে নাম না করলে নিজেদের মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না। অনুকূল যখন যা করতে বলে, তা তো করবিই; তবে তোদের ঠাকুর যা বলে তার কী উদ্দেশ্য, তা বুঝে উঠতে পারবি না, যদি ঠিকমত নামধ্যান না করিস।...

বর্ষা শুরু হলে কাদায় নাজেহাল অবস্থা গ্রাম্য পথের; ঠাকুরের ইচ্ছে, তপোবন বিদ্যালয় পর্যন্ত পথের যতটা সম্ভব ভরাট করে নেওয়া। ঠাকুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পোড়া ইটের টুকরো ঝাঁকায় বোঝাই করাচ্ছেন—আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই মহা-আনন্দে মাথায় করে ঝাঁকা নিয়ে তপোবনের সামনে নিয়ে ফেলছে। পঞ্চানন শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছেন, তখনও সকলের সঙ্গে মিলে কায়িক শ্রমে যোগদানের মত একাত্মতা আসেনি তাঁর মধ্যে। একটা বোঝাই ঝাঁকা দেখিয়ে ঠাকুর কর্মী অটল দাসকে জিজ্ঞাসা করেন—ঝাঁকাটা কত ভারী হয়েছে বলে মনে হয় রে অটলা?

অটল 'মণটাক হবে' জানালে তাঁর সঙ্গে ধরে ঠাকুর ঝাঁকাটা হঠাৎ করে পঞ্চাননের মাথায় তুলে দেন। তিনি এই আকস্মিক ব্যাপারে কিছুটা হতচকিত হলেও তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে ঝাঁকাটা দু'হাতে সাপটে ধরেন। ঠাকুরের উল্লাস আর দেখে কে! বলেন— দেখলি তো? সাধে কি বলে 'বাঘা বরিশাল'! এই বলে ঠাকুর পথ

দেখিয়ে এগিয়ে চলেন, পিছনে পিছনে ঝাঁকা মাথায় পঞ্চানন। পথের দৈর্ঘ্যও মন্দ নয়। তপোবনে পৌঁছে দেখেন, কর্মোদ্দীপনার আনন্দঘন এক উৎসব-বাসর যেন সেখানে; মাথায় বোঝা তুলে দিয়ে তাঁর মনের বোঝা আরও লঘু করে দেন দরদী দয়াল।

অমল আনন্দে দিন কাটে আশ্রমে; মনে ভাবেন, মাস দুই থেকে ভাল করে ঠাকুরের সংস্পর্শ হৃদয়ে-মনে গ্রহণ করে কলকাতা ফিরবেন।

কথাটা যেদিনই মনে হয়েছে সেদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকে বলেন—এই যে পঞ্চাননদা! আপনি তো শুনেছি খুব ভাল পড়ান?

পঞ্চানন উত্তর দেন যে তিনি পুঁথিগত বিদ্যার পঠন-পাঠন করেন বটে, তবে প্রকৃত বিচারে তার কোন সারবত্তা নেই।

ঠাকুর উদ্দীপনার সঙ্গে বলেন যে শিশু বয়স থেকে পৃথিবী এবং জীবন সম্বন্ধে নিজের মত করে বাস্তব বোধ তৈরি না করে কেবল কিছু বই হাতে তুলে দিলে শিশুদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাদের স্বাভাবিক বোধ নষ্ট হয়, বই পড়ে তারাও বই হয়ে ওঠে, বাস্তবের সঙ্গে শিক্ষার কোন সংযোগ থাকে না। লেখাপড়া শেখানোর প্রচলিত প্রথাটিই ত্রুটিপূর্ণ বলে নির্দেশ করেন ঠাকুর। এই প্রথাগত শিক্ষায় মানুষের স্বাধীন সত্তার উন্মেষ তো হয়ই না, বরং তা লুপ্ত হয়ে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে একধরনের দাস-মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়—এই অভিমত প্রকাশ করে ঠাকুর বলেন, ছেলেদের আট/ নয় বছর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে, বাপ মায়ের সঙ্গে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মে যুক্ত করে স্বাভাবিক সাধারণ বোধ গজিয়ে দিয়ে দশ বছর থেকে পড়াশুনো শুরু করালে ম্যাট্রিকের পাঠ্যক্রম তারা হয়তো তিন বছরের মধ্যেই শেষ করতে পারে। এর সঙ্গে তাদের কিছু কার্যকরী শিক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন যাতে বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতেকলমে কিছু করে নিজের এবং পরিপার্শ্বের দায় সে বহনক্ষম হয়।

একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে তিন বছরের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপযোগী হয়ে ওঠা সম্ভব কি না, এ-বিষয়ে পঞ্চানন কিছুটা সংশয় প্রকাশ করলে ঠাকুর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলেন—এই কল্পনা, (অর্থাৎ তিন বছরে ম্যাট্রিক দেওয়া সম্ভব, এই কল্পনা) যা আমায় ভূতের মত ধাওয়া করে এসেছে এতকাল—তা কি এতই অসম্ভব?

ঠাকুরের আগ্রহের তীব্রতা ও আকুলতা দেখে পঞ্চানন নেতিবাচক উত্তর দিতে পারলেন না, বললেন—ভেবে দেখতে হবে।

ঠাকুর ভেবে নিয়ে তাঁকে জানাতে বলে চলে গেলেন। আধ ঘন্টার মধ্যেই ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, ভাবা হয়েছে নাকি। পঞ্চানন তখনও কিছুই ভাবেননি, কিন্তু সংকোচবশত তা না বলে, বলে ফেললেন যে অত্যন্ত মেধাবী হলে তিন বছরে ম্যাট্রিক পাস করা সম্ভব বলে মনে হয়। সে-কথার পৃষ্ঠে ঠাকুর বলেন যে মেধাতত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। শিক্ষক আদর্শগত প্রাণ হলে তাঁর প্রতি আকুল টানে যে কোন

ছাত্রেরই মেধা গজিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। শেষে আবার বলেন—তাই তো আমার জিজ্ঞাসা—তিন বছরে পারা যায় কি না!

উত্তরে পঞ্চানন বলে ফেলেন— চেষ্টা করে দেখলে হয়!

আর যায় কোথা—সোৎসাহে ঠাকুর বলে ওঠেন—দেখবেন চেষ্টা করে? দিই তাহলে ক্লাস তৈরি করে?

পঞ্চানন দেখলেন যে তিনি যেভাবে জড়িয়ে গেলেন, তাতে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ঠাকুর ততক্ষণে যত আশ্রমিক মেয়েদের পেলেন—বারো থেকে বাষট্টি—সবাইকে ডেকে বলছেন,—স্লেট পেনসিল খাতা-কলম নিয়ে আজই দুপুরে যা সব, কবিরাজ-বাড়ির দরজায় গাছতলায় ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস মাস্টার পেয়ে গেছিস রে পরমপিতার দয়ায়—তিন বছরেই ম্যাট্রিক পাশ!

কিছু বোঝার আগেই কীভাবে যেন আটকে গেলেন পঞ্চানন আশ্রমে—ভাগ্নে ক্ষিতীশকে চিঠি লিখে দিলেন কলকাতার বাসা ছেড়ে দিতে। শুরু হল এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের—একান্ত ঘরোয়া মেয়েদের—তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা— একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে তিন বছরে ম্যাট্রিক পাশ করানোর অকল্পনীয় উপাখ্যান।

পঞ্চাননের দাদা অমৃতলাল কুষ্টিয়ার কাছে চড়াইকোল স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন—তিনি একদিন আগে থেকে কোন সংবাদ না দিয়ে হিমাইতপুরে দেখতে এলেন, সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ভাই কেমন আছে। তিনি পৌঁছেছেন রাত্রে—দেখেন পদ্মার ধারে সিমেন্টের বেদিতে ইটের বালিশ মাথায় ভাইটি সুখনিদ্রার আয়োজনে রত। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির! পঞ্চাননকে ডেকে তুলে যথাসাধ্য তিরস্কার করলেন সদ্‌গুরু-প্রাপ্তিতে এহেন দুর্দশা-কবলিত হওয়ার জন্য। পরে অবশ্য আশ্রমকর্মী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসহচর বঙ্কিম রায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলে অমৃতলালের বিরূপতা অনেকখানি হ্রাস পায়। ঐ-রাত্রেই তিনি কর্মস্থলে ফিরে গেলেও কিছুদিন পরপরই আশ্রমে আসতে লাগলেন এবং অবশেষে অনন্ত মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর আশৈশব সদ্‌গুরু সন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটল, পরম পাওয়ায় তৃপ্ত হল এতদিনকার আকাঙ্ক্ষা।

মাতৃবিদ্যালয়ের ক্লাস মহা উৎসাহে ও সাফল্যের সঙ্গে চলতে লাগল। সমস্যা, অসুবিধা দেখা দেয়, পঞ্চানন ছুটে যান মহাশিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে, অভিনব সমাধান লাভ করেন।

এরই মধ্যে নিত্যকার নানা সংঘটনের মধ্য দিয়ে তাঁকে নিত্যশিক্ষা দিয়ে চলেন ঠাকুর। একদিন একটি তরুণ একা এসেছে আশ্রম পরিদর্শনে, পঞ্চানন উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠান দেখিয়ে চলেছেন উৎসাহে। তার মধ্যে অবশ্য

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

তেমন আগ্রহ বা সাড়া লক্ষ করা যাচ্ছিল না, কিছুটা ঔদাসীন্যের সঙ্গেই সব দেখে চলেছে সে। সেসময় একটি খাঁচায় কয়েকটি বাঁদর রাখা ছিল, হঠাৎ সেটি দেখে এবং বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রের বারান্দায় শুয়ে থাকা একটি কুকুর দেখে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। পঞ্চানন মনে মনে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন তার মূঢ়তায়। এরপর সে যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি তরুণটির দু'কান মলে দিলেন। সে বেচারী একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির এই আচরণের কোন প্রতিবাদ করতে পারল না, নীরবে চলে গেল। কিন্তু পঞ্চানন নিজেই নিজের এই দুর্ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে সব কথা খুলে বললেন। ঠাকুর সব শুনে মৃদু হেসে বললেন—হয়নি বিশেষ কিছু, কেবল কর্মফল একটু সৃষ্টি হয়ে রইল, এই যা।

পঞ্চানন সে-কথার অর্থ বুঝতে না পারায় তিনি বুঝিয়ে বলেন যে তরুণটি সামনে প্রতিবাদ করতে না পারলেও হয়তো বাইরে গিয়ে একথা অনেককে বলে বেড়াবে এবং ঐ কানমলা তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে পঞ্চাননের দৃষ্টির ও জ্ঞানের অগোচরে। ফলে হয়তো বা বহু বছর পরে পঞ্চানন যদি কখনও কাশী যান, হঠাৎ কোন গলিতে কোন আড়াল থেকে কেউ তাঁর মাথায় বসিয়ে দিল এক লাঠির বাড়ি। তিনি তখন কিন্তু ভেবে উঠতে পারবেন না যে বহু বছর আগের তাঁর নিজের দুষ্কর্মই এই অদৃষ্টের সৃষ্টি করেছে।

ঠাকুরের কথায় পঞ্চাননের বোধোদয় হয় যে জগতের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহই কার্যকারণ-সম্বদ্ধ—কারণের জ্ঞান না থাকাই অদৃষ্ট। তবে ঠাকুরের মুখে ঐ কথা ক'টি শুনে তাঁর মনে এমনই এক শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল যে তিনি কখনও কাশী যাননি।

মাতৃবিদ্যালয়ের সম্মিলিত ক্লাস ছাড়াও সারাদিনের প্রায় সবখানি ঠাকুরের নির্দেশে কোন-না-কোন ছাত্রীকে পৃথকভাবে পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হত মাস্টারমশাই পঞ্চাননকে। একদিন ঠাকুর তাঁকে ডেকে বলেন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা পূজনীয়া সাধনাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য। পঞ্চানন জানান যে সারাদিনে তো আর কোন সময় ফাঁকা নেই, রাত বারোটা থেকে দেড়টা—এই সময়টুকু অবকাশ আছে। ঠাকুর শুনে মহা খুশি হয়ে মেয়েকে ডেকে বলেন—মাস্টারমশাই ফার্স্ট ক্লাস টাইম বের করেছেন—রাত বারোটা থেকে দেড়টা! কেউ জাগবে না, চারদিক নিস্তব্ধ, অঙ্ক কষার পক্ষে চমৎকার।

সাধনাও রাজি। পঞ্চানন তাঁকে 'মাগো' বলে সম্বোধন করতেন। মাতৃমন্দিরের বারান্দায় রাত বারোটায় শুরু হল 'মাগো'-র অঙ্ক ক্লাস। একদিন দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের অঙ্ক শেষ হওয়ার পর মাস্টারমশাই লক্ষ করেন, তাঁর 'মাগো' ভারী অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর মুখের দিকে। কারণ জানতে চাওয়ায় সাধনা জানান যে অঙ্কটি নির্ভুলভাবে কষতে কষতে মাস্টারমশাইয়ের নাক ডাকছিল ঠিক ঘুমন্ত মানুষের মত। জবাবে পঞ্চানন জানান, কথাটা ঠিকই। একটা অঙ্ক

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কষতে যতটুকু অঙ্গের প্রয়োজন—একটা চোখের একটা কোণ, মাথার খানিকটা আর ডান হাতখানা জাগিয়ে রেখে বাকি শরীরটাকে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এ কথায় আরও বিস্মিত হয়ে সাধনা জানতে চান যে এটা কীভাবে সম্ভব হয়। পঞ্চানন উত্তর দেন—সাধারণ ক্ষেত্রে হয়তো হয় না, কিন্তু তোমার বাবার ঠেলায় পড়ে এটা হওয়াতে হয়েছে। একে একরকম সার্কাসের কসরৎ বলতে পার; শক্ত কিছু নয়, অভ্যাসে আয়ত্ত করা যায়।

এর দু'একদিনের মধ্যে ঠাকুর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর পত্নী তরুবালা দেবীকে পড়ানোর জন্য পঞ্চাননকে একটু সময় বার করতে বলেন। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত কোন সময় নেই শুনে ঠাকুরের সহাস্য উক্তি—আহা! মানুষের will-টা তো time and space-এর বহু ঊর্ধ্বের জিনিস! পরমপিতার দয়ায় এতদিনে আপনি তা বুঝেও ফেলেছেন!

অগত্যা পড়ানোর সময় স্থির হল রাত তিনটেয়। তরুকে ডেকে বলেন উল্লসিত ঠাকুর—তরু! ফার্স্ট ক্লাস টাইম বেরিয়ে গেছে তোর ভাগ্যে—একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্ত!

অতঃপর এভাবে রাত তিনটে থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত সাড়ে বাইশ ঘন্টা ছাত্রী পরিবৃত হয়ে দিন কাটতে লাগল পঞ্চাননের; একটানা সাড়ে দশ বছর এভাবে কেটেছে। পরবর্তীকালে একসময় ঠাকুরের কাছে জানতে চান পঞ্চানন যে ঠাকুর তাঁকে অতবছর ঐভাবে নারীবেষ্টিত করে রেখেছিলেন কেন।

সহজভাবে জবাব দেন ঠাকুর—যে-সাপে কামড়েছিল, সেই সাপ দিয়েই বিষ তুলে নিতে হল,—নইলে আর উপায় কী?

এ প্রসঙ্গের পটভূমিকাটি ঈষৎ বিস্তারিত করা প্রয়োজন। বরিশাল কলেজে যখন পঞ্চানন পড়তেন, তখন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধক কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে এঁদের মত চরিত্রবান, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত প্রকৃতির হয়ে ওঠার দুর্মর বাসনা দেখা দেয়। ফলে বয়সোচিত স্বভাবধর্মের বিপরীতমুখী চলনে তাঁর মধ্যে এক স্নায়বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন এবং নিষিদ্ধতার অন্তরাল সৃষ্টি হয়। এর ফলে, নারীসংস্পর্শ সর্বথা দোষাবহ এবং বর্জনীয়, এরকম এক অস্বাভাবিকতার চাপে তাঁর মানসিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনই পরিস্থিতিতে তাঁকে অহর্নিশি নারী পরিবৃত করে রাখেন ঠাকুর। প্রথম দিকে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতেন পঞ্চানন। তিনি তখন মধ্য তিরিশের এক যুবক—একান্ত নিরালায়, গভীর রাত্রে অন্য কোন লোকচক্ষুর অন্তরালে তরুণী ছাত্রীকে মুখোমুখি বসে পড়াতে গিয়ে তাঁর ভারী অস্বস্তি বোধ হত। ঠাকুরকে সে-কথা জানাতে গেলেন—এত নিরালায়, শুধু দু'জন মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ানো খুবই মুশকিল, ঠাকুর!

ঠাকুরের রহস্যগম্ভীর উত্তর—শুধু দুজন? তৃতীয় কাউকে দেখতে পান না? ঠাকুর কি এতই বেকুব, পঞ্চাননদা, সাপ নিয়ে খেলছেন আপনি,—আর তাঁর নির্নিমেষ

নজরটি আপনার উপর নেই?

এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর মনের অবরুদ্ধ আবেগ-জনিত স্নায়বিক চাপ ক্রমে শিথিল হতে থাকে এবং কখন তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় তা তিনি নিজেও আর টের পান না। মনঃসমীক্ষণ ও মনোচিকিৎসার এমন সফল ও বাস্তবোচিত প্রয়োগ কেবল সর্ববোধী মহাচিকিৎসকের পক্ষেই সম্ভব।

আশ্রমে স্থায়িভাবে থেকে যাওয়ার কিছুদিন পরে স্ত্রী ও শ্বশ্রূ-পরিজনের কাছ থেকে অনুযোগপূর্ণ চিঠি পান এভাবে দায়িত্ব-পলাতক হয়ে চলে আসার জন্য। সে-কথা ঠাকুরকে জানানোয় ঠাকুর বলেন তাঁদের কোমলভাবে বুঝিয়ে লিখে দিতে যে পঞ্চানন বুঝতে পারছেন যে তাঁদের কত অসুবিধা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তিনি বর্তমানে যে-নেশায় মজেছেন, তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া আর সম্ভব নয়। পঞ্চানন সেইমত জবাব দেন। ইতিমধ্যে দাদা চিঠি দেন একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসার কথা জানিয়ে। হবিবপুরের পৈতৃক বাড়িতে মা একাই থাকেন;ঠাকুর নির্দেশ দেন দাদার সঙ্গে একত্রে বাড়ি গিয়ে মাতৃদর্শন করে আসার জন্য।

ঠিক হল ভোরে আশ্রম থেকে যাত্রা করে দাদার কর্মস্থল পর্যন্ত হেঁটে যাবেন, সেখান থেকে দু'ভাই একসঙ্গে মায়ের কাছে যাবেন। ভোরে ঠাকুরের কাছে গেছেন পঞ্চানন প্রণাম করে বিদায় নিতে; ঠাকুর জানতে চাইলেন খাওয়া হয়েছে কি না; তিনি জানান যে অত ভোরে আর কী খাবেন, দাদার কাছে গিয়ে দুপুরে স্নানখাওয়া সারবেন। অত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকার কথায় ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পঞ্চাননকে বলেন পদ্মা থেকে স্নান সেরে আসতে। স্নান করে এসে পঞ্চানন দেখেন গরম ভাত, ঘি, আলুভাতে আর বেগুনভাজার ব্যবস্থা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সামনে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে থাকেন স্নেহাতুর দৃষ্টি মেলে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আশ্রমিক খলিলর রহমান, বঙ্কিম ব্যানার্জি; তাঁদের দিয়ে চেয়ে ঠাকুর বলেন—পঞ্চান্নদার খাওয়া দেখি। খাওয়া যখন শেষ হওয়ার মুখে—তখনও পাতে কিছু ভাত অবশিষ্ট ছিল, সেদিকে লক্ষ করে ঠাকুর বলেন— . . . তাই তো, আর একটু ঘি হলে যে হত!

খলিলর শুনে নিজের ঘর থেকে ঘিয়ের পাত্র নিয়ে এলে ঠাকুর ঢেলে দিতে বলেন—তিনিও সবখানি ঘি ঢেলে দেন। ইতিমধ্যে বঙ্কিম ব্যানার্জিও ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ঘিয়ের হাঁড়ি নিয়ে এসে ঠাকুরের ইঙ্গিতে সবটুকু ঘি পঞ্চাননের পাতে ঢেলে দেন। পঞ্চাননের বিব্রত ভাব দেখে ঠাকুর তাঁকে অঞ্জলি করে ঐ ঘি সহ ভাত খেয়ে নিতে বলেন। ঠাকুরের নির্দেশ—অতএব তিনি তাই করেন।

রওয়ানা হয়ে পথে দুশ্চিন্তা হয়—অতখানি ঘি খেয়ে ফেললেন, শরীর অসুস্থ না হয়; কিন্তু সামান্যতম কোন অস্বস্তিও তাঁর হয় না। তাঁর সঙ্গে একই নৌকায় যাচ্ছিলেন ঠাকুরের অপর এক ভক্ত। তিনি সব শুনে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিটি গ্রাসে নিজে চোখ রেখে আপনাকে খাইয়েছেন। তাই ও খেয়ে আপনার অস্বস্তি

আসবে কোথা থেকে? ও-যে মহাপ্রসাদ, ওতে অসুখ করে কখনও?

যা-হোক, দু'ভাই একসঙ্গে বাড়ি যাওয়াতে মা খুব খুশি। তখন অগ্রহায়ণ মাস। বাড়ির গাছে অকালে কয়েকটি কাঁঠাল হয়েছে, তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুষ্ট এবং বড়, মা সেটা পাড়ালেন ছেলেদের জন্য—দু'একদিন ঘরে থাকলেই পেকে যাবে। অতবড় কাঁঠালটি দেখে পঞ্চাননের সাধ হয়—অকালের ফল, যদি ঠাকুরভোগে দেওয়া যেত! দাদা অমৃতলালের কাছে সে কথা তুলতেই দেখা গেল তাঁরও ঐ একই ইচ্ছা। কিন্তু আশ্রমে ফিরতে তখনও অন্তত পনের দিন বাকি; অতদিন ঐ কাঁঠাল না পেকে থাকবে কীভাবে, একথা বলতেই অমৃতলাল জোর দিয়ে বলেন—থাকবে না মানে? ঠাকুরভোগে যখন দেব বলেছি তখন এর মধ্যে ও কাঁঠাল কিছুতেই পাকবে না।

স্থির হল, অমৃতলাল কাঁঠালটি নিয়ে তাঁর কর্মস্থল চড়াইকোলে ফিরবেন। পঞ্চানন ঠাকুরের নির্দেশে আশ্রমে নলকূপ বসানোর কাজের ব্যাপারে কলকাতা যাবেন, সেখান থেকে ফেরার পথে চড়াইকোল হয়ে কাঁঠাল নিয়ে আশ্রমে ফিরবেন। কাজ সেরে চড়াইকোল ফিরতে ষোল দিন লেগে গেল পঞ্চাননের; গিয়ে দেখেন, কাঁঠালটি সদ্য পেকে উঠেছে, ঘ্রাণেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। পরের দিন অতি প্রত্যূষে কাঁঠাল নিয়ে রওয়ানা হলেন, যাতে সাড়ে দশটার মধ্যে আশ্রমে পৌঁছে যান, কারণ ঠাকুর সাধারণত এগারোটার মধ্যে আহারে বসেন। কিন্তু এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে বাজিতপুর ঘাটে পৌঁছতেই আড়াইটে বেজে গেল। পঞ্চানন হতাশ হয়ে ভাবেন—এত সাধ করে ঠাকুরের জন্য কাঁঠাল আনা হল, তাঁকে আর খাওয়ানো গেল না! কারণ সেদিনের মত ঠাকুরের আহার তো হয়েই গেছে—পরের দিন পর্যন্ত ঐ কাঁঠাল আর ভাল থাকা সম্ভব নয়।

প্রায় তিনটের সময় আশ্রমে পৌঁছে দেখেন, ঠাকুর যেন কারও জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি পৌঁছে প্রণাম করতেই মাকে ডেকে বলেন— মারে, পঞ্চাননদা আচ্ছা সময়ে কাঁঠাল এনে ফেলেছে। আর কাঁঠালও সেরকম, গন্ধে তার ভুবন একেবারে মেতে উঠেছে।

পঞ্চানন জানলেন, সেদিন নানা কাজে আটকে পড়ায় ঐ অত বেলা পর্যন্ত ঠাকুরের খাওয়া হয়নি। তখনই তিনি খেতে বসলেন এবং পঞ্চাননের আনা কাঁঠাল পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেলেন। আবেগে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যায় পঞ্চাননের চোখ!

প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কীভাবে ঐ কাঁঠাল অতদিন না পেকে ঐ সময়ে পাকল এবং কেনই বা সেদিন ঠাকুর এগারোটার বদলে বেলা তিনটের পরে খেতে গেলেন—অনেকদিন পরে একবার এ প্রশ্ন করেছিলেন পঞ্চানন। ঠাকুর জানান যে গভীর প্রত্যয় থেকে কোন কথা বললে তা ফলবান হয়; তাই অমৃতলালের কথা—'ঠাকুরভোগে যখন দেব বলেছি তখন এর মধ্যে ও কাঁঠাল কিছুতেই পাকবে না' এবং পঞ্চাননের ইচ্ছা ঐদিনই ঠাকুরকে কাঁঠাল খাওয়াবেন—দুটিই সত্য হয়েছে। তবে

বিভূতি-প্রদর্শনের আশায় কেউ এ-কাজ করলে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় না।

এরপরে মাতা মনোমোহিনীর নির্দেশে পঞ্চানন স্ত্রী ভবতারিণী এবং আড়াই বছরের কন্যা শান্তিকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভবতারিণী ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত চিন্তাহরণ দে-র কন্যা এবং তিনিও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিণী ছিলেন। আই. এস সি. পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম হন। কিন্তু হয়তো পঞ্চাননের অবৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী, রূঢ় সত্য বলার অভ্যাস এবং ভবতারিণীরও কিঞ্চিৎ অধীরতা—সব মিলিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন কিছুটা দ্বন্দ্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় করুণায় সে দ্বন্দ্বের হ্রাস হয়। আশ্রমে ভবতারিণী 'ভবী-মা' নামে পরিচিতা ছিলেন।

একবার পঞ্চানন কোন পারিবারিক দ্বন্দ্বের কথা ঠাকুরকে বলেন; ঠাকুর বলেন—এড়িয়ে চলতে হয়, নিজেকে আলগা রাখতে হয়। পঞ্চানন কথাটা শুনলেন, কিন্তু যেন পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হল না তা। ঠাকুর তা লক্ষ করেন। একটু পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বেরোন। হাঁটতে হাঁটতে আশ্রম-লাগোয়া একটি বাগানের মধ্যে ঢোকেন; সেখানে সাধারণত লোকে প্রাকৃতিক কর্ম সারত। সেই বিষ্ঠাপূর্ণ বাগানটি ঠাকুর পঞ্চাননকে সঙ্গে নিয়ে পার হলেন। পেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি পঞ্চাননদা, পায়ে ময়লা টয়লা লাগেনি তো?

পঞ্চানন জবাব দেন—আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে গা বাঁচিয়েই তো এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলেন—এই তো ধরে ফেলেছেন তুক!

পঞ্চানন বুঝলেন— প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়ে জীবন চলনার রীতি পরম যত্নে কীভাবে দয়াল অন্তরে গেঁথে দেন।

ঠাকুর একবার পঞ্চাননকে পরিবার-বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুদিন একা থাকার নির্দেশ দেন। তখন মাতৃবিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়া ছাড়া তাঁর আর বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। একা থাকার দরুন নিজের সব কাজ—রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা সব করেও অবসর সময় কী করবেন ভেবে পেতেন না তিনি। কর্মবর্জিত থাকা তাঁর পক্ষে বরাবরই অসুবিধার। ঠাকুরকে গিয়ে জানান যে কর্মেন্দ্রিয়গুলি কাজ করার জন্য ছটফট করছে। ঠাকুর হেসে রসিকতার সুরে জবাব দেন যে ওরা পঞ্চাননের প্রভুত্ব স্বীকার না করে তাঁরই প্রভু হয়ে উঠতে চাইছে, তাই ওদের একটু জব্দ করা দরকার। তিনি পঞ্চাননকে নাম ব্যতীত অন্য কিছুতে মন দিতে নিষেধ করলেন। পঞ্চাননও তদনুযায়ী নাম করে চলেন সর্বক্ষণ। ঐ সময়ে অনন্ত মহারাজের পত্রাবলি 'সান্ত্বনা' প্রকাশনার পথে—মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী নামধ্যান ছাড়াও ঐ বইয়ের প্রুফ দেখার দায়িত্ব নেন তিনি। কিন্তু আরও কিছু কাজের জন্য ভিতরে ভিতরে ছটফটানি তাঁর থেকেই যায়। তবুও ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ জোর দিয়ে নাম চালাতে

থাকেন।

এর মধ্যে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল—তাঁর মস্তিষ্ক যেন অসাড়, ধোঁয়াটে বোধ হতে লাগল, অতি সাধারণ সমস্ত পাঠন বিষয়ও অদ্ভুত জড়তার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। তিনি শঙ্কিত হয়ে ছুটে যান ঠাকুরের কাছে—ঠাকুর তাঁকে দেখেই বলে ওঠেন—থাক্ থাক্, কিছু আর কইতে হবে না, কইতে পারবেনও না । এখান থেকে পালান! এখানে আর আসবেন না!

কাতরভাবে পঞ্চানন বলেন—সইতে পারছি না যে!

শ্রীশ্রীঠাকুর অদ্ভুত এক কোমল গম্ভীর স্বরে বলেন—সইতেই হবে! এই সব তমসাচ্ছন্ন অবস্থার ভেতর দিয়েই যেতে হবে যে! মানিক আমার, সোনা আমার! কোন দিকে খেয়াল দিয়ে কাজ নেই, খুব জোর নাম চালিয়ে যান,—আরও জোরে চালান। আর এমুখো একেবারেই হবেন না। যান্, এখুনি যান,—এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই!

অগত্যা চলে আসেন পঞ্চানন—যন্ত্রবৎ নাম করে চলেন, 'সান্ত্বনা'-র প্রুফ দেখাও চলে। এভাবে দুসপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও কোন উন্নতির লক্ষণ না দেখা দেওয়াতে আবার ঠাকুরের কাছে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁকে দূর থেকে দেখতে পাওয়ামাত্র ঠাকুর বলে ওঠেন—বলেছি না—এ মুখো আসবেন না! কথা বোঝেন না! এদিকে এলে শালা পালিয়ে যাবে, ধরতে পারব না। যান—এক্ষুনি পালিয়ে যান, আর খুব চালিয়ে যান নাম—শালাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলুন!

অসহায় পঞ্চানন বলেন—আর যে সইতে পারছি না, ঠাকুর!

—আরে, আমি তো আছি, আপনার ভয়টা কীসের? পালিয়ে আর যাবেন কোথায়, আমার নজরের সীমানার বাইরে তো আর নয়!

আবার ফিরে আসেন, ঠাকুরের 'আমি তো আছি' কথাটিতে কিছু স্বস্তিবোধ হয়। আরও দু'সপ্তাহ পরে দুপুর বারোটা নাগাদ মহারাজের বইয়ের প্রুফ দেখে নিজের ঘরে ফিরেছেন ঘর্মাক্ত কলেবরে। হঠাৎ কোথা থেকে ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকেই তাঁর ঘাড় ধরে জোর করে নীচু করে শিরদাঁড়ায় বিশেষ এক স্থানে সজোরে দংশন করলেন। বললেন—এঃ! পঞ্চাননদার গায়ে বড্ড লবণ; শিগগির জল এনে দিন, মুখটা ধুয়ে ফেলি!

পরক্ষণেই চলে গেলেন ঠাকুর। অকস্মাৎ একনিমেষে ভোজবাজির মত সব কিছু পাল্টে গেল পঞ্চাননের কাছে—এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তির উচ্ছলতায় উথলে উঠলো সমগ্র সত্তা, আশ্চর্য নির্ভার এবং নন্দিত বোধ হতে লাগল।

সেদিন রাত্রে হল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দেহের দু'পাশ দিয়ে দুটি কী যেন বস্তু শরীর নিংড়ে বেরিয়ে গেল বলে মনে হল তাঁর। তখনই ছুটে গিয়ে ঠাকুরকে

জানাতেই তিনি খুশি মুখে বলে ওঠেন—বেঁচে গেছেন, শালারা কী বাসাটাই না বেঁধেছিল দেহের অণু-পরমাণুকে গ্রাস ক'রে! এতদিনে তা গেল ছেড়ে।

ওগুলো কী—জানতে চাইলে ঠাকুর বলেন, ও গুলো হল beaten complexes বা পরাভূত বৃত্তি।

এভাবে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বায়িত করে তোলার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন পঞ্চানন। তিনিও তাঁর অসাধারণ মেধা—স্পর্শমণির ছোঁয়ায় বা আরও বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল—এবং অকল্পনীয় শ্রম দিয়ে ঠাকুরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন পঞ্চানন। একেবারে গোড়া থেকে ধরে তিন বছরে ম্যাট্রিক পাস করানো তো বটেই, তারপরে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের আই. এস সি., বি. এস সি. পড়ার সময়ও তিনি ছিলেন সকলের সর্বক্ষণের মাস্টারমশাই।

আশ্রম থেকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ প্রায় চার মাইল রাস্তা, বর্ষায় যা অগম্য হয়ে ওঠে। সেজন্য আশ্রম থেকে এডওয়ার্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয় যে মেয়েরা বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকাল ক্লাস করতে কলেজে যাবে, থিওরি আশ্রমেই আশ্রমিক অধ্যাপকদের কাছে পড়বে—কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন তাতে অনুমতি দেন। তখন ব্রিটিশ অধ্যক্ষ; তিনি প্রথম এহেন অদ্ভুত প্রস্তাব নাকচ করে দেন। বারংবার অনুরোধ করায় শেষে বলেন যে ইংরেজি, অঙ্ক ও সংস্কৃত—এই তিন বিষয় যাঁরা আশ্রমে অধ্যাপনা করবেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে। তদনুযায়ী স্থির হয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, রত্নেশ্বর দাশশর্মা এবং পঞ্চানন সরকার যাবেন এডওয়ার্ড কলেজে সাক্ষাৎকার দিতে। কিন্তু সব শুনে পঞ্চানন ঠাকুরকে বলেন, আর কারও প্রয়োজন নেই, তিনি একাই যথেষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে সম্মত হন। পঞ্চানন একাই সেখানে যান এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উল্লিখিত তিনটি বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদের এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে তাঁরা নির্দ্বিধায় সমস্ত থিওরি ক্লাস আশ্রমেই হওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন।

যে-কোন বিষয়ে কুশলতা লাভ ছিল তাঁর কাছে খেলার মত। একাধিক দেশী বিদেশী ভাষা, বিভিন্ন বিষয়, নানা শাস্ত্র, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, জ্যোতিষচর্চা, এমনকি তাস ও দাবা খেলা—সব কিছুতেই তাঁর অনায়াস গতিবিধি ছিল এবং প্রতিটিতেই তাঁর দক্ষতা ছিল সাধারণ স্তরের অনেক উপরে। তাঁর সময়কালীন আশ্রমিক প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীরই তিনি ছিলেন মাস্টারমশাই। পরবর্তীকালে তাঁর এক অগ্রজ—যিনি অধ্যাপনা সূত্রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন—তাঁকে বলেন যে সদ্‌গুরু লাভ করে পঞ্চানন কী পেলেন—কলকাতা শহরে একখানি নিজের বাড়িও নেই, অথচ তিনি একাধিক বাড়ির মালিক। পঞ্চানন জবাব দেন—আপনি বিষয় চেয়েছেন, পেয়েছেন। আমি মানুষ চেয়েছি, পেয়েছি। আপনার অতগুলো বাড়ি রয়েছে, আমার

রয়েছে অগণিত ছাত্রছাত্রী—তারাই আমার বড় সম্পদ। এমনই নির্মোহ, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। ছাত্রের মনোযোগের অভাব, কোন বিষয় বুঝতে না পারা, ক্লাসে অনুপস্থিতি, পড়া ভুলে যাওয়া—শিক্ষার্থীর যে-কোন ত্রুটির জন্যই ঠাকুর শিক্ষককে দায়ী সাব্যস্ত করতেন। বলতেন—শিক্ষকের চারিত্র্যগুণ যদি তেমন ছাত্রমুগ্ধকর হয় তবে তাঁর প্রতি টানেই ছাত্রের মেধার উন্মেষ হয়, পাঠ্যবস্তু এবং ক্লাসের প্রতি গজিয়ে ওঠে আগ্রহ ও ভালবাসা। পাঠ্যক্রম কীরকম হওয়া উচিত, প্রশ্নপত্রের ধরন কেমন হলে ঠিক হয়, খাতা কী ভাবে দেখা উচিত, প্রতিটি বিষয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের সুনির্দিষ্ট অভিমত পঞ্চানন সাগ্রহে নিজ জীবনে কার্যকর করার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তার পরিবেশগত অবস্থান মাথায় রেখে তাদের সামনে উদাহরণ খাড়া করলে পাঠ তাদের পক্ষে অত্যন্ত জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—ঠাকুরের এই উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করে তিনি আশাতীত ফল পেয়েছেন।

শিক্ষককে ঠাকুর তুলনা করেছেন চিকিৎসকের সঙ্গে; তিনি বলতেন, রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে বিরক্ত হলে চলবে কেন? ছাত্র পড়ানোও একধরনের ডাক্তরি; তাই বলি, তাদের ভুলভ্রান্তি দেখে বিরক্ত বা ক্লান্ত হলে চলবে না, মন খারাপ করলে বা হতাশ হলেও চলবে না।

নারীর উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, শিক্ষা পুরুষ ও নারীর সমান ভাবেই চলা উচিত—তবে তা হতে হবে বৈশিষ্ট্যবাহী। শিক্ষা যদি এমনতর হয় যাতে নারীর বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে, তবে তা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য, কারণ এতে অস্বাভাবিকতা আসে, আর এই অস্বাভাবিকতা থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে, আর তা থেকে জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

আবার অন্য এক প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, মেয়েদের শিক্ষার ভিতর দিয়ে এমন সংস্কার তৈরি করতে হয় যাতে জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদি বিবেচনা না করে কাউকে পতিত্বে বরণ না করে—আর অন্যায্য ও অবাধ পুরুষ মিশ্রণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। শ্রেষ্ঠকে কীভাবে বরণ করতে হয়, শ্রেষ্ঠকে কী করে চিনতে হয়, শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ শ্রদ্ধা কীভাবে হয় ইত্যাদি বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।

একবার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের তৎকালীন প্রধান অনাথনাথ বসু সৎসঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার নামডাক শুনে আশ্রমে এসেছিলেন এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য। তপোবন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শে তিনি ঠাকুরের শিক্ষাদর্শ-বিষয়ে বিস্তারিত অবগতির জন্য পঞ্চানন সরকারের সঙ্গে দেখা করেন। পঞ্চানন একনাগাড়ে দু'ঘন্টা ধরে ঠাকুর-নির্দেশিত শিক্ষাপদ্ধতির কথা বিস্তৃতভাবে বলেন; তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে থাকেন, আনন্দে তাঁর চোখ অশ্রুসজল

হয়ে ওঠে। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলেন—আপনারা ঠাকুরের দেওয়া এই জিনিসগুলো যদি সূত্রাকারে লিখে রেখে যেতেন, তবে আমার স্থির বিশ্বাস, জগত এক অমূল্য সম্পদ পেয়ে ধন্য হত। উত্তরে পঞ্চানন জানান যে এ কাজের জন্য যে technical knowledge ও দক্ষতা প্রয়োজন, তা তাঁদের নেই, অনাথবাবুর মত এ-বিষয়ে দক্ষ লোক যদি এ কাজের ভার নিতেন তবে হত। অনাথনাথ বসু সময়াভাবের কথা ব্যক্ত করে সখেদে বলেন—মাথায় রইল, দেখা যাক কতটা কী করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐশী প্রেরণায় পঞ্চানন শিক্ষকতার যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন—তা সর্বযুগে অনুসরণীয়। ঠাকুরের সংস্পর্শে তাঁর বিবর্তন তপোবনের শিক্ষাধারায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। মূলত শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করলেও তিনি ছিলেন সুকবি ও সুগায়ক। তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত সংগীতাবলি 'গীতিসম্বিতী' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

নারীপুরুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক—আদর্শ দাম্পত্য, নারীর বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব ইত্যাদি জীবনের বহু জটিল বিষয়ে পঞ্চানন পর পর এগারো দিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করেন এবং ঠাকুরের কাছ থেকে প্রতিটির অমোঘ সমাধান লাভ করেন। এই প্রশ্নোত্তর-সংকলন 'নারীর পথে' নামক গ্রন্থে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইটির অমূল্য কথোপকথন চিরদিন মানুষকে পথের সন্ধান দেবে। এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকার কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: '. . . রূঢ় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্ত আকুলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র সন্ধিৎসা নিয়ে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও প্রতিঋত্বিক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার নারীজীবনের সঙ্গে জড়িত বহু জটিল বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তন্ন-তন্ন করে যে সব কূট প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্তরে ক্ষুরধার অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অপূর্ব তত্ত্বদৃষ্টি সমন্বিত যে অভিনব সমাধান পরম দয়ালের দিব্য অবদানস্বরূপ পেয়েছেন—তা-ই এই 'নারীর পথে' পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুপণ্ডিত প্রশ্নকর্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির সমর্থনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শনের ভাণ্ডার মন্থন করে বহু উদ্ধৃতি পাদটীকা সংযোজন করায় পাঠকবর্গের বিশেষ উপকার হয়েছে। . . .'

পঞ্চাননের আর এক উল্লেখযোগ্য কর্ম হল 'ধাতু-দীপনী অভিধান' সংকলন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী পঞ্চানন ঠাকুরেরই নির্দেশে ঐ অভিধান সংকলন করেন। তাঁর অনবদ্য অকপট স্মৃতিকথা "আমার জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর" রচিত হয় ১৯৬৪-তে, দেওঘরে। এ শুধু এক অশান্তচিত্ত মানুষের স্থিতির উৎস সন্ধানের আত্মকথনই নয়, এতে ধরা আছে ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের নির্যাস এবং সেসময়কার সৎসঙ্গের আংশিক ইতিবৃত্ত। বইটির কিছু অংশ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনানো হলে তিনি অত্যন্ত খুশির সঙ্গে বলে ওঠেন—Confessions of Saint Augustine নাকি

রে! তাঁর কথা বলতে গেলে এমনই একান্ত নিজের জীবনে কথার মতই বলতে হয়।

১৯৪৬-এ শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর চলে আসার পরেই পঞ্চাননও দেওঘরে চলে আসেন এবং ১৯৬৯-এ ঠাকুরের তিরোধান পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপরে কলকাতায় এসে পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা স্পষ্টভাষী মানুষটি কলকাতাতেও ইষ্টভ্রাতাদের সান্নিধ্যেই বেশি সময় কাটাতেন। ১৯৭৫-এর এপ্রিল মাসে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে—পুত্র এবং পুত্রবধূ স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তিনি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলেন—আমার এখনই কিছু হবে না —সূর্য যেদিন উত্তরায়ণে যাবে, সেদিন আমার যাবার পালা। সত্যি সত্যি তখনকার মত সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। এর কিছুদিন পরে ২৩শে মে—সেদিনই সূর্যের উত্তরায়ণ ঘটে—হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন এবং স্বঘোষিত দিনে স্বজ্ঞানে চলে যান প্রিয়পরমের সঙ্গে চিরসম্মিলনে মিলিত হতে।

অস্তিত্বের সংকটের বিপন্নতা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণে এসেছিলেন সুপণ্ডিত অধ্যাপক পঞ্চানন সরকার। তাঁর আদেশ নির্দেশ মাথায় নিয়ে, তাঁরই আলোকে বাস্তব চলনার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আদর্শ শিক্ষকের মূর্ত সংজ্ঞা হয়ে উঠেছিলেন; প্রাপ্ত হয়েছিলেন প্রতিঋত্বিকের পূত পাঞ্জা, পবিত্র নাম প্রদানে সার্থক করে তুলেছিলেন কত জীবন। তাঁর শুষ্ক পাণ্ডিত্যের বোঝা জ্ঞানের অমল স্বর্ণধারায় পরিণত হয়েছিল পরম জ্ঞানীর সুবর্ণ সান্নিধ্যে এসে এবং ইষ্টানুরাগদীপ্ত সেই জ্ঞানধারা তাঁর অসংখ্য ছাত্রের প্রাণে প্রাণে যে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালিয়েছে, তারই অম্লান দীপ্তিতে শাশ্বত হয়ে থাকবেন তাদের মাস্টারমশাই।
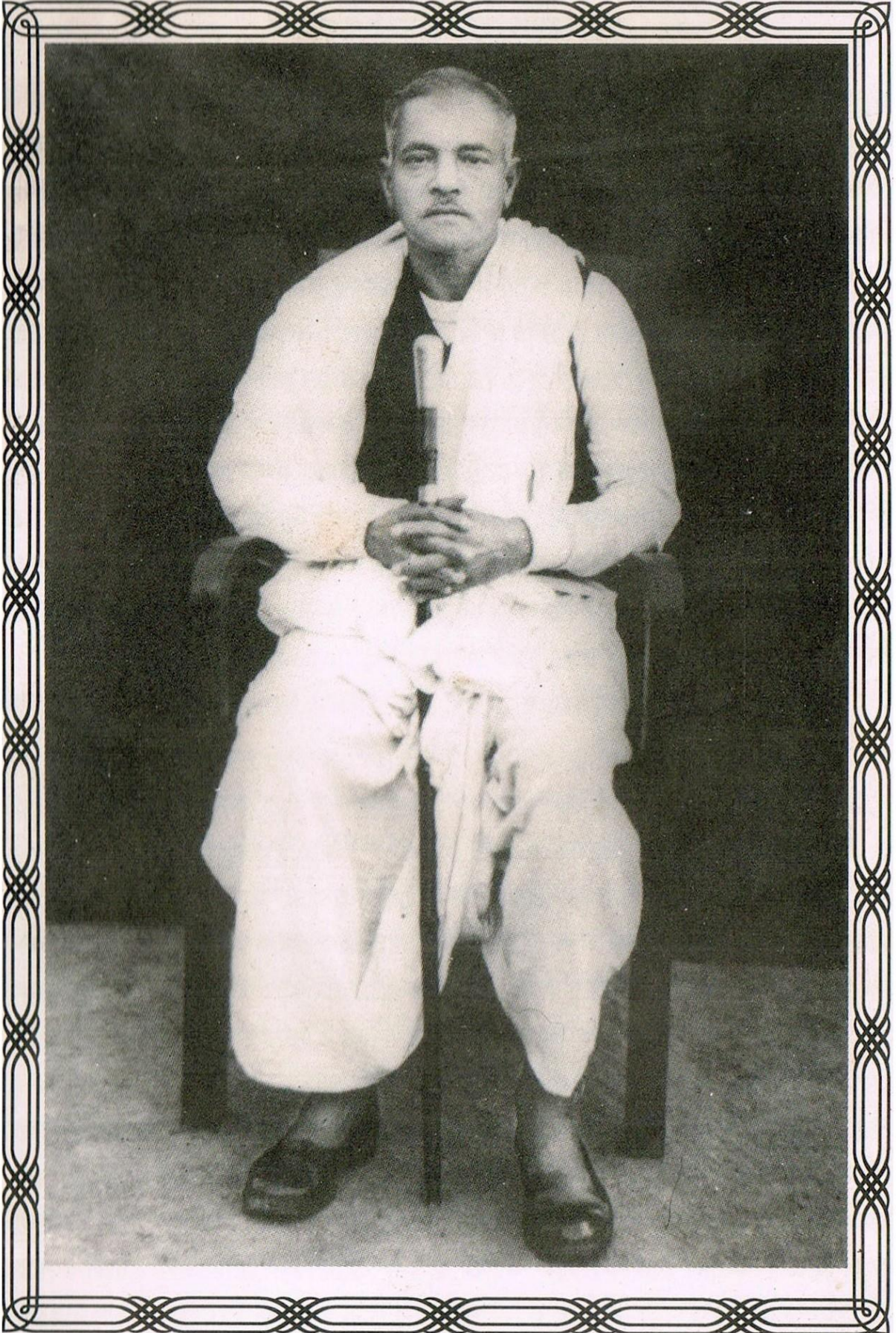
শরৎচন্দ্র হালদার

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ — ২রা শ্রাবণ, ১৩৮৯

শরৎচন্দ্র হালদার

বাইবেলে যীশুখৃষ্ট-কথিত গল্পে আছে—একজন বীজ বপনকারী কতগুলো বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর সেই বীজের কতগুলো পড়ল পাথরে, কতগুলো থেকে চারা জন্মালেও সে চারা পাখিতে ঠুকরে খেলো, আর কতগুলো উপযুক্ত জমিতে পড়ে উপযুক্ত ফসল ফলালো। কালজয়ী তাঁর সেই কাহিনী সর্ব যুগে সর্ব দেশে প্রযোজ্য। দেখা যায়, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর অমৃত-বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হলেও সেই সুধার ধারা সকলের প্রাণে পৌঁছয় না; কিন্তু প্রকৃত পিপাসু চিত্ত নিজ প্রযত্নে আবিষ্কার করে অমৃত-উৎস, আপন প্রাণ-পেয়ালা পূর্ণ ক'রে ধন্য হয় নিজে, এবং উপছে পড়া অমিয় সিঞ্চনে ধন্য করে তোলে পরিপার্শ্বকে। বিশেষ অধিকার, সত্তার বিশিষ্ট আধার ব্যতীত এই পিপাসা সকলের থাকে না, এ কথা অনস্বীকার্য। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নৈকট্য-সৌভাগ্য যঁদের হয়েছে, তাঁরা সকলেই যে সে দুর্লভ সৌভাগ্যের তাৎপর্য সমানভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা নয়। আবার অনেকে বহু দূর থেকেও অনুভব করেছেন তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ, তাঁদের প্রাণে অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে পরম প্রেমময়ের প্রবল প্রেমের আহ্বান, যে-আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের মানব-জমিনে সোনা ফলেছে। অধ্যাপক শরৎচন্দ্র হালদার এই শেষোক্ত শ্রেণীর এক উজ্জ্বল প্রতিভূ।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার চাঁপাতলা গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১০ই অগ্রহায়ণ শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বনমালী হালদার ও মাতা অমৃতময়ী দেবী, উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ঈশ্বরানুরাগী। মেধাবী ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই দৃষ্টি-আকর্ষণকারী নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপনার এক অদম্য প্রবৃত্তি যেন ছিল তাঁর সহজাত। যখন মোটে পাঁচ বছরের বালকটি, সবে পাঠশালা যাওয়ার শুরু, তখন থেকেই ঝোপঝাড়, আগাছা ইত্যাদি হাতের নাগালে যা পাওয়া যেত তাদেরই মহা উৎসাহে পড়ানো চলত; আবার পড়া না পারলে তাদের ভাগ্যে প্রহারও জুটত শিশু গুরুমহাশয়ের হাতে। খুব ছোট বয়স থেকে পূজার্চনার প্রতিও বিশেষ ঝোঁক ছিল শরৎচন্দ্রের। যখন থার্ড ক্লাসের (বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী) ছাত্র, তখন একবার সন্ন্যাস গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর মনে। গেরুয়া ধারণ করে ধুনি জ্বালিয়ে গাছতলায় বসেন তিনি; পিতামাতা বহু কষ্টে বুঝিয়ে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। একটু বড় হওয়ার পর থেকে পরিপার্শ্বস্থ সবাইকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে তোলার আন্তরিক প্রেরণা সৃষ্টি হয় তাঁর ভেতরে। গ্রামের সকলের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া, লাইব্রেরি স্থাপন, যুবকবৃন্দের চরিত্র গঠন ও নৈতিক চেতনার উন্মেষ ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে ছিল তাঁর সহজাত উৎসাহ। সকলকে নিয়ে চলা, ভাল কাজে সকলকে জড়িত করা ও উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা ও প্রবণতা তাঁর প্রকৃতিগত ছিল। একটা সামূহিক মঙ্গলের

লক্ষ্য, আদর্শপ্রাণতার সম্বেগ তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল।

বিদ্যালয়ের সীমানা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে স্নাতক পর্যায়ে শরৎচন্দ্র কলকাতায় সিটি কলেজে পড়াশুনো করেন রামমোহন হস্টেলে থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করেন, কিন্তু পেশা হিসাবে আইন ব্যবসাকে গ্রহণ করেননি তিনি। নির্বিবাদী প্রকৃতির মানুষটির পক্ষে বিবাদজীবী আইন ব্যবসা সম্ভবত বিশেষ উপযুক্ত বলে বোধ হয়নি। তবে নির্বিবাদী বা শান্তিপ্রিয় হলেও শরৎচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন। নিজের বিবেক অনুযায়ী যে-কথা যথাযথ বলে বোধ করতেন, সে-কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। এ কারণে কারও কারও তাঁকে কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষী বলে মনে হত। কিন্তু অফুরন্ত ভালবাসা ছিল তাঁর প্রাণে—তাই সাময়িক রূঢ় ভাষণ সত্ত্বেও তাঁর ভালবাসা এবং প্রাণশক্তিতে বহুসংখ্যক মানুষ আকৃষ্ট হতেন তাঁর প্রতি।

বাড়ির কাছে বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন শরৎচন্দ্র। মেধাবী ছাত্র শরৎচন্দ্র অধ্যাপনাতেও বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ছাত্রসমাজে তাঁর আদর্শমুখী ব্যক্তিত্ব, দরদী কল্যাণার্থী দৃষ্টিভঙ্গী এবং দক্ষ অধ্যাপনা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল; অচিরেই ছাত্রপ্রিয় তরুণ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হয়ে ওঠে তাঁর নাম। ছাত্রদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা, দুই-ই যথেষ্ট আকর্ষণ করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। কলেজের পরিচালন সমিতিও বিশেষ সমীহের দৃষ্টিতে দেখতেন এই তরুণ অধ্যাপকটিকে। কিন্তু গ্রাম ও পরিপার্শ্বস্থ উন্নয়নমূলক নানাবিধ কাজকর্ম এবং সফল অধ্যাপনার মধ্যেও তাঁর মনে এক অতৃপ্তি বাসা বেঁধে ছিল; মনে হত, এই বুঝি সব নয়, আরও কী যেন চাই, যা না পেলে অন্তর পূর্ণ হচ্ছে না, জীবন সার্থক হয়ে উঠছে না। শ্রীকৃষ্ণের মত সর্বসমন্বয়কারী ব্যক্তিত্বশালী কোন পুরুষের সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল করে তুলত তাঁর চিত্তকে; ইচ্ছা হত অমন সর্বপূরক সদ্‌গুরুর চরণে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আস্বাদন পেতে। অগ্রজ যোগেন্দ্রনাথ হালদার কর্মোপলক্ষে একসময় বার্মা (বর্তমান মায়ানমার)-য় ছিলেন। সেখানে যাজনকর্মে আগত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর মাধ্যমে যোগেন্দ্রনাথ সৎনাম করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি অনুজ শরৎচন্দ্রের আধ্যাত্মিক আকূতি লক্ষ্য করে তাঁকে ক্রমে ক্রমে বলতে থাকেন নিজ প্রাপ্তির কথা, পরমপুরুষের তাৎপর্য। শরৎচন্দ্রের অন্তরের গভীরে জেগে ওঠা ঈশ্বরপিপাসা তৃপ্তি খোঁজে অগ্রজ-প্রদর্শিত পথে। হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে তাঁর বোধ হয়, এই তাঁর অন্বিষ্ট সর্বসমন্বয়মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ পুরুষোত্তম। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেও বিশেষ মুগ্ধ ও তৃপ্ত হন

তিনি। অবশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের মাধ্যমেই সৎনাম প্রাপ্ত হন তিনি।

দীক্ষাগ্রহণের পর যথাসাধ্য সাধন অনুশীলনের ফলে সমাজসেবী অধ্যাপকের চৈতন্যরাজ্যে আসতে থাকে ব্যাপক পরিবর্তনের স্রোত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শের আলোকে অন্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত সমস্ত ধারণা। পরিবেশ ও সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের মূল সূত্র কী — এ বিষয়ক তাঁর এতাবৎ পালিত যাবতীয় বোধ ও সংস্কার সমূলে বদলে যেতে লাগল। তিনি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন, বাইরে থেকে তৈরি করে দেওয়া উন্নয়নের সোপান মানুষকে যথার্থ উন্নয়ন দিতে পারে না; উন্নতির প্রথম কথা আভ্যন্তরীণ সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চরিত্র গঠন, মূর্তিমান কোন আদর্শকে কেন্দ্র করেই যা হওয়া সম্ভব। মূর্তিমান আদর্শের নির্দেশ নিঃশর্তভাবে পালনের মধ্য দিয়েই বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলা যায় সপরিবেশ বর্ধনের পথে। এই বোধ তাঁর মধ্যে কত গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল তা বোঝা যায় পরবর্তীকালের এক ঘটনায়। বহুদিন পরে প্রবীণ বয়সে এক সৎসঙ্গী যুবককে তিনি বলেছিলেন—ঠাকুরের কাছে যদি না আসতাম, তাহলে এতদিনে হয়তো দেশময় আরও কতগুলো স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, হাসপাতাল তৈরি করে দেশটাকে আরও অধঃপাতে পাঠাবার, গোল্লায় দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম! অর্থাৎ আদর্শকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বাহ্যিক সংগঠনকর্ম উন্নয়নের পরিবর্তে সমাজের ক্ষতিসাধনই করে, এই ছিল তাঁর অভিমত।

দীক্ষার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎচন্দ্রকে বললেন, শরৎদা, আপনার ছুটিগুলো আমায় দেবেন? সেই কথা অনুযায়ী শরৎচন্দ্র গ্রীষ্মকালীন ও পূজার সময়কার অবকাশে চলে যেতেন হিমাইতপুরে, ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের সান্নিধ্যসুধায় পূর্ণ হয়ে উঠত অন্তর, মনেপ্রাণে পেতেন এক নবীন উদ্দীপনা। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন এই দুটি দীর্ঘ ছুটির সময়। আপন হৃদয়ের তাগিদে এবং ঠাকুরের নির্দেশে দক্ষ অধ্যাপক সুবক্তা শরৎচন্দ্র যাজনকার্য শুরু করেন; যত বেশি তৃষিত মানুষকে অমৃতপ্রাপ্তির পথে নিয়ে আসা যায়, ততই বাড়ে নিজের তৃপ্তির গভীরতা। মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের দেহত্যাগের পর ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে ঋত্বিগাচার্যরূপে পুরোভাগে রেখে গঠিত হল ঋত্বিক সংঘ। এই সময় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিঋত্বিকের পূত পাঞ্জা লাভ করেন তিনি—ঠাকুরের প্রতিনিধি হয়ে মানুষকে সৎনাম বিতরণের অধিকার অর্জনে ধন্য হন। ক্রমশই বাড়তে থাকে টান; শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমের জোয়ার সতত বর্ধনমুখী, এখানে হ্রাসের বা ভাটার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশেষে অধ্যাপনা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সব ভেসে গেল সে সর্বপ্লাবী জোয়ারের স্রোতে, পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন শরৎচন্দ্র ; ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হিমাইতপুর আশ্রমে চলে এলেন সপরিবারে স্থায়িভাবে—নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেন তাঁর কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে।

অধ্যাপনা ছেড়ে স্থায়িভাবে আশ্রমে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে তাঁর নিজের গ্রামসহ আশেপাশের সব ক'টি গ্রামের লোক অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং নানাভাবে শরৎচন্দ্রকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মত প্রাণদৃপ্ত, সর্বহিতাকাঙ্ক্ষী, মনন-প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে স্বভাবতই কেউই ছেড়ে দিতে চাইছিলেন না। বাগেরহাট কলেজ থেকে তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আশায়, কিন্তু সাগরমুখী নদীর মত অদম্য তাঁর নিজেকে নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা, কোন কিছুতেই তাঁকে টলানো গেল না। তখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেওয়ার সময় সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদায় অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেন তাঁকে। কলেজ থেকে দুটি এবং নিজের ও আশেপাশের গ্রাম থেকে আরও পাঁচটি অভিনন্দনবার্তা পান তিনি যার মধ্যে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং তাঁকে বিদায় দেওয়ার বেদনার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। এই অভিনন্দন বার্তাগুলির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের গোচরে এলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে ঐগুলি চেয়ে নিয়ে পাঠ করেন এবং কৃতী সন্তানের গর্বিত পিতার মত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

আশ্রমে যোগদানের পর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাজনকর্মে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা, ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বক্তব্য প্রকাশের দক্ষতা, আন্তরিক এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ—সবই মানুষকে আকর্ষণ করত। তাঁর স্বভাবের আর একটি বিশেষ উল্লেখ্য দিক ছিল তাঁর শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও সময়ানুবর্তিতা। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলার কর্মীদের একত্র করে ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী প্রাথমিকভাবে দুটি ভ্রাম্যমান কর্মীদল বা ট্যুরিং ব্যাচ গঠিত হয়;তার একটির নেতৃত্ব দেন শরৎচন্দ্র হালদার ও অপরটির ভার গ্রহণ করেন প্রফুল্লকুমার দাস (পরবর্তীকালে 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-র সংকলক)। এর পরে আরও দু'টি ট্যুরিং ব্যাচ গঠিত হয়। এই ভ্রাম্যমান দলের নেতা হিসাবে সারা ভারতে—বিশেষত পূর্বের আসাম অঞ্চলে ও পশ্চিমের মহারাষ্ট্রে শরৎচন্দ্র অগণিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। প্রসঙ্গত এই ট্যুরিং ব্যাচ-এর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা যে-অঞ্চলে যেতেন, সেখানকার সমাজের প্রতিপত্তিশালী গণ্যমান্য ব্যক্তিসমূহের সঙ্গে প্রথমে পরিচিতি হয়ে, ঠাকুরের আশীর্বাদ-উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্বে তাঁদের মুগ্ধ করে, তাঁদেরই মাধ্যমে সে-সমস্ত সমাজের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বকল্যাণসন্ধী ভাবধারা পৌঁছে দিতেন—দলে দলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সৎনাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হত। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরি, মন্দির-মসজিদ, বার লাইব্রেরি, কমিউনিটি হল ইত্যাদি জায়গায় নানা আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা সভা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদির মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের সকল মতের মানুষকে

মাতিয়ে তুলতেন এইসব সুযোগ্য কর্মীর দল, যাঁদের অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন শরৎচন্দ্র। অনেক সময় স্থানীয় ডাকবিভাগ থেকে সে-অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সন্ধান নিয়ে নিতেন ট্যুরিং ব্যাচ-এর কর্মীবৃন্দ।

দীপ্তপ্রাণ শরৎচন্দ্র যাঁর আদেশ ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন যাজন পথে, তাঁরই ভরসায় নিঃশঙ্কচিত্তে রেখে যেতেন স্বীয় পরিবার-পরিজনকে। হিমাইতপুর আশ্রমে কিংবা আশ্রমকর্মীদের পরিবারে তখন বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য একেবারেই ছিল না। শরৎ-জায়া রাধারাণী দেবীর কাছে শোনা কিছু কাহিনী এখানে উল্লেখ্য, যাতে ভক্তের ভগবানের করুণার আভা বিচ্ছুরিত।

বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে আশ্রমে পাকাপাকিভাবে চলে আসার পর শরৎচন্দ্রকে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বলেন, শরৎদা, কত হলে আপনাদের চলে? তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীকেও পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কী রে, কত হলে তোদের চলে? উত্তরে তিনি বলেন, আপনি আর্শীবাদ করে যা দেবেন, তাতেই আমাদের চলবে। শরৎচন্দ্র জানান যে মাসে ষাট টাকা হলেই চলবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, আপনার মা'কে পাঠাতে হয় না? আরও পনের টাকা মায়ের জন্য থাকুক। তখন স্থির হয়— মোট পঁচাত্তর টাকা করে মাসে দেওয়া হবে শরৎচন্দ্রের পাঁচটি সন্তানসহ পরিবার প্রতিপালনের জন্য। ঠাকুর মধ্যম ভ্রাতা পূজনীয় ক্ষেপুদাকে ডেকে সেইমত নির্দেশ দ্যান।

এর কিছুদিন পর ঠাকুর বলেন—শরৎদা অধ্যাপনা ছেড়ে এসেছেন, ওঁর পরিবারকে পুরোপুরি একশ টাকা করেই দেওয়া হোক। শরৎচন্দ্র তখন যাজনকর্ম উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ায়। তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী সই করে টাকা আনতে গিয়ে দেখেন, পঁচাত্তরের জায়গায় একশ টাকা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বেশি টাকা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করায় যিনি টাকা দিচ্ছিলেন তিনি বলেন যে এরকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাধারাণী দেবী বলেন, উনি (শরৎচন্দ্র) তো এখন এখানে নেই, ওঁর অনুমতি ব্যতীত আমি বেশি টাকা নিতে পারব না। তখন ঐ কর্মী ইষ্টভ্রাতা তাঁকে বলেন, আপনি সই না করেই তাহলে পঁচাত্তর টাকা নিয়ে যান, শরৎদা অনুমতি দিলে সই করে বাকি টাকা নেবেন।

রাধারাণী চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে বিষয়টি জানালে তাঁর কাছ থেকে উত্তর পান— ওঁরা আশীর্বাদ করে যা দেবেন, তা মাথা পেতে নিতে হয়, তবে অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা তুমি বরং ঠাকুর-প্রণামীরূপে দিও। এভাবেই চলল আট মাস। এরপরে শরৎচন্দ্রকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর অকস্মাৎ একদিন বললেন, শরৎদা, ওটা (আশ্রম থেকে দেওয়া টাকাটা) ছেড়ে দিতে পারেন না? উত্তরে শরৎ বলেন, ভেবে দেখি। দু'একদিন পর রাধারাণী গেছেন ঠাকুর-প্রণামে, তাঁকে ডেকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—কী রে , কী ঠিক করলি?

—কোন্ ব্যাপারে?

—কেন, শরৎদা তোকে কিছু বলেনি?

—না তো!

—তাহলে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নে—

বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঠাকুর অ্যালাওয়েন্স ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। দুজনে মিলিতভাবে স্থির করেন যে ঠাকুরের যখন ইচ্ছা তখন তা ছেড়ে দেওয়াই ভাল; তাঁর আশীর্বাদে ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। সে-কথা ঠাকুরকে জানাতে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন; বলেন, শরৎদা, আগে আপনার যজমানদের কাছে চাইবেন, তারপর দরকার হলে চাইবেন অন্যান্য গুরুভাইদের কাছে।

তদনুযায়ী এরপর থেকে যজমান এবং অন্যন্য গুরুভাইদের দানের ওপর নির্ভর করেই চলল তাঁর সংসারযাত্রা। শরৎ-গৃহিণী ডাল ভেঙে, বড়ি দিয়ে হাসিমুখে সংসার সামলাতেন অটুট ইষ্টপ্রণতা নিয়ে। একরকম স্থিতিশীল অবস্থা হয়ে উঠেছিল তাঁদের।

কিন্তু আবার দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৪৬-এর ২রা সেপ্টেম্বর হিমাইতপুর ছেড়ে দেওঘর এলেন। ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা পূজনীয় ক্ষেপুদার শরীর তখন অসুস্থ থাকায় ঠাকুরের নির্দেশে দিন সাতেক পর ক্ষেপুদা কিছুটা সুস্থ হলে তাঁকে নিয়ে সপরিবারে শরৎ এলেন দেওঘর। আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হল সবকিছু।

শরৎচন্দ্র দেওঘরে এসেও আগের মতই ব্যাপক যাজনকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। এদিকে পাঁচটি সন্তান নিয়ে রাধারাণী সংসার চালান ঠাকুরের আশীর্বাদ ভরসা করে। ইষ্ট কাজের ব্যাঘাত হতে পারে মনে করে কখনও স্বামীর কাছে কোন অসুবিধা বা অনটনের কথা জানাতেন না তিনি। একদিন এমন অবস্থা হল যে ঘরে কিছুই প্রায় নেই, রাত্রি কাটলে পরদিন ছেলেমেয়েদের কী খেতে দেবেন, জানা নেই। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর-প্রণামে গিয়ে ঠাকুরের চোখের দিকে তাকান না রাধারাণী, পাছে চোখে চোখ পড়লে ঠাকুর কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন! ঠাকুর কিন্তু বারবারই তাকাচ্ছেন তাঁর মুখের দিকে, আর উনি কেবলই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুয়ে শুয়ে অরণির গুরুভক্তির উপাখ্যান শোনাচ্ছেন। বেশ রাত হয়ে গেছে। হঠাৎ দরজায় কারও করাঘাত। 'কে'—জিজ্ঞাসার উত্তরে বুঝলেন—তদানীন্তন সেক্রেটারি প্রমথনাথ দে এসেছেন সস্ত্রীক। দরজা খুলে তাঁদের আপ্যায়ন করে বসালেন। প্রমথনাথ বললেন, প্রায়ই ভাবি আসব, শরৎদা এখানে থাকেন না, আপনাদের খোঁজ খবর নেওয়া তো আমাদের কর্তব্য, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না। তারপর নানা কথাবার্তা, ঠাকুরেরই নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলল বহুক্ষণ পর্যন্ত। অনেক রাতে ওঁর বিদায় নেওয়ার জন্য উঠলেন। দরজা পর্যন্ত এগোতে গেলেন রাধারাণী দেবী, প্রমথনাথ তখন অকস্মাৎ তাঁর ভৃত্যের নাম ধরে ডেকে বললেন, ওরে, ঝুড়িটা ভেতরে দিয়ে যা। এতক্ষণ

অপেক্ষমান ভৃত্যটি মস্ত এক ঝুড়ি ভেতরে এনে রাখল—তাতে রয়েছে দশ সের চাল, আনুষঙ্গিক ডাল, মশলা, তেল, আনাজপত্র যাবতীয় জিনিষ। প্রমথনাথ বললেন, জিনিযগুলো গুছিয়ে রাখুন, আপনাদের জন্য এনেছি। অভিভূত রাধারাণীর তখন দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। তাই দেখে তাঁরা বললেন—কী হল, কাঁদছেন কেন? আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কোনমতে তিনি বলেন, এ আমার দুঃখের কান্না নয়, পরম দরদী অন্তর্যামীর করুণার কথা ভেবে আমার চোখের জল সামলাতে পারছি না।

নিরবচ্ছিন্ন যাজন ছিল শরৎচন্দ্র হালদারের কর্মধারার মূল লক্ষ্য। প্রায় সমগ্র ভারত তিনি পরিক্রমা করে বেরিয়েছেন যাজন উপলক্ষে। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে টাটানগরে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয় নগেন্দ্রনাথ সেন, কমলাক্ষ সরকার ও অন্যান্য ইষ্টভ্রাতার উদ্যোগে। সেই উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ বড়দা, ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শরৎচন্দ্র হালদার, প্রফুল্লকুমার দাস প্রমুখ টাটানগরে যান। পূজ্যপাদ বড়দা, ঋত্বিগাচার্য্য ও শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে টাটানগর পৌঁছান। শরৎচন্দ্র হালদারের সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র গুরুপ্রসাদ। নগেন্দ্রনাথ সেন সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেন, "দাদা, একটু অপেক্ষা করুন; দুটি গাড়ি জোগাড় হয়েছিল—একটিতে বড়দাকে, আর একটিতে কেষ্টদাকে তুলে দিয়েছি, আপনার জন্য আর একটি গাড়ি নিয়ে আসছি।" এই বলে তিনি গাড়ির সন্ধানে যাওয়ামাত্র শরৎচন্দ্র পুত্র গুরুপ্রসাদকে বলেন, "নে, মাল তুলে নিয়ে চল্ রওয়ানা হই।" পিতাপুত্র দুজনে নিজেদের মালপত্র নিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে উৎসবস্থলে উপস্থিত হলেন। নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বললেন—"আপনি হেঁটে এলেন কেন? আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে গিয়ে আর আপনাকে পেলাম না!" শরৎচন্দ্র দৃঢ় প্রত্যয়ে উত্তর দিলেন—"আমার ঠাকুরের উৎসবে আমি এসেছি; আমি কি আপনার অতিথি যে আপনি গাড়ি নিয়ে আসবেন আমার জন্য আর আমি সে গাড়িতে যাব? আমি এসেছি আমার নিজের তাগিদে।" এই ছিল ইষ্টসর্বস্ব মানুষটির পরিচয়। উল্লেখ্য, টাটানগর উৎসবের অল্প কিছুদিন পর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর যতি বিষয়ক আলাপ আলোচনা ইত্যাদি শুরু করেন। ১৯৪৮-এর ১২ই অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলার অভ্যন্তরে যতি-আশ্রমের সূত্রপাত করেন। সম্পূর্ণত সংসার বিমুক্ত সন্ন্যাসীপ্রতিম জীবনযাপন করে যতিগণ তীব্র সাধনা ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে সৎসঙ্গ আন্দোলনের মূল ভাবধারা যথাযথভাবে ধারণ করে রাখবেন এবং উপযুক্তভাবে তা পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন, এই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের অভীপ্সা। এই উদ্দেশ্যে কালিদাস মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ দাস, শরৎচন্দ্র হালদার, যন্তা সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী এই ছ'জনকে ঠাকুর 'যতি' অভিধায় অভিহিত করে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যতি

আশ্রমে বসবাসের নির্দেশ দেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপশ্চর্যায় শরৎচন্দ্র ইষ্টনির্দেশ মূর্ত করায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। নিজ পরিবারকে অন্যান্য পরিবারের মত একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে—যতিগণের প্রতি ঠাকুরের এই নির্দেশ তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করে চলতেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ঋত্বিকের পূত পাঞ্জা প্রাপ্ত হন তিনি। যাজন উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ানো ছিল তখনও অব্যাহত। একবার আগরতলা যাওয়ার কথা। ঠাকুর ডেকে বললেন—শরৎদা, ওখান থেকে আমার জন্য কয়েকটা বেতাং (বেতের ডগা) আনবেন তো! তিনি 'আজ্ঞে, আনবো' বলে প্রণাম করে চলে যাওয়ার পর সম্মুখে উপস্থিত ইষ্টকর্মী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর রহস্যঘন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন—বল্ তো, ওকে বেতাং আনতে বললাম কেন? দেবীপ্রসাদ উত্তর দ্যান, আজ্ঞে, তা তো আপনিই জানেন। ঠাকুর বলেন, বক্তৃতার ঝোঁকের চেয়ে আমার ঝোঁকটা বেশি থাকলে ও saved হবে, এই জন্য বললাম।

কিছুদিন পর আগরতলা থেকে ফিরলেন শরৎচন্দ্র, ঠাকুরের জন্য কিছু 'বেতাং' সংগ্রহ করে এনে দিলেন তাঁকে। তারপরই শুরু হল মারাত্মক রক্ত আমাশয়, প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা। অনেক চিকিৎসায় এবং ঠাকুরের দয়ায় আরোগ্য লাভ হল। সম্ভবত ঐ বেতাং সংগ্রহার্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মনোযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলেই ঐ প্রাণঘাতী রোগ বিদেশ বিভূঁই-এ তাঁকে কাবু করে ফেলতে পারেনি, স্বীয় স্থানে ফেরা পর্যন্ত প্রতিহত হয়ে ছিল।

আর একবারের ঘটনা। শরৎচন্দ্রের এক কন্যার অকাল মৃত্যুর পর তাঁর শিশু সন্তানগুলির প্রতিপালনের দায়িত্বও শরৎচন্দ্রের পরিবারের উপর এসে পড়ে। শরৎচন্দ্র তখন যতি-আশ্রমে থাকতেন। কন্যার মৃত্যুর মাস দেড়েক পরে অকস্মাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে তাঁর স্মৃতি লোপ ও বাক্‌রোধ হয়ে যায়! তাঁর সহধর্মিণী রাধারাণী দেবী স্বামীর অসুস্থতার সংবাদ পাওয়ামাত্র ছুটে আসেন এবং যতি আশ্রমের বাইরে একটি ঘরে থেকে অতন্দ্রভাবে স্বামীসেবায় নিরত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেসময় অত্যন্ত অসুস্থ, তাই কেউ তাঁর দর্শন পাচ্ছে না। রাধারাণী দেবী মনে ভাবেন, 'একবার যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম! তাঁকে সব নিবেদন করতে পারলেই সব বিপদ কেটে যেত।' অবশেযে এক ফাঁকে রাধারাণী পৌঁছে যান ঠাকুরের কাছে, তাঁর চরণে নিবেদন করেন শরৎচন্দ্রের অবস্থা। ঠাকুর সব শুনে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে শরৎচন্দ্রের একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসার নির্দেশ দেন এবং সেইমত চিকিৎসা চলতে থাকে। তাঁর চিকিৎসার জন্য ঠাকুর পাটনার সিভিল সার্জনকেও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। প্রতিনিয়ত শরৎচন্দ্রের অবস্থার খোঁজ নিতেন ঠাকুর। বাগ্মীপ্রবর মানুষটির কণ্ঠ তখন সম্পূর্ণ নীরব। খুব ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি ফিরে এলেও বাকস্ফূর্তি আর হয় না। ঠাকুর আশ্বাস দেন—'হবে, আবার সব হবে, শরৎদা আবার

বক্তৃতা করতে পারবেন।' রাধারাণী দেবীকে বলেন, 'তুই গান করতে পারিস?' উত্তরে রাধারাণী 'না' জানালে তিনি বলেন, 'এক কাজ কর, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে শরৎদার সামনে যতজোরে সম্ভব 'উউউ'—এরকম আওয়াজ করে চলবি। রাধারাণী দেবী ঠাকুরের কথামতন তাই করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় এবং রাধারাণী দেবীর ঐকান্তিক সেবায় চৌদ্দ দিনের দিন শরৎচন্দ্র 'জয়গুরু' শব্দটি অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারলেন। পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে এর পরেও তাঁর আরও বেশ কিছুদিন লেগেছিল। ঠাকুরের কাজ করতে পারছেন না এই আক্ষেপে তখন মাঝে মাঝেই তিনি আকুল হয়ে উঠতেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন—'আমার আর থেকে কী লাভ? আমি আপনার কাজ করতে পারছি না!' ঠাকুর উত্তরে বলেন,—'না শরৎদা, আপনাকে থাকতে হবে। আপনি মহাস্থবিরের মত এখানে বসে থাকবেন, তাতেই আমার অনেক কাজ হবে।' পরমদয়ালের দয়ায় তিনি পুনরায় কর্মক্ষমতা ফিরে পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত নীতিবিধির রূপায়ণে তাঁর ছিল অপরিসীম ঐকান্তিকতা। বিপ্রবর্ণে নিজের দুই কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন ঠাকুর-ঈঙ্গিত 'বারুজীবী সম্প্রদায়ের কন্যার উচ্চ অসবর্ণ বিবাহ কাম্য'—এই বিধি অনুসরণে। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের আদর্শ রূপায়ণের বিষয়টি সম্যকরূপে অনুসরণ করা অত্যন্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তীব্র আদর্শানুরাগ সাপেক্ষ। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের অর্থ হল সবর্ণে এক স্ত্রী গ্রহণের পর নিম্নবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ রূপায়িত করার তাগিদে তিনি দুই কন্যারই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দিয়ে সচেতনভাবেই তাদের সপত্নীগৃহে প্রেরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর কন্যাগণ সকলেই সুরূপা এবং শিক্ষিতা। ব্যক্তিগত জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন; সহ্য করতে হয়েছে এক পুত্র ও এক কন্যার অকাল মৃত্যুশোক এবং তজ্জনিত পারিবারিক বিপর্যয়; কিন্তু তাঁর ইষ্টানুরক্তি কখনও টলেনি।

বর্তমানে আশ্রমকর্মীর পুত্রগণ অনেকেই আশ্রম পরিত্যাগ করে বহির্জগতে কর্মে নিযুক্ত হচ্ছেন এবং বাইরের লোক আসছেন আশ্রমের কাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কিন্তু এরকম অভিপ্রেত ছিল না। তিনি আশ্রমিকগণ সপরিবারে আশ্রমিক এবং ইষ্টকেন্দ্রিক হয়ে চলুক—এমনই চাইতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর পুত্র গুরুপ্রসাদ এম. এ. পাশ করার পর তাঁকে বলেছিলেন, আমি ঠাকুরের কথায় অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাজ নিয়ে সারাজীবন চলেছি, আমার ইচ্ছা, তুমিও ঠাকুরের কাজ নিয়েই থাক। তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিতার আদর্শপ্রাণতার সার্থক উত্তরাধিকারীরূপে আশ্রমের তপোবন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রত্যূষে ভ্রমণে বেরোতেন প্রতিদিন,

এবং তখন বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে সকলের খবরাখবর নিতেন। তাঁর মাধ্যমে সৎনাম প্রাপ্ত বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে গণ্যমান্য, বিশিষ্ট, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন অনেক। তিনি সকলের সঙ্গেই চিঠিপত্র, যাতায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে যথাসাধ্য যোগাযোগ বজায় রাখতেন। উৎসবের সময় বা কনফারেন্স-এ আগত বহু কর্মী এবং ইষ্টভ্রাতা তাঁদের টাকাপয়সা শরৎচন্দ্রের কাছে গচ্ছিত রাখতেন, নিয়ে ঘোরাফেরা করলে হারিয়ে কিংবা চুরি হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায়। তিনি প্রত্যেকের টাকা পৃথক পৃথক ভাবে নাম লিখে রেখে দিতেন এবং শত প্রয়োজনেও কখনও একটি সিকিও অল্প সময়ের জন্যও নেননি; 'এখনকার মত কাজ চালিয়ে নিই, যার টাকা তাকে দেওয়ার আগেই পূরণ করে রাখব'—এ ধরনের কোন শৈথিল্যকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। অসামান্য বাগ্মিতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সংযোগে যে কোন পরিস্থিতি নিজের বশে নিয়ে আসার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কোন সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে সংসারে নারীপুরুষের দায়িত্ব ও অবস্থান বিষয়ে এমন কিছু হয়তো বললেন যে উপস্থিত পুরুষ শ্রোতৃবৃন্দ সোল্লাসে সমর্থন করলেন তা, অপরপক্ষে নারীমণ্ডলী কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। কিছু পরেই হয়তো আবার তাঁর বক্তব্যে নারীমহল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, পুরুষপক্ষ তখন বিব্রতমুখে চুপ!

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে নববর্ষ উৎসবের সময় পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করলেও তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা-বিরোধী কিছু বক্তব্য রাখেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন যুগান্তর পত্রিকার তৎকালীন উপ-সম্পাদক, ইষ্টভ্রাতা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবুর বক্তব্যের পর তিনি তাঁর বক্তব্যে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করেন। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর সপক্ষে ও বিরুদ্ধবাদী বক্তার মত খণ্ডনে একের পর এক যুক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি থামার পর আবার পাঁচুগোপাল তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করেন। এভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তি-উৎসব সভা এক অস্বস্তিকর বিতর্কসভায় পরিগণিত হওয়ার উপক্রম হয়। পাঁচুগোপালের বক্তব্য শেষ হওয়ার মুখে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় উত্তেজিতভাবে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই সময় পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র হালদার—বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে কোন সুযোগ না দিয়ে মাইক টেনে নিয়ে বলতে শুরু করলেন— কমিউনিস্ট মানে যদি com une ist, অর্থাৎ একের সঙ্গে সংযুক্ত বোঝায়, কমিউনিজ্‌ম্‌ মানে যদি সকলের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার, ভালো থাকার পথকে বোঝায়, তবে Sri Sri Thakur is a communist to his backbone.

শরৎচন্দ্রের এই কথা শোনামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। এরপর কমিউনিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতবাদের সাযুজ্য এবং ঠাকুরের ভাবধারায় স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জল এক আলোচনা করে সমগ্র পরিস্থিতিটিই পরিবর্তিত করে ফেললেন বাগ্মীপ্রবর শরৎচন্দ্র। ঠাকুরকে যথার্থভাবে অন্তরে নিয়ে চলার ফলেই তাঁর সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা আরও বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

সভা-সমাবেশে আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও শরৎচন্দ্র বৈঠকী আলাপ-আলোচনাতেও ছিলেন বিশেষ পটু; ইষ্টভ্রাতারা যে যেখানে সৎসঙ্গ অধিবেশনের ব্যবস্থা করতেন, সকলেই চাইতেন শরৎদাকে;তিনিও প্রত্যেক স্থানে হাজির হতেন, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায়, মনোজ্ঞ ঘরোয়া আলোচনায় অনুপ্রাণিত করে তুলতেন উপস্থিত সকলকে। সামাজিক দায়বদ্ধতা, যা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল, যেন প্রকৃতিগত ছিল তাঁর এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে তা বহুগুণিত হয়ে ওঠে। গৌরবর্ণ, সুন্দর কান্তি ছিল তাঁর, ঋজু চরিত্রের সমন্বয়ে যা সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

একা কখনও কিছু উপভোগ করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যখনই যেখানে যেতেন, যা করতেন, সঙ্গে থাকত বেশ কিছু সঙ্গী। চমৎকার রান্নার হাত ছিল তাঁর। শাক, বড়ির ঝোল, চচ্চড়ি, মোচাঘন্ট ইত্যাদি নানা পদ মেয়েদের মত রীতিমত গুছিয়ে সুন্দর করে রাঁধতে পারতেন। ঠাকুর-ঈপ্সিত সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন পারদর্শিতা ছিল তাঁর চরিত্রগত। যতি-আশ্রমে থাকাকালীন ভিক্ষালব্ধ উপকরণে সযত্নে নানা পদ রান্না করে যতি আশ্রমস্থ সকলকে, বিশেষত আশ্রম দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত খগেন মণ্ডল ও তার পরিবারবর্গকে খাওয়াতেন। যা রান্না করতেন, তার সামান্য অংশই নিজের জন্য থাকত, অধিকাংশই বিতরণ করতেন। অপরকে উপভোগ করানোর আকাঙ্ক্ষাই হয়তো পরম উপভোগ্য সদ্‌গুরু-প্রাপ্তি সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্য যাজন কাজে তাঁকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে।

পাবনা থাকাকালীন ছোট্ট একটি ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পরিচিত ভঙ্গীতে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন; শরৎচন্দ্র সেদিকে আসছিলেন। ঠাকুর তাঁকে ডেকে নিজের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি ঠাকুরের পা টিপে দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে। একটু পরে তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরৎদা, 'সর্ব ধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ঠাকুরের এই বলা তিনি আমৃত্যু অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

ষাটের দশকেই ঘটে তাঁর দুই সন্তানের অকালমৃত্যু। শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল —আগের মত আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইষ্টকর্মে ছেদ পড়েনি কখনও, প্রতি রবিবারে অনুসন্ধিৎসু সভা পরিচালনা করতেন, নিত্য ছিলেন

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

যাজন-মুখর।

১৯৬৯-এর ২৬শে জানুয়ারী ঘনিয়ে এল সে কালরাত্রি —শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐহিক লীলার অবসান হল। এর অল্পদিন পরে মার্চ মাসে তৎকালীন সৎসঙ্গ প্রেসিডেন্ট ভক্তপ্রবর সুশীলচন্দ্র বসুর প্রয়াণ ঘটে। তখন পূজ্যপাদ বড়দা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ আত্মজ)-র ইচ্ছানুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে শরৎচন্দ্র সৎসঙ্গের সভাপতি পদে বৃত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে অধিষ্ঠান করেন। অবিরাম যাজন কর্মের অবকাশে বহু সাধু সন্ত মনীষীদের বাণী চয়ন করে 'যুগবাণী' নামে একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। Whither India নামক একটি মূল্যবান ইংরেজি পুস্তিকাও প্রণয়ন করেন তিনি।

প্রকৃতির নিয়মে জরা এবং তজ্জনিত অসুস্থতা দেখা দেয় শরৎচন্দ্রের শরীরে—মন যদিও ছিল সদাজাগ্রত, ইষ্টানুভবী। শারীরিক অসুস্থতার দরুন যতি-আশ্রম ছেড়ে পুরাণদহে পারিবারিক গৃহে অবস্থান করতে থাকেন তিনি। ক্রমেই আরও জীর্ণ, অশক্ত হয়ে পড়ে পার্থিব দেহমন্দির, অভ্যন্তরের আত্ম-দেবতা, শ্রীবিগ্রহ যেন অন্যতর নিগূঢ় কোন যাত্রায় অভিলাষী! অবশেষে, কালের অমোঘ বিধানে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই একাশি বৎসর বয়সে নির্বাপিত হয় তাঁর ঐহিক জীবন প্রদীপ—পরম ঈপ্সিত পদে লাভ হয় পরমা গতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবৃদ্ধিদ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত-প্রাণ শরৎচন্দ্রের নাম সৎসঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য

৪ঠা মার্চ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ — ৪ঠা জুন, ১৯৬৩

কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য

বস্তুগত জীবনে বিশেষ সাফল্য, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির দুর্নিবার আকর্ষণ জয় করে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণে এসে নানাবিধ পার্থিব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে হাসিমুখে তাঁরই সেবায় নিজেদের নিঃশেষে নিবেদনের মাধ্যমে ধন্য হয়েছেন, প্রথিতযশা চিকিৎসক কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য।

১৩০১বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ, ১৮৯৫ খৃঃ) ঢাকা জেলার অন্নপুর গ্রামে বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হরনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র কেদারনাথের জন্ম হয়। তাঁর মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। মাত্র চার বছর বয়সেই কেদারনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে একটি তেজী, একরোখা, জোরালো সত্তার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। নিজের চেষ্টায় পড়াশোনা আরম্ভ করেন পিতৃহীন বালক কেদারনাথ। বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরবর্তী তেঁওথা হাইস্কুলে পড়তে যেতেন; সেখানে কুমুদশঙ্কর রায় (পরবর্তীকালে প্রখ্যাত চিকিৎসক, যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল যাঁর নামাঙ্কিত) এবং কিরণশঙ্কর রায় (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) প্রমুখের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ তখন বাংলার তরুণের হৃদয় জুড়ে; সেই উত্তেজনাপূর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৃপ্ত তরুণ কেদারনাথ গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সহজাত মেধা ও স্বীয় পুরুষকার, দু'য়ের সমন্বয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন তিনি। পরে কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। বি. এ. পাঠ সমাপ্ত করার পর পরীক্ষায় বসার সময়ে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন ম্যালেরিয়া জ্বরে, ফলে বি. এ. পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। এরপর শিক্ষকতা শুরু করেন।

ম্যালেরিয়ার মহামারীর কবল থেকে গ্রামবাংলার অধিবাসীদের মুক্ত করার মানসে কেদারনাথ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেন। ভর্তি হন ঢাকার মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে। কিন্তু দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন ছিল তাঁর অন্তর জুড়ে। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। মেডিক্যাল ফাইনাল পরীক্ষার আগে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগদান করে মেডিক্যাল স্কুলের ইংরেজ প্রিন্সিপালের বিরাগভাজন হন কেদারনাথ, তাঁকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার অনুমতি নাকচ করে দেন প্রিন্সিপাল।

পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী নেওয়া সম্ভব না হলেও মেধাবী কেদারনাথের চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষভাবে অধিগত হয়েছিল। ফরিদপুর জেলার রাজবাড়িতে ডাক্তারি শুরু করেন তিনি এবং অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কলেরা—তৎকালীন গ্রামবাংলার কালান্তক বিভীষিকা এই তিন রোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক্তার কেদারনাথ

ভট্টাচার্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রাজবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং গোয়ালন্দ মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন তিনি। এরই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার যজ্ঞ। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল এবং বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী হিসেবে তাঁর এক বছর কাটে।

জেলে থাকাকালীন বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কেদারনাথের পরিচয় ঘটে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু জেলের ভিতর বিশেষ সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য অনেক নেতার আগ্রহাতিশয্য তাঁকে আহত করে; ভাবেন—দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করার পণ করেছেন, সামান্য শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা কেন এত ব্যাকুল? এই সুবিধালোভী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে ব্যথিত করে। মনে হয়, এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে কোথায় যেন ফাঁকি আছে, আছে আত্মপ্রবঞ্চনা। স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষমতা পেলে এ সমস্ত আত্মস্বার্থী নেতৃবৃন্দ যে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার প্রতিই দৃষ্টি দেবেন, এ কথাও তাঁর মনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল।

জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেল—দেখা দিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিরূপতা। মানসিক এই পরিস্থিতিতে ঘটনাচক্রে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হন। আগে মানুষ তৈরি, তারপর স্বাধীনতা— পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই মতবাদ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার কথা তখনও মনে আসেনি।

রাজবাড়ি শহরে তাঁর চিকিৎসার পশার, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বৈষয়িক বৈভব— সব মিলে তাঁকে ব্যবহারিক দিক থেকে চূড়ান্ত সফল জীবন এনে দিয়েছিল। আত্মীয়-পরিজন, পরিচিত মহলে তাঁর উপাধি ছিল 'রাজবাড়ির মুকুটহীন রাজা'। কিন্তু বাইরের পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি তাঁর অন্তরকে তৃপ্ত করতে পারত না, ভেতরে ছিল অন্যতর প্রাপ্তির তাগিদ। নানা প্রশ্ন উদিত হত মনে, যার সমাধান খুঁজতে হাজির হতেন বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মপ্রচারক ফকির দরবেশের দরবারে। কিন্তু যথাযথ উত্তর পাননি কারও কাছে, মনের অতৃপ্তি বেড়েই চলল।

রাজবাড়ি রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত। তিনি একবার ঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করে তাঁর অনুমতিক্রমে হিমাইতপুর আশ্রম থেকে কীর্তনের দল নিয়ে আসেন ফরিদপুর। সেই কীর্তনের দলে অন্যান্যদের মধ্যে মহারাজ অনন্তনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস, ব্রজগোপাল দত্তরায় প্রমুখ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-প্রচারে তাঁদের উদ্দীপনার অমিয় প্রভাবে ফরিদপুরে বহু মানুষ সৎনাম গ্রহণ করেন। ফরিদপুর থেকে ঐ দল আসে রাজবাড়ি।

কীর্তনে রাজবাড়ি শহরকে মাতিয়ে তুলে সেখানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়। যথারীতি কেদারনাথ ভট্টাচার্যও উপস্থিত হন সেখানে তাঁর অমীমাংসিত প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে। পূর্ব অভিজ্ঞতাবশত ধারণা নিয়েই এসেছিলেন যে, প্রকৃত সমাধান এখানেও পাওয়া যাবে না কিছুই। কিন্তু এই প্রথম পর্যুদস্ত হলেন কূটপ্রশ্নকারী; তার্কিক, অভিমানী চিকিৎসক, পরাজিত হয়ে জীবনের সবথেকে বড় বিজয়মাল্য বরণ করলেন তিনি; বাদ-বিতণ্ডার অসার অহমিকা বিসর্জন দিয়ে শরণ নিলেন সকল প্রশ্নের চরম সমাধানকারী সর্বজ্ঞ পুরুষের। ব্রজগোপাল দত্তরায় লিখিত জীবনীগ্রন্থ "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এখানে একান্ত প্রাসঙ্গিক :

"কীর্তন অন্তে মহারাজ (শ্রীঅনন্তনাথ রায়) শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব জীবন ও বাণী এবং সৎনামের অপার মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই আলোচনা সভায় স্থানীয় ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া মহারাজের নিকট নানা কূটপ্রশ্নের উত্থাপন করিলেন। উক্ত ভদ্রলোক ইতিপূর্বেও নাকি বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারককে এইরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করিলাম—মহারাজ উক্ত ব্যক্তির উত্থাপিত প্রশ্নাদির কোনরূপ মীমাংসা দান করিতে আদৌ চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্বভাবসুলভ সহাস্যবদনে শুধু বলিলেন—'দেখুন দাদা, বহুদিন ধরেই তো শুধু তর্কবিতর্ক করেই আসছেন, এখন এসব ছেড়ে দিয়ে একবার একটু কাজ করেই দেখুন না, কী হয়। যদি কোন সুফল না পান, ছেড়ে দিতে কতক্ষণ! নাম নিতে বা ছাড়তে তো টাকা-পয়সা লাগবে না! কাজ না করে শুধু কথা বলে লাভ কী?' মহারাজের সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট উক্তিগুলি শুনিয়া ভদ্রলোকটি আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ সৎমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিলেন।"

কেদারনাথের দীক্ষাগ্রহণ বাহ্যিকভাবে অকস্মাৎ মনে হলেও বস্তুত এর ক্ষেত্র যে বহুদিন যাবতই প্রস্তুত হচ্ছিল, সেকথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর যে তীব্র অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় ভাবসরিৎধারায় তারই নিবারণ হল, তাঁর আত্মিক অনুসন্ধানের আকূতি খুঁজে পেল এক নিশ্চিত প্রত্যয়ভূমি।

আদর্শপ্রাণতা এবং বিপুল কর্মোদ্যম ছিল তাঁর প্রকৃতিরই অঙ্গ; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি রাজবাড়িতে ঠাকুরের ভাবাদর্শে তপোবন বিদ্যালয়, হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য কারিগরি বিদ্যালয় এবং আনন্দবাজার স্থাপন করেন। তপোবন বিদ্যালয়ে ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক পৃথক হাইস্কুল ছিল। স্কুলে বিনা বেতনে পড়ানো হত এবং আনন্দবাজারের ব্যয়ভার বহন করতেন তিনি নিজে। শ্রীমৎ সতীশচন্দ্র গোস্বামীর যোগ্য আত্মজ শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামী ছিলেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। রাজবাড়ি তপোবন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য সন্তোষকুমার ঘোষের নাম—পরবর্তীকালে সাহিত্যিক সাংবাদিকরূপে যাঁর খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। সন্তোষকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে একবার দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে আসেন। তখন স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু বাল্যকালে আমি রাজবাড়িতে ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেখেছিলাম, যাঁকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করত, যিনি গুরুর চরণতলে নিজের সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। শিষ্য যদি এত মহান হন তবে তাঁর গুরু যে স্বয়ং অবতারপুরুষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সন্তোষকুমার দেওঘরে এসে খোঁজ করে কেদারনাথ-পুত্র কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (ম্যানেজার, সৎসঙ্গ প্রেস)-র সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে গিয়ে প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামীকে প্রণাম জানিয়ে আসেন।

রাজবাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ অনুযায়ী কর্মকাণ্ডের প্রসারে ব্যাপৃত থাকলেও কেদারনাথের ঠাকুর-সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। সব কাজের মধ্যে মন উচাটন হয়ে ওঠে, অনিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন ঠাকুরের মধুময় সঙ্গের প্রতি। একদিন সহধর্মিণী সাবিত্রী দেবীকে বলেন—চল, শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে যাই। সপ্তাহখানেক বাদেই ফিরে আসব। তখন তাঁদের দুটি কন্যাসন্তান, দুটিই নিতান্ত শিশু। দিন সাতেকের মত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন সাবিত্রী দেবী, রাজবাড়ি থেকে তাঁরা রওয়ান হলেন পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমের উদ্দেশ্যে। সারাদিনে একবেলা আনন্দবাজারে প্রসাদ মিলত—এই ছিল আশ্রমের তৎকালীন আর্থিক সঙ্গতির চিত্র। এই পরিস্থিতিতে রাজবাড়ির মুকুটহীন রাজা কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে হিমাইতপুর আশ্রমে ঠাকুরের পৈতৃক ভদ্রাসনের একটি ঘরে এসে উঠলেন। রাজবাড়ির শহর-জীবনের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা ছেড়ে আশ্রমের একান্ত স্বল্প-উপকরণের জীবনযাত্রা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবারই কথা; কিন্তু মাত্রই সাত দিনের জন্য আশ্রমে আগত কেদারনাথ ঠাকুরের ভুবন-ভোলানো যাদুর ছোঁওয়ায় বাহ্যিক ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সংসার ফেলে থেকে গেলেন হিমাইতপুরে স্থায়িভাবে, আর রাজবাড়ি ফিরলেন না কোনদিন। এই অবস্থান্তরে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার মানের বিপুল পরিবর্তন সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন কেদার-পত্নী, কোনও ক্ষোভ কিংবা বিরূপতা আসেনি তাঁর মনে, ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে পরমপ্রেমময়ের প্রেমসান্নিধ্যের সুযোগ লাভে।

আশ্রমের ব্যয়ভার চালানো হত তখন ঠাকুর-প্রণামী, দান এবং কর্মীগণ সংগৃহীত অর্থে। কোন ভক্তিমতী নিজের গহনা অথবা কেউ কোন স্থাবর সম্পত্তি দান করতে চাইলে ঠাকুর তা সচরাচর গ্রহণ করতেন না। কেদারনাথ একথা জানতেন। কিন্তু তাঁর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল নিজের সবটুকু শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে বিলিয়ে দিতে।

রাজবাড়িতে তাঁর নিজের আয় থেকে গড়ে তোলা বাড়িঘর, ডিসপেনসারি ও

অন্যান্য সম্পত্তি ঠাকুরকে দান করতে মনস্থ করেন তিনি। ঠাকুরের জ্ঞাতসারে এই দান করা সম্ভব নয় বলে তাঁর অজ্ঞাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির দানপত্র তাঁর নামে রেজিস্ট্রি করে কেদারনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করার সময় তাঁর চটির তলায় রেখে দেন। ঠাকুর চৌকি থেকে নেমে চটিতে পা গলাতে গিয়ে সেই দানপত্র দেখতে পান। ইষ্টের চরণে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণের এই নীবর বিনম্র ভঙ্গী সর্বযুগে অনুসরণীয়।

আশ্রমের কর্মীরা কয়েক বছর রাজবাড়ির তপোবন বিদ্যালয় এবং ডিস্‌পেনসারি পরিচালনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আশ্রমের পক্ষ থেকে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নৌকায় করে আশ্রমে নিয়ে আসা হয় এবং স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয়। আশ্রমিক জীবনের কৃচ্ছ্রতা ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে বাকি জীবন অতিবাহিত করেছেন কেদারনাথ, কিন্তু কখনও ঘুণাক্ষরে কারও কাছে তাঁর এই সমর্পণের কথা প্রকাশ করেননি তিনি, উপরন্তু এ বিষয়ে অপর কেউ আলোচনা করলে বিব্রত বোধ করতেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লিখিত 'আলোচনা' পত্রিকায় 'জন্মশতবর্ষে প্রণাম' নিবন্ধের এই অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, কেউ ষোল আনা পেয়েছে কি না তাই বলে দেয় সে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে এক আনা দিয়েছে কিনা। বাবা যা করেছেন, তার ষোল আনা ফল ভোগ করছি আমরা, তাঁর বংশধরেরা। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে রাত প্রায় নয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলার হল-ঘরে বসে আছেন। আমি সামনে বসে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — ওর বাবার রোখ ছিল খুব।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কেদারনাথের পুত্রগণ সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইষ্টস্বার্থী।

হিমাইতপুর আশ্রমে পাকাপাকিভাবে বাস শুরু করার পর কেদারনাথ আশ্রম-বাসীদের চিকিৎসা এবং তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর ইষ্টানুগ দৃপ্ত চলন, চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গমতা এবং আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকতা—সবই তাঁকে বহুদিক থেকে অনন্য করে তুলেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কোন প্রয়োজনে হিমাইতপুর থেকে কলকাতা যেতেন, তখন মাঝে মাঝে তিনিও যেতেন ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুর কলকাতা গেলে প্রায়ই জননী মনোমোহিনী দেবীও কিছুদিন পরই কলকাতা যেতেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে একবার ঠাকুর কলকাতা যাত্রার আগে বারবার জননী দেবীকে বলে যান যে, তিনি যেন কিছুতেই এবার কলকাতা না যান। সেবার ঠাকুরের সঙ্গে কেদারনাথও গেছেন কলকাতা। কিন্তু পুত্রের অদর্শন দীর্ঘদিন সহ্য করতে না পেরে জননী মনোমোহিনী পুত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কলকাতা চলে আসেন। তাঁকে কলকাতায় আসতে দেখেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে মাতৃদেবী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময় কেদারনাথ অনুক্ষণ মাতৃসেবায় নিযুক্ত

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

থাকতেন; তিনিই মাতৃদেবীকে নিয়ে হিমাইতপুর ফিরে আসেন। সর্বক্ষণের জন্য জননীর চরণপ্রান্তে সেবানিরত কেদারনাথকে জননীদেবী বলেন—'দ্যাখ্ কেদার, তোরা আমার আর কী করবি? আমার এই কর্মভোগ আমারই সৃষ্টি। অনুকূলকে আমি ছেলের বেশি ভাবতে পারিনি—এই আমার ব্যারাম। সে যা বলে তাই সত্য হয়। ভূত, ভবিষ্যত সবই ও জানে। ওর কথা না শুনেই আজ আমার এই দুর্ভোগ। অনুকূল বারবারই আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিল, আমি তা শুনিনি। যেখানেই বাৎসল্য সেখানেই তাচ্ছিল্য। পদে-পদে ভুল হয়ে যায়। কর্মফল আর এড়াতে পারলাম না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই অসুস্থতাই জননী দেবীর জীবনের অন্তিম পর্বের সূচনা করেছিল এবং এর ফলেই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কেদারনাথ দীক্ষাদানের অনুমতি প্রাপ্ত হন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর ইষ্টপ্রতিষ্ঠার আরেক অধ্যায়। নিবিড় ঐকান্তিকতায় পরমপুরুষের ভাবধারার অম্লান প্রদীপখানি এক জনপদ থেকে অপর জনপদে বয়ে নিয়ে বেড়ান তিনি—আলোকিত করে তোলেন অসংখ্য মানুষের যাত্রাপথ। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত অক্লান্তভাবে তিনি খুলনা, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের গ্রামে-গ্রামান্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়-বার্তা প্রচার করেন, সংগঠিত করে তোলেন ইষ্টমুখী নানা কর্মকাণ্ড। খুলনা জেলায় সৎসঙ্গ আন্দোলনের তিনিই ছিলেন পুরোধা।

অসাধারণ কর্মশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। সৃজনাত্মক রচনায় তাঁর বিশেষ প্রবণতা এবং পারদর্শিতা ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। তরুণ বয়সে 'জীবন-প্রভাত-গ্রন্থমালা' সিরিজের কয়েকখানি পুস্তিকা রচনা করেন কেদারনাথ, যার মধ্যে 'মহাত্মা গান্ধীর বাল্যজীবন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীক্ষা-পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবান্দোলন সংগঠনে তাঁর বিপুল কর্মোদ্দীপনা এবং বাক্শক্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখনীরও যথাযথ ব্যবহার করেন তিনি। পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সৎসঙ্গী পত্রিকায় নিরলসভাবে লিখতেন তিনি; সেসমস্ত লেখার মধ্যে তাঁর অম্লমধুর রচনা 'পঞ্চপ্রদীপ' বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। দেওঘরে আসার পর ঠাকুরের নির্দেশে তিনি দশ বছর গভীর গবেষণার পর 'Marriage System and Eugenics in Varnasram' শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্যে ঐ সময়ে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থেকে বড় বড় লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতায়াত করে পড়াশুনো করতেন কেদারনাথ। গ্রন্থটি রচনার পর ঠাকুরকে পড়ে শোনান তিনি। বর্ণাশ্রম ও বিবাহ-ব্যবস্থার সঙ্গে সুপ্রজননের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ বিষয়ক গ্রন্থখানি ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচারে বিশেষ সহায়ক। এছাড়াও তাঁর 'Way to Peace', 'The World without Conflict', 'Life Research and Postmortem Arrival' ইত্যাদি পুস্তিকা বিদ্বদ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'আলোচনা' পত্রিকায়ও প্রায়ই তাঁর সুচিন্তিত

সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। চিন্তায় বাক্যে-কর্মে-লিখনে সর্বথা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর আদর্শ-প্রচারই কেদারনাথের সমগ্র সত্তা জুড়ে ছিল। তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা ও আত্যন্তিক অনুরাগ পারিপার্শ্বিক নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে। ১৯৪৮—১৯৫০, এই দু'তিন বছরের মধ্যে পরিবারে ঘনিয়ে এসেছে দুর্দৈব, সহধর্মিণী সাবিত্রী দেবী, দুই কন্যা ও এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু ইষ্টপ্রাণ মানুষটির অন্তরে তা বিচলন আনতে পারেনি, শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে সমর্পিত মন নিয়ে শান্তভাবে অতিক্রম করেছেন এত বড় দুঃখের পাথার। অন্য কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়াই ছিল স্বাভাবিক।

তিনি ঠাকুরকে শুধু স্বোপার্জিত বিষয়-সম্পদই নিবেদন করেননি, উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজের সবখানি, ত্যাগ করেছিলেন পূর্বজীবনের বিপুল অধ্যায়নসঞ্জাত জ্ঞানাভিমানও। ঠাকুরের কাছে নিজেকে নবীন শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অনুভব করতেন তিনি। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাণীটি দিচ্ছিলেন :

'কুচর্চ্চা-ও-গুজববাটা মনের
বিয়োগ ও বিকৃতিই হচ্ছে
প্রধান পরিকর।....'

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার দাস বাণীটি লিখে নিয়ে ঠাকুরকে পড়ে শোনালেন। কেদারনাথ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঠাকুরের কাছে ঐ বাণীর মানে জানতে চাইলে ঠাকুর বলেন,—আপনিই কন না, আমি শুনি। আপনারা লেখাপড়া জানা মানুষ। কত গোছায়ে কইতে জানেন। আমি তো মুখ্যুর শিরোমণি।

এ কথায় লজ্জিত হয়ে নতমস্তকে বিনীতভাবে কেদারনাথ ঠাকুরকে বলেন,—সত্যানুসরণে আছে, 'যাই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর তাই জ্ঞান'। লেখাপড়া করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'জানি' বলে একটা মিথ্যা অহঙ্কার হয়। কিন্তু আপনি যাকে জ্ঞান বলেন, তার বিন্দু-বিসর্গও হয় না। তবে আপনার দয়ায় এইটুকুই বুঝেছি যে, যিনি স্বয়ং জ্ঞানমূর্তি, ক্রমাগত তাঁর সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা করতে-করতে ছিটেফোঁটা সুসঙ্গত জ্ঞান গজালেও গজাতে পারে। আপনার কাছে এসে নিজের অজ্ঞতার মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এবং অন্তঃসারশূন্য অহমিকা কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। এখন ভুল জানাগুলি ভুলতে পারলে বাঁচি। এখন যদি কেঁচে গণ্ডূষ করে অবিমিশ্রভাবে আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারি। বহুদিন নিজের বিকৃত বোধের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার ভাবধারার মূল্যায়ন করতে গিয়ে হয়রান ও ব্যর্থ হয়েছি। খাপছাড়া এলেমেলো নানা ধারণারূপী ভূতগুলি এখন মাথা থেকে নেমে গেলে রেহাই পাই।

প্রত্যুত্তরে দয়াল বলেন,—তাই বেত্তাপুরুষের শরণাপন্ন হতে হয় শৈশবে সশ্রদ্ধ খোলা মন নিয়ে, মনগড়া একদেশদর্শী ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের কয়েদ না হয়ে . . .

প্রকাশক: শান্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

কেদারদা! একটা-একটা ক'রে কত জানবেন? আবার জানাগুলির মধ্যে সঙ্গতিই বা কেমন ক'রে করবেন? তার চাইতে দেহধারী জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি ও প্রেমকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসুন, অনুসরণ করুণ, তাঁর হুকুম তামিল করুন। কোন-কিছুর জন্য নয়, একমাত্র তাঁরই তুষ্টি, পুষ্টি, তৃপ্তি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য। এই মহানেশায় সর্বদা সক্রিয়ভাবে ডুবে থাকুন, মজে থাকুন। আপনার যা জানবার, যা পাবার, যা হবার তার সব কিছুই তাঁর দয়ায় এই পথে সুসিদ্ধ হবে। নিশ্চয় ক'রে বলছি —হবে।...

কেদারনাথ ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার মহানেশায় মগ্ন হয়ে ইষ্ট-প্রোক্ত পথেই চলেছেন এবং তাঁকেই পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন নিজের অস্তিত্ব দিয়ে।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন। জৈষ্ঠ্যের খর তাপে দগ্ধ দেওঘর। অন্যান্য দিনের মতই পুরানদহের নিজ বাসভবন থেকে হেঁটে ঠাকুরবাড়ি যান তিনি, ঠাকুরের সান্নিধ্যে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, সমবেত প্রণামে অংশ নেন। বাড়ি ফিরে রাত্রে সময়মত আহার করে শয্যাগ্রহণ করেন। হঠাৎ ভোরবেলায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে তাঁর এবং ৪ঠা জুন, ১৯৬৩, বেলা দশটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমাপ্তি ঘটে কর্মোজ্জ্বল, দৃঢ়চেতা ইষ্টসর্বস্ব এক মহান ভক্তের ঐহিক অস্তিত্বের। তাঁর প্রয়াণে তৎপুত্র কুমারকৃষ্ণকে পূজ্যপাদ বড়দা বলেন—কেদারদা ছিলেন ভক্তমানুষ। কাউকে কষ্ট না দিয়ে এবং নিজেও কষ্ট না পেয়ে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

তাঁর শারীরিক সত্তার অবসান হলেও তাঁর ইষ্টানুরাগের হোমানল চির প্রজ্জ্বলন্ত হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

প্রফুল্লকুমার দাস

৩রা এপ্রিল, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ —

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রফুল্লকুমার দাস

মহাপুরুষের জীবৎকালে তাঁর আদর্শ জীবনধারার দৃষ্টান্ত এবং সান্নিধ্য, উপদেশ ও নির্দেশ সমসাময়িক জনমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ এবং যথাযথভাবে পরিচালিত করে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে যখন তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভের সুযোগের অবসান ঘটে, তখন মানুষের জন্য থেকে যায় তঁৎকথিত বাণীর অনির্বাণ দীপমালা, যার আলোকে পথ দেখে চলা যায়। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সর্বতো জীবনমুখী বাস্তবানুগ আধ্যাত্মিক দর্শন নিহিত রয়েছে তঁৎকথিত বিপুল সংখ্যক গ্রন্থরাজির মধ্যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পথপ্রদর্শকরূপে। তাঁর বাণীসমূহকে সংকলন ও গ্রন্থন করে যাঁরা সকলের জন্য পরিবেশনের উপযোগী করে তুলেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে মানবজাতির মহামিত্র, পরম সৌভাগ্যবান এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাধন্য। এই বিরল সৌভাগ্য ও বিশিষ্ট দক্ষতার অধিকারীদের অন্যতম প্রধান প্রফুল্লকুমার দাস, সৎসঙ্গ জগতে যিনি 'আলোচনা প্রসঙ্গে'-র সংকলকরূপে চিরবরেণ্য হয়ে থাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত গ্রন্থগুলিকে প্রাথমিকভাবে দু-ভাগে বিভক্ত করা চলে—এক, তঁৎ-প্রদত্ত বাণীচয়ন; দুই, প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনমূলক। ঠাকুর বিভিন্ন বিষয়ে বাণী বা ছড়ার মাধ্যমে তাঁর যে-সমস্ত বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলির সংকলনকে বাণীগ্রন্থ বলা চলে। অপরপক্ষে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য জিজ্ঞাসু ও জীবন-পিপাসু মানুষ তাঁর কাছে এসে তাদের নিজ নিজ প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান পেয়েছে, ঠাকুরের সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনার তাৎক্ষণিক অনুলিখনের সম্পাদিত প্রকাশনগুলি দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত। এই দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত, উপযোগী, প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী গ্রন্থটির উল্লেখ করতে গেলে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' শীর্ষক গ্রন্থটির নাম, এ পর্যন্ত যার বাইশ খণ্ড অবধি প্রকাশিত হয়েছে, আরও বেশ কিছু খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। এই মহাগ্রন্থের সংকলক বেদ-পরিবেশক প্রফুল্লকুমার দাস। তবে শুধুমাত্র 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-ই নয়, ঠাকুরের অধিকাংশ বাণীর অনুলিখন বা গ্রন্থনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি আদৃত হবেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিকাংশ বাণী ও আলোচনা-সমূহের সংগ্রাহক বা অনুলেখকরূপে। বিশ্বচেতনায় ঠাকুরের বাণীসমগ্র যত বেশি দ্যুতিত হবে, সেই দ্যোতনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবেন নিষ্ঠায় চির অতন্দ্র তাপসশ্রেষ্ঠ প্রফুল্লকুমার দাস।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত গোটাপাড়া গ্রামে ১৯১৩ সালের ৩রা এপ্রিল এক ধর্মপ্রাণ বংশে প্রসন্নকুমার দাস ও মানদাসুন্দরী দেবীর পুত্র প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্পবয়স থেকেই ধর্মানুশীলনের অভ্যাস ছিল তাঁর এবং এ বিষয়ে প্রেরণার উৎস ছিলেন মা মানদা দেবী। বরাবর প্রথম স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্ররূপে শিক্ষকদের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। ১৯৩০ বঙ্গাব্দে আইন-অমান্য আন্দোলনে

যোগদান করেন এবং বাগেরহাট সাবডিভিশনে কংগ্রেসের কার্য পারিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলে তীব্র অধ্যাত্ম-অনুসন্ধান। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ-শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের পুত্র অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এবং শ্রীশচন্দ্র সান্যালের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং ১৯৩০ সালেই রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ(মহাপুরুষ মহারাজ)-র কাছে বেলুড় মঠে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

১৯৩১ সালে প্রফুল্ল পাবনা হিমাইতপুর আশ্রমে প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-দর্শনে আসেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে বারবার নিয়ে আসে সৎসঙ্গ আশ্রমে এবং ভাবিত করে তোলে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্বন্ধে। তাঁর নিজের ভাষায় : " . . . আমার মন সর্বদা কাঁদত তাঁকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) রক্তমাংসসংকুল নরদেহে পাবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই জীবনেই আমি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পাব। বুকভরা আশা নিয়ে ব্যাকুল হয়ে নিত্যই আমি কাঁদতাম ও নাম করতাম। সেই ব্যাকুলতা ও কান্নাই আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের রাতুল চরণপ্রান্তে উপনীত করে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসর ধরে আমার মনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নানা প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের প্রবল ঘূর্ণিব্যাত্যা। জীবনজিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরপিপাসা যে মানুষকে যুগপৎ কী বিষামৃত আস্বাদনের অনির্বচনীয় দুরন্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলে, তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মধ্যে আমি পূর্বতন প্রত্যেক মহাপুরুষকে, বিশেষত শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে অনুভব ও উপভোগ করতে পেরেছি, তাই অনন্ত কোটি বর্ষব্যাপী সুপ্রলম্বিত বিবর্তনের কঠোর মধুর বিচিত্র বর্ণাঢ্য লীলার নিগূঢ় সূত্র ও তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করবার সুযোগ আমার ঘটেছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণপ্রান্তে তাঁর উপনীত হওয়ার হৃদয়গ্রাহী কাহিনীটি অতি আকর্ষণীয় শৈলীতে তিনি উপস্থাপিত করেছেন "স্মৃতি-তীর্থে" গ্রন্থের 'পূর্বতনের নবকলেবর' শীর্ষক আখ্যানে। আখ্যানটি সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়ার আকুলতা এবং বাস্তব জগৎ ও জীবনকে ধর্মের ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীণভাবে গড়ে তোলার সমস্যা প্রফুল্লকুমারকে উদ্বেল করে তুলত। এমন সময় সৎসঙ্গের কিছু কিছু গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে—বিশেষত 'নানাপ্রসঙ্গে'-র প্রথম খণ্ড পাঠে তাঁর মনে হয়েছিল যে একটা সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বইটিতে আছে, এবং কথাগুলি যিনি বলেছেন, তিনি উপলব্ধিবান পুরুষ। এর পরে যোগেন্দ্রনাথ হালদার ও শরৎচন্দ্র হালদারের কাছ থেকে অন্যান্য বই এনে পড়তে পড়তে তিনি ক্রমশই আরও বেশি আকৃষ্ট হতে লাগলেন। 'ভাববাণী' (পুণ্যপাঁথি গ্রন্থ) পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল ঈশ্বর ঠাকুরের মুখে স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন।

১৯৩১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করে যাওয়ার পরে প্রফুল্ল প্রায়শ স্বপ্ন দেখতেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মূর্তিতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠছে। এই স্বপ্ন দর্শনে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব এবং বেদনার সৃষ্টি হত—মনে হত, তাঁর প্রিয়তম থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন।

১৯৩৫-এ আবার পাবনা আশ্রমে গিয়ে ঠাকুরকে দেখে তাঁর অত্যন্ত আপনজন বলে মনে হয়, ভাল লাগে সৎসঙ্গীদের খোলামেলা চলন। মনে হয়—সবার সঙ্গেই ঠাকুরের গভীরতম প্রাণের যোগ, সুখে, দুঃখে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তিনি যেন সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন, সহজ মানুষটি, অথচ সবার ঊর্দ্ধে, সবের ঊর্দ্ধে তিনি। মানুষকে সুকেন্দ্রিক করে তোলা, কর্মঠ ও যোগ্য করে তোলা, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুখী করে তোলা, এই যেন তাঁর নেশা ও পেশা, কোন ক্লান্তি নেই এতে তাঁর। মায়ের প্রতি তাঁর আকুল টান, শিশুর মত সরলতা, সর্বগুণের সমন্বয়, নিরাসক্ত চলন, এ-সবই প্রফুল্লর মনকে অশেষভাবে মুগ্ধ করে তোলে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে উঠে ভাবতেন—এত ভাললাগা ভাল না, তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত।

একদিন নিভৃতে ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে তিনি ঠাকুরকে বলেন— রামকৃষ্ণদেবকে আমার খুব ভাল লাগে, তিনি কি আবার কোথাও এসেছেন? এবং এলেও, সে কোথায়?

ঠাকুর উত্তরে বলেন,—খোঁজ, খোঁজ, খুঁজতি থাক, খুঁজতি খুঁজতি মিলে যাবিনি, কোথার থেকে ডুব মেরে কোথায় এসে ওঠেন, তার কি ঠিক আছে?

—তিনি এসেছেন কি না, এবং যদি এসে থাকেন কোথায় এসেছেন—যদি জানেন সোজা কথায় বলুন।

—আমি তো সোজাই কই, তুই বুঝবি ব্যাঁকা, তা আমি ঠেকাব কী করে?

—দৈনন্দিন জীবনে বহু বাস্তব সমস্যা ও প্রশ্নের উদয় হয়, তার সমাধান পাব কী করে?

—'চলার সাথী' বইখানা বগলে করে রাখবি, আর যখন কোন সমস্যার উদয় হয়, বলবি, 'ঠাকুর আমাকে বলে দাও', এই বলে বইখানা খুলবি, দেখবি ওর মধ্যেই সমাধান পেয়ে যাবি।

এই কথা শুনে ঠাকুরের ভক্ত মণীন্দ্রনাথ সেন একখানি 'চলার সাথী' গ্রন্থ প্রফুল্লকে উপহার দেন। ঐ বই নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। ঠাকুরের কথামত বইখানি কাছে রাখতেন এবং বিশেষ কোন সমস্যা-পীড়িত হয়ে বইটি খুললেই দেখতে পেতেন, বিশিষ্ট যে সমস্যাটির সমাধান খুঁজছেন, তারই সমাধান সেই পাতায় লেখা আছে। বারবার এরকম হওয়ায় ঠাকুরের প্রতি তাঁর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। প্রায়ই তখন তিনি ঠাকুরের স্বপ্ন দেখতেন।

কিছুদিন পর আবার ঠাকুরের কাছে আসেন প্রফুল্ল। একদিন সকালে ঠাকুরের কাছে বসে থাকাকালীন তাঁর মনে হয়—শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ মুখেই যদি তাঁর স্বরূপ ব্যক্ত করেন, তা হলে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এমন সময় ঠাকুর-জননী মাতা মনোমোহিনী দেবী সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে মাকে বললেন—'মা, ভৃগুতে কয়, আমি নাকি আর জন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম; তা মা! এত সাধনভজন করলাম, এ-জন্মে আমার একখানা ঘরও তো হল না!' মা উদাসীনভাবে বললেন, 'তোমার ভালোটা তো ফলতে দেখলাম না, খারাপটাই ফলে।' প্রফুল্ল অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন —ঠাকুর নিজমুখেই তো বলছেন, তিনি গত জন্মে রামকৃষ্ণদেব ছিলেন। পরক্ষণেই মনে হল—অনেক সাধক এভাবে মনের ভাব বুঝে কথা বলতে পারেন, ওসব কিছু নয়। কিন্তু তবু তাঁর মনের চঞ্চলতা গেল না। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে আরও অনুপ্রাণিত করে তুললেন এবং ফলত ঠাকুরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হতে লাগল। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল—ইনিই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ঐ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত—ভাবতেন—ঠাকুরের কাছে আর এগোবেন না। কিন্তু কী এক অমোঘ আকর্ষণে আবার তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকটের কথা অবশেষে সংক্ষেপে সংযতভাবে ঠাকুরের কাছেই খুলে বললেন প্রফুল্ল। ঠাকুর বললেন—'তা কেন? তুই তোর ঠাকুর নিয়ে থাকবি। তাঁর স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবি, আর খুব যাজন করবি। এই ভাবে চলতে থাক—তুই তোরটা ছাড়বি কেন ? তবে একান্তই যদি কোথাও কাতকুত হয়ে পড়িস সে অন্য কথা।' ঠাকুরের এই কথায় প্রফুল্লর মন শান্ত হল।

এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর আয়োজন চলছে। প্রফুল্ল সুডেন্টস্ রামকৃষ্ণ সেন্টেনারির অন্যতম সংগঠক হিসাবে এম. এ. ক্লাসের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে যাজন করে ছাত্রসমাজকে মাতিয়ে তুললেন। তবে 'চলার সাথী' বইটি সবসময়ই তাঁর কাছে থাকতো, এবং প্রতিনিয়তই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে প্রেরণা লাভ করতেন।

১৯৩৯ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন সুকিয়া স্ট্রীটে ছিলেন। তখন প্রফুল্ল মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন। একদিন কথা বলতে বলতে ঠাকুর আদর করে তাঁর চিবুক স্পর্শ করাতে তাঁর সারা শরীরে আনন্দের তড়িৎ খেলে যায়। এরপর তাঁর মন অত্যন্ত অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। ধ্যান হয়ে ওঠে সহজসাধ্য, অভূতপূর্ব আনন্দে এবং স্থৈর্যে, প্রশান্তিতে মন যেন উর্ধ্বলোকে আরোহণ করত। পরিপার্শ্বস্থ সবকিছুকে, সমস্ত মানুষকে অতি সুন্দর ও প্রিয় বলে বোধ হত। তিনি বুঝলেন—এ আনন্দানুভূতি ঠাকুরেরই দান।

১৯৩৭ সালে তাঁর এম. এ. পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু শরীর ভাল না থাকায় পরীক্ষা না দিয়ে তিনি লালমণিহাটে তাঁর কাকা নেপালচন্দ্র দাসের কাছে চলে যান।

সেখানে সাপ্তাহিক 'সৎসঙ্গী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'নানাপ্রসঙ্গে', 'কথাপ্রসঙ্গে' ইত্যাদি গভীর অভিনিবেশে পাঠ করেন প্রফুল্ল; বাইবেল, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে পড়েন তিনি। এক বছর এভাবে গভীর অধ্যয়ন, নামধ্যান ও চিন্তার ফলে তাঁর কাছে অকাট্যভাবে প্রতিভাত হল যে পূর্ববর্তী অবতার মহাপুরুষদের বাণীর সঙ্গে ঠাকুরের ভাবধারার কোন বিরোধ তো নেই-ই, বরং আছে যুগোপযোগী পরিপূরণ এবং সর্বাঙ্গীণভাবে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার সুস্পষ্ট, সুসম্পূর্ণ কার্যক্রম।

১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় বসেন প্রফুল্ল। শেষ দিনের পরীক্ষায় 'বর্তমান ভারতের পরস্পর বিরোধী আদর্শনিচয়'—এই বিষয়ের উপর রচনা লিখতে বসে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—এরকম বহুবিধ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর শেষে প্রকৃত সমাধান কোথায়? লেখা থামিয়ে দু'চার মিনিট নাম করার পর ঠাকুরের সর্বসঙ্গতিসম্পন্ন জীবনবাদের মূল তত্ত্বটি তাঁর চোখের সামনে যেন মূর্তি নিয়ে ধরা দিল এবং তিনি সেই তত্ত্ব সুন্দরভাবে পরিবেশন করলেন। ছাত্রজীবনের শেষ পরীক্ষা দিয়ে তিনি যখন হল থেকে বেরোচ্ছেন জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পদক্ষেপ করার জন্য, তখন তাঁর চোখের সামনে একটি মাত্র মুখ জ্বলজ্বল করে ভাসছিল—সে মুখ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের। তাঁর অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটি সত্য— পৃথিবীকে পরিপূর্ণ সত্তা ফিরে পেতে হলে ঐ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ সন্তানের পায়ের তলায় বসেই পেতে হবে।

কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করেন প্রফুল্ল। ইতিমধ্যে স্বপ্নে ও ধ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিদর্শন তাঁর জীবনে যেন নিত্যকার স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে তাঁর মনে আর দ্বন্দ্ব হয় না—যেন একরকমের সমর্পণ করেই বসে আছেন নিজেকে—মনে হয়, দুই-ই এক, এক-ই দুই। বর্তমানের পদতলে প্রত্যক্ষের বেদীমূলে আত্মসমর্পণে তাঁর আর আপত্তি নেই, আবার উগ্র ব্যাকুলতাও তেমন অনুভব করেন না।

কিন্তু পাগল করে তোলাই যাঁর কাজ, তিনি কি সহজে নিস্তার দেবেন? সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে শুয়ে আছেন প্রফুল্ল, বুকে যেন কার স্পর্শ টের পেলেন, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে শুয়ে কে? জীবন্ত স্প র্শ—চেনা মানুষ। কিন্তু পাবনার মানুষটি এখানে এলেন কী করে? এ তাহলে স্বপ্ন। রাতের সুখস্বপ্নের শেষে সকালে তাঁকে দেখবার জন্য মন ব্যথায় টনটন করে। রাস্তায় বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীট ধরে হাঁটছেন—পাশে হেঁটে চলেছেন কে? পাশ ফিরে চেয়ে আর দেখা যায় না তাঁকে। মনের ভ্রম! আবার চলতে শুরু করেন—আবারও মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন তিনি, ফিরে চেয়ে আর দেখতে পাওয়া যায় না। দু'দিন, তিনদিন—রাত্রিদিন একই ভাবে কাটে। স্থির করলেন প্রফুল্ল—এবার পাবনায় গিয়ে সব বলতে হবে তাঁকে। পাথেয়র অসুবিধা ছিল—অযাচিতভাবে বন্ধু সুপ্রকাশ চ্যাটার্জির কাছ থেকে পেয়ে গেলেন টাকা।

রাত্রে পৌঁছলেন পাবনা। সে-রাত্রে আর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না। পরদিন সকালে তাঁর কাছে যেতেই দূর থেকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন,—কি রে কখন

আলি? প্রফুল্ল গত রাত্রে এসেছেন জানিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ানোর পর ঠাকুর বললেন—এম. এ. পাশ করিছিস শুনলাম, এখন করবি কী? প্রফুল্ল বলেন—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ ব্যক্তিগত কথা আছে। কলের পাশে খড়ের ঘরের বারান্দায় মোড়ায় বসে ছিলেন ঠাকুর; প্রফুল্লর কথা শুনে সেখান থেকে উঠে গিয়ে মাতৃমন্দিরের উত্তরে বকুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলেন—কী বলবি বল। আবেগাপ্লুত প্রফুল্ল ধরা গলায় বলেন—সর্বক্ষণ আমার মনে হয়, আপনিই আমার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আমি জানি আপনি আমাকে mislead (বিপথে পরিচালিত) করবেন না। আপনি সত্যি করে বলুন—এ বোধ আমার ঠিক কিনা, না, আমি ভুল পথে চলেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর মুখে কোন জবাব দিলেন না—প্রসন্ন মুখে একটুখানি হেসে স্নেহবিহ্বল দৃষ্টিতে অপাঙ্গে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ যেন বলে দিতে লাগলো—তোর বোধ ঠিক, তোর বোধ ঠিক, আর দেরি করিস না। প্রফুল্লের মনে মুহূর্তেই এক নিশ্চয়াত্মক প্রত্যয় জন্ম নিল যে ইনিই তাঁর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি তো দীক্ষা নিয়েছি ওখানে, আমার কি আর দীক্ষার প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নেওয়া ভাল। নিত্য নামধ্যানের সময় আগেরটা আগে করিস—পরে এটা করিস।

১৯৩৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভাট্টাচার্য্যের মাধ্যমে সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করেন প্রফুল্ল। দীক্ষা নিয়ে আশ্রম থেকে ফেরার আগেই ঠিক হল যে তিনি কিছুদিন পরেই আশ্রমে চলে আসবেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই মে স্থায়িভাবে আশ্রমে চলে এলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হল। তাঁর নিজের ভাষায় উদ্ধৃতিটি এখানে প্রাসঙ্গিক—"একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর মোড়ার উপর বসেছিলেন—অল্প সময়ের জন্য আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সামনে বসে আছেন—অবিকল সেই চেহারা। এ আমার ব্যক্তিগত অনুভব, আমি এর উপর কোন জোর দিতে চাই না, তবে আমার জীবনে এর মূল্য আছে, আর আমার বিশ্বাস এই যে পূর্বতন যে-কোন অবতার মহাপুরুষকেই তাঁতে প্রত্যক্ষ করা যায় ভাবতঃ, তত্ত্বতঃ, স্থূলতঃ। তাঁর স্বচ্ছ, সহজ, সরল দৈনন্দিন জীবনচলনার প্রতিটি ছন্দ মনের কাছে নিয়ে আসে ঈশৈকলক্ষ্য অপরূপ আনন্দলোকের আভাস এবং প্রতিনিয়তই তা মানুষের কাছে প্রকট করে তোলে ভাগবত জীবনের রসধন লীলামাধুর্য—যা কিনা মানুষ যুগে যুগে উপভোগ করেছে সচ্চিদানন্দঘন নরবিগ্রহের নিকট-সান্নিধ্যে। ... তিনি স্নেহময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়। আবার এমন শক্তিমান পুরুষ তিনি, যে যে-ই তাঁর প্রতি উন্মুখ হয়, সে-ই তাঁর দয়ায় এক নবীন আনন্দচেতনায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।

১৯৩৯ সালের জুন মাসে তখন প্রাজাপত্য করছি ও নানাপ্রসঙ্গে চার ভাগের বিষয় সূচী, অধ্যায় সূচী ইত্যাদি তৈরী করছি—তখন একদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের

কথা পড়তে পড়তে ও ভাবতে ভাবতে এমন একটা বিশ্বপ্লাবী আনন্দ ও সার্থকতার অনুভূতি জেগেছিল যে, তখন মনে হয়েছিল যে, শুধু সেইটুকু আনন্দের মূল্যস্বরূপ যদি কোটি কোটি জীবন দুঃখ ভোগ করা লাগে তাও সে দুঃখ দুঃখই নয়। তাঁকে নিয়ে চললে তাঁর দয়ায় মাঝে মাঝেই এমনতর আনন্দের আস্বাদন লাভ করা যায়, তাই দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, আপদ, দোষ, দুর্বলতা, সব সত্ত্বেও জীবনটা পরম উপভোগ্য মনে হয়।..."

১৯৩৯ সালের মে মাসে আশ্রমে চলে আসার পর আশ্রম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন প্রফুল্লকুমার দাস। ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিঋত্বিকের পূত পাঞ্জা পান। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, মননশীলতা এবং জ্ঞানসন্ধিৎসার জন্য ঠাকুর তাঁকে ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্নের একান্ত সচিবের কার্যভার ন্যস্ত করেন এবং ঋত্বিগাচার্য্যও স্নেহ, শাসন ও যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি করে ইষ্টকার্যে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের কথোপকথন ও বাণী অনুলিখনের কাজে প্রফুল্লর সহায়ক হিসাবে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রেবতীমোহন বিশ্বাস, নিখিল ঘোষ, মণিলাল চক্রবর্ত্তী, আতপেন্দ্র রায়চৌধুরী, সুনীল করণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৪২—১৯৪৪, এই তিন বছর অবিভক্ত বাংলার গ্রামগঞ্জ শহরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য ট্যুরিং ব্যাচের নেতৃত্ব দেন প্রফুল্লকুমার। ১৯৪৬ সালে মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। দেওঘরে আসার পর ১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ঠাকুরের নির্দেশে কিছুকাল তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। কিন্তু এই শ্রুতিধর তাঁর মুখ্য যে কীর্তির জন্য সৎসঙ্গ তথা বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা হল শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে আগত অবিরাম জনস্রোতের সঙ্গে ঠাকুরের দৈনন্দিন অথচ অমূল্য কথোপকথন, আলাপ-আলোচনার তাৎক্ষণিক অনুলিখন, এবং পরবর্তী সুসম্পাদনা।

প্রফুল্লকুমার দাস যে-সময়ে আশ্রমে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন, সে-সময়টিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-প্রকাশের যুগ বলা চলে। অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাওয়া তাঁর অমূল্য বাণীনিচয় সেসময় উৎসারিত হয়ে চলেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে; ঋত্বিগাচার্য্যের উপযুক্ত সহকারীরূপে প্রফুল্ল সেই অমিয় সম্পদ আহরণে ও সুগ্রথনে তৎপর হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসঙ্গী যিনি, ঠাকুরের অমিয় সঙ্গ ও করুণায় আকীর্ণ তাঁর জীবনের অঙ্গন। সেই অলোক-সুধার কয়েকটি কণিকা বর্ণিত হল।

দয়ালের লীলামধুর সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর ভক্তের জীবনের পরম সম্পদ, প্রতিক্ষণেই যেন তাঁর এক একটি অভিনব পরিচয় ফুটে ওঠে। এই নিত্য মাধুর্যের সীমা নেই, ভক্তের অস্তিত্বকে ভরিয়ে তোলে তা অনাস্বাদিত আনন্দের রসে। ১৯৪০-এর জুন মাসে ঠাকুর কলকাতা থেকে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করছিলেন আমনুরা প্যাসেঞ্জারে।

একটি থার্ড ক্লাস কামরায় সদলবলে ফিরছেন তিনি, দলের মধ্যে প্রফুল্লও আছেন। ঠাকুরের সামনাসামনি উল্টোদিকের বেঞ্চে বসেছিলেন প্রফুল্ল। রাত একটার পর ঠাকুর তামাক খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রফুল্ল তামাক সেজে তাঁর হাতে নল ধরিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঠাকুর তামাক খাওয়া শেষ করে তাঁর হাঁটুতে ডান হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে নলটি ধরতে ইঙ্গিত করেন। ঠাকুর হাঁটু স্পর্শ করায় প্রফুল্ল চমকে উঠে নল ধরতে গিয়ে ঘুমের ঘোরে কলকে ধরে ফেলেন এবং গরম কলকে হাতে রাখতে না পারায় হাত থেকে পড়ে গিয়ে জ্বলন্ত টিকেগুলি ছড়িয়ে পড়ে। পাছে ঠাকুরের কাপড়ে আগুন ধরে যায় এই ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপরাধীর মত তিনি পোড়া টিকেগুলি গোছাতে লাগলেন। দেখলেন কলকে নীচে পড়ায় ঠাকুরের গায়ে লাগেনি। তবু তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত ও বেদনাহত হয়ে করুণমুখে নীরবে দয়লের ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। এর পরের মধুর বর্ণনা তাঁর ভাষাতেই করা শ্রেয়: "আনন্দ-উত্তাল ভঙ্গীতে স্নেহকরুণ নয়নে দয়ালের তখন সে কী দমকে দমকে হাসি, সমস্ত দেহ তাঁর হাসির হিল্লোলে থরে থরে দুলছে, বিমূঢ় ভাব যে আমার পক্ষে কত অশোভন তা যেন তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীতে ফুটে উঠছে। এই রকম একটা মজাদার ব্যাপার ঘটায় জীবনের একঘেয়েমি ঘুচে গিয়ে যেন একটা অভিনব আনন্দের খোরাক জুটেছে বৈচিত্র্যহীন ট্রেন যাত্রায় এবং ঠাকুর যেন তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন এবং আমাকেও যেন তা উপভোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। এটা যেন কোন ভুল নয়, যেন একটা মজার খেলা, যা না ঘটলে এই অভিনব আনন্দটা মাঠে মারা যেত, ভ্রমণটা স্মরণীয় হত না। ঠাকুরের নীরব অভিব্যক্তি ও অভিনয়ে আমার কাছে তাঁর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি তখন খুশি হয়ে উঠলাম। এই ঘটনার পর সে রাতের মত আমার চোখের ঘুম চলে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই-ই যেন চাইছিলেন, কত মোহন ভঙ্গিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর যে সে-রাত্রে আমার চোখে চোখ রেখে হেসেছিলেন তা আজও মনে পড়ে। বাকি রাত ছিলাম আমি তাঁর রাত্রি জাগরণের সাথী। তিনি যে কতভাবে এই প্রাণে প্রবেশ করেন তার রোম্যান্টিক কাহিনীর কি কোন শেষ আছে? গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে"।

অবিরাম আত্মসংশোধনে উৎসুক প্রফুল্ল একবার কাতরভাবে ঠাকুরকে বলেন—চেষ্টা সত্ত্বেও কতকগুলি দোষত্রুটি এড়াতে পারছি না। এমন অবস্থায় তাহলে কি পরজীবনে আপনার সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ব? আজ এত অহেতুক করুণা উপভোগ করছি, পরজীবনে কি শ্রীচরণতলে ঠাঁই পাব না?

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—কলকাতার গঙ্গা দেখেছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—তার উপর কী থাকে?

—অনেক ময়লামাটি, আবর্জনা, মড়া, ফুল, বেলপাতা, ভালমন্দ কত কী!

—কিন্তু সাগরমুখী স্রোতটা গঙ্গার যদি ঠিক থাকে, তবে সব কিছু নিয়েই ঐ গঙ্গা

সাগরে পৌঁছে যায়। তোমার যদি ইষ্টমুখী গতিটা ঠিক থাকে, তবে সব কিছু নিয়েই ইষ্টের কাছে পৌঁছে যাবে। ভাবনার কিছু নেই। ভালমন্দ নিয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে চল। অবশ্য মন্দকে প্রশ্রয় দিও না। ইষ্টে টান বাড়াও। তাঁকে নিয়ে মেতে থাক।

এমন করেই পরম ত্রাতা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভক্তের আকুল প্রাণকে অভয়বাণীতে আশ্বস্ত করেন।

ঠাকুর তাঁর একান্ত অনুরক্ত ভক্তদের মাঝে মাঝে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। এও তাঁর রহস্যমধুর লীলার অঙ্গ। একসময় তিনি চেয়েছিলেন যে প্রফুল্ল সর্বদা তাঁর কাছে থাকেন। কিন্তু সঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিদের তখন ইচ্ছা ছিল সংগঠনকর্মের জন্য সারা ভারতে তাঁকে ঘুরতে পাঠাবেন। তাঁরা ঠাকুরের কাছে সেই প্রস্তাব করায় তিনি বললেন—সে তো খুব ভাল। পাঠাবেন।

পরে প্রফুল্লকে বললেন—তোকে বাইরে পাঠাতে চাইছে এরা। আমি মত দেব। তুই কিন্তু যাবি না। আমি তোর নিন্দা করব, ওরাও তোকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করবে। সকলেই তোকে ভুল বুঝবে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তুই আমার কাছে থেকে বাণী ও কথোপকথন লিখবি, চিঠিপত্রের উত্তর দিবি। আমার ফাইফরমাস খাটবি। এইসব পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারিস, তোরও লাভ, আমারও লাভ।...

ঠাকুর আরও বলেন— ... তাঁকে পেতে গেলে সব ছাড়তে হয়। সুতোর এতটুকু ফেঁসো থাকলে সূচের মধ্যে ঢুকতে পারে না। তোকে আমি যতি করিনি। কিন্তু তুই খাঁটি যতি হোস, আমি তাই চাই। সাজা যতি নয়, বাস্তবে যতি। কিছু যতি না হলে আমার কাজ হবে না। আমি তোমার মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই।... আমার কথাগুলি মনে রেখো। এবং আমার কথাগুলি পৃথিবীর লোকে যাতে জানতে পারে, সময়মত তার ব্যবস্থা করে যেও।...

শরীর অসুস্থ বলে প্রফুল্ল তাঁর নিজের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—শরীর রুগ্ন হলেও তোমার মাথাটা সাফ আছে। তাই তোমাকে দিয়ে দেওঘরে এসে অবধি এতগুলি বইয়ের ভূমিকা লিখিয়েছি। ভূমিকার focussing ঠিক না থাকলে ঐ রন্ধ্র দিয়ে পরে অনেক গলদ ঢুকে যায়। তাই সেবার তুমি রোগশয্যায় কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও লোক দিয়ে ছড়ার ফর্মা তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম ভূমিকা লিখিয়ে আনার জন্য। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, পরমপিতার কাজে তোমাকে ব্যাপৃত করে তোমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলার। আমি এক ঢিলে অনেক পাখি মারি। ছলে-বলে-কৌশলে তোমাদের ভাল করাটাই আমার লক্ষ্য। আমার স্বার্থই যে তোমরা।

জগৎস্বার্থী জগৎপিতার স্বার্থ এবং স্বার্থ পূরণের যন্ত্র—দুই রূপেই জন্ম সার্থক হয়েছে পূর্ণসমর্পিত প্রাণ প্রফুল্লর।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম থেকেই তাঁর কর্মসাধক প্রফুল্লকে ঘষে-মেজে তৈরি করেছেন।

প্রফুল্ল আশ্রমে চলে আসার অল্পদিন পরেই ঠাকুর তাঁকে ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সংকলিত প্রশ্নোত্তর-মূলক সারবান গ্রন্থ 'নানাপ্রসঙ্গে' চার খণ্ডের বিষয়সূচী ও অধ্যায়সূচী প্রণয়নের নির্দেশ দেন। তিনিও ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী কাজটি করে ঠাকুরকে দেখিয়ে ঠিক করে নেন। এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বলেন ঐটি একবার আশ্রমিক সুপণ্ডিত পঞ্চানন সরকারকে দেখিয়ে নিতে, এবং তাঁকে যে ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে সে-কথা জানাতে বারণ করেন। প্রফুল্ল নির্দেশানুযায়ী পঞ্চানন সরকারকে দেখানোর পরে তিনি আবার কিছুটা পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। ঠাকুরকে প্রফুল্ল সে-কথা জানালে ঠাকুর ঐ পরিবর্তিত রূপেই আর একবার কাজটি করার কথা বলেন। প্রফুল্ল তা-ই করেন। এর পরে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন আগের প্রস্তুত সূচী এবং পঞ্চানন-নির্দেশিত পরিবর্তিত সূচী—দুটিই সঙ্গে নিয়ে পঞ্চানন-সহ প্রফুল্লকে তাঁর কাছে আসতে এবং পরিবর্তিত সূচীটি আগে তাঁর সামনে পড়ে শোনাতে। তদনুযায়ী প্রফুল্ল পঞ্চানন-সহ ঠাকুর সমীপে গিয়ে পঞ্চানন-নির্দেশিত সূচীটি ঠাকুরকে পড়ে শোনালেন। শুনে ঠাকুর খুব প্রশংসা করলেন। এরপরে প্রফুল্লকৃত আগের সূচীটি পড়ে শোনাতে বললেন। সেটিও পড়া হল। পড়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চানন-নির্দেশিত সূচীটির অজস্র প্রশংসা করে শেষে বলেন—ওটার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। তবে আমার মত গোলা লোকের পক্ষে এটা (অর্থাৎ প্রফুল্ল-কৃত সূচী) বুঝতেই সুবিধে।

একথা শুনে পঞ্চানন প্রসন্ন চিত্তে আগের সূচীটিই প্রেসে দিতে বললেন। পরে প্রফুল্ল ঠাকুরের কাছে অকারণে দ্বিতীয় সূচীটি প্রস্তুত করার সময় ও শ্রম নষ্টের কারণ জানতে চাইলে ঠাকুর জানান যে এভাবে পঞ্চাননকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে তাঁর মধ্যে একটু ভুল-বোঝার ভাব দেখা দিত এবং তাতে তাঁর ক্ষতি হত। এরপরে কোমল গম্ভীর স্বরে ঠাকুর বলেন—পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে চলতে শেখা লাগে। মানুষ গড়ে তোলাই আমার মুখ্য কাজ। তোমার যদি সহ্য-ধৈর্য-অধ্যবসায় না বাড়ে, সব রকম মানুষকে নিয়ে চলতে না শেখ তাহলে আমার কাজ ঠিকভাবে করতে পারবে না।

মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে একটা গোটা মানুষ করে তোলাই আমার স্বার্থ। তোমরা কতকগুলি মানুষ যদি ইষ্টকে ভালবেসে বৃত্তি-প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ করতে পার, অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পার এবং তোমাদের মধ্যে যদি সহযোগিতা ও সংহতি থাকে, তোমরাই পারবে সারা ভারতের ও সারা জগতের সব সমস্যার সমাধান করতে। . . . ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা ছাড়া যাদের অন্য কোন ধান্দা থাকবে না, তারাই পারবে পরমপিতার বিশ্বমঙ্গল যজ্ঞের হোতা হতে। . . . তুমি একলা যদি পুরোপুরি আমার হতে পার, তাহলে দেখতে পাবে, কী অঘটন ঘটে যাবে দুনিয়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিরবচ্ছিন্ন সংশোধনী দৃষ্টিস্নাত প্রফুল্ল একটু একটু করে নিজেকে বিবর্তিত করার অসীম সৌভাগ্যে কৃতার্থ হয়েছেন। একদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর ছড়া দিচ্ছেন,

প্রফুল্ল প্যাডের কাগজে লিখে নিচ্ছেন। একটি কাগজের তিন/চার লাইন লেখা হতে না হতেই প্রফুল্ল কাগজটি ছিঁড়ে রাখার উদ্যোগ করছিলেন। তা দেখে ঠাকুর জানতে চাইলেন যে কেন প্রফুল্ল ওরকম করছেন। প্রফুল্ল উত্তরে জানালেন, যাতে অসুবিধা না হয় তাই আগে থাকতেই তিনি ছিঁড়ে রাখছেন। ঠাকুর বলেন যে অত আগে থেকে কাগজ ছিঁড়ে রাখার প্রবণতার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লর সমগ্র জীবন ও চরিত্র বোঝা যায়, বোঝা যায় যে ভবিষ্যতের জন্য সর্বদাই প্রফুল্লর মনে একটা উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা লেগে থাকে, যা ক্ষতিকর। প্রফুল্ল স্বীকার করেন যে কথাটি অত্যন্ত সত্য এবং এজন্য তিনি খুব কষ্ট পান। ঠাকুর পরম আশ্বাসে বলেন—সমস্ত মনপ্রাণ পরমপিতার চিন্তায় ও সেবায় এমনভাবে ডুবিয়ে রাখতে হয়, যাতে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মনে ঠাঁই না পায়। করণীয় করে যেতে হয় আর পরমপিতার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা নিয়ে চলতে হয়। আত্মসমর্পণ ছাড়া মনে প্রশান্তি, স্থৈর্য ও সাম্যভাব আসে না। শিশু যেমন মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে আনন্দে থাকে, ইষ্টসর্বস্ব হয়ে ঐভাবে কর্মঠ চলনে চলতে হয়। এতে ভক্তি, মুক্তি, যোগ, সবই সিদ্ধ হয়। এই দেহেই অমরার অমৃত উপভোগ করা যায় এন্তার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রত্যয়পূর্ণ কথায় প্রফুল্ল দৃষ্টি এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাবনার অভ্যাস ক্রমে তিনি পরিহারে সক্ষম হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সুগভীর দরদ সর্বদাই প্রফুল্লকে বেষ্টন করে থাকত। ১৯৪০-এর প্রথম দিকে ঠাকুর "আর্য্য ভারতবর্ষ" শীর্ষক গানখানি রচনা করেন। একদিন 'নিভৃত-নিবাস' নামে হিমাইতপুর আশ্রমস্থ একটি ঘরে বসে ঠাকুর গানটি বলে চলেন এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তার শ্রুতিলিখন নিতে থাকেন। সামনে প্রফুল্ল উপস্থিত ছিলেন। ঐসময় ওখানে একাধিক লোক থাকা প্রয়োজন নেই মনে করে কৃষ্ণপ্রসন্ন ইশারায় প্রফুল্লকে বাইরে যেতে বলেন। প্রফুল্ল বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। গানটি লেখা শেষ হলে কৃষ্ণপ্রসন্ন বাইরে বেরিয়ে আসার পরে প্রফুল্ল সেটি দেখতে চান। কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন বলেন—তোমাকে পাঠিয়ে আমি তো বেকুব! তোমাকে চলে আসতে বলায় তোমার যদি মন খারাপ হয়ে থাকে, এই ভেবে ঠাকুর বিমর্ষ এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আমি লিখছি, কাছে এমন কেউ নেই যাকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠাই। আমারও ভাল লাগছিল না।

এ কথা শুনে পরম দরদীর অফুরন্ত স্নেহের স্পর্শে প্রফুল্লর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

অসৎ নিরোধ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অনুগামীবৃন্দকে সর্বদা তৎপর ও সতর্ক থাকতে বলতেন। ১৯৬৬ সালে এক বর্ষা-সন্ধ্যায় ঠাকুর দেওঘর আশ্রমের পার্লার নামাঙ্কিত ঘরে নিজের বিছানায় বসে এই বিষয়ক আলোচনা করছিলেন; বিশিষ্ট ভক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র হালদার প্রমুখ অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে প্রফুল্লও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কথায় কথায় প্রফুল্ল জানতে চান যে সঙ্ঘের কর্তাস্থানীয়

কোন ব্যক্তি যদি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা এবং ইষ্টনীতির পরিপন্থী চলনে চলেন, সেখানে কী করণীয়। ঠাকুর উত্তরে জানান—অন্যত্র ঘোঁট না পাকিয়ে তাকেই তা বলা উচিত। উচিত কথা বললে মার খেতে হতে পারে—প্রফুল্লর এই উক্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুর দৃঢ়ভাবে বলেন—মারলে মার খাবি, তবু ভদ্রভাবে যা বলার বলবি। ন্যাকার মত বলবি—আপনি হয়ত ঠিকই করছেন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না।

স্বার্থবুদ্ধি বা ভয়বশত যদি তুমি কোন শক্তিমান লোকের অসৎ চলনের প্রশ্রয় দাও, তবে জেনে রেখো—তুমি তার, তোমার নিজের, সমাজের এবং ইষ্টের সঙ্গে শত্রুতা সাধন করছ এবং তার সমুচিত শাস্তি থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের অভাবে দেশে দিন-দিন পাপীরাই প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তবে পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীকে ঘৃণা করতে নেই। অসৎ-নিরোধের ব্যাপারে মনোবল যেমন থাকা চাই, তেমনই চাই সংযম, শুভবুদ্ধি, কুশলকৌশলী বাক্য ও ব্যবহার।

এমনভাবে প্রতিনিয়ত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রফুল্ল নিজেকে সর্বদিক থেকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়ত-সান্নিধ্য তাঁকে কতখানি যোগ্য এবং সর্বমান্য করে তুলেছিল নিম্নোক্ত ঘটনায় তার পরিচয় মেলে।

প্রফুল্লর মত কৃতী ছাত্র একান্ত তরুণ বয়সে সব ছেড়ে ঠাকুরের কাছে আশ্রমে চলে আসায় তাঁর নিকটজন কেউ কেউ স্বভাবতই ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হন। তাঁর দাদা অমূল্যকুমার দাসও প্রাথমিকভাবে আশ্রমের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু ১৯৪১-এর শেষদিক থেকে অমূল্য বেশ কয়েকবার আশ্রমে যাতায়াত করেন। ১৯৪২-এর শেষদিকে তিনি অনুজ প্রফুল্লর কাছে এসে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি সস্ত্রীক দীক্ষা নেবেন—প্রফুল্ল যেন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে আসেন যে কোন ঋত্বিকের কাছে তাঁরা দীক্ষা নেবেন। প্রফুল্ল এসে ঠাকুরকে সেকথা জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর তাঁকেই তাঁর দাদা-বৌদিকে দীক্ষা দিতে বলেন। এ কথায় প্রফুল্ল আশঙ্কা হয় যে এতে হয়তো তাঁর দাদার দীক্ষা নেওয়ার সংকল্প ভগ্ন হবে। তাই তিনি ঠাকুরের নিত্যসেবকসেবিকাদের অন্যতম, শ্রদ্ধেয় ভক্ত রাধারমণ জোয়ারদারের স্ত্রী সরোজিনী-মায়ের মাধ্যমে তাঁর আশঙ্কার কথা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন। সরোজিনী-মা ঠাকুরকে তা জানালেন, কিন্তু ঠাকুর তাতে গুরুত্ব না দিয়ে আবার প্রফুল্লকেই নির্দেশ দিলেন দাদা-বৌদিকে দীক্ষা দিয়ে দিতে। প্রফুল্ল কিছুটা বিব্রতভাবে দাদাকে সেকথা জানাতেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—ঠাকুর যে অন্তর্যামী, তা আমি আর একবার বুঝলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল—দীক্ষা নিলে তোর কাছ থেকেই নেব। ঠাকুর আমাদের মনের কথা জেনেই এই নির্দেশ দিয়েছেন।

তখন প্রফুল্ল আনন্দিত চিত্তে তাঁদের দীক্ষা দিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐ দীক্ষাপর্বের

অল্প কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্তব্য করেন— "... দীক্ষা নিয়ে এসে ওর (প্রফুল্লর) দাদা কয়—'ঠাকুর, আপনি অন্তর্যামী। আমার বড় ইচ্ছে ছিল, দীক্ষা যদি নিই তো প্রফুল্ল কাছ থেকেই নেব।' শুনে একটা আত্মপ্রসাদ হল যে প্রফুল্ল আমার কাছে পড়ে থেকে দাদার মনে এতখানি দাগ কাটতে পেরেছে।" (আঃ প্রঃ ২২/১০/১৯৪২)।

১৯৪৬ সালে পাবনায় সমাজবাদী কর্মীদের সম্মেলনে সভাপতিরূপে আসেন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া। সেসময় লোহিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় প্রফুল্লকুমার দাসের। ডাঃ লোহিয়া প্রফুল্লকে ভারতের সর্বত্র সমাজবাদ প্রচারের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি জানান—তিনি আর্য ভারতীয় সমাজবাদের পূজারী এবং সংক্ষেপে আদর্শবাদ, সমাজবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আর্য ভারতীয় সমাজবাদের জগতকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গী বিবৃত করেন। তিনি বলেন—জগতের সমস্ত মহাপুরুষগণ একই আদর্শের পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত; পরিবেশ বলতে বোঝায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদ দিয়ে মানুষের বিকাশ ও কল্যাণ হতে পারে না। ইষ্টকৃষ্টি, সমাজ, চতুবর্ণ, চতুরাশ্রম সবকিছুর সমন্বয়েই সামগ্রিক মঙ্গল সম্ভব।

ইংরেজিতে এই সংক্ষিপ্ত আলাপের পর ডাঃ লোহিয়া বলেন—তোমার দৃষ্টি আমার দৃষ্টির তুলনায় অনেক গভীর ও ব্যাপক। তবে এইটুকু বুঝি যে তুমি ধর্মপ্রাণ লোক হলেও শুধু নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত নও, তুমি সবার কল্যাণ চাও। এমনতর ধার্মিক যারা, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি তোমার পথে চলো। আমি আমার পথে চলি। আমাদের উভয়ের ধারায়ই লোকের কল্যাণ হবে এই বিশ্বাস আমি রাখি।

পরে একজন স্থানীয় যুবনেতাকে লোহিয়া বলেন—অধ্যাপক দাস ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও যে এতখানি উদার ও ব্যাপক হবেন তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

উক্ত যুবনেতাটি বলেন—উনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সেবকএবং তাঁর প্রধান কথা হচ্ছে ধর্ম মানে সপরিবেশ বাঁচা বাড়া। উনি ওঁর গুরুর কথাই বলেছেন।

একথা শুনে ডাঃ লোহিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

একবার সাংসদ অনন্ত শায়নম্ আয়েঙ্গার আশ্রমে এসেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার গোপনীয়তা যেন দোভাষী বজায় রাখেন। ঠাকুর বললেন, আমার প্রফুল্ল আছে, ও থাকলে চিন্তার কারণ নেই। প্রায় ঘন্টাখানেক আলোচনায় দোভাষীর কাজ করলেন প্রফুল্ল। অনন্ত শায়নম্ পরে তাঁকে বলেছিলেন—ভারত সরকারের আই. সি. এস.-দের মধ্যে কিন্তু তোমাদের মতো committed লোক কমই। তোমার মত একজন সাথী পেলে আমার খুব আনন্দ হতো। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের প্রত্যয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আর একবার উৎসবের সময় হোম মিনিস্টার বি. এন. দাতার এসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শুনলেন যে বঙ্গভাষী শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই ইংরেজি বোঝেন না। তিনি তখন ঠাকুরকে বললেন—আপনি আমাকে এমন একজন লোক দিন, যে আমি একটা করে

sentence ইংরেজিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা করে বলবে। আমি ত্রিশ মিনিট বলব, সেও ত্রিশ মিনিট বলবে। ডায়াসে পাশাপাশি মাইক থাকবে।

প্রফুল্ল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ঠাকুর বললেন—প্রফুল্ল ইচ্ছা করলে পারে। তিনি বললেন—তা নয়, আপনার যদি দয়া হয় তাহলে পারি। ঠাকুর বললেন—ভাল করে কবি। দাতার সাহবের কথায় অডিয়েন্সকে পাগল করে দিবি। ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে দাতার সাহেবের।

মিটিং-এর মঞ্চে দাতারের এবং প্রফুল্লর মাইক পাশাপাশি রাখা হল। দাতার বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। বক্তৃতার শেষে সমবেত ত্রিশ হাজার শ্রোতার হাততালি আর থামে না। বক্তৃতার পর ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের সামনে এসে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি দাতারের ইংরাজি বক্তৃতার কপিটা আগে পড়ে নিয়েছিলেন? উত্তরে প্রফুল্ল 'না' বলাতে কৃষ্ণপ্রসন্ন বলেন—তাহলে ওঁর বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে অমন করে সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা সংযোজন করলে কি করে? মনে হচ্ছিল গুরুগতপ্রাণ কোন ভক্তের বক্তৃতার তর্জমা হচ্ছে। তোমার অনুবাদ যারা শুনেছে তারা উপকৃত হয়েছে।

প্রফুল্ল বলেন—ঠাকুরের দয়ায় এবং আপনার আশীর্বাদে হয়েছে। আমি কিছু ভেবে বলিনি। ঠাকুর ললিতমধুর ভঙ্গীতে বললেন—মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

প্রফুল্ল আপ্লুত হৃদয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

তাঁর জীবনে নামের সক্রিয়তা বাস্তবভাবে বহুবার অনুভূত হয়েছে। একবার ১৯৪২-এর জুন মাসে ঠাকুরের নির্দেশিত কাজে সাঁওতাল পরগণার বাকুদি গিয়ে রাতে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন প্রফুল্ল। প্রবল জ্বরের ঘোরে ঠাকুরের নাম করে কাঁদতে লাগলেন তিনি; হঠাৎ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—উঠে বসে নাম কর, জ্বর ছেড়ে যাবে।

তিন ঘন্টা দুর্দান্ত বেগে নাম করার পর ভোরবেলা জ্বর ছেড়ে গিয়ে দারুণ খিদে পেল তাঁর। ঠাকুরকে বললেন মনে মনে—এই বিদেশ বিভূঁইয়ে একমাত্র তোমার দয়া ছাড়া প্রাণঘাতী ক্ষুধার হাত থেকে ত্রাণ পাব না। কিছুক্ষণ পরেই সেখানকার ইষ্টভ্রাতা রোহিণী রায় তাঁকে সাদরে নিজের বাড়ি চা খাওয়ার জন্য নিয়ে গিয়ে তাঁর যথোপযুক্ত আহার্যের ব্যবস্থা করেন।

গভীর নামধ্যানের ফলে দেহের অসারতার বোধ এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়। একবার বিছানায় শুয়ে গভীরভাবে নাম করতে করতে প্রফুল্লর হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। প্রাণটা যেন দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তাঁর বিন্দুমাত্র ভয় হল না, বরং এক অপূর্ব মুক্তি ও ব্যাপ্তির স্বাদ অনুভব করলেন তিনি। দূরদূরান্ত ঘুরতে লাগলেন। দেহটার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা অনুভব করলেন। কিন্তু বেশ কয়েক

ঘন্টা পরে হঠাৎ কেমন করে আবার দেহের মধ্যে তাঁর প্রবেশ ঘটল। এই ঘটনার ফলে দেহাতীত সত্তার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নেয়।

একবার পূজ্যপাদ বড়দার (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ তনয়) সঙ্গে শিলচর যান প্রফুল্লকুমার । সেখানে অন্নদা দেব নামে একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অন্নদা দেব নিজ কৌতূহলে প্রফুল্লর একটি জন্মকুণ্ডলী তৈরী করেন। জন্মকুণ্ডলী বিচার করে জ্যোতিষী বলেন—কী আশ্চর্য, আপনার এক দুর্লভ যোগ রয়েছে—এই জন্মই আপনার শেষ জন্ম! কর্মফল ভোগ করার জন্য আপনাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। একথা বলে তিনি পাঁচটি টাকা দিয়ে প্রণাম করেন ক্ষণজন্মা প্রফুল্লকুমার দাসকে। প্রফুল্ল বিব্রতভাবে বলেন—আমারই তো আপনাকে দেওয়া উচিত কিছু . . .। উত্তরে অন্নদা দেব বলেন—না, না। আমি বহু মানুষের ঠিকুজি-কোষ্ঠী নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, অনেক সৎসঙ্গীরও কোষ্ঠী দেখেছি, কিন্তু এরকম যোগ আমার চোখে পড়েনি। আমি জানতাম যে শেষ জন্মের যোগ বলে একটা যোগ রয়েছে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আর কারও কোষ্ঠীতে সে যোগ না পেয়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে ঐ যোগ কারও হয় না। এই প্রথম আপনার কোষ্ঠীফলে আমি এই যোগ দেখলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রফুল্লকুমার দাস রচিত 'স্মৃতি-তীর্থে' গ্রন্থে এবং তৎসংকলিত 'আলোচনা প্রসঙ্গে'-র বহু স্থানে মুক্তির জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। হয়তো এই মুমুক্ষুত্ব তাঁর কোষ্ঠীফলেরই প্রতিফলন।

অন্তর্যামী ও সর্বব্যাপী ঠাকুরের করুণায় অবগাহন করে ধন্য হয়েছে তাঁর জীবন। হয়তো কোন বিষয়ে কখনও তাঁর মনে সংশয় দেখা দিত;তখনই হয়তো দেখলেন যে ঠাকুর এমন বাণী বা কথোপকথন শুরু করলেন যাতে ঐ দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। দূরে বসে আর্তভাবে ডাকলে ঠাকুর টের পেতেন। ১৯৬১ সালে একদিন প্রফুল্ল অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় বসে ঠাকুরকে আকুলভাবে ডাকছেন ও বারবার তাঁর ছবির সামনে মাথা খুঁড়ছেন—মনে হচ্ছে, দয়াল যেন কাছেই আছেন। ঠিক সেই সময় ঠাকুর দেওঘরে সর্বসমক্ষে বললেন—প্রফুল্ল এইমাত্র আমাকে প্রণাম করে গেল।

প্রফুল্লকুমার দাসের জীবনবৃত্তান্ত ঠাকুরের বাণী ও কথোপকথনের ভাণ্ডারীরূপে সবচেয়ে সার্থকভাবে বর্ণনা করা চলে। 'সাহিত্যকৃতি' শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তৃত কথনের প্রয়াস করা হল।

সাহিত্যকৃতি ঃ -

আলোচনা প্রসঙ্গেঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্চর্য মানুষ-পিপাসা এবং চুম্বক ব্যক্তিত্বের টানে বিভিন্ন মতের ও বিচিত্র চরিত্রের অসংখ্য মানুষ এসেছেন দীর্ঘদিন ধরে—তাঁদের মধ্যে অতি সাধারণ দেহাতী গ্রাম্য মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, লেখক, কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সবাই রয়েছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে ঠাকুর তার প্রয়োজনানুসারী কথা বলেছেন, অভিনব সমাধান দিয়েছেন প্রতিটি সমস্যার। এই

প্রকাশক: শাণ্ডিল্য প্রকাশন, কলকাতা।

দৈনন্দিন অথচ সারগর্ভ কথোপকথন ১৯৩৯-এর ১৫ই জুন থেকে প্রফুল্ল তাৎক্ষণিক অনুলিখনের মাধ্যমে সংকলন করে চলেন এবং ১৯৫৮ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে এই অনুলিখন-পর্ব। এই সংকলন সমগ্রই, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' নামে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' নামে বাইশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি খণ্ড এখনও প্রকাশিতব্য।

অনন্যমনা শ্রুতিধর প্রফুল্লকুমারের এই শ্রুতিলিখন ডায়েরি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানার এবং বোঝার পক্ষে অপরিহার্য এক মাধ্যম যা আগামী প্রজন্মের কাছে পরম বিস্ময়কর উপাদান রূপে প্রতিভাত হবে।

এই কথোপকথন গ্রন্থগুলির সংকলন-নৈপুণ্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণীয় উক্তি (৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০) ঃ "প্রফুল্লর বইগুলি তাড়াতাড়ি ছেপে ফেলা দরকার। Conversation (কথোপকথন) গুলি wonderdul (অপূর্ব) জিনিষ হয়েছে। এত সহজ, এত সুন্দর, আমার সামনে যখন পড়ে, আমিই মুগ্ধ হয়ে যাই।" অন্য এক প্রসঙ্গে আর একদিন (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০) ঠাকুর বলেন—"প্রফুল্ল আলোচনা প্রসঙ্গে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললে ভাল হয়। জিনিষগুলি একেবারে supernatural (অতিপ্রকৃত)। ওর কানটাও তেমনি। ভগবান সেইভাবেই সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন এই কাজ করবে বলে। যে-কলমটায় কথাগুলি লিখছে, বাণীগুলি লিখছে তাকে কওয়া যায় পুণ্যলেখনী। এটা রেখে দেওয়া লাগে।"

এছাড়াও, 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' মহাগ্রন্থ এবং তার সঙ্কলক প্রফুল্লকুমার দাস সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার বহু উক্তি করেছেন, যেগুলির মাধ্যমে এ বিষয়ে ঠাকুরের নিজের করা মুল্যায়নের আভাস পাওয়া যায়। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' এবং 'দীপরক্ষী' (দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত) গ্রন্থ থেকে এমনই কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল, যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"প্রফুল্লর দিকে চেয়ে (ঠাকুর) কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—ঐ আর একজন! খাতা-কলম বাগায়েই আছে। আবোল-তাবোল যা কব লিখে ফেলবে। আমি কখন কি কই, তার ঠিক নেই। যত সব পাগলের কাণ্ড।

কেষ্টদা(কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য) জোরদার সমর্থনের সুরে বললেন—আপনার রোজকার কথাবার্তা লিপিবদ্ধ না করে আমরা যে অপরাধ করেছি, ও তার প্রায়শ্চিত্ত করছে।

চতুর-চুড়ামণি এবার কৌতুকজনক ভঙ্গিমায় মাথায় হাত দিয়ে বললেন—ও হরি! আপনিও ঐ চ্যাংড়ার হয়ে ওকালতি শুরু করে দিলেন! বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!" (আঃ প্রঃ, ১৭/৮/১৯৮৪)

"কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— প্রফুল্ল যে নোটগুলি নিচ্ছে, যদি তা ঠিকমত unfold (প্রকাশ) করতে পারে, বিরাট কাম হতে পারে। অবশ্য চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, চিন্তা অনুযায়ী কাজ চাই।" (আঃ প্রঃ, ১৮/৮/১৯৪৮)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

"একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আস্তে বললে প্রফুল্ল বুঝতে পারে না কেন? কিন্তু ভগবান ওর কানটা দিয়েছেন এমন, ওর কিন্তু শোনাই উচিত। আর অনেক সময় যখন কেউ ধরতে পারে না, ও ধরে। ও জন্মেছেই যেন এই কাজের জন্য — আমার কথাগুলি ধরবার জন্য শ্রুতি নিয়ে।" (আঃ প্রঃ, ৫/১০/১৯৪৮)

"শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন— প্রফুল্লকে বলা যায় নারায়ণী কেরাণী। মানুষ কেমন করে কীভাবে বাঁচতে পারে, সে সবই তো লিখে রাখে। যা লেখে সব becoming (বৃদ্ধি)-এর জন্য।" (আঃ প্রঃ, ৩১/১০/১৯৪৮)

"শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের জন্য নির্ম্মীয়মান টিনের ঘরের নিচে বসে বাণী দিচ্ছিলেন। পরম পূজনীয় বড়দাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গত বললেন—প্রফুল্লর কান ঠিক হয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কানটাই অন্যরকম। জন্মই এই কাজের জন্য। Blessed birth (পবিত্র জন্ম)। গণেশের মত লিখছেই। True disciple (প্রকৃত শিষ্য)-এর মত discipline (শৃঙ্খলা)-ও খুব। ধমক দিলে আবার চৈতক ঘোড়ার মত alert (সজাগ) হয়ে ওঠে।" (আঃ প্রঃ, ২৫/১১/১৯৪৮)

"প্রফুল্লকে লিখতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর জন্মই এইজন্য। ওর কান দুটো দেখেছেন? ও যা করেছে, মানুষ পরে বুঝবে—এ জিনিষের দাম কী। কত কথা, কত আলোচনা হয়ে গেছে, এতদিন বরাবর যদি লেখা হত, একটা লাইব্রেরী হয়ে যেত।" (আঃ প্রঃ, ৬/৬/১৯৪৯)

"বই ছাপা সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—আমার বাণীর বইগুলি বের হবার আগে তোর বইগুলি (আলোচনা-প্রসঙ্গে) বের হওয়া দরকার। যখন আমার সামনে পড়িস তখন মনে ভাবি—আমার কথাগুলি কি এত সুন্দর! আমার যদি এমন হয়, তাহলে বাইরের লোকের কতখানি হয় তা তো বুঝতেই পার। আর, শুনিও তো সবার কাছে। যা কয় তাতে তো মনে হয় singularly effective, beautiful and wonderful (অসাধারণ কার্যকরী, সুন্দর এবং বিস্ময়কর)। কোথাও ডাকে আলোচনা (সৎসঙ্গের মুখপত্র) গেলে সবাই নাকি দল ধরে পড়তে শুরু করে দেয়। একজন পড়ে আর দশজনে শোনে। যেন ভাগবতের আসর।" (আঃ প্রঃ, ৩/২/১৯৫০)

"শ্রীশ্রীঠাকুর — . . . conversation (কথোপকথন)-এর নোট যে প্রফুল্ল লিখছে তার পিছনে ওর খাটুনি আছে খুব। জিনিষগুলি অপূর্ব। এত সহজ ও সুন্দর যে, কারও বুঝতে কষ্ট হয় না। ঐগুলি ভাল edit (সম্পাদনা) করে বেরোলে খুব কাজ হবে।" (আঃ প্রঃ, ১৫/১২/১৯৫০)

"শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে লক্ষ করে বললেন—ওর কান দেখে মনে হয়, ওর জন্মই হয়েছিল এ কাজের জন্য। ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো ব্যাস-ট্যাস কবে।" (আঃ প্রঃ,

২৮/৫/১৯৫১)।

"শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ প্রফুল্লর খাতার বাক্সটা এখানে (দুমকায়) নিয়ে আসবার কথা বলতে গিয়ে বললেন—একটা সাম্রাজ্যের চেয়ে ওর দাম বেশী।" (আঃ প্রঃ, ২৭/৮/১৯৫২)

"শ্রীশ্রীঠাকুর চুণীদাকে (রায়চৌধুরী) ডেকে পাঠালেন; চুণীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবদারের সুরে বললেন—আর এক ব্যাপারে তো ঠেকে গেছি। প্রফুল্লর ঐ কলম কেষ্টদা দিয়েছিল। কলম খুব দামী কলম, কিন্তু লিখতে পারছে না। হয় ওটা ভাল করে এনে দেবে, আর যদি ভাল না হলো, আর একটা কলম এনে দেবে ভাল দেখে। বোঝো তো, আমার চলন আর প্রফুল্লর কলম।" (আঃ প্রঃ, ১৯/৩/১৯৫৪)

"শ্রীশ্রীঠাকুর— . . . প্রফুল্ল একেবারে চুর হয়ে গেছে। কোন মহাপুরুষ ও তা আমি জানি না। কিন্তু যা ও পেয়ে গেল, আর কত হাজার পর এতখানি কেউ পাবে জানি না।" (আঃ প্রঃ, ১/৯/১৯৫৪)

"শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে আজ গুরুদায়িত্ব দেন। প্রফুল্লও সেটা সানন্দে গ্রহণ করে।

দয়াল বারবার সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন—প্রফুল্ল আজ আমাকে যে relief (স্বস্তি) দেছে, সে আর কবার না। শুনেছি মায়েদের ছেলেপুলে হলে ঘুমোয়ে পড়ে। এত আরাম পায় যে অসাড়ে ঘুমোয়ে পড়ে। প্রফুল্লর কথা দেওয়ার পর থেকে আমার যেন তেমন লাগছে। আর আমার মনে হয় ও কৌশল যা শিখেছে এতদিনে, তা খাটিয়ে successful (কৃতকার্য) হয়ে যাবে।" (আঃ প্রঃ, ৫/৯/১৯৫৪)

"শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্লর হাতটা দেখ তো (আকুদাকে)।

আকুদা হাত দেখে বললেন—সাহিত্যের যে দার্শনিক দিক সেইটে নিয়ে অনুশীলন করলে ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যে কাণ্ড করিছে! Conversation (কথোপকথন) গুলি এমনভাবে লিখেছে যে তাতে যেন ছবি ফুটে উঠেছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃতের থেকেও বোধহয় ভাল হবে।" (আঃ প্রঃ, ১৭/১০/১৯৫৪)

"শ্রীশ্রীঠাকুর— . . . বইগুলি ভাল করে পড়ে ফেলাও। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-র মধ্যে সব আছে। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' লিখে প্রফুল্ল ভালই করেছিল। ওতে commoner (সাধারণ লোক) -দের সাথে কথাবার্তা আছে। যদিও সব লেখা হয়নি, কিন্তু যা লিখেছে তা-ই খুব। বাইরের লোক কয় দাসমশাই। এবার দাসকে দেখার জন্য যে কত লোক খোঁজ করেছে তার ঠিক নেই।" (দীপরক্ষী, ১৭/১২/১৯৫৮)

"শরৎদা বললেন—প্রফুল্ল চিঠি লিখেছে, কোলকাতায় গিয়ে ওর শরীর ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো হল। কিন্তু এদিকে 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' লেখার কাজে বাধা পড়ে যাচ্ছে। ওগুলির মধ্যে আমার সব কিছু কওয়া আছে। একেবারে Prima facie

(প্রথম দৃষ্ট বিষয়ের)-র মতন। . . . প্রফুল্লর লেখার কতগুলি সুন্দর ধারা আছে।" (দীপরক্ষী, ৫/৮/১৯৫৯)

"শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ, ঐ 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'-র কাজ যা আছে তাড়াতাড়ি করে শেষ কর। এ কথা আমি কই কেন? কারণ, কাল যে আমার কী অবস্থা হবে তা তো আমি জানিনে।

প্রফুল্লদা—শরীরের জন্য একটু অসুবিধা হয়। শরীর ভাল থাকলে আমি ঠিক পেরে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, পার না যে তার একটা কারণ হল স্বাস্থ্য। সেইজন্য পাবনা আমল থেকেই যখন ওগুলি নিতে, তখন তখনই যদি সব গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে তাহলে ভাল হত। তোমার পরিবেশনের ক্ষমতাও আছে। ধর, আগে সন্দেশ দিলে, তারপর একটু বোঁদে দিলে, কি আগেই বোঁদে দিলে। এরকম করে দেবার ক্ষমতা তোমার আছে। আর এইভাবে দিতে পারলে এগুলি মানুষের মাথায় সহজভাবে ঢোকে। এ দিয়ে যা হচ্ছে তা ঐ নানা-প্রসঙ্গে বা কথা-প্রসঙ্গে দিয়ে হবনানে। ওগুলো আর এক ধরনের জিনিষ। এই পরিবেশনের ক্ষমতা সকলের থাকে না। 'ডিশ' সাজানো ক্ষমতার দরকার।..." (দীপরক্ষী, ৯/৮/১৯৫৯)

আলোচনা-প্রসঙ্গে এবং দীপরক্ষী ছাড়াও প্রফুল্ল দাস বিরচিত অপর গ্রন্থ 'স্মৃতি-তীর্থে' গ্রন্থে আলোচনা-প্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রফুল্লকে বলেন—আমি বলি, আমার সামনে বসে লিখিস। এগুলির মধ্যে আমার নিঃশ্বাস থাকছে। এসব ঠিকমত রাখা লাগে। এই খাতাগুলির মধ্যে এমন impulse (সাড়া) থাকছে যে, এগুলি দর্শন করে হয়তো শত শত বৎসর পরে বহুলোক উদ্ধার পেয়ে যাবে।

ঐ গ্রন্থেই উল্লেখিত অপর একটি ঘটনাও স্মরণীয়। ঠাকুরের লেখা নিয়ে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকার দরুন প্রফুল্ল নামধ্যানের অবকাশ পৃথকভাবে তেমন পেতেন না, অথচ রাত্রিতে ঘুমের সময় তাঁর মন এক অপূর্ব আনন্দে নিমজ্জিত থাকত। ঠাকুরের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—যা নিয়ে সব সময় থাকিস, তা হ'লো বেদ না কি যেন কয়, তাই। তার দরুন পরমপিতার দয়ায় এসব হয়।

আলোচনা-প্রসঙ্গে-র কয়েকটি খণ্ডের অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই পুস্তকের যে-সমস্ত পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি পত্রিকা থেকে তার কিয়দংশ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্তব্যগুলির মধ্যে সংকলনের বিষয়বস্তু এবং সংকলক সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ "অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে জড় বিজ্ঞানকে blend করার একটা প্রয়াস শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তায় পরিস্ফুট।... এই পুস্তক প্রণয়নে সংকলয়িতা

তাঁহার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন।"

সাপ্তাহিক দেশ ঃ "আশ্রমের আবাসিক শিষ্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস দিন প্রতিদিনের ডায়েরি রেখেছেন এবং ঠাকুরের অলোচনা, ব্যাখ্যানা ও মন্তব্যের শ্রুতিধর ভাণ্ডারী হিসাবে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে সংগ্রহ করেছেন।"

যুগান্তর ঃ "ঠাকুরের উপদেশগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সংকলয়িতার কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর সংগঠনশক্তি এবং সর্ববিষয়ে বৈজ্ঞানিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গীও পরিস্ফু ট হয়েছে।"

দৈনিক বসুমতী ঃ "এর মধ্যে যে মহামূল্য সম্পদ নিহিত আছে তার পরিমাপ করা দুরূহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ...অত্যন্ত সহজ, যুক্তিসংগত ও অকাট্য ঠাকুরের এ উপদেশবাণী সমূহ যেমন হৃদয়স্পর্শী, তেমনই সহজবোধ্য। সংকলনকারী দাস মহাশয়ের কৃতিত্বও এ ক্ষেত্রে স্বীকার করিতেই হয়।"

Hindustan Standard ঃ "Prafulla Kumar Das has done good job to compile the talks which Thakur Anukulchandra often gave to his disciples."

অখণ্ড জীবন-দর্শন ঃ প্রফুল্লকুমার দাস প্রণীত ২৬৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের চার বছর পর ১৯৭৩-এ। ১৯৬৪ সালের শেষভাগে ঠাকুর সৎসঙ্গের সামগ্রিক ভাবধারা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কথা বলেন। তার অব্যবহিত পরেই প্রফুল্ল এই গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। ধর্ম, কৃষ্টি, দীক্ষা, সাধনা, সৃজনতত্ত্ব, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, বিবাহ, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সদাচার, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি ছাব্বিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এগ্রন্থ এককথায় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-দর্শনের অখণ্ড চিত্রায়ন।

An Integral Philosophy of life ঃ : ৩২০ পৃষ্ঠার ইংরেজি এই গ্রন্থে ঠাকুরের সর্বতো জীবনমুখী ও সর্বপূরক দর্শন ও ভাবধারার সুসংহত রূপায়ন ঘটেছে। প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিতে কেমন করে দিব্যভাবাপন্ন ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড মানবজাতি গড়ে উঠতে পারে—তারই অমিয় সংকেত রয়েছে গ্রন্থটিতে। বিশেষতঃ অবাংলাভাষীদের পক্ষে এই গ্রন্থ ঠাকুরের ভাবধারা আস্বাদনের অনন্য মাধ্যম।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্রপত্রিকার মতামত :—

যুগান্তর ঃ "লেখকের ভাষা সুন্দর, বিশ্লেষণ হৃদয়গ্রহী। পাঠকগণ গ্রন্থটির সর্বত্র একটি প্রত্যয়নিষ্ঠ মনের সন্ধান পাবেন।"

দৈনিক বসুমতী ঃ "গ্রন্থকারের বিদ্যাবত্তা ও প্রগাঢ় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিভাব যেমন বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থের মধ্যে, তেমনি অপরদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত রচিত এই গ্রন্থ 'সৎসঙ্গ'-র ভাবধারার প্রাঞ্জল পরিচয় বহন করে এনেছে।"

অমৃত ঃ "গ্রন্থটির বড় গুণ এর ভাষা এবং দুরূহ তত্ত্ব ও দর্শনচিন্তাকে সহজ করে সাধারণ মানুষের জন্য বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। গ্রন্থ ও গ্রন্থের লেখক অভিনন্দনযোগ্য। বস্তুত গ্রন্থটি সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রহযোগ্য।"

Amrita Bazar Patrika ঃ "The work is an attempt to present in a synthetic way the all embracing ideology of the Preceptor."

The Holy Book ঃ বাহাত্তর দিনের মহাভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীগ্রন্থের নাম পুণ্যপুঁথি। ঠাকুরের অন্তরের গভীরতম ইচ্ছা ছিল, পুণ্যপুঁথির ইংরেজি অনুবাদ হোক। ঠাকুরের ইহলীলাবসানের পর প্রফুল্লকুমার নিজ দায়িত্বে সেই অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেছেন এবং সেই অনুবাদ সৎসঙ্গের ইংরেজি মুখপত্র Ligate -এ প্রকাশিত হয়েছে।

যতি-অভিধর্মের ইংরেজি অনুবাদ ঃ ঠাকুর-প্রদত্ত শ্রমণ ও যতি জীবনে পালনীয় নীতিসমূহ যথা আত্মসমর্পণ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, আত্মবিশ্লেষণ, লোকচরিত্র নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৮৭টি গদ্যস্তবকের বাণী সংকলনের নাম যতি-অভিধর্ম। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের দুরূহ কার্যটি প্রফুল্লকুমার দাস সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন। এখনও তা কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

স্মৃতি-তীর্থে ঃ ক্ষণজন্মা ঋষিসদৃশ মানুষটি ঊনআশি বৎসরে অপটু শরীরে দয়াল ঠাকুরের ভাবধারা যথাযথভাবে পরিবেশনের জন্য তাঁর অনুপম সান্নিধ্যের স্মৃতি-কাহিনী 'স্মৃতি-তীর্থে' গ্রন্থ ভক্ত-পিপাসুদের উপহার দিয়ে নন্দিত হয়েছেন। ১৫১টি শিরোনামের অধীনে ১৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির বিষয়বৈচিত্র্য ঠাকুরের স্মরণোজ্জ্বল কথামালিকার সমাহারে অত্যন্ত আকর্ষক। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ শিরোনাম 'বিবেক-বিতান' থেকে প্রকাশিত 'সপ্তার্চ্চি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বইটির সবকটি অনুচ্ছেদ হয়তো সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'স্মৃতি-তীর্থে' পরিক্রমা প্রেমের, ভালবাসার, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অভিজ্ঞতার, সাধনজগতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যবোধের, বাস্তবে চলার নির্ভুল সংকেতের, সর্বোপরি পরম দয়ালের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির পরশের অভিজ্ঞতা।

A Pilgrimage to Memory ঃ ১৯৯২ সালে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থটি 'স্মৃতি-তীর্থে'-র অনুবাদ। দয়াল ঠাকুরের অনুপম সান্নিধ্যের স্মৃতিমণিকার এই চয়নটি বঙ্গভাষী নন এমন ভক্ত ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীর কাছে অতি আদরণীয়।

অন্যান্য ঃ এতদ্ব্যতীত প্রফুল্লকুমার দাস রচিত অন্যান্য কয়েকটি ঠাকুর বিষয়ক পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। যেমন—আলাপনী ১ম ও ২য় খণ্ড, ঐ এলোরে দুয়ারে, Meaningful Education, In Quest and All in One, বৃদ্ধি কি ও কোনপথে এবং শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়-কৃত Nature's Dharma গ্রন্থের 'প্রাকৃত ধর্ম' নামক

অনুবাদ।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ঠাকুরের ভাবধারা অবলম্বনে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে ঋত্বিক, আলোচনা, ধৃতিদীপা, সপ্তর্চ্চি, Ligate, Becoming ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক বসুমতীতেও তাঁর কিছু মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। Ritvik Manual-এর তৎকৃত অনুবাদ 'ঋত্বিকসাথী' একসময়ে প্রতিটি পাঞ্জাধারী কর্মীর নিত্য পাঠ্য ছিল।

বাণী সংকলন ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত বাংলা গদ্যবাণীর সংখ্যা ১০,৩৯২ ;সাত খণ্ডে প্রকাশিত ছড়ার সংখ্যা ৮,৮২৯ এবং নয় খণ্ডে প্রকাশিত ইংরেজি বাণীর সংখ্যা ২,৪৬৭। এই বিপুল বাণীসমূহের অধিকাংশের সংগ্রাহক ও সংকলক ঠাকুরের অশেষ কৃপাধন্য চিরপ্রসন্ন প্রফুল্লকুমার দাস। উপরন্তু, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণীত গ্রন্থরাজির বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের তাৎপর্য-প্রকাশক গভীর মননশীল মূল্যবান ভূমিকাও তিনি প্রণয়ন করেন।

দূরদর্শন অনুষ্ঠান ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ১০২তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ভারত সরকারের কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত "পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" শীর্ষক তথ্যচিত্রে প্রফুল্লকুমার দাসের মূল্যবান বক্তব্য বহু দর্শকের কাছে মনোগ্রাহী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ দেওঘরে গিয়ে এই বক্তব্য রেকর্ডিং করেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্প্রচার করেন।

তিনি বর্তমানে বেশ কিছুকাল যাবৎ দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে ঠাকুরের মধ্যম পুত্র প্রয়াত বিবেকরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বাসভবন 'বিবেক-বিতান'-এ আছেন। ঠাকুরের পৌত্র পূজনীয় বিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং বিবেক-বিকতানের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও প্রফুল্লকুমারের পুত্র মুক্তেন্দু দাসের সদাজাগ্রত দৃষ্টি এই শ্রুতিধরের নিয়ত স্বস্তি বিধান করে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মানবীয়, জীবনীয় আদর্শবাদ অবিকৃতভাবে পরিবেশন-কারী অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটি কোন বস্তুজাগতিক সমৃদ্ধি পাননি, পেয়েছেন অসংখ্য মানুষের সশ্রদ্ধ ভালবাসা, অনুভব করেছেন প্রেমমূর্তি ঠাকুরের অপরোক্ষ প্রেমানুভব। ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কর্মনিচয় অভূতপূর্বরূপে পরিগণিত হবে। তিনি যেন দেবদেউলের সেই অনির্বাণ প্রদীপখানি যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেবতার প্রসন্ন মুখচ্ছবি ভক্তজনের অন্তরলোকে। পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা, তিনি সুস্থ দেহে আমাদের মধ্যে আরও বহুকাল থেকে বিকীর্ণ করে চলুন দেব-উদ্ভাসক অমিয় আলোকধারা।

এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে
সুভাষচন্দ্রের শয়নকক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি

পরিশিষ্ট - ১

[নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিতামাতা জানকীনাথ বসু এবং প্রভাবতী দেবী সৎমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতার গুরুর প্রতি সুভাষচন্দ্রেরও ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। একধিকবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর- সান্নিধ্যে আসেন এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন প্রসঙ্গে নানাবিধ আলাপ আলোচনা করেন। বর্তমান নিবন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নেতাজীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং আলোচনার কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়েছে। নেতাজী জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা', আশ্বিন, ১৪০৪ সংখ্যায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।]

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

— কুমার কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নেতাজীর পিতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু এবং মাতা শ্রীমতী প্রভাবতী বসু উভয়েই দীক্ষা গ্রহণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণাশ্রিত হয়েছিলেন। নেতাজীর বড়দা এবং বড় বৌদিও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নেতাজীর পিতা এবং মাতা উভয়েরই গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাঝে-মাঝে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে (পাবনা) আসতেন। সৎসঙ্গের গঠনমূলক কাজে তাঁরা সব সময়ই মুক্তহস্তে দান করতেন।

তখন আশ্রমে চলছে সংগঠনের যুগ। নানারকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের বিরাট বিরাট দালান নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ইঁট আশ্রমেই তৈরি করা হত। আশ্রমবাসী দাদা ও মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় নিজেরাই ইঁট কাটতেন। অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং রাতের বেলায় 'ডে-লাইট' জ্বালিয়ে ইঁট কাটা হত। নেতাজীর জননী এই সময় আশ্রমে এলে এই ইঁট কাটায় অংশগ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনেক সময় দালানের জন্য ইঁট, সিমেন্ট, মশলা প্রভৃতি অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে নিজের মাথায় বহন ক'রে যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। এই বিষয়ে তাঁর কোনও বড়লোকী ভাব বা লজ্জা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী মনোমোহনী দেবী কলকাতায় গেলে মাঝে-মাঝে জানকীনাথ বসুর বাড়ীতে উঠতেন। হিমাইতপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য জননী মনোমোহনী দেবী এবং নেতাজী-জননী প্রভাবতী দেবী উভয়েই কলকাতায় জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করতেন। এতে তাঁদের কোনও কুণ্ঠা ছিল না। নেতাজীর পিতামাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের নিয়ে পুরীধামে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁরা যে বিপুল অর্থব্যয় এবং আপ্রাণ যত্নে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গী ভক্তদের সেবা করেছিলেন তা বিস্ময়কর। জানকীনাথের

মৃত্যুর পরও প্রভাবতী দেবী দীর্ঘকাল একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইষ্টের সেবা ক'রে গেছেন। আনন্দবাজারের (সাধারণ ভোজনাগার) ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রতি মাসে একশো টাকা ক'রে জননী মনোমোহনী দেবীর কাছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি নেতাজী-জননীর কী অসীম ভক্তি ছিল নিম্নের ঘটনায় তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বসু বাড়ীর জামাই এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার শ্রীহরিদাস মিত্র ১৪ই মে, ১৯৭৪ তারিখের 'একটি স্মৃতিচারণে' লিখেছেন—

'সেটা বোধহয় ১৯৪১ সাল। আজ থেকে ৩৩/৩৪ বছর আগেকার কথা। আমি একটি নতুন ক্যামেরা সে-সময় কিনেছিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, নেতাজীর মা, যাঁকে আমরা সবাই 'মা-জননী' বলে ডাকতাম, তাঁরই ছবি প্রথম তুলবো। তাঁকে সেই অনুরোধ করলে তিনি খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে নেতাজী ভবনের গাড়ী বারান্দার ছাতে দাঁড়াতে বলাতে তিনি তখনই ছাতে না দাঁড়িয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন এবং পরমুহূর্তে দেখলাম তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একটি বাঁধান ছবি মাথায় ক'রে নিয়ে ছবি তুলবার জন্য দাঁড়ালেন। আমি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন বুঝেছিলাম গুরুভক্তি কাকে বলে।

আমি দীর্ঘকাল জেলে থাকায় এবং নেতাজী-ভবন থেকে নেতাজী-পরিবারের লোকদের অন্যত্র যাওয়ায়, সে অমূল্য ছবিটি কোথায় চলে গেছে জানি না। কিন্তু এ ঘটনাটি আমার মনের গভীরে এমন দাগ কেটে রেখেছে যা কখনও ভুলতে পারি না।'

জনক-জননীর ইষ্টদেবতা ব'লে সুভাষচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পরও দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি কয়েকবার হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের তলায় বসে তিনি বিনীতভাবে কথাবার্তা বলতেন। কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেবার পর পাবনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র পাবনায় আসেন। সেখান থেকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনের জন্য হিমাইতপুর যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসার জন্য একজন ভক্ত তাঁকে একখানি চেয়ার এনে দেন। তখন তিনি সেই ভক্তটিকে বলেন, জনক-জননী আমার গুরু। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার গুরুরও গুরু। তাঁর সামনে আমি চেয়ারে বসতে পারি না। এই বলে তিনি মাটিতেই ব'সে পড়েন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের পুজোর ছুটির পর জানকীনাথ এবং প্রভাবতী দেবী হিমাইতপুর আশ্রমে (পাবনা) আসেন। সেই সময় প্রভাবতী দেবী জননী মনোমোহনী দেবীর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুরীধামে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জননীদেবী সে কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানান। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—'আমার যাওয়া তো মুশকিল। কেন না, আমার পুরী যাওয়ার সংবাদ পেলে সৎসঙ্গীরা যে যেখানে আছে সবাই পুরী যেয়ে

উপস্থিত হবে। তাদের সকলের তাল সামলাতে বোস-মা এবং বোস-দার অনেক বেগ পেতে হবে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা শুনে জানকীনাথ এবং প্রভাবতী দেবী বলেন—'আমরা সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। ভক্তদের সেবা করব, এর চেয়ে অর্থব্যয়ের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কোথায়?' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের এই উত্তর শুনে পুরীধামে যেতে রাজী হলেন।

প্রথমে শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু শ্রীশ্রীবড়মা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে পুরী রওনা হয়ে যান। সেখানে আর্মস্ট্রং রোডে জানকীনাথের পিতার নামাঙ্কিত 'হরনাথ লজ' বাড়িতে ওঠেন। পরে ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২২) জননী মনোমোহিনী দেবী, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীঅনন্তনাথ রায় (মহারাজ), শ্রীনফর ঘোষ প্রমুখ আশ্রম থেকে রওনা হয়ে ২রা জানুয়ারি (১৯২৩) পুরীধামে পৌঁছান এবং হরনাথ লজে ওঠেন। তার পরে ভক্তপ্রবর শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীকিশোরীমোহন দাস প্রমুখ কীর্তনের দল নিয়ে পুরীতে এসে পৌঁছান। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীতে গেছেন শুনে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের অনেক সৎসঙ্গী পুরীতে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের থাকার জন্য আরও কয়েকটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। জানকীনাথ এবং প্রভাবতী দেবী ভক্তদের সেবার জন্য সারাক্ষণ উন্মুখ থাকতেন। তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য হাসিমুখে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। পংক্তিভোজের সময় উপস্থিত থেকে তাঁদের আপ্যায়িত করেছেন। এমনকী সৎসঙ্গীদের বাড়ি ফিরে যাবার জন্য পাথেয় পর্যন্ত দিয়েছেন।

এই সময় পুরীধাম সৎসঙ্গের ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্তনে সর্বদা মুখরিত থাকত। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে আসতেন এবং সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতেন। হরনাথ লজ সব সময়ে আলাপ-আলোচনায় মুখরিত থাকত। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে আগমনে এই অঞ্চলে বিশেষ সাড়া প'ড়ে যায়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ফটো তুলতে রাজী হন। প্রায় দুই মাস শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণসহ পুরীধামে অবস্থান করেন।

সুভাষচন্দ্রের মামা মিঃ জে এন দত্ত দীক্ষাগ্রহণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আই সি এস্-এর চাকুরি গ্রহণ না ক'রে দেশসেবার সঙ্কল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে আসার পরই মামাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। সৎসঙ্গের বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে সুভাষচন্দ্রের পিতামাতার সঙ্গে পূর্ব থেকেই শ্রীসুশীলচন্দ্র বসুর বিশেষ পরিচয় ছিল। দেশবন্ধুর বাড়িতে সৎসঙ্গের কাজকর্ম নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেখানে শ্রদ্ধেয় সুশীলদার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা নিয়ে সুশীলদা তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেন—'ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি আমার গভীর টান ছিল। যেভাবেই হোক, রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন এসে পড়েছি, তখন ঠিক করেছি আর কোনও দিকে না গিয়ে জীবনটাকে এভাবেই বলি দেব।'

ম্যাণ্ডালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার বছর দুয়েক পর সুভাষচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রম (পাবনা) পরিদর্শনে আসেন। শ্রদ্ধেয় সুশীলদা তাঁকে সমস্ত কিছু ঘুরে ঘুরে দেখান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা, কর্ম, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সৎসঙ্গের সমস্ত বিভাগ দেখার পর সুভাষচন্দ্র বলেন— 'আশ্রম বলতে লোকে অবিবাহিত, সংসার বিরাগীদের বাসস্থানই বোঝেন। গৃহী হয়ে আশ্রমজীবন যাপন করার দৃষ্টান্ত এ যুগে আপনারাই প্রথম দেখাচ্ছেন। পরিবার পরিজনদের ভার নিয়ে অভাব- অভিযোগের ভিতর দিয়ে আপনারা যদি এভাবে এগিয়ে যেতে পারেন তাহ'লে গার্হস্থ্য-আশ্রমের আদর্শ রূপ আপনারা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিবাহ-সংস্কার এবং সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনে সুভাষচন্দ্র সুশীলদাকে বলেছিলেন— 'দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনারা যা' বলতে চাইছেন দৃঢ়কণ্ঠে লোকের সামনে তা' ঘোষণা করুন। তাতে একদল লোক আপনাদের ঘোর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে বটে, কিন্তু অপর দিকে এমন কতকগুলি একনিষ্ঠ কর্মী পেয়ে যাবেন যারা আপনাদের আদর্শ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে। তাদের সাহায্যেই কাজ এগিয়ে যাবে। বিরুদ্ধবাদীরা আপনাদের রুখতে পারবে না।'

আশ্রমের প্রতিষ্ঠানগুলি দেখার পর সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসেন এবং ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে পিতা, মাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সুভাষচন্দ্র তার যথাযথ উত্তর দিলেন। তারপর বললেন—আমার মা একবার আশ্রমটি দেখে যেতে বলেছিলেন। তাই আমি দেখতে এলাম। দেখে বেশ ভালই লাগল। ওঁর (সুশীলদার) সঙ্গে সৎসঙ্গের ভাবধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, দেশের জন্য তো অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করলে দেশের প্রকৃত সেবা করা যাবে? এ বিষয়ে আপনার মত কী?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কথা হচ্ছে, দেশের কাজ করতে হলে প্রথমে মানুষ তৈরির প্রোগ্রাম নিতে হবে। ভাল মানুষ পেতে হলেই বিবাহ-সংস্কার আগে করতে হবে। আর, বিয়েগুলি সব compatible (সুসঙ্গত) হ'লেই তা' সম্ভব হবে। Compatible (সুসঙ্গত) মানে হল বর্ণ, বংশ, আয়ু, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব কিছুরই বিহিত সঙ্গতি। বিহিত বিবাহ হলেই ভাল সন্তানাদি আসে। আর তখন তাদের দ্বারা দেশ, সমাজ সবারই কাজ হয়। দাশদা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) যখন আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি এমন উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না যার উপর ভার দিয়ে তিনি একটু সরে দাঁড়াতে পারেন, তার উত্তরে আমি তাঁকে এ কথাই বলেছিলাম।

সুভাষচন্দ্র বললেন—মানুষ তৈরির যে প্রয়োজন আছে তা' আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু তাতে যে বিবাহ-সংস্কারের আশু প্রয়োজন তা ভেবে দেখিনি। বিবেকানন্দও মানুষ তৈরির কথা ব'লে গিয়েছেন, কিন্তু কী ক'রে হবে তা তিনি তেমন করে বলে

যাননি। আমার মনে হয়, তিনি শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছেন। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, ভাল সংস্কারসম্পন্ন শিশু যদি না জন্মায়, শুধু শিক্ষা তাদের বিশেষ কী করতে পারে? বীজ থেকেই তো গাছ হয়। বীজ ভাল হ'লেই গাছ ভাল হবে—এটা আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি। আর, শিক্ষাও দেওয়া দরকার মানুষের সহজাত-সংস্কারকে ভিত্তি ক'রেই। কিন্তু এ তো দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীর্ঘ সময় তো নেবেই। আমরা তো এতদিন জাতির বা সমাজের জন্য কিছুই করিনি। গলদ যা' জমে গেছে তা সাফ করতে সময় নেবে বৈকি। কোনও শর্টকাট প্রোগ্রামে জাতির সত্যিকার কল্যাণ হবে বলে তো আমার মনে হয় না।

আরও নানা কথা হওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে সুভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সুবিধা হ'লে আবার আসতে বললেন। তিনিও মাথা নত করে সম্মতি জানালেন।

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু তাঁর স্মৃতিকথায় আরও লিখেছেন—'সুভাষ-জননী প্রভাবতী দেবী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাই কলকাতা গেলে পর তাঁর সাথে দেখা না করলে অনুযোগ শুনতে হত। তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনার সুযোগ হয়েছে।

'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত তাই নিয়ে একদিন সুভাষ-জননীর সঙ্গে কথা উঠল। তিনি বললেন—'স্বামী-স্ত্রীর মনান্তর কী জিনিস তা আমাদের জীবনে কখনও জানতে পারিনি।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মিল হলে সন্তান-সন্ততি ভাল হয়। সুভাষ-জননী সত্যই রত্নগর্ভা।

'সুভাষের বাল্যকালের কথা বলতে গিয়ে সুভাষ-জননী আমায় বললেন—ছোটবেলা থেকেই ওর ধরনটা ছিল আমার অন্যান্য ছেলেদের চাইতে আলাদা। সে আমার কাছেই শয়ন করত। রাত্রে উঠে একদিন দেখলাম সুভাষ বিছানায় নেই, তার খোঁজে বেরিয়ে দেখি সে খোলা ছাদে হাতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। তাকে ডেকে বললাম —এভাবে শুয়ে আছিস কেন? উত্তরে সুভাষ বলল—তুমি আমাকে নরম বিছানায় শুইয়ে শরীরটাকে নরম ক'রে দিচ্ছ। ভবিষ্যতে এই শরীর দিয়ে আর কোনও শক্ত কাজ করতে পারব না। তাই এইরকম করে শক্ত ছাদে শুয়ে আছি। ছেলের কথা শুনে আমি তো অবাক। তখন তাকে বললাম—তোকে আবার শক্ত কাজ করতে হবে কেন? সুভাষ উত্তর দিল—জীবনে বড় হতে গেলে, দেশের কাজ করতে গেলে শরীর সুদৃঢ় করা দরকার।

'সুভাষ-জননীর মুখে আর একটি কথা শুনেছিলাম সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কিছুদিন পর। গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাকে এসে প্রশ্ন করেন—সুভাষবাবু অসামান্য মাতৃভক্ত, একথা আমরা জানি। আপনাকে

জিজ্ঞাসা না ক'রে কোনও কাজে তিনি হাত দেন না। তিনি বাড়ি ছাড়ার আগে আপনাকে নিশ্চয়ই ব'লে গেছেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনি সেটা অনুগ্রহ করে আমাদের জানিয়ে দেবেন কি?

সুভাষ-জননী সেই রাজকর্ম্মচারীটিকে বলেছিলেন—আপনার এ-কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন। আপনারা আমার বাড়ির চারিদিক গোয়েন্দাদের দিয়ে এমনভাবে ঘিরে রেখেছেন যে একটা কাকও আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এ অবস্থায় আমার ছেলে যে আপনাদের নজর এড়িয়ে কোথাও চলে যাবে এটা একবোরেই অবিশ্বাস্য। তাই আমার ছেলেকে আপনারা কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন আগে তার জবাব দিন। মায়ের এই দৃপ্ত ভাষণে উক্ত অফিসারটি আর বেশি কিছু বলতে পারেননি।'

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ জননেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস তাঁর স্মৃতিকথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে (শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনা থেকে দেওঘরে চলে আসার পর) আমি তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স য়্যাণ্ড টেকনোলজি' পাবনার আশ্রমে টিম-টিম করে চালিয়ে যাচ্ছি। এই সময় শক্তিমন্দিরে (হিমাইতপুর) এক বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যতদূর মনে পড়ে ক্যাপ্টেন দেবনাথ দাস, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা সেখানে যোগদান করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার ও সাহাপাড়ার আরও অনেকে। সৎসঙ্গে তখন অনেক আমেরিকান দীক্ষা গ্রহণ ক'রে কর্ম্মী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। আমেরিকানদের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসী হিসাবে গভীর মাখামাখি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিশীল সে সম্বন্ধে শরৎবাবুর মনে কূট প্রশ্ন জেগেছিল। তাই তিনি একদিন আমার সঙ্গে এ বিষয়ে নিভৃতে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আমি তাঁকে বলি—প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীই তো পথিকৃৎ। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লোকমাতা নিবেদিতার ভূমিকা তো খুব সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যে-সব আমেরিকান আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য পাগল। তাঁদের ধারণা, ভারত স্বাধীন হলে সে বিশ্বে তার নিজস্ব ভূমিকা আরও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে এবং সারা জগতের প্রত্যেক দেশে বাস্তব স্বাধীনতা ও সমুন্নতি এগিয়ে যাবে। এই সব আমেরিকান সৎসঙ্গীরা ভারতের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে সশ্রদ্ধ। তাঁরা ত্যাগী, সদাচারী এবং সাধনশীল।

শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু এ-সব কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হন। তখন তিনি বলেন—এতদিন ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতাম আমার পিতামাতা, বড়দা ও বড়বৌদির গুরু ব'লে। আজ দেখছি তিনি চতুর-চূড়ামণি বিশেষ। বড়-বড় ঘরের আমেরিকান ছেলেদেরও তিনি আজ ভারতপ্রেমী ক'রে তুলেছেন। মনে হচ্ছে, ভগবান ভারতের স্বাধীনতাকে

নানা দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলেছেন। আমি ব্যাপারটাকে মোটেই হাল্কাভাবে দেখছি না। আমি এ ব্যাপারে আশান্বিত, প্রফুল্লবাবু। আপনি আমাদের প্রণাম জানাবেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে।

আনন্দে ওঁর চোখ দুটো চিকচিক করতে লাগল।

বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আমি ওঁকে প্রণাম করতে গেলে শরৎবাবু বললেন—আপনি ঠাকুরের ভক্ত, আপনি আমাকে প্রণাম করবেন না। ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানাবেন এবং সুশীলদার (বসু) সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।'

কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের পরে সুভাষচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রমে (পাবনা) আসেন, সে-কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি। সেদিন ছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। পাবনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে তিনি পাবনা শহরে আসেন। সেখান থেকে তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে আসেন। সম্মেলনে বক্তৃতা শেষ করে আশ্রমে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তিনি সকলের বাধা এবং আপত্তি আগ্রাহ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনের জন্য আশ্রমে আসেন। জননেতা হিসেবে তিনি তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাই তিনি আশ্রমে আসায় খুবই ভিড় হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পদ্মার ধারে বাঁধের ওপর মাটিতে পাতা বিছানায় বসে আছেন। সুভাষচন্দ্র সেখানে এসে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে চেয়ারে না বসে মাটিতেই বসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন এবং এখানে থাকার জন্য বলেন। সুভাষচন্দ্রকে সেই রাতেই ঢাকা রওনা হয়ে যেতে হবে তাই তিনি সেদিন থাকতে পারবেন না জানান। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সুযোগমতো আবার আসতে বলেন। সুভাষচন্দ্র তারপর বিদায় নেন। এটাই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ সাক্ষাৎকার।

ফিরে যাবার সময় সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধেয় সুশীলদাকে (বসু) বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিভৃতে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এত ভিড় যে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। শ্রদ্ধেয় সুশীলদা তাঁকে বলেন যে, ভিড় সরিয়ে তাঁর কথা বলার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাতে রাজি হন না। এতো লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করতে তিনি চাইলেন না।

সুভাষচন্দ্র যখন আশ্রমে আসেন তখন আমি বালকমাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক ভদ্রাসনের একটি ঘরে আমরা বাস করতাম। আমাদের ঘরের সামনে দিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে যেতে হত। সুভাষচন্দ্র যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করে আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে আমি দেখি। সে-কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপর স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পর আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে কলকাতা যাই। এলগিন রোডের নেতাজী ভবনের পাশেই একটি মিশনারি স্কুলে আমার পরীক্ষার সিট পড়ে। ঐ সময় একটি বিশেষ দিনে আমি নেতাজী ভবনে তিনি যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরটি দেখতে যাই। ঐ ঘরের দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি টাঙান ছিল তা আমি দেখি। এর দ্বারা

বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে কতখানি ভক্তি করতেন। এই ঘরটিতেই তিনি অন্তরীণ ছিলেন এবং এখান থেকেই তাঁর ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণ ঘটে। ঐ ঘরের অন্য দেওয়ালে আরও দুইটি প্রতিকৃতি দেখতে পাই। একটি তাঁর পিতার, অন্যটি তাঁর পিতামহের।

আর একটি ঘটনার কথা পরে জানতে পেরেছিলাম। থাইল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে নেতাজী যখন সে-দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বাঙালি অফিসার নেতাজীকে বলেছিলেন—আপনাকে আজ খালি হাতে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে। নেতাজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন—তুমি জান না যে আমি কখনও আমার পিতামাতার গুরুদেবের ছবি, গীতা এবং শ্রীহরির তুলসীর মালা সঙ্গে নিতে ভুলি না। তাতে মনে হয় আমার সঙ্গে আমি যেন একটা সাম্রাজ্য বহন করে নিয়ে চলেছি।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তাঁর সঙ্গে থাকত তা থেকে বুঝতে পারি নেতাজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর হৃদয়ে কত গভীরে স্থান দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বগৃহে অন্তরীণ এবং মহানিষ্ক্রমণের আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু এলগিন রোডের বাড়িতে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন কথাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁদের বলেছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের যে-পথে পরিচালিত করেছেন সেটাই সর্বকালের, সর্ব মানবের পথ—এতে কোনও সন্দেহ নেই। বৈদেশিক শাসন থেকে ভারত যখন মুক্তিলাভ করবে তখন তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে।

নেতাজীর এই কথার পর অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশি কাল কেটে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে তিনি তখন যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনা থেকে দেওঘরে চ'লে আসার পর (দেওঘরে প্রথম ঋত্বিক অধিবেশন) ৩৪তম ঋত্বিক অধিবেশন দেওঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্মীদের ওপর কতকগুলি দায়িত্ব অর্পণ করেন। কর্মীদের উদ্দীপ্ত করার জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা ও সঙ্কল্প যদি জাগে তাহ'লে প্রতিকূলতার মধ্যেও যে কী অসাধ্য-সাধন করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন নেতাজী। অসুস্থ অবস্থায়, নিঃসম্বল একক একটি মানুষ, বিদেশ-বিভূঁইয়ে কী কাণ্ডটাই ঘটিয়ে তুললেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারের কীর্ত্তিকলাপের কথা যত শোনা যায় ততই মন আনন্দে নেচে ওঠে। তোমরাও যদি পরমপিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য, লোকের কল্যাণের জন্য পিছটান ছেড়ে সর্বস্ব পণ ক'রে লাগ তাহলে তাঁর দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হবে।' (৮ই অক্টোবর, ১৯৪৬)

স্বয়ং পুরুষোত্তমের কাছ থেকে নেতাজী যে প্রশংসা পেয়েছেন তার কি কোনও তুলনা আছে?
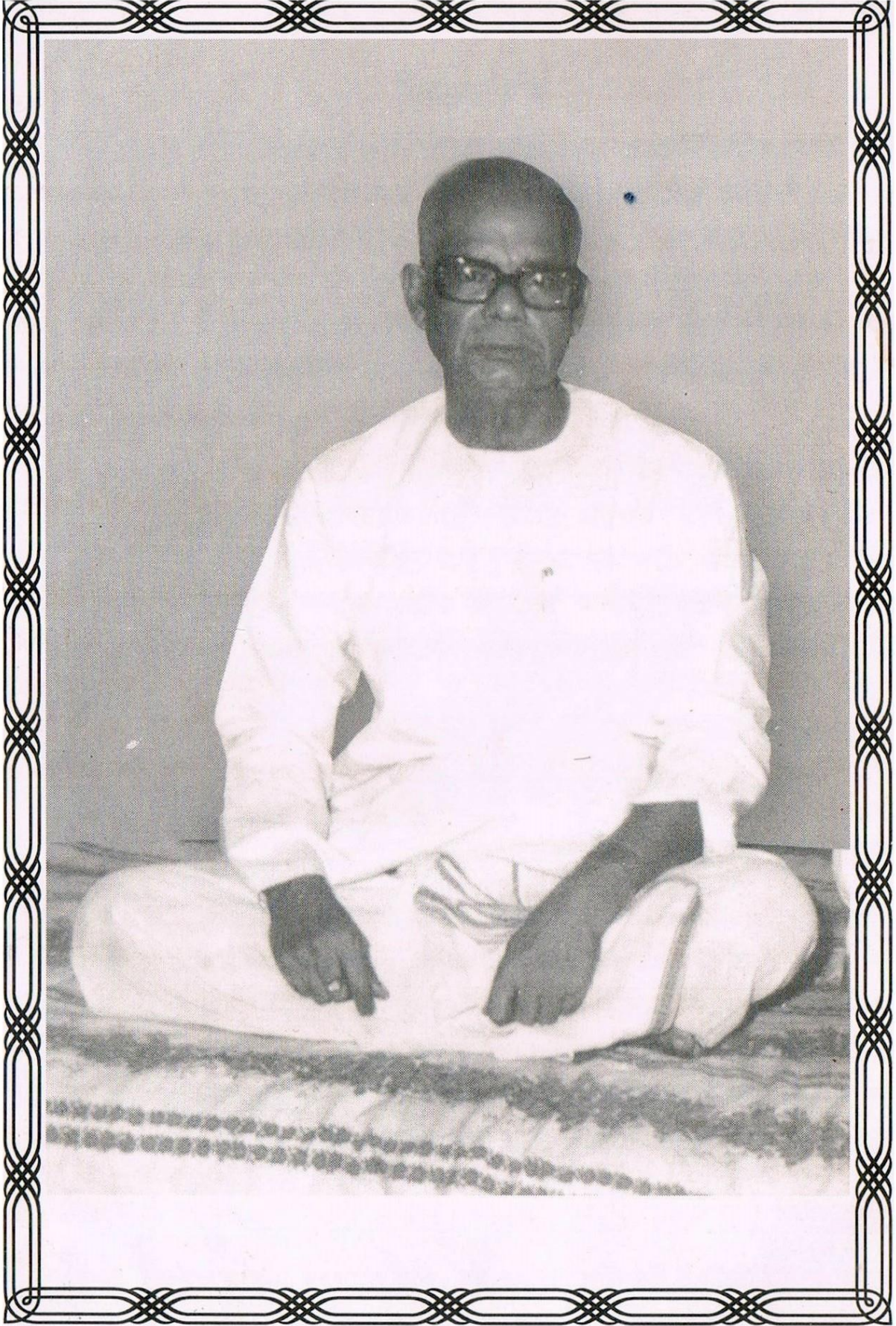
সন্তোষকুমার রায়

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ — ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

পরিশিষ্ট - ২

পিতৃতর্পণ

[আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ডাঃ সন্তোষকুমার রায়, সহপ্রতিঋত্বিক, যাঁর কৃপায় মানবজন্ম লাভ করে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে গ্রহণ করার পরম সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁর পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরই ইষ্টমুখর স্মৃতিকথা "নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে" (সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা', মাঘ, ১৩৮৪ সংখ্যায় পূর্বে প্রকাশিত) এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজন করে পিতৃতর্পণে ধন্য হলাম। এই ছোট নিবন্ধটির মধ্যে তাঁর নিষ্ঠানন্দিত ভক্তজীবনের ও ইষ্টায়িত ব্যবহারিক জীবনের রূপরেখা আভাসিত হয়েছে।

বৃহত্তর সৎসঙ্গ পরিবারের তিনি ছিলেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেবাধর্মে তাঁর আত্মনিয়োগ জীবনের শেষ প্রান্তেও ছিল অব্যাহত। এই ভক্তপ্রাণ মানুষটি বিদেহী হয়েছেন ১৯৮৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। ঠাকুরকেন্দ্রিক তাঁর সূক্ষ্মসত্তা পরমপদেই লগ্ন হয়ে রয়েছেন— এ আমার প্রত্যয়। তিনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের আশীর্বাদ করুন, প্রেরণা জোগান শ্রীশ্রীঠাকুর বিষয়ক সমস্ত কার্যকলাপে—দয়াল ঠাকুরের কাছে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

— ফণিভূষণ রায়।]

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হ'তে

— ডাঃ সন্তোষ কুমার রায়

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইষ্টরূপে পাইয়া জীবন আমার ধন্য। তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিয়া জীবনে পাইয়াছি শান্তি, পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা, মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। তাঁহার দয়া সবসময়েই আমাদের উপর আছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে চার পাঁচবার তিনি আমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাহারই একটা ঘটনা আজ উল্লেখ করিতেছি। এই অধ্যায়টি একটু দীর্ঘ হইবে—তাই পাঠকবর্গের নিকট প্রথমেই ক্ষমা চাহিয়া লইতেছি, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুরূপে পাওয়ার পূর্বের দুই-একটা ঘটনা ইহার সহিত জড়িত।

ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ঢাকা মিডফোর্ড এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করি। দুই জায়গা হইতেই ইনটারভিউ অসিল— আগে আসিল ঢাকার। তাই ঢাকার পথেই রওয়ানা হইলাম। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমারে উঠিলাম, ভাগ্যকুলের নিকট আমাদের পাশেই একজন সুন্দর যুবক তাহার বিছানাপত্র লইয়া বসিলেন। আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম যে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন এবং মেডিক্যাল লজ নামক হোস্টেলে থাকেন। তাঁহার আন্তরিকতায় এবং সাহায্যে আমি ভর্ত্তি হইলাম এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে

বন্ধুত্বও হইল। তাঁহার নাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাহা।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা বীরেনদা একখানা ফটো বাহির করিয়া নিজে প্রণাম করিয়া আমার কপালে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, ইনি জাগ্রত ঠাকুর, ভগবান। ফটোখানা সঙ্গে রাখলে আপদ-বিপদ কিছু আসে না, ফটোখানা তোমার কাছে রেখে দাও।

আমি ফটোখানায় দেখিলাম, সুন্দরকান্তি একজন যুবক শুভ্র বিছানায় একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। পাশে আরও দুই-একটি তাকিয়া। ছবি দেখিয়া মনের কুসংস্কার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, ইনি তো একজন সৌখিন বাবু, ইনি কি করিয়া জাগ্রত গুরু হইতে পারেন। তখন কি জানিতাম যে ইনিই আমার উত্তর জীবনের দিশারী হইবেন, এবং আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া প্রকৃত জীবনের পথে, অমৃতের পথে পরিচালিত করিয়া আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন। আমি ভালভাবে ডাক্তরি পাশ করিয়া ফরিদপুর জেলার কৃষ্ণনগরের বাড়িতে যাই। মা, বাবাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করি। ইহার দুই-তিন দিন পর নিজেদের বাগানের কিছু তরিতরকারি, ফল, কিছু ভাল চাউল ও বড় বড় কিছু কৈ মাছ লইয়া আমার দাদু ও দিদিমাকে ফরিদপুর শহরে প্রণাম করিতে যাই। সংবাদ শুনিয়া দাদু মহাখুশি এবং সেদিনই আমাকে লইয়া হেল্‌থ্ অফিসার শ্রদ্ধেয় ডাঃ অভয়কুমার সরকারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দাদু ফরিদপুর জেলার ভিতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সুদীর্ঘকাল হেডমাস্টারি করিয়াছেন। তাঁহার মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, নিয়মিত গুরুপ্রদত্ত নাম জপ, ধ্যান, সহজ-সরল জীবন, পরোপকারী, স্বাধীনচেতা, নিষ্ঠাবান, নির্লোভি, সত্যনিষ্ঠ লোক খুব কমই দেখা যায়। গ্রামের মাইনর পাশ করিয়া এই দাদুর নিকটে থাকিয়াই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি এবং তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করে।

পূর্বের কথামত আমরা বেলা প্রায় নয়টার সময় অভয়বাবুর বাসায় যাই। অভয়বাবু দাদুকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। দাদুকে দেখামাত্রই অভয়বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া দাদুকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। দাদু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। সরকারি বৃত্তি ও স্বর্ণপদক পাইয়া ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করিয়াছি তাহাও বলিলেন। অভয়বাবু আমাদের মিষ্টি ও চা দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। ঐ বসার ঘরে দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি এবং কিছু ছড়া সুন্দরভাবে টাঙ্গান ছিল। পরে জানিলাম তিনিও সৎসঙ্গী। অভয়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগীর ইন্‌জেক্‌শন্ ও রক্ত পরীক্ষা করিতে পারি কি না। আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম। তিনি পরদিন বেলা দশটার সময় জেলাবোর্ড অফিসে গিয়া ওখানকার ডাক্তারবাবুর নির্দেশমত ইনজেক্‌শন এবং রক্ত লওয়ার জন্য বলিলেন। পরদিন ওখানে গিয়া চার- পাঁচজনকে ইন্‌জেকশন্ এবং শিরা হইতে রক্ত লওয়ার পর একজন বেয়ারা আসিয়া আমাকে বলিল যে বড়সাহেব সেলাম দিয়াছেন। আমি অভয়বাবুর

নিকট যাইতেই তিনি আমার হাতে একখানি নিয়োগপত্র দিয়া বলিলেন, সেইদিনই বিকাল পাঁচটার ট্রেনে আমাকে পাংসার নিকটবর্তী বেলগাছিয়া স্টেশনে নামিয়া ঐ স্টেশনের কাছেই জেলা-ডাকবাংলোতে থাকিতে হইবে। এবং তিনটি কেন্দ্র করিয়া পালাক্রমে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, আমাশা, সর্দিকাশি প্রভৃতির চিকিৎসা করিতে এবং বিনামূল্যে ঔষধাদি দিতে হইবে। একজন পঁচিশ / ছাব্বিশ বছরের যুবককে আমার ঔষধ বাহকরূপে দিলেন। সে খাওয়াদাওয়ার পরিবর্তে আমার রান্না ও অন্যান্য কাজ করিয়া দিবে। ঔষধপত্রাদি সেই যুবকটি বুঝিয়া লইল। আমি বিকাল চারটার সময় ফরিদপুর স্টেশনে গিয়া দুইখানি টিকিট করিয়া রাখিব, সেইমত কথাবার্তা হইয়া রহিল। পূর্ব ব্যবস্থামত আমি স্টেশনে গিয়া দুইখানা টিকিট করিলাম এবং ঔষধ বাহককে খুঁজিলাম, কিন্তু তাহার দেখা নাই। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন আসিল, আমার মালপত্র লইয়া একটি বগিতে উঠিয়া ঔষধ বাহকের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্রমে গাড়ি ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল, ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম তাহাকে না পাইয়া। এই আমার প্রথম চাকুরি, অচেনা জায়গা, মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন— মনে ভাবিলাম, আর যাওয়া হইবে না, পরের স্টেশনে নামিয়া যাইব। এই সময় হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়িল। মনে মনে বলিলাম —ঠাকুর, এই মুহূর্তে যদি আমার ঔষধ বাহক আসে, তবে বুঝিব যে সত্যই তুমি জাগ্রত ভগবান। তখন আমার বগিখানি প্ল্যাটফর্ম্ অতিক্রম করিয়াছে এবং ঔষধ বাহকের আসা অসম্ভব। হঠাৎ দেখিলাম, একজন লোক তীব্র বেগে দৌড়াইয়া আসিতেছে এবং ট্রেনের শেষ কামরায় কোনপ্রকারে হাতল ধরিয়া উঠিল। অবাক বিস্ময়ে দেখিলাম যে সে আমারই ঔষধ বাহক। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর আমার যেন একটু বিশ্বাস জন্মিল।

পরে বি. এম. এস. চাকুরিতে যোগ দিই এবং ভারত বিভাগের সময় ভারতে অপশন্ দিয়া দাদার রেলের কোয়ার্টার নৈহাটিতে আসি। ওখানেই নৈহাটি স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক শ্রদ্ধেয় অমূল্যদা ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয়। ইঁহারা আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের যাজন করেন। কিন্তু আমার মনের সংশয় দূর করিতে পারেন না। এই সময় শ্রদ্ধেয় সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের লেখা তত্ত্বকণা বইখানি এবং শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল দত্তরায় রচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ করিয়া আমার মনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান পাইলাম এবং ১৯৪৮-এ ঋত্বিক-দেবতা বিরাজমোহন ভট্টাচার্য্যের মাধ্যমে সৎনাম প্রাপ্ত হইলাম।

প্রায় এক বৎসর পর আমি সোদপুর ও মধ্যমগ্রামের মধ্যবর্তী বিলকান্দা (তেঘরিয়া) স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার হইয়া আসিলাম। সেবারে দেওঘরে নববর্ষে পুরুষোত্তম স্বস্তি-তীর্থ মহাযজ্ঞে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় চৌদ্দ/পনেরখানি স্পেশাল ট্রেন গিয়াছিল। শিয়ালদহ হইতেও একখানা স্পেশাল ট্রেন যায়। নৈহাটির দুলালদা এবং সিঁথির ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) আমাকে একেকটি পঁচিশ পাতা বিশিষ্ট দুইখানি ঐ ট্রেনের টিকিটের রসিদ বই দেন। আমি আমার পরিবারের সবার জন্য

টিকিট করিলাম এবং পাঁচ/ছয় দিনের মধ্যেই রসিদ বই শেষ করিয়া তাঁহাদের টাকা পাঠাইয়া দিই। ইতিমধ্যে আমার একমাত্র পুত্র ফণিভূষণের জ্বর হইল, বহু ঔষধপত্রেও জ্বর কমিল না। আর মাত্র চার/পাঁচ দিন বাকি স্পেশাল ট্রেন ছাড়িবার; মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনাও করিলাম। শ্রদ্ধেয় যতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী আবির পাঠাইয়াছিলেন। নরেনদাকে প্রতি উৎসবেই অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া দিতাম। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "ছেলের কপালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী আবির মাখিয়ে দাও।" আমার স্ত্রী তাহাই করিলেন। দুই ঘন্টা পর আমার ছেলের অল্প অল্প ঘাম হইতে আরম্ভ করিল এবং ঐদিনই জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল। কিন্তু চব্বিশ /পঁচিশদিন জ্বর ভোগ করিয়া সে খুবই দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিন দিন পর আমরা ঠাকুরবাড়ি যাত্রা করিব স্থির করিলাম। মাতৃদেবী তখন আমার নিকট ছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই অসুস্থ ছেলেকে দেওঘর নিয়ে গেলে ছেলেকে বাঁচাতে পারবি না। তুই একা যা—বৌমারা পরের বার যাবে।" আমি বলিলাম, "মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হতে পারে না। সংকল্প যখন করেছি, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা করেই যাব।" মা অসন্তুষ্ট মনে বলিলেন , "যাবে যাও, তবে কাজটা ভাল হল না—খুব সাবধানে যাবে, ছেলেকে সাবধানে রাখবে।" ঠাকুরবাড়ি গেলাম। আনন্দবাজারের প্রসাদ পাইলাম। অনিয়মও কিছু হইয়াছিল। কিন্তু দয়ালের কৃপায় আমার পুত্র ক্রমে ক্রমে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল।

এবার আমার আসল কথায় আসি। ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার সময় দেড় মাইল দূরে 'সাজিরহাট' নামক স্থানে বিকালে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসিত। আমি সাইকেলে হাটে গিয়া তিন-চার দিনের মত বাজার করিয়া আনিতাম। সেদিন ছিল মাঘ মাসের এক ঘন দুর্যোগপূর্ণ দিন। আকাশ মেঘে ঢাকা—এত ঘন কুয়াশা যে দুই হাত দূরের জিনিস চোখে পড়ে না, সাইক্লোনের মত বাতাস—শীতে হাড়ে কাঁপুনি ধরে। আমি সাইকেলে বাতাসের বিরুদ্ধে যাইতেছি—সামনে তীব্র ঝোড়ো বাতাসে খুব কষ্ট হইতেছিল। পিচের রাস্তার মাঝখান দিয়া প্রায় এক মাইল গিয়াছি। হঠাৎ পিছনে তীব্র হর্ণ শুনিলাম। পিছনে তাকাইয়াই আমি দেখিলাম মাত্র দুই তিন হাত পিছনে দুটি তীব্র আলো ততোধিক তীব্রবেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার চোখ বুঁজিয়া আসিল, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটি শুধু বাঁ দিকে ঘুরাইয়া দিলাম। আমার ডান দিক দিয়া ঝোড়ো বাতাস বহিয়া গেল এবং আমার ডান কানটি যেন ছিঁড়িয়া গেল। আমি সাইকেলসহ রাস্তার পাশে খাদে পড়িয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে সাইকেল লইয়া রাস্তায় উঠিলাম। সাইকেলের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমার শরীরেরও বিশেষ কিছু হয় নাই—শুধু ডান কানের লতির ছাল উঠিয়া গিয়াছে লরীর কাঠের স্পর্শে। কী করিয়া যে সেদিন আমার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ না হইয়া সামান্য কানের একটু আঘাতের উপর দিয়া গেল—তা আজও আমার নিকট পরম বিস্ময়ের । শ্রীশ্রীঠাকুর অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া আনিলেন।